বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ক) ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খ) শামীম বানু
সহযোগী অধ্যাপক
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ আবুল কালাম সরকার
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি. নম্বর ১১/২০০৮-২০০৯
আরবী বিভাগ
ও
সহকারী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট, ২০১১

GIFT

বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ক) ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খ) শামীম বানু
সহযোগী অধ্যাপক
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449955

Dhaka University Library
449955

গবেষক

মোঃ আবুল কালাম সরকার
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নম্বর ১১/২০০৮-২০০৯
আরবী বিভাগ
ও
সহকারী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবুল কালাম সরকার কর্তৃক **বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫** শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ.ডি বা এম.ফিল ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি গবেষণাকর্মটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে গবেষককে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

449355

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১/৮/১১

ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবুল কালাম সরকার কর্তৃক **বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫** শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ.ডি বা এম.ফিল ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি মনোযোগ সহকারে আগাগোড়া পাঠ করেছি। এ গবেষণাকর্মের মৌলিকত্ব বিবেচনা করে আমি গবেষককে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এটি উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

449955

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

1-8-2011

শামীম বানু
কো-তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
আধুনিক ভাষা ইনিস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। এটি কোন যুগ্মকর্ম নয়; বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণা। এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য লিখিত হয়েছে এবং এটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

মোঃ আবুল কালাম সরকার
গবেষক
আরবী বিভাগ
ও
সহকারী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫ শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। দূরূদ ও সালাম নিবেদন করছি নবীকুল শিরোমণি, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, নবী ও রাসূলগণের সরদার, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবী ও তাবে'য়ীদের প্রতি ।

আমি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক-এ অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামীর প্রতি, যাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সক্ষম হয়েছি। তিনি অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে এ অভিসন্দর্ভের আদ্যোপান্ত পাঠ করে সংশোধন এবং পরিমার্জনের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এর জন্য সত্যিই আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও এ অভিসন্দর্ভের সম্মানিত কো-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শামীম বানুর প্রতি, যিনি গবেষণাকর্মকে গতিশীল করতে ও গবেষণাকর্মের সার্বিক সফলতার লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগের অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাসারের প্রতি, যিনি আমাকে গবেষণার মান উন্নত করতে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আমার শ্রদ্ধাভাজন সকল শিক্ষক ও সহকর্মীদের প্রতি, যাঁরা আমার গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় উৎসাহ প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রতি যাঁরা এ গবেষণাকর্মের অগ্রগতির সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ কবির স্যারের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী, তিনি এ গবেষণাকর্মের শিরোনাম নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. সাঈদ-উর-রহমান স্যারের প্রতি, যিনি আমাকে গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময় দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে নিজে সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মো. কামাল উদ্দিনের প্রতি, যিনি গবেষণাকর্মকে গতিশীল করতে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করেছেন। একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমার প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠি ড. মো. আতাউল্যাহর নিকট আমি কৃতজ্ঞ, যার সার্বিক সহযোগিতায় গবেষণাকর্মটি দ্রুত সম্পাদিত হয়ছে।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমার প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠি মুহাম্মদ নোমান শাওকী ও মোহাম্মদ আবুল বাশারের প্রতি, যারা আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

আর যারা প্রতিনিয়ত আমার গবেষণাকর্মে উৎসাহ যুগিয়ে কাজটি সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মোঃ ইসহাক সরকার, বড় ভাবী রাবেয়া খন্দকার - যারা আজীবনই আমার সফলতা দেখতে চেয়েছেন। আমি আরও কৃতজ্ঞ আমার সহধর্মিনী মোসা. আকলিমা আক্তারের প্রতি যিনি এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

এছাড়াও বন্ধুবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ নূরুল আমিন, আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব এম. এ. কাউসার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভূঁঞা ও ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান- যারা নিত্যই আমাকে গবেষণাকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. যুবাইর মো. এহসানুল হকের প্রতি যিনি এ গবেষণকর্মের মানকে উন্নত করতে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে আমি এ গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি সে সব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার মরহুম পিতা-মাতাকে যাঁদের মাধ্যমে এ ধরায় এসে এমন একটি গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম সরকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(ফারসি, আরবী ও উর্দু বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

آ	অ’	ش	শ
ا	আ	ص	স
ب	ব	ض	য
پ	প	ط	ত
ت	ত	ظ	য
ٹ	ট	ع	আ / ‘
ث	স	غ	গ্ব
ج	জ	ف	ফ
چ	চ	ق	গ্ব
ح	হ	ک	ক
خ	খ	گ	গ
د	দ	ل	ল
ڈ	ড	م	ম
ذ	য	ن	ন
ر	র	و	ও / ভ
ڑ	ড়	ه	হ
ز	য	ء	আ
ژ	জ্ব	ی	য়
س	স		
آ	অ’ / া’	اُو	ঊ
اَ	আ / া	اِی	ঈ / ি/ী
ا	এ / ে	او	অও / আও
اُ	ও / ো	ای	এই

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

অনু.	:	অনুবাদক
অনূ.	:	অনূদিত
আ.	:	আলাইহিস সালাম
খ্রি.	:	খ্রিষ্ট/ খ্রিষ্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পূ.	:	পূর্বাব্দ
প্র.	:	প্রকাশ
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
প্রা.	:	প্রাইভেট
মু.	:	মুহাম্মাদ
মো.	:	মোহাম্মদ
মৃ.	:	মৃত/মৃত্যু
র.	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
রা.	:	রাযিআল্লাহু আনহু
সম্পা.	:	সম্পাদিত, সম্পাদনা
সং	:	সংস্করণ
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হি.	:	হিজরী সন
হি.শা.	:	হিজরী শামসী (ইরানী সাল)
Co.	:	company
ed. /eds.	:	edited by, edition, editor, editions
Inc.	:	incorporated
Ltd.	:	limited
p.	:	page
pp.	:	pages
Pub.	:	published, publication
trans.	:	translated, translation, translator
vol.	:	volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র i

প্রত্যয়ন পত্র ii

ঘোষণা পত্র iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iv

প্রতিবর্ণায়ন vii

শব্দ সংকেত viii

সূচিপত্র ix

ভূমিকা ১

অধ্যায় ১ বাংলা–ইরান সর্ম্পক ১৪

১.১ বাংলার পরিচয় ১৪

১.২ ইরানের ভূ-রাজনৈতিক পরিচয় ১৮

১.৩ বাংলা-ইরান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ২৪

১.৪ বাংলা সাহিত্য ও ফারসি সাহিত্য পরিচয় ২৭

১.৫ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক ৩৩

১.৬ বাংলা ভাষা সংগঠনে ফারসি ভাষা সংগঠনের প্রভাব ৩৮

১.৬.১ বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত ফারসি শব্দাবলী ৩৯

১.৬.২ বাংলা ব্যাকরণ ও ফারসি ব্যাকরণের পারস্পরিক সর্ম্পক ৪২

১.৭ বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব ৪৩

১.৮ ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ৪৭

১.৮.১ বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ৪৭

১.৮.২ বাংলা সূফী সাহিত্য ৪৯

১.৮.৩ বাংলা সওয়াল সাহিত্য ৫১

Dhaka University Institutional Repository

১.৮.৪ বাংলা জীবনী সাহিত্য.....৫২
১.৮.৫ বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য.....৫৩
১.৮.৬ বাংলা পুঁথি সাহিত্য.....৫৫

অধ্যায় ২ বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্রমবিকাশ.....৬০

২.১ বাংলায় ফারসি ভাষা চর্চার পটভূমি ও বিকাশ.....৬২

২.২ মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে ফারসি সাহিত্য চর্চা.....৬৩

২.৩ মোগল আমল (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.).....৬৮

২.৪ ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.).....৭৩

২.৫ বাংলায় পরিবার কেন্দ্রিক ফারসি চর্চা.....৭৯
২.৫.১ ঢাকার খাজা পরিবার.....৭৯
২.৫.২ ফরিদপুরের কাজী পরিবার.....৮২
২.৫.৩ সিলেটের মজুমদার পরিবার.....৮৪

২.৬ পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.).....৯১

২.৭ স্বাধীনতা উত্তরকালে ফারসি চর্চা.....৯৫

অধ্যায় ৩ বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্য-অনুবাদের ক্রমবিকাশ.....১০৫

৩.১ অনুবাদ পরিচিতি.....১০৫

৩.২ অনুবাদ প্রকরণ.....১০৯

৩.৩ কবিতার অনুবাদ সমস্যা.....১১৪

৩.৪ ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ.....১১৭
৩.৪.১ পঞ্চদশ শতক.....১১৮
৩.৪.২ ষোড়শ শতক.....১২১
৩.৪.৩ সপ্তদশ শতক.....১২৫
৩.৪.৪ অষ্টাদশ শতক.....১৩৮
৩.৪.৫ উনবিংশ ও বিংশ শতক.....১৫২

অধ্যায় ৪ স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ভাষায় ফারসি অনুবাদকর্ম (১৯৭১-১৯৭৯).....১৭০

৪.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন.....১৭০

৪.২ ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদকর্ম.....১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.১ *রিয়াজ-উস-সালাতিন*..১৭৬
৪.২.২ *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরীন*..১৮১
৪.২.৩ *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*..১৮৫
৪.২.৪ *হুমায়ুননামা*...১৮৮
৪.২.৫ *তবকাত-ই-আকবরী*..১৮৯
৪.২.৬ *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী*..১৯৭
৪.২.৭ *তারীখে ফিরিশ্‌তা*..২০১

অধ্যায় ৫ ইরানের ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদ (১৯৭৯-২০০০)...... ২০৪

৫.১ ইসলামী বিপ্লব ও ইমাম খোমেনী.. ২০৪
৫.২ ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে ফারসি বঙ্গানুবাদ চর্চায় বিপ্লবের প্রভাব..............২১৪
৫.৩ ফেরদৌসীর শাহনামার অনুবাদ.. ২১৫
৫.৪ ওমর খৈয়্যামের রুবাঈয়াতের অনুবাদ... ২২৮
৫.৫ শেখ সা'দীর সাহিত্যকর্মের অনুবাদ.. ২৩৬
৫.৬ মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মাসনবীর অনুবাদ ২৪৭
৫.৭ মহাকবি হাফিজের কাব্যের অনুবাদ... ২৫৪
৫.৮ আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের সাহিত্যকর্মের অনুবাদ ২৬০

অধ্যায় ৬ একুশ শতকে ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদের ধারা (২০০১-২০০৫)..................... ২৯৭

৬.১ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী.. ২৯৭
৬.২ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী... ৩০২
৬.৩ ধর্মীয় গ্রন্থাবলী... ৩২১

উপসংহার ৩৩১

গ্রন্থপঞ্জি.. ৩৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় দু'শতাধিক ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বলা যায় যে, অনুবাদের রীতি এ ভাষাগুলোর প্রত্যেকটিতেই প্রচলিত। লিখিত ইতিহাসে সভ্যতার বিবর্তনের ও রূপান্তরের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় অনুবাদের ধারা আধুনিক নয়, সুপ্রাচীন। ভাষার ভিন্নতা থেকে অনুবাদের সূচনা ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং তথ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সবখানেই অনুবাদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অনুবাদ শিল্প বর্তমানকালে জাতিবর্গের অপরিহার্য কার্যক্রমের অংশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে রেনেসাঁসের আমদানি ঘটিয়ে অনুবাদ এ পর্যন্ত তার সবচেয়ে বড় ভূমিকাটি পালন করেছে।

মধ্যযুগে আরবরা প্রাচীন গ্রীকদের এবং রেনেসাঁসের ইউরোপীয়রা মধ্যযুগের আরবদের জ্ঞানভাণ্ডার অনুবাদের মাধ্যমে আত্মস্থ করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়েছিল। বিদেশী-বিভাষীদের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি অনুরাগের এ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়েছিল অনুবাদ শিল্প। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকেই একদিকে অনুন্নত জাতি উন্নত জাতির, অপরদিকে উন্নত জাতি অনুন্নত জাতির ভাষা থেকে অনুবাদের ধারা চলে আসছে। শুধু পরভাষা থেকে স্বভাষায় নয় স্বভাষা থেকে পরভাষায় অনুবাদের রীতিও অনেক পূর্ব থেকেই চলে আসছে। এছাড়াও একই ভাষার কোন রচনা পূর্ববর্তী কালের ভাষা-রূপ থেকে বর্তমান কালের ভাষা-রূপে রূপান্তরিত করার মাধ্যমেও জানার এবং জানানোর আর অনুভব করার ও অন্যকে অনুভব করানোর গুরুত্ব এক ধরনের অনুবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বর্তমান পৃথিবীতে অনুবাদ জ্ঞানানুশীলন ও সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোর অন্যতম। যে জাতি যত উন্নত সে জাতির অনুবাদের আয়োজনও তত বলিষ্ঠ। বাংলা ভাষার কবিরা পনের শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসি ও আরবী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় কাব্য অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃত থেকে অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকাহিনী ও শাস্ত্রগ্রন্থ, এবং হিন্দী ও ফারসি থেকে অনূদিত প্রণয়োপাখ্যান সেকালে বাঙ্গালীর চিন্তা ও অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করেছে, সেইসঙ্গে বাংলা ভাষাকেও করেছে সংগঠিত, বিকশিত ও উন্নত। মধ্যযুগীয় জীবন ও জগত দর্শনের জীবনাদর্শের ও রীতিনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ সেকালের অনুবাদ গ্রন্থগুলোতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। জীবন দর্শনের বিবর্তনের প্রতিবিম্বও অনুবাদের ধারায় সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

গত প্রায় ছয় দশকের মধ্যে বাংলা একাডেমী, ইসলামিক একাডেমী-পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইকবাল সংসদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইরান কালচারাল সেন্টার এবং আরও কয়েকটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরবী-উর্দু-ফারসি অনুবাদ পরিকল্পনা প্রণীত হয়ে কম-বেশী বাস্তবায়িত হয়েছে।

এ সময়ে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পতত্ত্ব, প্রকৌশল প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়ের গ্রন্থের যেমন অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাসিকের অনুবাদে যেমন অনেকে উদ্যোগী হয়েছেন তেমনি অনেকে আবার সমকালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যবসায়-সফল গ্রন্থের অনুবাদেও আগ্রহী হয়েছেন। অনুবাদে অনেকে সবদিক দিয়ে মূলানুসারী হতে চেষ্টা করেছেন, আবার অনেকে দেশ-কালের চাহিদা অনুযায়ী ভাবানুবাদের রীতি অবলম্বন করেছেন। শিক্ষার উচ্চস্তরে বাংলা প্রচলনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এক দিকে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় সকল বিষয়ের কিছু-না-কিছু পাঠ্যপুস্তক অনূদিত হয়েছে, অন্যদিকে অবসর যাপনের জন্য যারা বই পড়েন তাদের মনোরঞ্জনের জন্য রম্য কিংবা রোমাঞ্চমূলক গ্রন্থও অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অনুবাদকর্ম ছাড়াও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে এ জাতীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আরবী-উর্দু-ফারসি ভাষা হতে ব্যাপকহারে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেমন:

আরবী ভাষা থেকে *অস-সবউল মু'অল্লাকাত* বা *ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক* বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মাওলানা নূরুদ্দীন অনুবাদ করেন।[১] ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিশিষ্ট সাহাবী কা'ব ইবন যুহায়ের রচিত *বানাত সু আ'দ* কাব্য গ্রন্থটি মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত *সাহাবী কবি ও তাঁর অমর কাব্য* শিরোনামে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২] হযরত আলী (রা.) এর অন্যতম কাব্য সম্ভার *দীওয়ানে আলী* শিরোনামে মুহাম্মদ হাসান হরমতী অনূদিত ও আবদুল মুকীত চৌধুরীর কাব্যরূপে, ফজলুর রহমানের সম্পাদনায় ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৩] আব্বাসী আমলের আরবী কবি শরফুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবনুল ফারিদ এর দীওয়ানটি *অশ্রু-সরোবর* নামে শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির কর্তৃক অনূদিত হয়ে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪] রাসুল (স.) এর শানে রচিত জগদ্বিখ্যাত চারটি আরবী কাসিদা মাওলানা রুহুল আমীন খাঁন *কাসীদা সওগাত* শিরোনামে অনুবাদ করেছেন; যা ইসলামিক

---

[১] মাওলানা নূরুদ্দীন আহমদ, *অস-সবউল মু'অল্লাকাত*(ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২)।

[২] ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪)।

[৩] মুহাম্মদ হাসান রহমতী ও আবদুল মুকীত চৌধুরী, *দীওয়ান-ই-আলী*{রা.}-কাব্যানুবাদ (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২)।

[৪] মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, *অশ্রু সরোবর*-দীওয়ানু ইবনিল ফারীদ-এর কাব্যানুবাদ (বরিশাল: শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬)।

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৫] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান *কাসীদাতুল বুরদাহ* ও আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কবির কবিতা *আরব মনীষা* নামে অনুবাদ করেন।[৬] প্রবাসী কবি খলীল জিবরান রচিত *আন-নবী* কবিতার অনুবাদ *দি প্রফেট* নামে আবদুস সালাম মোল্লা কর্তৃক অনূদিত হয়।[৭] আরব ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রচিত *আল মুকাদ্দিমা আরবী কাব্য তত্ত্ব* শিরোনামে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে অনূদিত হয়ে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জিবরান খলীল জিবরান রচিত *আর-রামালু ওয়া আল-যাবাদু* কাব্য গ্রন্থটি কবি আবদুস সাত্তার কর্তৃক *বালি ও ফেনা* শিরোনামে অনূদিত হয়ে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৮] গোলাম সামদানী কোরায়শী রচিত *আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, আবদুস সাত্তার রচিত *আধুনিক আরবী সাহিত্য*, আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন রচিত *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থ সমুহে উপস্থাপিত প্রচুর আরবী কবিতা বাঙলায় অনূদিত হয়েছে।

মিসরীয় কথাশিল্পী ড. নাজিব কিলানী রচিত উপন্যাস *রিহলাতুন ইলাল্লাহি* ও *আত-তারীক আত-তাবীল* মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ কর্তৃক যথাক্রমে *আল্লাহর পথের সৈনিক* ও *রক্ত রঞ্জিত পথ* নামে অনূদিত হয়।[৯] নোবেল বিজয়ী নাজীব মাহফুজ রচিত *আল লিসসু ওয়া আল-কিলাব* এবং আত-তারিক নামে উপন্যাসদ্বয় যথাক্রমে *চোর ও সারমেয় সমাচার* এবং *খোঁজ নামে* আলী আহমদ কতৃক অনুদিত হয়েছে।[১০] মিশরীয় উপন্যাসিক ড. তাহা হুসায়ন এর *দুআ আল-কারওয়ান*, *কোকিলের ডাক* শিরোনামে অনূদিত হয়।[১১]

আহমদ শাওকীর *মাজনূন ওয়া লায়লা* জিবরান খলীল জিবরান এর *ইরামা যাতিল 'ইমাদ* তাওফীক আল হাকীম প্রণীত *নাহরুল মাজনূন*, *আবদুন নীজরু* ও *শাহরাজাদ* নাটকগুলো যথাক্রমে *লায়লি-মজনু*, *গৌরবের রাজধানী*, *উন্মাদের নদী*, *নিগ্রো দাস*, *শাহেরজাদ* শিরোনামে আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত হয়ে *আধুনিক আরবী নাটক* নামে প্রকাশিত হয়।[১২] তাওফীক আল হাকীম রচিত নাটক *সুলতানুজ্জাহান্নাম*, *সম্রাটের দ্বন্দ্ব* নামে মুক্তধারা থেকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তাওফীক আল হাকীমের নাটক *সালাত আল-মালাইকা*, *ফেরেশতার প্রার্থনা* নামে, *আল-শয়তান ফী আল-খতর*,

---

[৫] রুহুল আমীন খান, *কাসীদা সওগাত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪)।

[৬] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *কাসীদাতুল বুরদাহ* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০১)।

[৭] অধ্যাপক আবদুস সালাম মোল্লা (অনু.), *দি প্রফেট* (ঢাকা: গ্রাজুয়েট প্রডাক্ট বিডি লি., ২০০৬)।

[৮] আবদুস সাত্তার-অনুবাদক, *বালি ও ফেনা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৩)।

[৯] মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, *আল্লার পথের সৈনিক* (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৫); মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, *রক্ত রঞ্জিত পথ* (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১)।

[১০] আলী আহমদ, *চোর ও সারমেয় সমাচার* (ঢাকা: বুক ক্লাব, ১৯৯১)।

[১১] মো. জিয়াউদ্দিন সরকার, 'বাংলাদেশে আরবী সাহিত্য চর্চা: সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব', অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০০৮।

[১২] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

সংকটে শয়তান, বাইন আল-হারব ওয়া আস-সালাম, যুদ্ধ ও শান্তির মাঝামাঝি নামে অনূদিত হয়। তাঁর আস-সুলতানুলহায়ের নাটকটি দ্বিধান্বিত সম্রাট শিরোনামে অনূদিত হয়।[১৩]

প্রখ্যাত নয়জন আরবী গল্পকারের গল্পের বাংলা অনুবাদ সংকলন আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত *আধুনিক আরবী গল্প* শিরোনামে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে লায়লা বা লাবাক্কি-র *ভালোবাসার চন্দ্রে*, মাহমুদ দীআব-র *আমার বাড়ী*, মাহমুদ তাইমুর-র *মৃত্যু*, যুনযুন আইয়ুব-র *অভিপ্রায়*, নাজীব মাহফুজ-র *পাগল*, ইউসুফ আল সাবায়কী-র *ঘরেফেরা*, ইউসুফ শারোনী-র *দারাইগলি*, ইউসুফ ইদরীস-র *দায়িত্ব* , ইদরীস শা'রাবী-র *তীর্থযাত্রা* শিরোনামে-গল্প গুলো অনূদিত হয়।[১৪] নাজীব মাহফুজের *বযল আল-আসীর–বন্দীর পোষাক, আলমুত্তাহাম–অভিযুক্ত অপরাধী, জান্নাত আল আতফাল–শিশুর স্বর্গ, হাযা অল করন–এই শতাব্দীর প্রেম, আর রাজুল আস সায়ীদ–ভাগ্যবান, খাম্মারা আল-কিত আল-আসওয়াদ–কাল বিড়ালের শুরিখানা, তাহতাল মিযাল্লাহ্–যাত্রী ছাউনীর নিচে, খাম্মারা আলকিত আল আসওয়াদ–মাতালের গান* নামে আহসান সাইয়েদ কর্তৃক অনূদিত হয়ে *নোবেল বিজয়ী নাজিব মাহফুজের ছোটগল্প* শিরোনামে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১৫] মুস্তফা লুৎফী আল মানফালুতী রচিত ছোটগল্প *আল ইয়াতীম, আল ইকাব, আল হাভিয়া, আল-শুহাদা, আল-জাযা, আল-হিজাব, আল-যিকরা, আল-গনী ওয়া আল ফকীর* শীর্ষক গল্পগুলো যথাক্রমে *কবরের কান্না, দোযখ, শহীদান, অপূর্ব শান্তি, স্বপ্ন শেষ, স্মৃতি, ধনী ও গরীব* শিরোনামে ড. মীজানুর রহমান কর্তৃক অনূদিত হয়ে *মিশরের ছোটগল্প শিরোনামে* ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১৬]

বাংলা কাব্যে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ফারসি ও উর্দু কাব্যের অনুবাদ পরিলক্ষিত হয়। দৌলতউজীর বাহরাম খা, আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, বাহরাম খান, সৈয়দ হামযা, সাবিরিদ খান, দোনা গাজী চৌধুরী, নওয়াজিস খান, সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবর, সৈয়দ সেরবাজ চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রমুখ পাঠান মোগল যুগের কবিরা, ফারসি কাব্য থেকে সরাসরি অথবা সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দুর মাধ্যমে ঐ কাব্য-কাহিনীর ভাবাবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন।[১৭]

---

[১৩] আহসান সাইয়েদ, *তাওফীক আল হাকীমের নাটক* (ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০২)।
[১৪] আবদুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী গল্প* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৫)।
[১৫] মো. জিয়াউদ্দিন সরকার, *প্রাগুক্ত*।
[১৬] *প্রাগুক্ত*।
[১৭] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮), পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি ভাষায় রচিত *লাইলী-মজনুর* প্রেম কাহিনী নিয়ে দৌলত উযীর বাহরাম খান *লাইলী-মজনু* কাব্য রচনা করেন।[১৮] মোল্লা জামীর *য়ুসুফ জুলায়খার* কাব্যের অনুসরণে শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্য রচনা করেন এবং আবদুল হাকিম রচনা করেন দ্বিতীয় *ইউসুফ-জোলেখা*। তাঁর কাব্যের আখ্যান ভাগও ছিল মোল্লা জামীর ফারসি কাব্য।[১৯] আলাওল আরব্য রজনী গ্রন্থের *সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল* উপাখ্যান রচনা করেন এর ফারসি অনুবাদ অবলম্বনে। তাছাড়া তিনি ফারসি কাব্য অবলম্বনে *সপ্তপয়কর, সিকান্দরনামা* ও *তোহফা* কাব্য রচনা করেন।[২০] আবদুল হাকিম ফারসি কাব্যাবলম্বনে *নূরনামা, ইউসুফ-জোলেখা, লালমোতি সয়ফুলমুলক* গ্রন্থ রচনা করেন।[২১] এছাড়া কবি শেরবায চৌধুরী ফারসি থেকে *ফিকর নামা*, কবি মুহম্মদ নওয়াজিশ খান ফারসি *গুলে বকাউলি* অনুবাদ করেন।[২২] কবি নসরুলাহ্ খান ফারসি অবলম্বনে *মুসার সওয়াল*, আবদুল করীম খোন্দকার *দুলা মজলিস*, মুহাম্মদ নকী *তুতীনামা* এবং কবি আবদুস সামাদ *গুলিস্তান* ও *বুস্তা*-এর অনুবাদ করেন।[২৩] নিযামী গানজুবীর ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে পরাগল খান *শাহা পরীর কিচ্ছা* অনুবাদ করেন।[২৪] এছাড়া হাজী আলী *মওতনামা* মুহাম্মদ আলী *হায়রাতুল ফিকাহ্* আলী রযা ওরফে কানু ফকীর *সিরাজ কুলুব* ফারসি মূল পুস্তক *সিরাজ কুলুব* থেকে অনুবাদ করেন।[২৫] কবি হায়াত মামুদ *সর্বভেদ* নাম দিয়ে ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।[২৬] ফরহ্তুলাহ্ ফরহৎ কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত *হাতেমতাই* গ্রন্থটি সৈয়দ হামযা বঙ্গানুবাদ করেন। মুনশী কাদের উল্লাহ্ও *হাতেম তাই* এর একজন অনুবাদক বলে জানা যায়।[২৭] উল্লেখ্য যে পয়গম্বরদের জীবন কাহিনী, হযরত রসূল (সা.) এর জীবন, কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত, আমীর হামযার যুদ্ধ কাহিনী, হযরত আলীর পুত্র হানিফার যুদ্ধের বর্ণনা, সোনাভান, জৈগুন প্রভৃতি বীর রমণীদের বিরত্বগাথা হানিফার জঙ্গ, দাতা হাতেম তাই এর কেচ্ছা আরবের প্রেমিক যুগল লাইলী মজনুর অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান, ইরানের প্রেমিক-প্রেমিকা *শিরী-ফরহাদের* করুণ প্রণয়কাহিনী, সোহরাব রুস্তমের কাহিনী যে ফারসি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাজা রামমোহনের বদৌলতে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের ভাবও বাংলা সাহিত্যে প্রবিষ্ট হয়েছে।

---

[১৮] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০১), পৃ. ১৩৮-১৩৯; শেখ তোফাজ্জল হোসেন (সম্পা.), *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ৩০।

[১৯] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. ২৩৩-২৩৫।

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *কবি আলাউল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১)।

[২১] ড. রাজিয়া সুলতানা (সম্পা.), *আবদুল হাকিম রচনাবলী* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯), পৃ. ভূমিকা।

[২২] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২-২৫৫।

[২৪] ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ২৫২।

[২৫] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৫৯।

[২৬] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১১২।

[২৭] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী আবদুল কাদির কর্তৃক অনূদিত সা'দীর কবিতা *পুষ্পোদ্যান* ও *গোলেস্তার বঙ্গানুবাদ* নামে কলকাতা থেকে যথাক্রমে ১৯০১ ও ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৮] আমিনুল্লাহ কর্তৃক সা'দীর পন্দ নামার কাব্যানুবাদ উপদেশ মালা শিরোনামে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয়।[২৯] ইসলামধর্ম সম্বন্ধে সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ মনীষী জামালুদ্দীন আফগানী কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত নেচার এবং নেচারিয়া নামক গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে *এসলাম তত্ত্ব* নামে প্রকাশিত হয়।[৩০]

মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আত্তার কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত *তাযকেরাতুল আওলিয়া* অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র *তাপসমালা* রচনা করেন।[৩১] তাঁর *তাপসমালা তাযকেরাতুল আওলিয়া*র আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও মূলত অনুবাদই। কোন কোন স্থানে ভাবানুবাদ এবং কোন কোন স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ। তাছাড়া বাহুল্য রোধে অনেক জায়গা তিনি বাদ দিয়েই অনুবাদ করেছেন। *তাপসমালায়* ছয় খণ্ডে ছিয়ানব্বই জন ওলি-আল্লার জীবনী আলোচিত হয়েছে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই গিরিশচন্দ্রের *তাপসমালা* রচনার কাজ শেষ হয়। প্রতি খণ্ডেরই পাঁচের অধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। বাংলা ভাষায় *তাপসমালা* রচনা গিরিশচন্দ্রের অবিস্মরণীয় দান।

এছাড়া গিরিশচন্দ্র সেন *দিওয়ান-ই-হাফিজ, গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, মকতুবাত-ই-মখদুম,* মস্‌নবী-ই-রুমী, *মানতেকুত্তায়ের, কিমিয়া-ই-সাদত, গুলশন-ই-আসরার* পুস্তকগুলোর আংশিক অনুবাদ করেন।[৩২] *তত্ত্বরত্নমালা* (বা তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধীয় রচনাবলী) ভাই গিরিশচন্দ্র কর্তৃক পারস্য পুস্তক *মানতেকুত্তায়ের* ও *মসনবীয়ে মৌলবীয়ে রোম* থেকে সংকলিত। সবটা অনুবাদ নয়, অনেকস্থানে মূলের ভাবমাত্র অবলম্বন করে *তত্ত্বরত্নমালা* লিখিত হয়েছে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে এ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ছোট ছোট গল্পের আকারে এ গ্রন্থে নানা নীতিকথা ও শিক্ষণীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এতে নীরস তত্ত্ব ছাড়াও চিত্তকে প্রফুল্ল করে এমন অনেক বিষয় স্থান পেয়েছে।

এ সমাজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (র.) এর *কিমিয়ায়ে সাআদাত* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ।[৩৩] অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন মৌলবী মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী স্বয়ং। দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর *কিমিয়ায়ে সাআদাত* পাঁচ খণ্ডে রচিত। বাংলায়

---

[২৮] আলী আহমদ (সংক.), *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১০৭-১০৮।

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬।

[৩০] মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪), পৃ. ১৩৪।

[৩১] প্রফেসর ড. কুলসুম আবুল বাশার, *আত্তার ওয়া আসারে উ দার বাঙ্গাগাল*, ইয়াদ বুদে হাফতাদ ওয়া পানজুমিন সালে তা'সীসে বাখসে ফারসি ওয়া উর্দু দার দানেশগাহে দাকা (ঢাকা: বাখশে ফারসি ওয়া উর্দু, ১৯৯৬), পৃ. ৩৬।

[৩২] মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪), পৃ. ১৫১।

[৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ পাঁচ খণ্ডের অনুবাদ সাত ভাগে প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য সাত ভাগকে প্রত্যেক খণ্ডের অনুগামী করে পাঁচ খণ্ড করা হয়। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই এ অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছিল। অনুবাদক মীর্জা ইউসুফ আলী *কিমিয়ায়ে সাআদাত* এর উপযুক্ত বাংলা নাম দিয়েছেন *সৌভাগ্য স্পর্শমণি*। পাঁচ খণ্ডের অনুবাদ দেড় হাজার পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। খণ্ডগুলোর নাম 'দর্শন পুস্তক', 'এবাদত পুস্তক', 'ব্যবহার পুস্তক', 'বিনাশন পুস্তক' ও 'পরিত্রাণ পুস্তক'।

মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই ছোট থেকে বড়ো হয় কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করেনা; তার জন্য প্রয়োজন হয় সাধনার। ইসলাম প্রদর্শিত পথে সংযম, শালীনতা ও চরিত্রোন্নতির পথ ধরে কিভাবে মানুষ তার চরম লক্ষ্য আল্লাহতে পৌছার 'সৌভাগ্য' লাভ করে, তারই অনুপম ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমাম গাজ্জালী তাঁর *কিমিয়ায়ে সাআদাত* গ্রন্থে। মীর্জা ইউসুফ আলী সুন্দর ও সাবলীল বাংলা গদ্যে *কিমিয়ায়ে সাআদাত* এর অনুবাদ করে অত্যন্ত সংগত কারনেই *সৌভাগ্য স্পর্শমণি* নাম দিয়েছেন। শুধু ইসলামী বিষয়বস্তু বলে নয়, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যেও *সৌভাগ্য স্পর্শমণি* এক মহত্তম অবদান। উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালে আবদুল খালেক কৃত অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে *সৌভাগ্যের পরশমনি* নামে প্রকাশিত হয়।[৩৪] তাছাড়াও *কিমিয়ায়ে সাআদাত* গ্রন্থটি মাওলানা নুরুর রহমান কর্তৃক অনূদিত হয়ে *কিমিয়ায়ে সাআদাত* নামে এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৫] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মোহিতলাল মজুমদারও মুসলমানী অধ্যাত্মতত্ত্বমূলক কিছু কবিতা অনুবাদ করেন।[৩৬] মাওলানা রুমীর *মসনবী*র গদ্যানুবাদ করেন মৌলবী আযহার আলী বখতিয়ারী।[৩৭] মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর *মসনবী শরীফে* এর প্রথম কাব্যানুবাদ করেন চট্টগ্রামের মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ। অনুবাদটি অসম্পূর্ণ। 'শুকপাখি ও গজনবী হাকিমের কবিতাদ্বয়' অধ্যায় পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেছেন। বাংলা পয়ারে রচিত ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।[৩৮]

পাকিস্তান আমলের কাব্য অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই নজর পড়ে আল্লামা ইকবালের কাব্যানুবাদের উপর। ইকবালের কবিতার অনুবাদই পাকিস্তান আমলে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ইকবালকে পাকিস্তানের 'সপ্নদ্রষ্টা' 'জাতীয় কবি' জাতীয় সংহতির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হতো। বাংলা ভাষায় ইকবালের

---

[৩৪] আবদুল খালেক (অনু.), *হযরত ইমাম গায্যালী (র.) সৌভাগ্যের পরশমণি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. কভার পৃষ্ঠা।

[৩৫] মাওলানা নুরুর রহমান (অনু.), *কিমিয়ায়ে সাআদাত* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০২), পৃ. কভার পৃষ্ঠা।

[৩৬] ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, *অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ* (কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৮ বাংলা); মো. আবদুল কাদির, "সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিত লাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভারসিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ২০০৬।

[৩৭] মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৫৯।

[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা পাকিস্তান আমল থেকেই অনূদিত হয়ে আসছিল, এবং পাশ্চাত্য সমাজেও ইকবালের চিন্তাধারা এ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকেই সুপরিচিত। ১৯৫২ খিষ্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় *ইকবালের কবিতা নামে* একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়।[৩৯] তাতে সম্পাদকের নিজের, ফররুখ আহমদের ও আবুল হোসেনের অনুবাদ স্থান পায়। ইকবালের কবিতার নিকলসন কৃত ইংরেজী অনুবাদই ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। সঙ্কলনটিতে কিছু খণ্ড কবিতার এবং *আসরারে খুদি*-র কোন কোন অংশের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। এ সমস্ত খণ্ড কবিতার অধিকাংশই 'বাংগে দারা' থেকে নেয়া।[৪০] ফররুখ আহমদের অনুবাদেই উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উত্তরকালের কবিতায় আরবী-ফারসি শব্দের যে আধিক্য দেখা যায় , ইকবালের এ অনুবাদে তা দৃষ্ট হয় না।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আবুল ফারাহ মুহাম্মদ আবদুল হক অনূদিত *রুমূযে বেখুদী* । ইকবালের মূল ফারসি অবলম্বনে মূলানুগ পদ্যানুবাদ করা হয়েছে বলে কাব্যটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অনুবাদ কাব্যেও সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। ইকবালের দার্শনিক তত্ত্ব-সম্বলিত ফারসি কাব্য *আসরারে খুদীর* বাংলা গদ্যোনুবাদ করেছেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। গোলাম মোস্তফা ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন *কালাম ই ইকবাল*। ইকবালের বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থ থেকে ইকবাল একাডেমী কর্তৃক নির্বাচিত উনিশটি কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন।[৪১] তাঁর অনূদিত *শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া* ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান পূর্বকালেও *শেকওয়া* ও *জওয়াবে শেকওয়ার* কয়েকটি বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী কোন কোন অনুবাদের উৎকর্ষকে এ কালের অনুবাদকেরা অতিক্রম করতে সক্ষম হননি। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে মনিরুদ্দীন ইউসুফ অনূদিত *ইকবালের কাব্যসঞ্চয়ন* এবং মীজানুর রহমান কৃত *ইকবালিকা* ও *বালে জিবরীল* প্রকাশিত হয়। *ইকবালের কাব্যসঞ্চয়ন*-এ *বাঙ্গে দারা*, *বালে জিবরীল*, *জরবে কলীম*, *আরমুগানে হিজাজ* প্রভৃতি উর্দূ কাব্য থেকে নির্বাচিত কিছু কবিতা অনূদিত হয়েছে।[৪২] ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত *শেকওয়া* ও *জওয়াবে শেকওয়া*। মাহেনও পত্রিকায় ইকবালের কবিতার যেসব অনুবাদ প্রকাশিত হয় সেগুলো থেকে নির্বাচিত অনুবাদ অবলম্বনে *ইকবাল চয়নিকা* ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আবুল হাসনাত মুহাম্মদ কলিমুল্লাহ অনূদিত *শেকওয়া*। ইকবালের *Raconstruction of Religious thoughts in ওংষধস* গ্রন্থেরও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, *ইসলামের ধর্মীয় চিন্তা ধারার পূনর্গঠন* নামে।

---

[৩৯] আলী আহমদ (সংক.), *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২৩১।

[৪০] সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ৩৪০।

[৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১।

[৪২] মনির উদ্দীন ইউসুফ, *ইকবালের কাব্য-সঞ্চয়ণ* (ঢাকা: বাঙলা একাডেমী, ১৩৬৭ বাংলা), পৃ. সূচীপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাতে প্রচুর পরিমাণে অনূদিত হয়েছে ওমর খৈয়াম এবং হাফিজের কবিতা। বিনোদ বিহারী মুখার্জী কর্তৃক রুবাঈয়াতে ওমর খৈয়াম ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪৩] ওমর খৈয়ামের অনুবাদকদের মধ্যে নরেন্দ্র দেব, কান্তি চন্দ্র ঘোষ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অপরাজিতা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। নজরুল ইসলামও ওমর খৈয়ামের রুবাঈ অনুবাদ করেছেন। নজরুলের অনূদিত ১৯৮টি রুবাঈ ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪৪] নরেন্দ্র দেবের অনুবাদটি কাব্যপ্রসাদ গুণ-সম্পন্ন এবং ড. শহীদুল্লাহর অনুবাদের সঙ্গে যে ভূমিকাটি আছে তা গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করছে। ড. শহীদুল্লাহ মূল ফারসির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অনুবাদ করেছেন। আর নরেন্দ্র দেবের অবলম্বন ছিল ফিটজিরাল্ড। নরেন্দ্র দেব হাফিজের *দীওয়ান* এরও অনুবাদ করেছেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *দিওয়ান-ই-হাফিজ* একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'সদ্ভাবশতকে' সাদী এবং হাফিজের কবিতার ভাবানুবাদ করেছেন। আজিজুল হাকিম অনূদিত *রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম* ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সিকান্দর আবু জাফর অনূদিত *দীওয়ানে হাফিজ* ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে এবং শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির কর্তৃক শেখ সাদীর উপদেশমূলক কিছু কবিতার কাব্যানুবাদ *কারীমা* শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।[৪৫]

স্বাধীনতা উত্তরকালেও অনুবাদের এ ধারা অব্যাহত থেকে উল্লেখযোগ্য ফারসি গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। এছাড়াও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ দ্বারা বর্তমানে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রধানত বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ-পরিকল্পনার ভিত্তিতে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, চিকিৎসাবিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস, ফিকহ, ইসলামী রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে।

ফারসি সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কারণে এর প্রতি বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্য পাঠকের আগ্রহেরও কমতি নেই। মধ্যযুগের পুরোটা সময় জুড়ে শুধু ভারত বর্ষেই নয় বিশ্ব সাহিত্য দরবারের সিংহাসনও ফারসি কবি-সাহিত্যিকগণের অধিকারে ছিল। তাই পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষায়ও ফারসি সাহিত্য-নক্ষত্রের কালজয়ী সাহিত্যকর্মসমূহ অনূদিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

ফারসি বঙ্গানুবাদের সুবিশাল ভাণ্ডার বিশেষত স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সম্পাদিত বঙ্গানুবাদ কর্মের সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ভাষাভাষী পাঠক, লেখক, আলোচক, গবেষক এবং ছাত্র-শিক্ষকদের পরিচিত করাই *বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা* ১৯৭১-২০০৫ শিরোনামে আলোচ্য পিএইচ. ডি সন্দর্ভ

[৪৩] আলী আহমদ (সংক.), *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৫৬৩।
[৪৪] প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নজরুল ইসলাম হায়াত আওর কারনামে* (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০০৬), পৃ. ২৪৫।
[৪৫] সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও এর ধারাবাহিকতায় ফারসি গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ বিষয়ে দু একটি প্রবন্ধ দৃষ্টি গোচর হয়েছে। তবে এগুলো কিছু অনূদিত গ্রন্থের তালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধাবলীতে এ সকল অনুবাদের মান এবং সহজ-সরল সাবলীলতার দিক থেকে যথার্থ হয়েছে কিনা এ মর্মে কোন পর্যালোচনা করা হয়নি। এছাড়াও মূল ভাষা (ফারসি) এবং অনূদিত ভাষা (বাংলা)-এর মধ্যে কোনরূপ তুলনামূলক পরীক্ষা স্থান পায়নি। অবশ্য এটি অনস্বীকার্য যে, প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে এতসব আলোচনা, পর্যালোচনা সন্নিবিষ্ট করাও দুরূহ ব্যাপার।

এ অভাব দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তা পরিপূরণের লক্ষ্যেই বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫ শিরোনাম নির্বাচনের যৌক্তিকতা। মূলত তথ্য উদঘাটন ও সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া হল গবেষণা পদ্ধতি। এক্ষেত্রে প্রাথমিক (Primary) ও দ্বৈতয়িক (Secondary) উভয় ধরনের উৎস থেকে সংগৃহীত উপাত্তের উপর ভিত্তি করেই বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫ শীর্ষক গবেষণাকর্মটি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত ও তথ্যাবলী সংযোজনের ক্ষেত্রে স্বীকৃত সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

এ গবেষণাকর্ম ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত ছয়টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত হয়েছে। এ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

অধ্যায় ১ঃ বাংলা–ইরান সর্ম্পক

এ অধ্যায়ে বাংলার পরিচয়, ইরানের ভূ-রাজনৈতিক পরিচয়, বাংলা-ইরান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সর্ম্পক, বাংলা সাহিত্য ও ফারসি সাহিত্য পরিচয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক, বাংলা ভাষা সংগঠনে ফারসি ভাষা সংগঠনের প্রভাব, শব্দ, বাংলা ব্যাকরণ ও ফারসি ব্যাকরণের পারস্পরিক সর্ম্পক, বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, বাংলা সূফী সাহিত্য, বাংলা সওয়াল সাহিত্য, বাংলা জীবনী সাহিত্য, বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য এবং বাংলা পুঁথি সাহিত্য বিষয়ক তথ্যভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে পারস্য দর্শন এবং ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত ধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে দৌলত উজীর বাহরাম খা, আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, সাবিরিদ খান, দোনা গাজী নওয়াজিস খান, সৈয়দ সেরবাজ চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন, সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবর প্রমুখ কবিগণ ফারসি কাব্যাবলম্বনে সরাসরি অথবা ভাবাবলম্বনে *ইউসুফ-জোলেখা, আমীর হামজা, লাইলী-মজনু, মধুমালতী, হানিফা ও কয়রা পরী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, লালমতি ও সয়ফুল মুলুক, গুলে বকাওলী, জঙ্গনামা,*

Dhaka University Institutional Repository

রসুল বিজয়, সিকান্দার নামা, হাফতে পেইকার, নূরনামা, নসিয়তনামা, দুররে মজলিস, সুরতনামা, জ্ঞান চৌতিশা, যোগ কলন্দর, মুসার হাজার সওয়াল, সখিনার বিলাপ, সংগ্রাম হুসন, আমীর নামা, আমীর হামযা, ফক্কর নামা নবীবংশ, শব-ই-মিরাজ, রসুল বিজয়, ওফাৎ-ই-রাসুল, জয়নাবের চৌতিশা, মক্তুল হোসেন, জঙ্গনামা, ফাতেমার হাজার সওয়াল, শহীদ-ই-কারবালা ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন । আলোচ্য অধ্যায়ে এ বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

অধ্যায় ২: বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্রমবিকাশ

এ অধ্যায়ে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পটভূমি ও বিকাশ, মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে ফারসি সাহিত্য চর্চা, মোগল আমল, ব্রিটিশ আমল, ব্রিটিশ আমলে বঙ্গে রচিত ফারসি গ্রন্থাদি, পরিবার কেন্দ্রিক ফারসি চর্চা, পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে ফারসি চর্চা সংক্রান্ত নাতিদীর্ঘ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাদেশের মাধ্যমে ফারসিকে সরকারী ও অফিস-আদালতের ভাষা থেকে অপসারিত করা হলেও ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত থাকে। এ সুদীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলের অনেক কবি-সাহিত্যিক ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন এবং প্রচুর গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: *ইকবাল নামায়ে জাহাঙ্গীরী, আকবরনামা, তারীখে ফিরোজ শাহী, তারীখে মোবারকশাহী, তারীখে ফিরিশতা, তারীখে আদেল শাহী, জাওয়াহিরুল আজায়েব, লুবাবুল আলবাব, নাফায়েসুল মা'সার, মাজমাউল ফুযালা, খুলাসাতুল আশয়ার, রিয়াদুস শুআরা, মাকামাতুস শু'আরা, সুহুফে ইবরাহীমী, মাখযানুল গারায়েব, হাফতে আকলীমা, গিয়াসুল লুগাত, ফারহাঙ্গে আনন্দ রাজ, ফিরুযুললুগাত, জাওয়াহিরুল মাসাদের, বুরহানে কাতে, ফারহাঙ্গে জাহাঙ্গীরী, ফারহাঙ্গে রশীদী, দাস্তানহায়ে ফারসি ও আরবী, উলূমে পেযেশকী, ফালসাফা ও মানতেক, হুনারেখুশনাবেসী* প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায়। বর্তমানে এ সমস্ত কর্মের নির্দেশনাবলী বা মুদ্রিত গ্রন্থ আকারে উপমহাদেশের লাইব্রেরী সমূহে সংরক্ষিত আছে। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যনির্ভর বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

অধ্যায় ৩: বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্য-অনুবাদের ক্রমবিকাশ

এ অধ্যায়ে অনুবাদ পরিচিতি, অনুবাদ প্রকরণ, কাব্যানুবাদ সমস্যা, ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ এবং প্রনয়োপাখ্যানের অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকে উপাখ্যানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এ সময়েই বেশিরভাগ ফারসি উপাখ্যানের বাংলা অনুবাদ হয়। ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে যে সকল লেখক, কবি ও সাহিত্যিক সূচনালগ্ন

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের শতক ভিত্তিক যেমন: পঞ্চদশ শতক, ষোড়শ শতক, সপ্তদশ শতক, অষ্টাদশ শতক, উনিশ শতক ও বিশ শতকে ফারসি সাহিত্য অনুবাদের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা বিধৃত হয়েছে।

অধ্যায় ৪: স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ভাষায় ফারসি অনুবাদকর্ম (১৯৭১-১৯৭৯)

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ভাষায় ফারসি অনুবাদকর্ম বিশেষত ১৯৭১-১৯৭৯ সময়কালে অনূদিত যেমন: *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরীন*, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, *হুমায়ুননামা*, *তবকাত-ই-আকবরী*, আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী এবং *তারীখে ফিরিশ্‌তা* গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও অনুবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যায় ৫: ইরানের ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদ (১৯৭৯-২০০০)

এ অধ্যায়ে ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও ইমাম খোমেনী, বিপ্লবোত্তরকালে ফারসি বঙ্গানুবাদ চর্চায় বিপ্লবের প্রভাব, ফেরদৌসীর *শাহনামার* অনুবাদ, ওমর খৈয়্যামের *রুবাঈয়াতের* অনুবাদ, শেখ সা'দীর সাহিত্যকর্মের অনুবাদ, মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর *মাসনবীর* অনুবাদ, মহাকবি হাফিজের কাব্যের অনুবাদ এবং অন্যান্য লেখকের অনুবাদ যেমন: *বিলায়েত নামা*, *তারিখে ফিরোজশাহী*, *তবকাত ই নাসিরী*, *চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন*, *ইমাম খোমেনীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য*, *ইমাম খোমেনীর বাণী*, *শহীদ*, *জাতিসমুহের আগামী দিনের পথ ইসলামী বিপ্লব*, *জাগো-সাক্ষ্য দাও*, *জিহাদ ইসলামের পবিত্র যুদ্ধ ও তার কুরআনী বৈধতা*, *ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শুরা*, *ইসলাম পরিচিতি*, *আধুনিক আরবী ফার্সী তুর্কী কবিতা*, *ফতুহাতে ফিরোজ শাহী*, *তাহেরেহ্ সফরজাদেহঃ স্বনির্বাচিত কবিতা*, ইমাম খোমেনীর কবিতা, *নারী নির্যাতনঃ যুগে যুগে*, *ইসলামী বিপব কি ও কেন*, *শিক্ষাঙ্গনে নৈতিকতা*, *সিয়াসতনমা*, *কারবালা ও হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাত*, *হজ্জ আমাদের কি শেখায়*, *ইন্তে খাব আয্ গুলিস্তান ও পান্দনামা*, *আল মুরতাজা ইমাম আলী ইবনে আবি তালেব (আ.)*, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙী*, *মোজাফ্ফরনামা*, *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি*। উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলোর অনুবাদ বিষয়ে তথ্যনির্ভর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় ৬: একুশ শতকে ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদের ধারা (২০০০-২০০৫)

এ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক গ্রন্থ, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী, এবং ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থসমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদের ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থ শিরোনামে *আইন-ই-আকবরী তাযকিরাতুল ওয়াকিয়াত সম্রাট হুমায়ুনের কাহিনী* গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী শিরোনামে *মীযান, পাঞ্জগাঞ্জ, ফুসূলে আকবরী, নাহ্‌বেমীর, ইলমুস্‌সীগাহ, ফারসী কী পহেলী কিতাব, দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন ও পান্দ নামা* ইতাদি গ্রন্থ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থাবলী শিরোনামে বর্ণিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নবুওতের ধারা, আল্লাহ, রাসুল ও রিসালাত, মহাকালের ত্রাণকর্তা,আহকামে মুমিনাত, মালা বুদ্দা মিনহু, চিরভাস্বর মহানবী (স.), ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান, আজবেবাতুল ইস্তিফতাআত*।

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটির শেষপর্যায়ে গ্রন্থপঞ্জি শিরোনামে ফারসি, উর্দু, আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ইত্যাদি ভাষায় বিরচিত চার শতাধিক মৌলিক তথ্যসূত্র-গ্রন্থ ও সাময়িকীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও Web Address সংযোজিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১
বাংলা–ইরান সম্পর্ক

বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্য ও প্রশাসনের সাথে ইরানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বাংলা ভষা সাহিত্যে রয়েছে ফারসি ভাষা সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব। এ অধ্যায়ে বাংলার পরিচয়, ইরানের ভূ-রাজনৈতিক পরিচয়, বাংলা-ইরান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, বাংলা সাহিত্য ও ফারসি সাহিত্য পরিচয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, বাংলা ভাষা সংগঠনে ফারসি ভাষা সংগঠনের প্রভাব, বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত ফারসি শব্দাবলী, বাংলা ব্যাকরণ ও ফারসি ব্যাকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক, বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব, ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা যেমনঃ বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, বাংলা সূফী সাহিত্য, বাংলা সওয়াল সাহিত্য, বাংলা জীবনী সাহিত্য, বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য এবং বাংলা পুঁথি সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

১.১ বাংলার পরিচয়

বাংলাদেশের বর্তমান সীমানার সাথে প্রাচীন সীমানার হুবহু মিল করা দুরূহ ব্যাপার। বাংলা ভাষাভাষীদের বসবাসরত এ ভূখণ্ড বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।[১] এমন এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সবটুকু নিয়ে বাংলাদেশ বুঝাত। আবার কখনো বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ়, পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও তাম্রলিপ্ত রাজ্য বুঝাতো। 'মহাভারতে'র যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকিকচ্ছ, সুস্ম, প্রসুস্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এসব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।[২]

জনপদ অর্থে 'বঙ্গ' শব্দটি প্রথম নজরে পড়ে ঋক, ঋযু, সাম, অর্থব এ চার খণ্ডে বিভক্ত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্র ও সাহিত্য যা সম্প্রদায় বিশেষের কাছে 'বেদ' বলে পরিচিত গ্রন্থের ঐতরেয় মুণি কর্তৃক রচিত 'ঋক'-এর 'আরণ্যক' শীর্ষক উপসংহার ভাগে।[৩] এর রচনাকাল খ্রিষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বের বলে মনে করা হয়। এ সময় 'বঙ্গ' একটি ক্ষুদ্র জনপদ রূপে বিবেচিত ছিল। খ্রিষ্টীয়

[১] মুহম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১।

[২] আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ বর্ণায়ন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১-১৮; ফজলুল হাসান ইউসুফ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ১।

[৩] রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১), পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গভূমি 'বঙ্গ', 'পুণ্ড্র', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'সুহ্ম', 'ব্রহ্ম', 'তাম্রলিপ্ত', 'সমতট', প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক এ জনপদগুলোকে 'গৌড়' নামে একতাবদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায়।[৪] এরপর ইতিহাসের মধ্যযুগে এসে মোঘল সম্রাট মহামতি আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তার '*আইন-ই-আকবরী*' গ্রন্থে বলেনঃ

> نام اصلی بنگله بنگ- فرماندهان بستانی به پهنای بیست و بلندی ده گزدر همگی
> الکا خیابانی بسته اند آنرا آل گویند (بهمزه الف و لام)[৫]

> বাঙ্গলার আসল নাম ছিল বঙ্গ পূর্ববর্তী শাসকগণ দেশের সর্বত্র দশ গজ উচ্চ ও বিশ গজ প্রস্থ বাঁধ নির্মাণ করতেন, এ বাঁধগুলোকে আল বলা হত। এ থেকে বাঙ্গালাহ নামের উৎপত্তি হয়েছে।

ড. আর সি মজুমদারের মতে– পাল রাজাদের সময়ে বাংলা বলতে সমগ্র বাংলাকে নির্দেশ করা হত। পক্ষান্তরে ড. এইচ. সি রায় চৌধুরীর মতে– পাল ও সেনদের 'বঙ্গ' বলতে বাংলার একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলকে বুঝাত। মুসলিম শাসনামলের প্রথম দিকেও একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলই 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ' নামে অভিহিত ছিল।[৬] গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় থেকে 'বাঙ্গালাহ' নাম মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত হয়। বারণী সর্ব প্রথম মুসলিম লেখক যিনি 'বাঙ্গালাহ' নাম ব্যবহার করেন। তিনি 'বাঙ্গালাহ' বলতে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখ করেন।[৭]

যুগে যুগে বাংলাদেশের আয়তন বদলেছে। গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩২০-৩৪০ খ্রি.) বঙ্গরাজ্য মগধ রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত হয়। ব্রিটিশ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) অর্থাৎ ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার আগে বঙ্গদেশ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি এ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। তখন জেলা ছিল মোট সাতাশটি। এছাড়া উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও পূর্ব বাংলার সিমান্তে ত্রিপুরা-এ দু'টি দেশীয় রাজ্য ছিল। এ সময়ে বর্তমান ভারতের আসাম ও বিহার প্রদেশের সাথে বঙ্গদেশের কিছু অংশ, যেমন–সিলেট, কাছাড়, গোয়াল পাড়া, মানভূম জেলা ও সিংহ ভূমের ধলভূম পরগনা সংযুক্ত ছিল।

---

[৪] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ৯।

[৫] আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খণ্ড (কলকাতাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি, তা.বি.), পৃ. ৪৯।

[৬] ডক্টর এম. এ. রহীম (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনু.), *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ২।

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০১১ তথ্যমতে বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ। প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড় বসতি ১০৯০ জন। জনসংখ্যার শতকরা ৮৭.৭ ভাগ মুসলমান, ৯.২ ভাগ হিন্দু অবশিষ্ট বৌদ্ধ ০.৭ ভাগ, খ্রিষ্টান ০.৩ ভাগ এবং অন্যান্য ০.১ ভাগ। বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীর আনুপাতিক হার ১০৫.৪ ঃ ১০০। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫৭%।

আন্তর্জাতিক সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রিনীচ মান থেকে ৬ ঘণ্টার পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক দূরত্বে সময়ের পার্থক্য ৪ থেকে ৯ মিনিট।[৯] ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। সমগ্র দেশ সাতটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে মোট পৌরসভার সংখ্যা ২৯৮টি। প্রতিটি উপজেলায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে কয়েকটি ইউনিয়ন। দেশে মোট ৪ হাজার ৪৮৪টি ইউনিয়ন রয়েছে এবং ৮৭ হাজার ৩১৯টি গ্রাম। বর্তমানে দেশে ৬টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের জনগণের বাৎসরিক গড় আয় প্রায় ৬২১ মার্কিন ডলার। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ৬% প্রায়। দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে প্রায় ৪০% মানুষ।

বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির পরিমাণ ২ কোটি ১ লক্ষ ৯৮ হাজার একর। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২৮ একর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনের প্রায় ২১.৯৯ শতাংশ আসে কৃষিখাত থেকে। ৬২% লোকের কর্মসংস্থান এবং ৮০% বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আসে কৃষি থেকে। কৃষিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬.২৭ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ এবং এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৭০% এখনও নানাভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তথাপি সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এদেশে তৈরী পোশাক তথা গার্মেন্টস শিল্পের অভাবনীয় বিকাশের ফলে দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৫৬% ভাগের বেশি অর্জিত হয় এ খাত থেকে।

বাংলাদেশ শিল্প ক্ষেত্রে এখনো কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। জিডিপিতে শিল্পের অবদান ১৬.৫৮ শতাংশ। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধ্যে রয়েছে পাটজাত দ্রব্য, কার্পেট, সূতী বস্ত্র, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, চিনি, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধ, সার, চামড়া ও নানা চামড়াজাত পণ্য। বাংলাদেশের মোট ২ হাজার ৮৫৪ কি.মি. রেলপথ, ১৬ হাজার ২৭৪ কি.মি পাকা রাস্তা এবং মৌসুমীসহ প্রায় ৮ হাজার ৪০০ কি.মি. জলপথ বিদ্যমান। আকাশপথে রাজধানী ঢাকার সাথে জাতীয় বিমান সংস্থা বিশ্বের ২৬টির বেশি গন্তব্যে তাদের সার্ভিস চালু রয়েছে।

---

[৯] Central Intellegence Agency (CIA), *The World Sect Book Bangladesh 2011*, Available at: www.cia.gov/library/publications on 28.07.2011.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এমন সংখ্যা নিয়ে শিক্ষিতের হার ৪৭.৯%। পাশাপাশি স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষিতের হার ৬৫%। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬২ হাজার ৩৭৭। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭৭৪৪। উচ্চতর শিক্ষার জন্য রয়েছে ২২টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। ৫৩টির বেশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। কারিগরী শিক্ষার জন্য ৫টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ২১টি সরকারী মেডিকেল কলেজ এবং ৪৮টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ। ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরে রয়েছে ৪টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।[১০] বাংলাদেশে ৩৬৪টি দৈনিক সহ মোট ১০৪৯টি সংবাদপত্র ও সাময়িকী রয়েছে। ২টি সংবাদ সংস্থা ও ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ সহ বিশ্বের খ্যাতনামা সংবাদ সংস্থাসমুহের অফিস রয়েছে ঢাকাতে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারকেন্দ্রও রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ বাংলাদেশের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গঠিত গণপরিষদের সংসদীয় পদ্ধতি সম্বলিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বিলটি ৪ নভেম্বর ৭২ এ চুড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী জাতীয় সংসদের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির বিলোপ সাধন করে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার পর পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২ জুলাই '৯১ তারিখে পুনরায় জবাবদিহিমূলক সংসদীয় সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন সংক্রান্ত আদেশ সংবিধান সংশোধনী বিল ১৯৯১ উত্থাপিত হয়। ৬ আগস্ট '৯১ তারিখে জাতীয় সংসদে ঐ বিল গৃহীত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর '৯১ দেশব্যাপী গণভোটের মাধ্যমে বিলটি অনুমোদন লাভ করে। দেশে এখন সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলন রয়েছে। ৩০০ আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্টে ৪৫টি মহিলা আসন রয়েছে। ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত সংসদে প্রধানমন্ত্রী সরকারের কার্যনির্বাহী।

১.২ ইরানের ভূ-রাজনৈতিক পরিচয়

ইরান[১১] পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইরানী জাতি অত্যন্ত গৌরবময় ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। যুগে যুগে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিচিত্র রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও সামাজিক

---

[১০] University Grants Commission of Bangladesh (UGC), 2011, *List of the University in Bangladesh*, Available at: www.ugc.gov.bd/university on 28.07.2011.

[১১] ইরানঃ শাব্দিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইরান শব্দটিকে পাহলভী শাসনামলে এরান (Eran) বলা হতো। সাসানী শাসনামলে এরান শাতর (Eran Shatre) এবং হাখামানশী বা একিমোনীয় যুগে এইরিয়া (Airya) বলা হয়। অপরদিকে ইরানের একটি জাতির নাম ছিল ঈরোন (Urone)। ইরান শব্দটি আরিয়ানা (Aryana) হতে উদ্ভূত, যার অর্থ আর্যদের আবাস ভূমি। দ্রষ্টব্যঃ James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 3 (New York: Charles Scribner's Sons, 1959), p. ৪১৮; আল্লামা আলী আকবর দেহখোদা, *লোগাত নামেয়ে দেহখোদা*, ৮ম খণ্ড (তেহরানঃ দানেশগাহে তেহরান, ১৩৪২ ইরানী সাল), পৃ. ৫৫১-৫৬১।

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরের পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ইরানীরা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় একটি মহান জাতি হিসেবে স্থান লাভ করেছে। ইরানের পূর্ব নাম পারসা (Parsa), পার্স (Pars), ফার্স (Fars), পারসিস (Persis) অথবা পারসিয়া (Persia)।[১২] এক সময় এ পারসিয়া ছিল আর্য জাতির (Aryan) আবাসভূমি।[১৩] রেযা শাহ পাহলভীর শাসনামলে ২১ মার্চ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রশাসনিকভাবে দেশটির নাম পারসিয়া থেকে ইরান নামে রূপান্তরিত হয়।[১৪] ২৬ অক্টোবর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে দেশটি এ [ইরান] নামেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।[১৫] ভৌগোলিক দিক হতেও ইরান সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পবিত্র মক্কা–মদীনার স্মৃতি ধন্য 'আরব' থেকে পারস্য উপসাগর পাড়ি দিলে সর্বপ্রথম যে অনারব দেশটি রয়েছে, সেটিই হচ্ছে 'ইরান'। ইরানের বর্তমান সরকারী নাম হল–'ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান' তথা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।[১৬] ১ এপ্রিল ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে গণভোটের মাধ্যমে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান নামকরণ করা হয়।[১৭] ১৬,৪৮,১৯৫ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দেশটি ৩০টি প্রদেশে বিভক্ত, মোট জনসংখ্যা ৬৭.৪৭ মিলিয়ন, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৪%, চাকরিজীবীর সংখ্যা ১২.৬%, তন্মধ্যে সরকারী চাকরিজীবী ২.৩% এবং ইরানের গ্রামের সংখ্যা ৬৮,১২২টি ও শহরের সংখ্যা ৯৯২টি।[১৮] ইরানের রাজধানী তেহরান।[১৯]

ইরান এশিয়ার বৃহৎ একটি দেশ। এর পূর্বে পামির মালভূমি, পশ্চিমে আর্মেনিয়া, মধ্যএশিয়া এবং দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী বিশাল মরুভূমি। উত্তরে ককেসাস পার্বত্য অঞ্চল, কাস্পিয়ান সাগর এবং আমু দরিয়া। দক্ষিণে ওমান সাগর এবং পারস্য উপসাগর অবস্থিত।[২০] প্রাচীন ইরান তাইগ্রীস থেকে

---

[১২] Donald N. Wilber, *Iran Past and Present* (New Jersey: Princeton University Press, 1958), p. 1; *ইসলামী বিশ্বকোষ,* চতুর্থ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ৫৯০।

[১৩] Donald N. Wilber, Aziz Hatami, *Iran* (Tehran: Ettela'at Press, 1963), p. 8.

[১৪] *Iran Past and Present*, p. 1; *Contemporary Iran*, p. 73; A.B. Rajput, *Iran To-Day* (Lahore: Lion Press, 1953), p. 1.

[১৫] *The Encyclopedia Americana*, Vol. 15 (Grlier Incoporated, 1984), p. 368; *Iran To-Day*, p. 1.

[১৬] আ, ন, ম, রুহুল আমিন চৌধুরী, *ইরান বিপ্লবের চেতনা* (ঢাকাঃ আল-আমিন পাবলিকেশন্স নর্থব্রুক হল রোড, ১৯৮৫), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৯।

[১৭] হযরত ইমাম খোমেনীর (র.) নেতৃত্বে ১৯৭৯ খ্রি. ১১ ফেব্রুয়ারী তারিখে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। *ইসলামী প্রজতন্ত্র ইরান* প্রশ্নে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মার্চ ইরানে 'হ্যাঁ' এবং 'না' ভোট অনুষ্ঠিত হয়। সেই গণভোটে ৯৮ শতাংশের বেশী ভোট পড়ে 'হ্যাঁ' সূচকে। ফলে ১ এপ্রিল ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে গণভোটের রায় ঘোষণা করা হয় এবং ঐ দিনটিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে গণ্য করা হয়। [দ্রষ্টব্যঃ নূর হোসেন মজিদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব* (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৭), পৃ. ১০৯; নূর হোসেন মজিদী (অনু.), *ইরানের সমকালীন ইতিহাস* (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৬), পৃ. ২৮৮।]

[১৮] Available at: www.iranembassy.org.za/e/trade/iran%20statistics.htm on 29.07.2011.

[১৯] **তেহরানঃ** ইরান বা পারস্যের রাজধানী। আরবী উচ্চারণ 'তিহরান' (طهران) আরবরা প্রায় ইরানী নামের ক্ষেত্রে ت –কে– ط লিখত ও উচ্চারণ করত। ইরানী লেখক যাকারিয়া কাযবীনীই শুধু এ রূপটি ব্যবহার করেছেন। আধুনিক ফার্সীতে সব সময় যের (-) বা –ই– এর উচ্চারণ –এ –এর মত করা হয়। [দ্রষ্টব্যঃ Abbas Aryanpur Kashani, *Persian English Dictionary* (Tehran: Amir Kabir Publication, 2004), p. 347; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১৩শ, পৃ. ২৬।

[২০] ড. মুহাম্মদ জাওয়াদ মাশকূর, *তারীখে ইরান জামীন* (তেহরানঃ এন্তেশারাতে এশরাকী, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ধু উপত্যকা এবং কাস্পিয়ান সাগর ও ককেসাস থেকে আরব মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২১] বর্তমান ইরানের পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অবস্থান। পশ্চিমে ইরাক ও তুর্কীস্থান। এর উত্তর পশ্চিমে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার (USSR) মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ অবস্থিত। এ মরুভূমি সমুদ্র থেকে ১২০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত।[২২] ইরানের অধিকাংশ অঞ্চল শুস্ক ও উঁচু ভুমি। পূর্ব সীমান্ত ব্যতীত অবশিষ্ট ভূখণ্ড পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত।

ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী বাগদাদ ও ইমাম হোসেন (রা.) এর আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্মর কারবালা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যায়। ইরানে মরূদ্যান এবং নিবিড় বনাঞ্চলও রয়েছে। তেহরানের নিকটে রয়েছে সুবিখ্যাত সুউচ্চ আলবুর্জ[২৩] পর্বতমালা যা প্রায় আঠার হাজার ছয়শত ফুট উঁচু।[২৪] শীত ও গ্রীষ্মকালে ভোর ও সন্ধ্যাবেলায় আলবুর্জ ও দাসাভান্দ পর্বতমালা অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। আমাদের দেশ থেকে ইরানের জলবায়ুর কিছুটা পার্থক্য আছে। শীতকালে তেহরান ও তার আশপাশের শহরগুলোতে তাপমাত্রা রাত্রে ০ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস উঠানামা করে এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী বা ৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস কিংবা তার চেয়েও বেশি থাকে।

ইরানের ইতিহাস আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে অম্ল-মধুর হাজারো ঘটনায় পূর্ণ। আরব ও আযমের মিলনভূমি ইরান নানাবিধ কারণে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক হতে গুরুত্বের অধিকারী। প্রাক ইসলামী যুগেও যে দু'বিশাল সাম্রাজ্য উন্নত, সভ্য এবং দোর্দণ্ড প্রতাপ-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল, তার একটি হচ্ছে ইরান, যা তৎকালে পারস্য সাম্রাজ্য নামে অভিহিত ছিল। আর অপরটি ছিল রোম সাম্রাজ্য। এ দু'শক্তি তদানীন্তন বিশ্বের অপরাজেয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[২৫] মহানবী (স.) খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করার সময় ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, 'অচিরেই মুসলিম জাতি এ দুই সাম্রাজ্যকে পদানত করতে সক্ষম হবে।[২৬] যদিও সে দিন আরবের ইহুদী-খ্রিষ্টান, কাফির-মুশরিকগণ একে হাস্যোস্পদরূপে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হিজরী ২১ সালে মহানবী (স.) এর এ অমর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ লাভ করে।

---

[২১] আব্দুস সাত্তার, *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯), পৃ. ১।

[২২] *তারীখে ইরান জামীন*, পৃ. ১; *The World Book Encyclopedia*, Vol. 10, p. 405; রীভীন লীভী, *ফারসি আদাব কী মোখতাসার তারিখ*, ড. হাফিজ উদ্দীন আহমদ কেরমানী (অনু.) (লক্ষ্ণৌ: নিযামী প্রেস, ১৯৮৫), পৃ. ৪।

[২৩] **আলবুর্জ:** আলবুর্জ পর্বতের নাম ইয়াশ্‌ত গ্রন্থে ***হারা ও হারাঈতী*** হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাহলাভী ভাষায় একে ***হারবুর্জ*** বলে অভিহিত করা হয়। আর ফারসি ভাষায় *আলবুর্জ* শব্দটি উঁচু পর্বত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফারসি সাহিত্যে বিশেষত ফেরদৌসীর *শাহ্‌নামা মহাকাব্যে* এর প্রয়োগ অধিক পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়। [দ্রষ্টব্য: ড. মোহাম্মদ জা'ফর ইয়াহাকী, *ফারহাঙ্গে আসাতীর ওয়া ইশারাতে দাস্তানী দার আদাবিয়াতে ফারসি* (তেহরান: এন্তেশারাতে সোরূশ, ১৩৭৫ ইরানী সাল), পৃ. ৯৯।

[২৪] আ. ন. ম, রুহুল আমিন চৌধুরী, *ইরান বিপ্লবের চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০; *The Mavmillan Family Encyclopedia*, Vol. II, p. 249.

[২৫] আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, ১১তম সংস্করণ, খাদিজা আখতার রেজায়ী (অনু.) (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ২০০৪), পৃ. ৬৯।

[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন ইরানের সাসানী রাজ-বংশীয় সম্রাট ইয়াজদ গিরদ মুসলিম মুজাহিদদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করার মাধ্যমে ইরানের বুকে ইসলামী সবুজ পতাকা উড়তে থাকে।[২৭]

ইরানে রাজতান্ত্রিক শাসন অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ইরানী রাজতন্ত্রের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। আর ইরানে সাম্প্রতিক ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দু'হাজার বছর ধরে ইরানের বুকে রাজতান্ত্রিক শাসন বলবৎ ছিল। খুলাফা রাশেদূনের শাসনকালে ইরান বিজিত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে যেহেতু মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতেমী ও ওসমানী প্রভৃতি রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে, সেহেতু বলতে গেলে ইরান কখনও গণতান্ত্রিক শাসন প্রত্যক্ষ করেনি।[২৮] কাজার বংশেরই সাতজন শাসক দীর্ঘদিন ইরান শাসন করেন।[২৯]

পারস্যের সর্ব প্রথম রাজবংশ ছিল 'একিমেনিয়ান' রাজবংশ, তারা ৫৫৯-৩৩০ খ্রি.পূ. পর্যন্ত পারস্য শাসন করে। তারপর আলেকজান্ডার 'ম্যাকেডোনিয়া' রাজবংশ শাসন করেন,৩৩০–২৫০ খ্রি.পূ.পর্যন্ত। আশকানী রাজবংশ ২৫০ খ্রি.পূ-২২৪ খ্রি.। সাসানীরা মুসলমানদের ইরান বিজয়ের পূর্ব (৬৫১ খ্রি.) পর্যন্ত ইরান শাসন করেন। তারপর মুসলমানরা উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলিফাদের দ্বারা প্রায় দু'শ (৬৫১-৮২১ খ্রি.) বছর ইরান শাসিত হয়। তাহেরী রাজবংশ (৮২১-৮৭৩ খ্রি.), সাফারী (৮৬১ –৯০০ খ্রি.), আলাভী (৮৬৪–৯২৪ খ্রি.), সামানী (৯০০-৯৯৯ খ্রি.), গজনভী (৯৯৮-১০৪১ খ্রি.), সালজুক (১০৪০-১১৫৭ খ্রি.), মোঙ্গল রাজবংশ (১২২০-১৩৩৬ খ্রি.) খ্রি. পর্যন্ত ইরান শাসন করেন।[৩০] সাফাভী রাজত্ব চলে (১৫০২-১৭৩৬ খ্রি.) পর্যন্ত।[৩১] আফগানীদের দ্বারাও ১৭২২-১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পযর্ন্ত ইরান শাসিত হয়। তারপর নাদির শাহ (১৭৩৬-১৭৪৭ খ্রি.) শাসন করেন। কারিম খান জান্দ ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। কাজার রাজবংশ ১৭৭০-১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ পযর্ন্ত ইরান শাসন করেন।[৩২] রেজা খান ১৯২৫ খ্রি. ইরানের শাসন ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। এর পর হতে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরানের শাসক ছিলেন রেজা খানের পুত্র মুহাম্মদ রেজা শাহ পাহলাভী।[৩৩]

---

[২৭] আ. ন. ম, রুহুল আমিন চৌধুরী, *ইরান বিপ্লবের চেতনা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

[২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

[২৯] নুর হোসেন মজিদী (অনু.), *ইরানের সমকালীন ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

[৩০] Dr. Mohammad Hossein Panahi, *An Introduction to The Islamic Revolution of Iran and Its Slogans*, Vol. 6 (London: Al-Hoda, 2001), p. 11.

[৩১] *The New Encyclopeadia Britannica* (London: Encyclopeadia Britannica Inc., 2002), p. 376.

[৩২] *An Introduction to the Islamic Revolution of Iran and Its Slogans*, p. 11.

[৩৩] আমিন আল আসাদ, *ইমাম খোমেনী (রহ.) ও ইসলামী বিপ্লব* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৭), পৃ. ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম আগমনের পূর্বে ইরানে যেমন রাজতান্ত্রিক শাসনের প্রথা চালু ছিল, তেমনি মুসলমানদের বিজয়ের পরও ইরান রাজতান্ত্রিক শাসনের অক্টোপাশেই আবদ্ধ ছিল। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ রেযা শাহের পতনের মধ্য দিয়ে পাহলাভী রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৩৪]

ইরানে বৃটিশ ও রাশিয়া যে ঔপনিবেশবাদ গড়ে তুলেছিল সে সুযোগে তারা সামাজিক আধুনিকতা আনয়নের অজুহাতে ইরানীদের উপর পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। রেযা শাহ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিকতা আনয়নের স্বপ্ন দেখেন। এ সুযোগে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাঁকে দিয়ে স্ব স্ব উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলঃ দু'টি প্রথমত; ইসলামের গোড়া কর্তন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে মুছে ফেলে অধঃপতন নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত; আধুনিক সমাজ গড়ে তোলা অর্থাৎ পাশ্চাত্যকরণের জন্য পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতে সামাজিক উন্নয়ন।[৩৫] রেজা শাহের আমলে তারা এ লক্ষ্য অর্জনে অনেকটা সফলও হয়েছিল। কিন্তু ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হলে তাদের সে লক্ষ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

কাজারী আমলে সাংবিধানিক বিপ্লবের পূর্বেই ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাহী দরবারের ব্যয়ভার ছিল মোটা অঙ্কের। রাজা বাদশাদের ঘন ঘন বিদেশ গমনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত। মোটা অংকের কর ধার্য করে এবং শাহজাদা ও পরিষদবর্গের নিকট বিভিন্ন প্রদেশের শাসনক্ষমতা বিক্রি করে দিয়েও রাজদরবারের ব্যয়ভারের পুরো অর্থ যোগান দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত। সে জন্য শাহ ঔপনিবেশবাদী দেশগুলোর কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিতে লজ্জা পেত না এবং সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করতেন। এ সময় জনসাধারণের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায়। নাসিরুদ্দীন শাহের (১৮৪৮-১৮৯৬ খ্রি.) যুগের শেষ দিকে এবং মোজাফ্ফরুদ্দীন শাহের শাসনামলে এ চাপ কঠিনতর হয়ে পড়ে। রাশিয়া ও বৃটেনের ব্যবসায়ীদের প্রভাবে দেশী বহু ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে পড়ে। গ্রাম ও শহরে ক্ষুধা-দারিদ্র চরম আকার ধারণ করে এবং খাদ্যাভাবে বহুলোক মারা যেতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে সরকারের বিরুদ্ধে গণরোষ সৃষ্টি হতে থাকে।

---

[৩৪] *A Short History of Persian Literature,* p. 16.

[৩৫] মুহাম্মদ হাসান রেজবী, *জিন্দেগী নামেয়ে সিয়াসীয়ে ইমাম খোমেনী*, তৃতীয় সংস্করণ (তেহরানঃ মারকাযে ফারহাঙ্গীয়ে কেবলে, ১৩৭৩ ইরানী সাল), পৃ. ৮০-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের মানসলোকে ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামী চিন্তা চেতনা ও ভাবাদর্শ দৃঢ়মূল থাকার কারণে শোষিত বঞ্চিত জনগণ উলামা সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংগঠনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।[৩৬]

ইরানীদের অধিকাংশই শিয়া মুসলমান। কিছু কিছু কুর্দি এবং তুর্কী ও রয়েছে, যারা সুন্নী মুসলমান হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও ইরানে কিছু খ্রিষ্টান, ইহুদী, বাহাই এবং অগ্নিউপাসক বসবাস করে।[৩৭] শাহ ইসমাঈল ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে সাফাভী রাজবংশের নেতৃত্বে আসেন। তিনিই প্রথম ইরানে 'বার ইমামে' বিশ্বাসী 'শীয়া' মতবাদকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্মের সম্মান দেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রাউন (Browne) সাফাভী যুগে সাহিত্যের অধপতনের জন্য এ ধর্মীয় পরিবর্তনকেই দায়ী করেন।[৩৮] সাফাভীরা ছিল শিয়া ও খাঁটি ইরানী বংশোদ্ভব। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে আরব বাহিনী কর্তৃক পারস্য বিজিত হলে এতদঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে প্রাচীন ভাবধারা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। সাফাভী আমলে ইরানে সুফী মতবাদ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।[৩৯]

কাজার রাজবংশের শাসনামলেই (১৭৯৫–১৯২৫ খ্রি.) ইরান ও ইউরোপের মাঝে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ইউরোপের সংস্কৃতির নতুন অবয়ব ইরানে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই কিছু সংখ্যক ইরানী ইউরোপে পড়ালেখার সুযোগ পান । তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইরানে ফিরে এসেই নিজ দেশে আধুনিকতা আনয়নে সচেষ্ট হন।[৪০] নাসিরুদ্দীন শাহের (১৮৪৮-১৮৯৬ খ্রি.) শাসনামলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর প্রধান সচিব (আমীরে কাবীর) মীর্জা তাকী খান ইউরোপ সফরে যান এবং সেখানকার শিক্ষা সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার দেখে আসেন এবং উচ্চশ্রেণীর ইরানীদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলার জন্য সর্বপ্রথম 'দারুল ফুনূন' নামে একটি আধুনিক কলেজ স্থাপন করেন।[৪১] নাসিরুদ্দীন শাহ কাজার ইউরোপ সফরে যান এবং সেখানকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ অবলোকন করেন এবং নিজ দেশে তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন।[৪২] তাঁরা ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও শিক্ষা সংস্কৃতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে কিছু প্রাচীন ও কিছু আধুনিক

---

[৩৬] নুর হোসেন মজিদী, *ইরানের সমকালীন ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬; ড. মুহাম্মদ জাওয়াদ মাশকূর, *তারীখে ইরান জামীন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০।

[৩৭] *The New Encyclopeadia Britannica*, Vol. 6 (London: Encyclopeadia Britannica Inc., 2002), p. 375.

[৩৮] Roger Savory, *Iran Under the Safavid* (New York: Cambridge University Press, 1980), p. 27.

[৩৯] এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ৭১।

[৪০] *An Introduction to The Islamic Revolution of Iran and Its Slogans*, p. 7.

[৪১] ড. মুহাম্মদ জা'ফর ইয়াহাকী, *চূন সাবুয়ে তেশনে* (তেহরান: জামী প্রেস, ১৯৯৫), পৃ. ১৪-১৫।

[৪২] Joel Waiz Lal, *An Introductory History of Persian Literature* (Delhi: Adma Ram & Sons, 1925), p. 193.

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্টি-কালচার যা মানুষের জীবনের জন্য কোন উপকার বয়ে আনবে না তা তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল।[৪৩]

রেযা শাহের প্রায় বিশ বছরব্যাপী একনায়কতান্ত্রিক শাসনামলে ইসলামের শত্রুরা প্রবলভাবে ইসলাম ও আলেম-ওলামাদের বিরোধীতা করে এবং তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তারপরেও প্রায় একশ ভাগ ইরানী জনগণই ইসলামী সংস্কৃতির অনুসারী ছিল। এর কারণ ইসলামী সংস্কৃতি ইরানী জনগণের অন্তরে এমনই দৃঢ়মূল ছিল যে, দুশমনদের এত বিরোধিতা ও চাপ সত্ত্বেও তাঁদের ইসলামী সাংস্কৃতিক চেতনাকে নিশ্চিহ্ন বা দুর্বল করা সম্ভব হয়নি।

১.৩ বাংলা-ইরান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্য ও প্রশাসনের সাথে ইরান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ইসলাম গ্রহণের ফলে ইরানী সংস্কৃতির সঙ্গে তুর্কীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তুর্কীরা যখন উত্তর ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করে, তখন থেকেই এদেশে ইরানী সংস্কৃতির আর্বিভাব হয়। এ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফল ছিল ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী।[৪৪] মোগল শাসনামল থেকে শুরু করে কোম্পানী শাসনামলের প্রথমার্ধ পযর্ন্ত ফারসি ছিল এদেশের প্রশাসন ও আদালতের ভাষা। বাংলা ইরানের পারস্পারিক সর্ম্পকের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

যে কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং এর অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলা-ইরানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমুহ জনসাধারনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছে। দেশ দু'টির প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র বর্তমানের ন্যায় অতীতেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ-ইরান ঐতিহ্যের অধিকারী দেশ। ভৌগোলিক দিক থেকেও বাংলাদেশ-ইরান এশিয়ার অন্যতম মুসলিম দেশ হওয়ায় দেশ দু'টির মিল লক্ষ করা যায়।

সামাজিক দিক থেকে বাংলাদেশ-ইরানের মাঝে সম্পকের্র বন্ধন অনেক পুরাতন। ইরানের মতো বাংলাদেশেও পুরুষশাষিত সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশের মতো ইরানেও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা তথা মা-বাবা, ভাই-বোন এক সাথে মিলেমিশে বসবাস করার বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। ইরানের মতো

[৪৩] মুহাম্মদ হাসান রেজবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

[৪৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি* (ঢাকা: বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১), পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশবাদ গড়ে উঠেছিল। সে সুযোগে তারা পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় বাংলাদেশ ও ইরান সমজাতীয় সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

বাংলা-ইরানের ধর্মীয় সম্পর্ক হাজার বছরের পুরোনো। কয়েকশত বছর পূর্বে ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির মাধ্যমে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিজয়ের পর থেকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এতদঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। ছয়শত বছরের (১২০৩-১৮৩৭ খ্রি.) অধিক সময় ধরে ফারসি রাজ ভাষা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর ইমাম খোমেনীর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বিশেষ করে ইসলামী জাহানের সাথে ইরানের সর্ম্পকের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সর্ম্পক জোরদার হয়। বাংলাদেশ ও ইরান মুসলিম দেশ হওয়ার ফলে ধর্মীয় দিক থেকে দু দেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট মিল রয়েছে। দু'দেশের জনগণ ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাস করে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলে। মুসলিম প্রধান এ দু'টি দেশে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক বসবাস করে থাকে। উভয় দেশেই বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান।

পৃথিবীর প্রাচীন দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশও প্রাচীনকালের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বাহক হিসেবে উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। শিক্ষা , সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে ইরান-বাংলাদেশের মাঝে সম্পর্কের বন্ধন প্রায় হাজার বছরের। বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিভিন্ন আঙ্গিকে অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পযর্ন্ত তা রাষ্টীয় কাঠামোর আওতায় আসেনি। ঐ বছরে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আওতায় চলে আসে।

বাংলার মুসলিম শাসকরা ফারসি ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জনগণের ভাষায় পরিণত করেছেন। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবী ও ফারসি শব্দের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বর্তমান আধুনিক ফারসি প্রাচীন ফারসি থেকে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হলেও বর্ণমালা-ব্যবহার সহ নানা দিক থেকে এর উপর আরবীর প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার ফারসির মাধ্যমে এ আরবীর প্রভাব বাংলার উপরও লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষের পান্জাব সীমান্তে তুর্কী এবং ইরানীরা হানা দিলে ১২০২/১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

বিজিত হয়। সেমেটিক রক্তের বিজয়ী তুর্কী শাসক ও তাদের অনুগামী আরব ও ইরানের বণিক, ধর্ম প্রচারক, আলেম-উলামা ও সূফীগণ আরবী-ফারসি ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মীয় দিক থেকে তুর্কীরা মুসলমান আর সংস্কৃতিতে ছিলেন ফারসি। তারা তুর্কী ভাষায় কথা বলতেন, আর রাজনীতিতে ফারসি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন। এ ভাবে রাজার ভাষার প্রভাব প্রজা সাধারণের উপর পড়তে থাকে। তুর্কী আমল (১২০৩-১৩৫০ খ্রি.) স্বাধীন মুসলিম বাংলার পাঠান আমল (১৩৫০-১৩৭৬ খ্রি.) হয়ে মোগল আমল (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.)-এ ফারসি রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে। ফারসির প্রচলন এ দেশে একটা আভিজাত্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কালের কবি-সাহিত্যিকরা আরবী-ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কাব্যচর্চা করে উক্ত তিন ভাষার জ্ঞানার্জন অত্যাবশক বলে মন্তব্য করেছেন।

সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিম আরবী-ফারসি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে যে কথা বলে গেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

আরবি পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান ॥
আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিৎ
ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত ॥
ফারছি পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥
ফারছি এলেম হয় আরবী তনয়।
আরবির অনুরূপ ফারছি লিখয় ॥
হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারছি নন্দন।
পুস্তকের লিখিয়ে (আমি) ফারছি কথন ॥
এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার।
নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার ॥[৪৫]

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফারসি ছিল এ দেশের আইন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের ভাষা। ফলে ফারসি ভাষার চর্চা ছিল এখানকার সাধারণ মানুষ থেকে কবি-সাহিত্যিক পর্যন্ত বিস্তৃত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় ফারসির প্রভাব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। অনেক ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, সেগুলো আমাদের ভাষার অতীব প্রয়োজনীয় শব্দ হিসেবে বিবেচিত হয়ে নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে এখন এগুলো একেবারেই বাংলা শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন: মা-বাবা, আরাম-আয়েশ, আইন-আদালত, ঈমান-আকিদা, কম-বেশি, নামায-রোযা ইত্যাদি। উইলিয়াম গোল্ডস্যাক প্রণীত

---

[৪৫] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, সং-৩য় (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৯৬৫), পৃ. ২০৮-২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

Mussalmani Bengali-English Dictionary, গোলাম মাকসুদ হেলালী প্রণীত *Perso-Arabic Elements in Bengali* এবং হরেন্দ্র চন্দ্র পাল রচিত *'বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসি শব্দ'* এ অভিধানগুলো বাংলা ও ইরানের ভাষার মধ্যস্থিত পারস্পরিক সর্ম্পকের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

ফারসি ভাষার প্রভাব যে শুধু মাত্র বাংলায় রয়েছে এমন নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়ও অজস্র ফারসি শব্দ রয়েছে। গবেষক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক *Perso Arabic Elements in Chittagong bangla* শিরোনামে যে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন তাতে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত প্রায় তিন হাজার আরবী-ফারসি শব্দ স্থান পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে উপরোক্ত সম্পর্ক ছাড়াও আরো নানাবিধ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এ দু'টি দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট হওয়ায় ধর্মীয় দিক থেকে উভয় দেশের আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার প্রায় একই। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে ইরান-বাংলাদেশের মাঝে সম্পর্কের বন্ধন প্রায় হাজার বছরের পুরনো। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ইরানী প্রেসিডেন্ট হাশেমী রাফসানজানীর বাংলাদেশ সফর এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক রূপে বিবেচিত হয়। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের সাংস্কৃতিক ও ইসলামী নির্দেশনা মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর আঙ্গিকে (৬টি অধ্যায় ও ৪৬টি ধারা) ২০০৪ থেকে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের জন্য স্বাক্ষরিত হয়। এ কর্মসূচীর ১১তম ধারায় নিজ নিজ দেশে পারস্পরের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যাপারে এবং ১২তম ধারায় শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র বিনিময়ের বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

১.৪ বাংলা সাহিত্য ও ফারসি সাহিত্য পরিচয়

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পরিচয়

বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটি দেড় হাজার বছর।[৪৬] বাংলা ভাষা অপভ্রংশ ভাষা থেকে জন্মলাভ করে।[৪৭] বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয় বাংলা ভাষার জন্মের দুইশ বছর পরে। সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ প্রাচীন যুগ, ৮০০-১২০০ খ্রি., মধ্যযুগ, ১২০১-১৮০০ খ্রি. ও আধুনিক যুগ, তারপর থেকে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আধুনিক যুগের শুরু যা এখনও চলছে।

---

[৪৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. ১।

[৪৭] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন *চর্যাগীতিকা*। এ সময়ে অনেক চর্যাপদ রচিত হয়েছিল কিন্তু কালের প্রভাব এড়িয়ে মাত্র পঞ্চাশটি *চর্যাপদ* আমাদের হাত পর্যন্ত পৌছেছে। এ গুলো আবিষ্কার করেছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে। চর্যাপদের বিষয় হলো মানবদেহ নিয়ে সাধনা করা ও দেহ নিয়ন্ত্রণ করে রোগ-শোক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা এবং অমরত্ব অর্জন করা। এ পর্যন্ত বাইশ জন চর্যাকারের নাম পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত হলেন কাহ্ন পা, লুই পা, ভুসুকু পা, শবরীপা প্রমুখ। নামগুলো অবশ্য ছদ্মনাম, মূল নাম পাওয়া যায়নি। সংকলনের প্রথম কবি লুইপা, তার রচিত চর্যাপদের দুটি পংক্তি হচ্ছে:

> কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
> চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥[৪৮]

মধ্যযুগ

মধ্যযুগের প্রথম কবি বড়ুচণ্ডীদাস। আনুমানিক ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী নিয়ে তিনি রচনা করে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। মধ্যযুগের শুরুতেই তুর্কীরা বাংলাদেশ দখল করে, প্রথম কিছুদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটলেও ধীরে ধীরে তাদের অবস্থার খুব উন্নতি হয় এবং প্রচুর সাহিত্যকর্ম রচিত হয়ে সাহিত্যের নতুন নতুন শাখার উদ্ভব হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শাখা হলো মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ শাখা, বৈষ্ণব পদাবলী, প্রণয়োপাখ্যান, ইসলামী সূফীবাদ ও শরিয়ত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ দ্রুত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য

স্থানীয় দেবতাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচারের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় *মঙ্গলকাব্য*।

মনসামঙ্গল

সাপের দেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে *মনসামঙ্গল*। মনসা মঙ্গলের আদি কবি কানাহরি দত্ত। এ ধারার বিখ্যাত কবি হলেন বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, নারায়ণদেব ও বংশীদাস।[৪৯]

চন্ডীমঙ্গল

চন্ডীদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে *চন্ডীমঙ্গল*। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কবি হলেন মানিক দত্ত, মুকুন্দুরাম ও দ্বিজ মধাব।[৫০]

---

[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।

[৪৯] আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৪৩২-৪৪২।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম মঙ্গল

ধর্ম ঠাকুরের কাহিনী নিয়ে লেখা ধর্মমঙ্গল। এ বিষয়ে বিখ্যাত কবিরা হলেন মানিকরাম, গণরাম ও রুপরাম। ঐ সময়ে আরও একজন বড় কবির জন্ম হয়েছিল তার নাম ভারত চন্দ্র, তিনি রচনা করেছেন অন্নদা মঙ্গল।[৫১]

অনুবাদ

ঐ সময় কবিরা প্রাচীন ও ক্লাসিক রচনাগুলোর অনুবাদ করেছেন বাংলা ভাষায়। যেমন *রামায়ন* অনুবাদ করেছেন কৃত্তিবাস ওঝা, *মহাভারত* অনুবাদ করেছেন কাশীরাম দাস। এ সময়ে একজন বিখ্যাত ধর্ম প্রচারক ছিলেন চৈতন্য দেব, তার ধর্মের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। তার জীবনসাধনা ও তত্ত্ব নিয়ে বাংলা ভাষায় বিশাল এক সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়েছে। সে গুলো বৈষ্ণব পদাবলী নামে বিখ্যাত। উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন চণ্ডী দাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, ও গোবিন্দ দাস ।[৫২]

প্রণয়োপাখ্যান

প্রাচীনকালে সহজিয়া বৌদ্ধ রচনা করেছে চর্যাপদ এর কবিরা আর হিন্দুরা রচনা করেছে মঙ্গলকাব্য, পদাবলী ও ধর্মাশ্রয়ী অনুবাদ প্রভৃতি। সে পরিবেশে মুসলিম কবিরা এক নতুন ধারার সূত্রপাত করেন। এগুলো একান্তভাবে মানবীয় কাহিনী এবং ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত। এ ধারার নামকরা কাব্যগুলো হচ্ছে *ইউসুফ-জোলেখা*, *লাইলী-মজনু*, *সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, *পদ্মাবতী*, *গুলেবকাওলী*, *সতীময়না লোরচন্দ্রানী*। প্রণয়োপাখ্যানের বিখ্যাত লেখকরা হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর (পঞ্চদশ শতক), দৌলত উজীর বাহরাম খান (ষোড়শ শতক), আলাওল (সপ্তদশ শতক), দোনাগাজী (সপ্তদশ শতক), নওয়াজিস খান (সপ্তদশ শতক) প্রমুখ। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে মুসলমান কবিদের হাতে আরবী-ফারসি শব্দবহুল দোভাষী নামে একটি কাব্যধারার জন্ম হয়। এ বিষয়ে দুজন বড় কবি হলেন শাহ গরীবুল্লাহ (সপ্তদশ শতক) ও সৈয়দ হামজা (অষ্টাদশ শতক)।[৫৩]

ইসলামী সূফীবাদ ও শরিয়ত সম্পর্কিত কবিতা

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন সূফী আওলিয়াগণ, এ দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের খানকাহ গড়ে উঠেছিল। তাঁদের অনিন্দিত চরিত্র ও ইসলাম ধর্মের সাম্যের ডাকে সাড়া দিয়ে অনেক

---

[৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৫-৪৪৯।

[৫১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯।

[৫২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. সূচীপত্র।

[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০-২৯২।

স্থানীয় লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নওমুসলিমদের শিক্ষার জন্য সূফী দরবেশরা বাংলা ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন। দু'জন বিখ্যাত সূফী ও কবি ছিলেন সৈয়দ সুলতান (আনু:১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.) ও হাজী মুহাম্মদ (আনুঃ ১৫৫০-১৬২০ খ্রি.)। সৈয়দ সুলতান লিখেছিলেন *জ্ঞানপ্রদীপ* ও *জ্ঞান চৌতিশা* আর হাজী মুহাম্মদ *নুর জামাল* ও *সুরত নামা*।[৫৪] সূফীদের প্রচারিত ধর্ম নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমানদের অনেক আপত্তি ছিল সেজন্য তারা ইসলামী শরিয়ত ও নিয়ম কানুন প্রচারের করার জন্য বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছিলেন।[৫৫] উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিতাবের নাম হচ্ছে *কায়দানী কিতাব*, *তোহফা* ও *কিফায়াতুল মুসাল্লীন*।

আধুনিক যুগ

অন্নদামঙ্গল ও দোভাষী পুঁথির মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। আধুনিক যুগ ধরা হয় ১৮০০ খ্রি. থেকে। এ সময় ইংরেজরা ছিলেন বাংলার সিংহাসনে। ইংল্যান্ড থেকে আগত তরুণ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল শাসকগোষ্ঠী। সে লক্ষ্যেই ১৮০০ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ভারতীয় পণ্ডিতেরা তাদেরকে বাংলা শেখানোর জন্যে বাংলা ভাষায় কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। বইগুলো তেমন জনপ্রিয় ছিল না তবুও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদানকে গুরুত্ব সহকারে নেয়া হয়। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের পার্থক্য শুধু সময়গত নয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এর সাথে জড়িত রয়েছে। আধুনিককালে মানুষের দৃষ্টি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ইহলৌকিক। মধ্যযুগের কবিরা ছিলেন পরকালমুখী ও গোষ্ঠীকেন্দ্রীক। তাঁদের সব সাহিত্য পদ্যে রচিত। কিন্তু আধুনিককালে গদ্য একটি মুখ্যস্থান দখল করে। এ সময় আধুনিককালে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পদচারণা শুরু হয়; গীতিকাব্য, মহাকাব্য, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাস রচনা আরম্ভ হয়। ইংরেজ আগমনের সুযোগ সুবিধা হিন্দুরা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছিল। সাহিত্য রচনায় তাঁরা এগিয়ে যান। তাদের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর শিক্ষিত মুসলিম সমাজের উদ্ভব হয় এবং তারাও আধুনিক সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রথম আধুনিক কবি হিসাবে বিবেচনা করা হয় ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.) কে। তিনি শুধু গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে গীতি কবিতা রচনা করেন দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০ খ্রি.), ও বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪ খ্রি.)। মহাকাব্য রচনা শুরু করেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৬ খ্রি.), মাইকেল মধুসূধন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি.), হেমচন্দ্র

---

[৫৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭; মোমেন চৌধুরী (সম্পা.), *মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী*, খণ্ড ১ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃ. ১৩৮।

[৫৫] ওয়াকিল আহমদ, "সুফী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খণ্ড ৭ (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ খ্রি.), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রি.) ও কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খ্রি.)। বিহারীলালের পরে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) তিনি সাহিত্যের সব শাখায় বিচরণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিকাশের সর্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত করেন।

বিশ শতকের শুরুতে বিপুল প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.)। তাঁর প্রতাপে বাংলা সাহিত্যে নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। তার কিছুকাল পর বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪ খ্রি.) নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নূতন ধারার সূচনা হয়। সে ধারায় কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪ খ্রি.), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ও অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬ খ্রি.)। সে সময় আরেকটা ক্ষীণ ধারা ছিল প্রগতিশীল ধারার কবিতা। এ ধারার প্রথম কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭ খ্রি.)। এ ধারাগুলোই বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমাজসচেতন সাহিত্যের উদ্ভব হয়। ঐ সময় হিন্দুসমাজে অনেক অনাচার বিদ্যমান ছিল; যেমন– সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা প্রভৃতি। এ সকল অনাচার দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দু সমাজেরই একাংশ সাহিত্য রচনা শুরু করেন। যেমন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) রাম নারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬ খ্রি.) ছিলেন প্রধান । তাঁর নাটকের নাম *কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব*। এ ধারাটি মোটামুটি উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সে সময়েই ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *নীলদর্পণ*।

হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানরাও সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। জমিদারদের অত্যাচার নিয়ে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২ খ্রি.) রচনা করে ছিলেন জমীদারদর্পণ। তাছাড়া উনিশ শতকের দিকে আবিভূর্ত হন ডি এল রায়। তিনি কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন।

প্রথম বাংলা উপন্যাস হিসেবে গৃহীত হয় টেকচাঁদ ঠাকুর রচিত *আলালের ঘরের দুলাল*। এটি ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। তার পরপরই আবিভূর্ত হন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি.)। তিনি চৌদ্দটির মত উপন্যাস রচনা করে ছিলেন। তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তির কারনে তাঁকে সাহিত্যসম্রাট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বিশ শতকের শুরুতে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮খ্রি.) ও মুসলিম সমাজের মীর মশাররফ হোসেন। *বিষাদ সিন্ধু* মীর মশাররফ হোসেন এর অসাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ। উপন্যাস রচনায় তেমন বড় প্রতিভাবান উপন্যাসিক না থাকলেও নজিবুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৬০-১৯২৩ খ্রি.), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬ খ্রি.) ও মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.) বেশ উল্লেখযোগ্য। *আনোয়ারা*, *আবদুল্লাহ* ও *জোহরা* তাঁদের রচিত উপন্যাস। এ গুলোতে মুসলমান সমাজের প্রচলিত ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে আধুনিকতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য গদ্যের প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকে প্রচুর পরিমাণে গদ্য রচনা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রি.), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) ছিলেন খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক। প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রি.), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০খ্রি.) অত্যন্ত নামকরা ব্যক্তিত্ব।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বহু বিচিত্র ও বহুকাল বিস্তৃত। অতি সংক্ষেপে এর বর্ণনা দেয়া অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। উপর্যুক্ত আলোচনায় শুধু মূলধারাগুলোর পরিচয় উপস্থাপিত হল। অনুবাদ সম্পর্কে ভূমিকাংশে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

ফারসি ভাষা-সাহিত্যের পরিচয়

ফারসি পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সমৃদ্ধ ভাষাসমূহের অন্যতম। বর্তমান পৃথিবীর শত সহস্র ভাষার মধ্যে ফারসি মানব জাতির প্রধান দু'টি নৃ গোষ্ঠী তথা আর্য ও সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে ফারসি প্রথমটির প্রতিনিধি। এ ভাষা চারটি পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে; আবেস্তা,[৫৬] প্রাচীন ফারসি,[৫৭] পাহলভী[৫৮] এবং আধুনিক ফারসি [৫৯]। বর্তমানে এটি পারস্য তথা ইরান, আফগানিস্তান, কুর্দিস্তান, তাজাকিস্তান ও বেলুচিস্ত

---

[৫৬] **আবেস্তাঃ** প্রাচীন ইরানের ধর্মীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছিল। যারতুস্ত প্রবর্তিত ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এ ভাষায় লেখা হয়। আবেস্তা নাম থেকেই এ ভাষা আবেস্তা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উত্তর ইরানের মাদ এলাকায় এ ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। [দ্রষ্টব্যঃ সালিম নিছারী, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরানঃ ১৩২৮ ইরানী সাল), পৃ. ১।

[৫৭] **প্রাচীন ফারসিঃ** খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে হাখামানশিদের যুগে এ ভাষার প্রচলন ছিল। প্রাচীন ইরানের প্রথম রাজধানী কেরমানের বিস্তুন পর্বত, তাখতে জামশীদ, নাকশে রুস্তম ইত্যাদি শিলালিপিতে এ ভাষার নিদর্শনগুলো এখনো অক্ষত রয়েছে এ ভাষা সাংকেতিক মিখ্ বা পেরেক আকৃতির চিহ্ন বিশেষের মাধ্যমে লেখা হতো। [দ্রষ্টব্যঃ আবু মুসা মো. আরিফ বিল্লাহ, বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসি শব্দ অভিধান, *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষঃ ৩৮, সংখ্যাঃ ৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২ বাংলা, পৃ. ১৫৯।]

[৫৮] **পাহলভি ভাষাঃ** আশকানী যুগে (খ্রি..পূর্ব ২৪৯-২২৬) পাহলভি নামে ইরানে আরেকটি ভাষার উৎপত্তি হয়। এটি মূলতঃ আবেস্তা ও প্রাচীন ফারসির বিবর্তিত রূপ। পরবর্তীকালে সাসানীদের রাজত্বকালে (খ্রি.পূ. ২২৬-২৫২) এ ভাষার উচ্চারণ ও আঙ্গিকে উৎকর্ষ সাধিত হয়। আশকানী ও সাসানীদের রাজত্বকাল মিলে প্রায় এক হাজার বছর ব্যাপী এ ভাষা ইরানে প্রচলিত ছিল। আসকানী যুগে পাহলভি ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়। কিন্তু দু'চারটি ছাড়া সেগুলোর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। [দ্রষ্টব্যঃ সালিম নিছারী, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরানঃ ১৩২৮, ইরানী সাল), পৃ. ৪।

[৫৯] **আধুনিক ফারসি ভাষাঃ** শেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদগারদ (৬৪৩-৬৫২ খ্রি.) এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলফিা হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলিম বাহিনী কর্তৃক ইরান দখলের পর ইরানের জনগণ বিপুলভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ফলে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয় কারণে সাসানীদের প্রচলিত পাহলভি ভাষা আরবী ধারায় ধীরে ধীরে ফারসিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। পাহলভি বর্ণমালা পরিবর্তন করে আরবী বর্ণমালায় পরিণত করা হয়। তবে কিছু কিছু পাহলভি বর্ণের আরবী প্রতি বর্ণ না থাকায় আরবী 'বে' হরফের নিচে ৩টি নুকতা লাগিয়ে 'পে' আবার জিমের পেটে ৩টি নুকতা বসিয়ে 'চে', 'যে' হরফের

Dhaka University Institutional Repository

ান প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চলের ষাট মিলিয়নের অধিক জনগোষ্ঠির ভাষা হলেও এর উৎপত্তি হয় ইরানে। বর্তমান ইরানের অধিবাসীদের প্রায় দু-তৃতীয়াংশই আর্য[৬০] বংশোদ্ভূত। এখানকার আদিবাসী এবং অভিবাসী আর্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মেলামেশার ফলে যে নূতন ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, তা-ই 'ফারসি' নামে পরিচিত[৬১]।

১.৫ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক

পৃথিবীর প্রাচীন দেশ-গুলোর ন্যায় বাংলাদেশও প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক- বাহক হিসেবে বিবেচিত। সে কারণে এ দেশটি বিশেষ ভাষা, রীতি-নীতি এবং উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। অবশ্য এদেশের সাহিত্য সমাজ-সংস্কৃতিতে বিদেশী প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাই দেখা যায় যে, এতদঞ্চলের লোকেরা তুর্কী, মোগল এবং ইরানীসহ অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিজেদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতির মৌলিকত্ব তারা হাত-ছাড়া করেনি। বিজয়ী শক্তি হিসেবে বাংলার মুসলমানদের আগমনের পূর্বে দ্বীন-ইসলামের প্রচারকগণ এ অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। এ সব প্রচারকদের আচরণ ও প্রভাবে এ ভূখণ্ডের অসংখ্য মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুফী সাধকগণের অনেক দল-উপদল এ দেশে বসবাস করতে থাকায় তাঁদের কথা-বার্তা এবং আচার-আচরণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর এক বিশেষ ধরনের প্রভাব ফেলে। দ্বীন প্রচারকদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ এবং তাদের আদেশ ও উপদেশাবলী এতো বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে যে, অমুসলিম জনগোষ্ঠী যেমন বৌদ্ধ এবং হিন্দুরাও ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে সমবেত হন। নিঃসন্দেহে বাংলার সুফী-দরবেশদের খানকাসমূহ ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা এবং ফারসি সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। অধিকাংশ ধর্ম প্রচারকদের ভাষা ছিল ফারসি। তারা তাদের খানকায় আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর আদেশ নিষেধ পালনের বাণী অত্যন্ত সহজ সরল ও মিষ্টি ভাষায় বর্ণনা করার ফলে বাংলাভাষী লোকেরা সেগুলো অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করেন।

উপরে তিনটি নুকতা বসিয়ে 'ঝে', 'কাফ' হরফের উপর একটি টান দিয়ে 'গাফ' বর্ণ তৈরীর মধ্য দিয়ে আরবী ভাষাবিদদের সহযোগিতায় আধুনিক ফারসি ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটে। [দ্রষ্টব্যঃ রেজাযাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান* (তেহরানঃ ১৯৭৪ খ্রি.) পৃ. ১০৪-১০৫।

[৬০] **আর্যঃ** ইরানের আদিবাসীগণ আর্য বংশোদ্ভূত ছিল। এরা খ্রিষ্টপূর্ব চার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বসবাসযোগ্য ভূমির সন্ধানে "পামির" এলাকা থেকে ইরানের দিকে যাত্রা করেছিল। প্রথমে এরা বর্তমানে স্বধীনতাপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্র তাজিকিস্তানের অর্ন্তগত সমরখন্দ ও বোখারা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে সংখ্যাবৃদ্ধি ও স্থানাভাবের কারণে খ্রি.পূ.১৫০০-১২০০ সালে এদের একটি দল খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে এবং অপর দলটি ইরানে প্রবেশ করে। ইরানী দলটির একটি অংশ উত্তর ইরানের উপকূলবর্তী এলাকা 'ফার্স'-এ স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। এদের এক শাখা আজকের পাঞ্জাব অঞ্চলেও এসে ঘর-বাড়ী করেছিল। [দ্রষ্টব্যঃ মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *তারীখে ইরান*, ১ম খণ্ড (তেহরানঃ মজলিসে তারাককীয়ে উর্দু, ১৯৬৭), পৃ. ১৮; ফজলুল হাসান ইউসুফ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৫।]

[৬১] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৬ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর সেনাপতি মইজুদ্দিন মুহাম্মদ সাম (শেহাব উদ্দিন ঘোরী) এর দ্বারা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তিনিই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৬২] আবুল কাসেম *তারীখে ফিরিশতা* গ্রন্থে বলেন:

و سر حد بنگاله در عوض شهرند یا شهری موسم به رنگ پور فناه کرده دار الحکومت خود ساخته و مساجد و خانقاه، و مدارس در ان شهر و ولایت برسم اسلام برونق و رواج تمام مزین و محلی گردانید.[৬৩]

ধারণা করা হয় যে, এ অঞ্চলে ফারসি ভাষা শিক্ষার যাত্রা সেখান থেকেই আরম্ভ হয়। এবং এর পর থেকে ফারসি ভাষা সুধী ও শিক্ষিতজনের কাছে সমাদৃত হতে থাকে।

পরবর্তীকালে উপমহাদেশের প্রায় সকল আলেম, কবি, বক্তা, ঐতিহাসিক, এবং জীবনীকার বিশেষ করে বাংলাদেশের জ্ঞানী ও পণ্ডিতবর্গ ফারসি ভাষাতেই তাঁদের নিজস্ব অবদান তুলে ধরেন। বলা যায় মুসলিম শাসনামলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (১২০৩ খ্রি.-১৮৩৭ খ্রি.) অর্থাৎ প্রায় ছয়শত বছর ফারসি ভাষা উপমহাদেশের অফিস আদালতের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৬৪] এ সুদীর্ঘ সময়ে বাংলায় শত শত বই পুস্তক ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছে। সে রচনা সম্ভারগুলো বাংলাদেশের অত্যন্ত উঁচুমানের শিল্প ও সাহিত্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত। ফারসি ভাষার প্রয়োগ কেবলমাত্র শিল্প ও সাহিত্য অঙ্গনেই হয়নি বরং কুরআন-হাদীস, ইতিহাস এবং অন্যান্য ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে এ বিষয়টি অস্বীকার করার সুযোগ নেই।[৬৫] এক সময়ে এতদঞ্চলে ফারসি ভাষার উন্নতি এবং পরিপূর্ণতা লাভের পাশাপাশি দেশের অনেক শিল্পকর্ম যেমন চারুলিপি, চিত্রশিল্প, স্থাপত্যশিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ইরানী সংস্কৃতি সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে। এখনো বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক মসজিদ, খানকা, ঐতিহাসিক ইমারত সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য শিল্পের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই ফারসি ভাষা বাংলার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছিল। ফারসি ভাষা শিক্ষা ও অধ্যয়ন এবং পারস্য সংস্কৃতি সাহিত্যের চর্চা এতো ব্যাপক রূপ লাভ করে যে আমাদের অজান্তে এখনো বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অসংখ্য নির্দেশনাবলী বিদ্যমান।

---

[৬২] আবদুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশে* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ২৬।

[৬৩] মৌলভী আবদুস সাত্তার, *তারীখে মাদরাসায়ে আলীয়া*, ২য় খণ্ড (ঢাকা:মাদ্রাসা-এ-আলিয়া, ১৯৫৯), পৃ. ২২।

[৬৪] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৯।

[৬৫] ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার, *পেইভান্দহায়ে মাওজুদ দরমিয়ানে দু' যাবান ফারসি ওয়া বাঙালী* (ইসলামাবাদ: ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজেতাগণ আগমনের পূর্বে হিন্দু রাজাগণ এ অঞ্চলের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ সকল রাজ রাজরা এবং হিন্দুদের ধর্মীয় গুরু (ব্রাক্ষ্মণ)দের প্রচলিত ভাষা ছিল সংস্কৃত। হিন্দু রাজা এবং তাদের ব্রাক্ষ্মণেরা বাংলা ভাষায় কথা বলা কে তুচ্ছ জ্ঞান করতো।[৬৬] সে সময়ে সার্বজনীনভাবে কোন কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক বাংলা বিজিত হওয়ার পর, তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে। তাঁরা মনে করেন এ দেশের মানুষের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের জন্য এ ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করা অত্যন্ত জরুরী। তাই মুসলিম শাসকগণ বাংলা ভাষার প্রচার, প্রসার এবং পরিচর্যার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যদিও এ সময়ের বাংলার অধিকাংশ শাসকই তুর্কী ও মোগল ছিলেন। তা সত্ত্বেও ফারসি ভাষার ব্যবহার এককভাবে তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। এ কারণে প্রচলিত দু'টি ভাষার কোনটিকেই তাঁরা খাঁটো করে দেখেননি। এ সুবাদে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফারসি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে; যার মাধ্যমে এ দু'ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান ব্যাপকভাবে বাংলায় প্রবেশ করেছিল। এ সময়ে কারবালা, হযরত মুহাম্মদ (স:), হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.) এর জীবনী নিয়ে অসংখ্য কবিতা, ছন্দ এবং গল্প রচিত হয়েছে। কবি শাহ বদিউদ্দিন *ফাতেমার ছুরত নামা* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়ে *জংগে হানিফা* এবং *আমীর জংগ* এর ন্যায় কারবালার ঘটনা অবলম্বনে বেশ কিছু সত্য এবং কল্পনা নির্ভর গল্প রচিত হয়েছে। এ সব লেখায় হযরত আলী (রা:) এর বংশধরদের সাথে ইয়াজিদের সংঘর্ষের বিষয় জোরালোভাবে স্থান পেয়েছে।

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে ফারসি ও বাংলা ভাষার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নূতন মাত্রা যোগ হয়। ফারসি ভাষাকে সহজ সরল ও বোধগম্য করে তোলা এবং বাংলার জনগণের সাথে এ ভাষার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বাংলা ভাষায় পুঁথি সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে। পুঁথি সাহিত্যকে "দোভাষী" সাহিত্য বা উভয় ভাষার সাহিত্য বলেও ধারণা করা হয়। কেননা এ পুঁথি সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ফারসি ভাষার শব্দ এবং ফারসি ভাষার রচনা কৌশল গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম লেখকগণ ফারসি ভাষার ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তাঁরা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। এবং স্বাভাবিক প্রচলিত কথা-বার্তা এবং কাজে-কর্মে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেননি। বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় পুঁথি সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন।

---

[৬৬] ড. আবদুল হাই, প্রফেসর আলী আহসান ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা আদবকী তারীখ* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭), পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ফারসি ভাষা সাহিত্য এবং এর রীতি-নীতি বাংলাদেশে সহ দূরের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ফলে এ ভাষা সম্পর্কে মানুষের মনে বিশেষ উপলব্ধি জাগ্রত হয়। বঙ্গে এ ভাষার এতই প্রভাব পড়েছিল যে, ইচ্ছা করলেও ফারসি শব্দাবলির ব্যবহার তাঁদের দৈনন্দিন কথা থেকে উঠিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল না।

খ্রিষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর এতদঞ্চলের কবিগণ তাদের কবিতায় ফারসি সাহিত্যকে অনুসরণের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন। বাংলার জনগণ ইরানের কবি সাহিত্যিক এবং বক্তাদের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাদের কবিতা ও লেখা পড়ে তারা অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেছেন। এখনো এ অঞ্চলে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সাদী, হাফিজ, রুমী এবং খৈয়্যামের কবিতা আবৃত্তি করা হয়। বাংলা কবিতা, মুর্শিদী, জারী এবং বাউল গানসহ বিভিন্ন ধরনের গান গুলোতে হাফিজ, রুমী, আত্তার এবং সানায়ীর চিন্তাধারা ও ভাব অনুসরণে রচিত এবং ফারসি শব্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত।

এ অঞ্চলের লোকেরা *দীওয়ানে হাফিজ*, সাদীর *গুলিস্তান* এবং রুমীর *মসনবী*কে বিশেষ ধরনের সুর দিয়ে পড়ে থাকেন; তাঁরা হাফিজ, রুমী এবং সাদীর প্রতি সুমিষ্ট ফারসি ভাষার কারণে আন্তরিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন। বাংলা ভাষায় ভালবাসার কবিতা এবং গান ফারসি সাহিত্যেরই প্রভাব এবং ফারসির সাথে সম্পর্কের কারণেই বাংলা ভাষায় মন মাতানো হৃদয় গলানো এবং মিষ্টি গজলের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। কাজী নজরুল ইসলামের গযল সম্ভার এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে। যেমনঃ

মোদের নবী আল-আরাবী
সাজল নওশার নওল সাজে,
সে রুপ হেরী নীল নভেরই
কোলে রবিলুকায় লাজে ॥
আরাস্তা আজ জমীন আসমান
হুর পরী সব গাহে গান,
পূর্ণ চাঁদের চাঁদোয়া দোলে
কা'বাতে নৌবত বাজে ॥
কয় 'শাদী মোরকবাদী'
আউলিয়া আর আম্বিয়ায়,
ফেরেশতা সব সওদা খুশীর
বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে ॥
গ্রহ তারা গতি-হারা
চায় গগনের ঝরোকায়,
খোদার আরশ দেখছে ঝুঁকে
বিশ্ব-মধুর হৃদয় রাজে ॥[৬৭]

[৬৭] আবদুল মুকীত চৌধুরী, *নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর গযলগুলো অত্যন্ত মনোহরী, সহজ সরল এবং সাধারণ অর্থবহ। তাঁর কবিতা ও গযল প্রকৃত অর্থেই উঁচুমানের বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। বাংলার অপরাপর অনেক কবি যেমন–কবি হাদী মুহাম্মদ (১৫৫০-১৬২০ খ্রি.), কবি শেখ চাঁদ (১৫৬০-১৬২৫ খ্রি.) কবি মুহম্মদ খাঁন (১৫৮০-১৬৫০ খ্রি.) কবি হায়াত মামুদ (১৬৮০-১৭৬০ খ্রি.) নিজের কবিতায় ইরানী স্টাইল গ্রহণ করেন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, ফারসি ভাষা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এ ভাষাকে চিন্তা ও জ্ঞানের উন্নত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

ড. গোলাম মাকসুদ হিলালী (১৯০০খ্রি.-১৯৬১ খ্রি.) কর্তৃক '*Perso-Arabic Elements in Bengali*' (*বাংলা ভাষায় ফারসি আরবী উপাদান*) শিরোনামে রচিত অভিধানটি অধ্যয়ন করলে ফারসি-বাংলা পারস্পারিক সম্পর্ক ও ফারসি থেকে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির বিষয়টি উপলদ্ধি করা যায়। এ অভিধানটিতে দেখানো হয়েছে যে, ৫হাজার ১৮৬টি ফারসি ও আরবী শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ যা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[৬৮] মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলিম সকলেই ফারসি চর্চা করেন। ফলে প্রায় ২হাজার ৫০০ ফারসি ও ফারসি উচ্চারণে আরবী শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে।[৬৯] ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার উইলিয়াম গোল্ড প্রকাশনী *ফারহাঙ্গে মুছলমানী* নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এতে প্রায় ছয় হাজার ফারসি এবং আরবী শব্দ স্থান পেয়েছে যে শব্দাবলি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনিভাবে বাংলাদেশের অনেক ফারসি কবিও ফারসি ভাষায় অনেক বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এতে করে ফারসি ভাষাও বাংলা ভাষার রূপ-সৌন্দর্য্য গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে বেশ কিছু ফারসি পদ্য ও গদ্যে বাঙ্গালী অনেক কবি ও লেখক এমন কিছু সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেছেন সে শব্দগুলোর ইরানী ফারসি শব্দের সাথে সম্পর্ক নেই। এমনকি যে সকল কবি এবং সাহিত্যিক দিল্লী থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন ইরানী তাদের রচনাবলীতেও বাংলা শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আমীর খসরু দেহলবী, আবুল বারাকাত মুনির লাহোরী এবং অন্যান্য ফারসি কবিদের কবিতায় বাংলার বিভিন্ন পেশা, ফল ও স্থানীয় ফুলের নাম ফারসি ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের লেখকদের একটি অংশ বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের প্রচলন মেনে নিতে না পারায় বাংলা ভাষা ইসলামী বিষয়াবলী থেকে দূরে সরে যায়। তারা বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটায়। অপর দিকে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২ খ্রি.),

---

[৬৮] আবু মুসা মো. আরিফ বিল্লাহ, বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসি শব্দ অভিধান, *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষঃ ৩৮, সংখ্যাঃ ৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২, পৃ. ১৭১।

[৬৯] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ৫ম মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০), পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খ্রি.), শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬ খ্রি.) এবং রিয়াজউদ্দীন মাশহাদীর (১৮৫৯-১৯১৯ খ্রি.) ন্যায় অসংখ্য মুসলিম কবি সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ ধরনের সংকীর্ণতায় ভোগেননি। তাঁরা পুঁথি সাহিত্যের ন্যায় বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। এর ফলে ফারসি ভাষা ও বাংলা ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক আরো মজবুত আকার ধারণ করে।

বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ও সম্পর্ক নূতন করে আরম্ভ হয়। কেননা এ সময়ের মুসলিম লেখকগণ যেমন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১ খ্রি.), ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০ খ্রি.), শাহাদাৎ হোসাইন (১৮৯৩-১৯৫৩ খ্রি.), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি.), কাজী মাজহার হোসাইন, গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রি.), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি.), আখতারুল আলম, সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮ খ্রি.), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২ খ্রি.), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২ খ্রি.), জসীম উদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রি.) সহ আরো অনেকে বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেছেন যে রচনাবলি ফারসি শব্দ সম্ভার ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করেছে; যা ফারসি ভাষা ও বাংলা ভাষা সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কেরই ফসল।

১.৬ বাংলা ভাষা সংগঠনে ফারসি ভাষা সংগঠনের প্রভাব

বাংলায় যেসব বহিরাগত মুসলমান স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল একদিকে তারা যেমন স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল অন্যদিকে স্থানীয় জনসাধারণও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষ এবং ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্রাট আকবর কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মোঘল শাসনের গোড়াপত্তন হলে বাংলায় ফারসির প্রভাব পূর্বের তুলনায় আরও ব্যাপক হয়। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর এক সাংস্কৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়, যার ফলশ্রুতিতে ইন্দো-মুসলিম সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। এ সংস্কৃতির বাহন ছিল হিন্দুস্থানী তথা উর্দু ভাষা। সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতকে হিন্দুস্থানী ভাষা ভারত উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও ইসলামী চেতনা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে অভিজাত শ্রেণীর লোকজন, এমনকি হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও কথ্য বাংলায় ব্যাপকভাবে ফারসি শব্দ ব্যবহার করতে থাকে। উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং বাংলার মুনশিরা ধনিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ফারসি পড়াতেন। দীর্ঘ ছয়শত বছরের এ মুসলিম প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষায় কয়েক

Dhaka University Institutional Repository

হাজার ফারসি এবং ফারসির মাধ্যমে আরবী ও তুর্কী শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের প্রভাবে মূল বাংলা শব্দেরই বিলুপ্তি ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি বাংলা শব্দ উল্লেখ করা হলোঃ খরগোশ (শশক), বাজ (সয়চান), শিকার (আখেট), নালিশ (গোহারি), বিদায়(মেলানি), জাহাজ (বুহিত), হাজার (দশ শ) ইত্যাদি।

১.৬.১ বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত ফারসি শব্দাবলী

দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের কারণে এবং মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি ভাষা-ভাষী ইরানী ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসারের ফলে রাজস্ব, প্রশাসন, রাজকীয় সম্ভাষণ, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিজমা এবং ধর্ম সংক্রান্ত বহু ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং এ গুলোর বহু ব্যবহারে বাংলা ভাষা-ভাষীদের নিকট এসব শব্দ এতটাই পরিচিত হয়ে উঠেছে যে, এখন আর এগুলোকে বিদেশী শব্দ বলে মনেই হয় না। ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় আগত শব্দ গুলোকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ

যেমনঃ নামাজ (نماز), রোজা (روزه), বেহেশত (بهشت), দোযখ (دوزخ), খোদা (خدا), পয়গাম্বর (پیغمبر), ফেরেশতা (فرشته), বন্দেগী (بندگی), ঈদগাহ (عیدگاه), দরগাহ (درگاه), খানকাহ (خانقاه), মাতম (ماتم), মরসিয়া (مرثیه), তাজিয়া (تازیه), শবেবরাত (شب برات), শবেকদর (شب قدر), পীর (پیر), বুযুর্গ (بزرگ), গুনাহ (گناه), গুনাহকার (گناه کار), নেককার (نیک کار), বদকার (بد کار), পরহেজগার (پرهیزگار), জায়নামাজ (جای نماز) ইত্যাদি।

ভূমি,শাসনকার্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত শব্দ

যেমনঃ যমিন (زمین), যমিনদার (زمیندار), খাস (خاص), খাযনা (خزانه), দাগ (داغ), পরচা (پرچه), নকল (نقل), তহশিলদার (تحصیل دار), ইজারাদার (اجارة دار), জায়গিরদার (جایگیردار), তালুক (تعلق), তালুকদার (تعلقدار), কামান (کمان), তুপ (تپ), ফৌজ (فوج), বাহাদুর (بهادر), জানবাজ (جانباز), রশদ (رشد), সিপাই (سپاهی), নবাব (نواب), বেগম (بیگم) খাসমহল (خاص محل) ইত্যাদি।

আইন-আদালত সংক্রান্ত শব্দ

যেমনঃ আইন (آئین), আদালত (عدالت), কানুন (قانون), দসতুর (دستور), ওকিল (وکیل), ওকালতনামা (وکالت نامه), জেরা (زیرا), অছিয়তনামা (وصیت نامه), হাকেম (حاکم), হুকুম (حکم),

Dhaka University Institutional Repository

ফরমান (فرمان), মক্কেল (موکل), রায় (رای), জোর (زور), নালিশ (نالیش), সালিশ (شالیش), মোকদ্দমা (مقدمه), পারওয়ানে (پروانه), মুনশী (منشی), মুন্সেফ (منصف), দলীল (دلیل), মেয়াদ (میعاد), মোক্তার (مختر), কয়েদ (قید), কয়েদখানা (قیدخانه), কয়েদী (قیدی), গেরেফতার (گرفتار), পেয়াদা (پیاده), পেশকার (پیشکار), ফরিয়াদ (فریاد), ফয়সালা (فیصله), তামাদি (تمادی) ইত্যাদি।

শিক্ষা সংক্রান্ত শব্দ

যেমন: মাদরাসা (مدرسه), গযল (غزل), কাগজ (کاغذ), কলম (قلم), আলেম (عالم), মক্তব (مکتب), কেচ্ছা (قصه) ইত্যাদি।

সভ্যতার উপকরণ ও পোষাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত

যেমন: আচকান (اچکن), জোব্বা (جبّه), আয়না (آئینه), চাদর (چادر), পর্দা (پرده), জামা (جامه), দালান (دالان), বরফ (برف), বাগিচা (باغیچه), মখমল (مخمل), রুমাল (رومال), আতর (عطر), ফারশ (فرش), কামিস (قمیص), শালওয়ার (شلوار), পিরাহান (پیراهن), বাযুবান্দ (بازوبند), কমরবান্দ (کمربند) ইত্যাদি।

খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য উপকরণ সম্বন্ধীয়

যেমন: পোলাও (پلاؤ), কোর্মা (قرمه), বিরিয়ানী (بریانی), হালুয়া (حلوا), কালিয়া (قلیه), গুশত (گوشت), কোপ্তা (کوفته), বাদাম (بادام), আনার (انار), মিছরী (مصری), কাবাব (کباب), কিমা (قیمه), মোরব্বা (مربه), সজি (سبزی), কিশমিশ (کشمش), পেস্তা (پسته), বেরেশ্‌তা (برشته), দস্তরখানা (دسترخان) ইত্যাদি।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধীয়

যেমন: পা (پا), সিনা (سینه), গরদান (گردان), পাঞ্জা (پنجه), দেল (دل), রান (ران), কোমর (کمر), বাজু (بازو), যবান (زبان), চেহারা (چهره), সুরাত (صورت), যুলফ (زلف), ইত্যাদি।

জাতি ও পেশা সংক্রান্ত

যেমন: হিন্দু (هندو), ইহুদী (یهودی), ফিরিঙ্গি (فرنگی), খানসামা (خانشامه), খিদমতগার (خدمتکار), খিদমত (خدمت), চাকর (چاکر), জাদুকর (جادوکر), দরজী (درزی), দোকারনদার (دکاندار), মেথর (مهتر), বাজিগর (بازیگر), কারিগর (کاریگر) ইত্যাদি।

পরিবার ও আত্মীয় সংক্রান্ত

বাবা (بابا), মা (ما), দাদা (دادا), খালা (خاله), বাচ্চা (بچه), দোস্ত (دوست), দুশমন (دشمن), ইয়ার (یار) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

নাম বাচক

যেমন: দিল আফরোয (دل افروز), দিলরুবা (دلربا), দিলারা (دلارا), নূরজাহান (نورجهان), ফাতেমা (فاطمه), যাহরা (زهرا), যিনাত আরা (زینت آرا), ইফতেখার (افتخار), আলমগীর (عالمگیر), জাহাঙ্গীর (جهانگیر), জামশিদ (جمشید), সোহরাব (سهراب), রোস্তম (رستم), মাহদী (مهدی), জাহান আরা (جهان آرا), আন্দালিব (اندلیب) ইত্যাদি।

পশু পাখির নাম সংক্রান্ত

যেমন: খরগোশ (خرگوش), কবুতর (کبوتر), বুলবুল (بلبل), তোতা (طوطا), বাজ (باز), হাইওয়ান (حیوان), জানোয়ার (جانوار) ইত্যাদি।

স্থান বিষয়ক

যেমন: হাম্মামখানা (حمام خانه), গোসলখানা (غسل خانه), কয়েদখানা (قید خانه), হুজরাখানা (حجره خانه), সরাইখানা (شرای خانه), মোসাফেরখানা (مسافرخانه), ইয়াতিমখানা (یاتیم خانه), কারখানা (کارخانه), বালাখানা (بالاخانه), বাজার (بازار), দরবারখানা (دربارخانه), তোপখানা (تب خانه), আসমান (آسمان), যমীন (زمین) ইত্যাদি।

ভৌগোলিক স্থান সংক্রান্ত

যেমন: গুলিস্তান (گلستان), নওয়াবপুর (نواب پور), পিলখানা (پیل خانه), রাজশাহী (راجشاهی), রংপুর (رنگپور) ইত্যাদি।

অন্যান্য বিষয় ও সাধারণ দ্রব্যাদি সংক্রান্ত

যেমন: আফসোস (افسوس), কম (کم), গরম (گرم), তাজা (تازه), নরম (نرم), নাম (نام), পছন্দ (پسند), পেশা (پیشه), বদল (بدل), হাওয়া (هوا), আবহাওয়া (آب وهوا), হযম (هزم), বদ (بد), খুব (خوب), হরদম (هردم), হুশিয়ার (هوشیار), সবুজ (سبز), সেতার (سه تار), বাহবা (بهبه), জোর (زور), আবাদ (آباد), আরাম (آرام), আওয়াজ (آواز), আসান (آسان), আন্দাজ (آنداز), বেচারা (بیچاره), বেকার (بیکار), বেহুশ (بیهوش), বালিশ (بالش), তোষক (توشک), দূরবীণ (دوربین), সুদ (سود), সাবেক (سابق), শরম (شرم), খবরদার (خبردار), খামোশ (خاموش), চেরাগ (چراغ), শুরু (شروع) ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, তালিকায় প্রদত্ত কতিপয় শব্দ মূলত: আরবী শব্দ, যেগুলো ফারসি ভাষার হাত ধরে বাংলায় অনুপ্রবেশ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬.২ বাংলা ব্যাকরণ ও ফারসি ব্যাকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক

বাংলা ব্যাকরণ ও ফারসি ব্যাকরণের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। নর পায়রা, মর্দা বা মদ্দা কুকুর, মাদী ঘোড়া ইত্যাদি রূপে শব্দের লিঙ্গ নির্দেশনা ফারসি প্রভাবেরই ফল। যদিও ফারসিতে এসব লিঙ্গ বাচক শব্দ মূল শব্দের পরে এসে মূল শব্দের লিঙ্গভেদ নির্দেশ করে কিন্তু বাংলায় এগুলো মূল শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। ফারসিতে মোরগ মানে পাখি। এর সাথে স্ত্রী বাচক 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে বাংলায় মুরগী শব্দ তৈরি হয়েছে। বাংলায় মোরগ মানে পুরুষ মোরগ আর মুরগী মানে স্ত্রী মোরগ। অথচ ফারসিতে 'মুরগী' শব্দ নেই।

অনেক বাংলা শব্দ ফারসি তদ্বিত প্রত্যয় ও উপসর্গের সঙ্গে একাত্ব হওয়ার ফলে স্বতন্ত্র অর্থ ও ভাব বিশিষ্ট শব্দ তৈরী হয়েছে। যেমনঃ

'ঈ' প্রত্যয় যোগেঃ ইরানী, দেশী, বিলাতী, বাঙালী ইত্যাদি।

'কর' প্রত্যয় যোগেঃ যাদুকর, ধুনকর, কলাইকর ইত্যাদি।

'খোর' প্রত্যয় যোগেঃ আফিমখোর, গাঁজাখোর, চশমখোর, হারামখোর ইত্যাদি।

'গিরি' প্রত্যয় যোগেঃ কেরানীগিরি, বাবুগিরি, বান্দীগিরি, বাবুর্চিগিরি, দর্জিগিরি ইত্যাদি।

'দার' প্রত্যয় যোগেঃ তহশীলদার, হাবিলদার, হাওলাদার, জমিদার, তালুকদার, শিকদার, পোদ্দার, দোকানদার ইত্যাদি।

বাজ প্রত্যয় যোগেঃ চাঁদাবাজ, ধোকাবাজ, মামলাবাজ, মতলববাজ, চালবাজ ইত্যাদি।

ফারসি উপসর্গ যোগেও অনেক নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। এগুলোর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। যেমনঃ

'কম' (স্বল্প অর্থে) কমজোর, কমবখত, কমজাত, কমপোখত ইত্যাদি।

'কার' (কাজ অর্থে) কারখানা, কারচুপি, কারবার, কারসাজি ইত্যাদি।

'দর'(অধীন, মধ্যস্থ অর্থে) দরদালান, দরপত্তনী, দরপাট্টা ইত্যাদি।

'না' (না অর্থে) নাকাম, নাখোশ, নামঞ্জুর, নামরদ, নারাজী, নালায়েক ইত্যাদি।

'বে' (না অর্থে) বেআক্কেল, বেআদব, বেকসুর, বেকায়দা, বেকার, বেখবর, বেতার, বেনজীর ইত্যাদি।

'বদ' (মন্দ অর্থে) বজ্জাত, বদবখত, বদমেজাজ, বদমাশ, বদরাগী ইত্যদি।

এসব শব্দ ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত উপাদান বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জার সাথে মিশে গিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় এসব শব্দের প্রচলনের ফলে অনেক সময় এগুলোকে অন্য ভাষার শব্দ বলে মনেই হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বাক্য গঠনেও ফারসির প্রভাব লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ: মান ইন কার কারদেবুদাম (من این کر کردبدم)= আমি একাজ করেছিলাম; মান ইয়েক্‌তা নান খোর্‌দাম (من یک تا نان خوردم) = আমি একটা নান খেলাম; তু কুজা রাফ্‌তি (تو کجا رفتی) = তুই কোথায় গেলি? ইত্যাদি।

ফারসির ন্যায় বাংলাতেও লিঙ্গের তারতম্যের কারণে ক্রিয়াপদ প্রভাবিত হয় না, যেমন: বাবা রাফ্‌ত (بابا رفت) = বাবা গেলেন; মামা রাফ্‌ত (ماما رفت) = মা গেলেন; বেরাদর অমাদ (برادر آمد) = ভাই এলেন; খাহার অমাদ (خواهر آمد) = বোন এলেন ইত্যাদি।

বাংলা ও ফারসি উভয় ক্ষেত্রেই সংখ্যা ও লিঙ্গভেদের কারণে বিশেষণ প্রভাবিত হয় না, যেমন: গুলে সাফীদ (گل سفید) = সাদা ফুল; গুলহায়ে সাফীদ (گلهای سفید) = সাদা ফুলগুলি; দোখতারে খোশগেল (دختر خوشگل) = সুন্দরী মেয়ে; দোখতারহায়ে খোশগেল (دخترهای خوشگل) = সুন্দরী মেয়েরা ইত্যাদি।

১.৭ বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীরা পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন তবে সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হতে আরও প্রায় একশ বছর লেগে যায়। এ সময় থেকে গৌড়ের পাঠান সুলতান ও তাঁদের অমাত্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ফারসি ভাষাভাষী শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এতদঞ্চলে একদিকে যেমন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলন শুরু হয় অন্যদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে। তুর্কী আফগান বিজয়ীগণ বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে স্থানীয় বাঙ্গালীদের সাথে তাঁদের ওঠা-বসায় এ অঞ্চলের সংস্কৃতিতে তুর্কী তথা মোঙ্গলীয় সংস্কৃতিরও প্রভাব পড়ে। ফলে বাংলায় একটি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কাল সূচিত হয়। এ বিবর্তন পরবর্তী সাতশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যার ফলে বাংলা ভাষার মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকগণ মৌলিক বাংলা সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ইসলামী বিষয় সম্বলিত বহু ফারসি গ্রন্থও বাংলায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদের হাত ধরে বাংলা ভাষায় অসংখ্য ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। একইভাবে ফারসি সাহিত্যের প্রচলিত অনেক ফর্মও বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয়। উদাহরণ হিসেবে মর্সিয়া সাহিত্য, বীরত্বগাঁথা, উপাখ্যান প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যের ইতোপূর্বে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যধারার দেব-দেবীর বন্দনা ও গুণকীর্তন রীতির পরিবর্তে মুসলিম রীতি, বিশেষত ইরানী রীতি অনুযায়ী হাম্‌দ (খোদা প্রশস্তি) নাত (রাসুল প্রশস্তি) এর প্রচলন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮ খ্রি.) কিংবা আলাওল (১৬০৭-

Dhaka University Institutional Repository

১৬৮০ খ্রি.) যখন হিন্দু রাজপুত্রের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেন তখন তাঁদেরও তা হাম্‌দ-নাতের মাধ্যমেই শুরু করতে দেখা যায়।

ফারসি ভাষা প্রভাবিত মুসলিম লেখকদের সাহিত্য মুলত 'রোমান্সমূলক সাহিত্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। 'রোমান্স সাহিত্যে' কোন মুসলিম রাজসভার বর্ণনা কিংবা ইসলামী চিন্তা-আদর্শ, কুরআন-সুন্নাহ অথবা মুসলিম সুফী-দরবেশ ও মুসলিম মনীষা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আরবী ও ফারসি শব্দের ব্যবহার-আধিক্য লক্ষ করা যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) দরবারের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের রচনাবলী, সরদার জয়েনউদ্দীনের (পঞ্চদশ শতক) *রসুল বিজয়* প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। জয়েনউদ্দীন তাঁর *রসুল বিজয়ে* মুকুটের স্থলে 'তাজ', আরোহীর স্থলে 'সোয়ার' পিতামহের স্থলে 'দাদা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন:

তার পাছে সাজিলো সাজ নবী রাজেশ্বর॥
মুকুতা মণ্ডিত তাজ আজ অতি মনোহর ॥[৭০]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে নবদ্বীপে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে, শচী দেবীর গর্ভে নিমাই ওরফে গৌরাঙ্গ ওরফে চৈতন্যের জন্ম হয় এবং ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে নীলাচলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাংলা সাহিত্যে শ্রী চৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে পদাবলী ও জীবনীসাহিত্য গড়ে ওঠে তার মধ্যেও আরবী-ফারসি শব্দ, ভাব ও দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর বলে প্রায় সব সাহিত্য সমালোচকই স্বীকার করেছেন। ফলে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির মতো বৈষ্ণব কবিদের পাশাপাশি সৈয়দ মুর্তাজার মতো মুসলিম কবিরাও পদাবলী সাহিত্যে সুনাম অর্জনে সক্ষম হন। অপরদিকে মুসলমানদের জীবনী সাহিত্যধারার অনুসরণে চৈতন্যদেবের অনুসারীদের হাতে ষোড়শ শতকে শুরু হয় বাংলা জীবনী–সাহিত্য ও কাব্যচর্চা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত (১৫১২-১৫৩৫ খ্রি.) এবং জয়ানন্দ ও লোচনদাস ঠাকুরের *চৈতন্যমঙ্গল* (১৫৩৭-১৫৭৬ খ্রি.) এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭১]

বৈষ্ণব দর্শনের সূফীতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যে শতাধিক শক্তিশালী মুসলিম কবি-সাহিত্যিককে পদাবলী রচনায় ব্রতী ও বিখ্যাত করে তুলেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন: সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তজা আলী, আফজাল আলী, দৌলত উজীর বাহরাম খান, এরশাদুল্লাহ, আলাওল, শেখ ফয়জুল্লাহ, নাসির মোহাম্মদ প্রমুখ। পারস্যের সূফী ভাবধারার আশেক-মাশুক এবং ভারতীয় বৈষ্ণব দর্শনের জীবাত্মা-

---

[৭০] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (ঢাকা: হাসি প্রকাশনালয়, ২০০২), পৃ. ১২৭।
[৭১] আনিসুর রহমান স্বপন, *বাংলাদেশে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য* (ঢাকা: বুক ভিউ, ১৯৯৫), পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

পরমাত্মার তত্ত্বকে সমন্বয়কারী এসব কবিরা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি নামে পরিচিত হন। তবে বৈষ্ণব পদের গীতরীতি ছিল কীর্তন কিন্তু পারসিক সূফীদর্শনের প্রভাবে মুসলিম কবিদের পদাবলীর গীতরীতি ছিল বৈচিত্রময়। এতে প্রায় অর্ধশত রাগরাগিনী ব্যবহৃত হতো বলে শ্রী যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন।[৭২] ষোল শতকের সমসাময়িক বাংলাদেশের গণস্তরে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সাথে পারস্য সংস্কৃতিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রী চৈতন্য–কেন্দ্রিক বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনী সাহিত্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ধর্মশুদ্ধি, সংস্কার ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের যে রূপ পাওয়া যায় তারই আরেক অন্তজ বা নিম্নবর্ণের রূপ হলো মঙ্গলকাব্য। কিন্তু এ ধারাও ফারসি ভাষা-সাহিত্যের প্রভাব হতে মুক্ত থাকতে পারেনি। একারণেই পঞ্চদশ শতকে লেখা বিজয়গুপ্তের *পদ্মপুরান* ও *মনসামঙ্গলে* ১৮ হাজার পংক্তিতে ১২৫টি ফারসি শব্দ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে এ পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় মানিক গাঙ্গুলীর *ধর্ম মঙ্গলে*। সেখানে ১৭ হাজার পংক্তিতে ফারসি শব্দ পাওয়া যায়। এ শতকের শেষার্ধে লেখা মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যেও ২০ হাজার ছত্রে দু'শতাদিক ফারসি শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। চৌতিশা বা বর্ণমালার চৌত্রিশ অক্ষর দিয়ে কবিতার চরণ শুরু করার আরবী-ফারসি রীতির সাথে সংস্কৃতরীতি মিশ্রণ করে এ শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ *জয়নাবের চৌতিশা* এবং সৈয়দ সুলতান *জ্ঞান চৌতিশা* রচনা করেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এ প্রভাব আরো ব্যাপকতা লাভ করে। সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.) ফারসি শব্দেই তাঁর কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম করেন *শবে মেরাজ* নামে। *শবে মেরাজে* তিনি আলিমান, আলিম প্রভৃতি শব্দ ছাড়াও আল্লাহ, রাসূলে খোদা, নুরে মোহাম্মদী, পীর-পয়গাম্বর ইত্যাদি আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন:

দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রছুল খোদার।
নূর মোহাম্মদ বলি জগতে প্রচার ॥
.....
চতুর্থে প্রণাম করি পীর পেগাম্বরে।
এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়ায়।
.....
আরবী ফার্ছি ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মূর্খ মূত॥[৭৩]
নজরুলের সাহিত্য চিন্তা

---

[৭২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

[৭৩] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, সং-৩য় (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৯৬৫), পৃ. ১৪২-১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ন্যায় আধুনিককালের কবিদের কাব্যেও ফারসি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্র রায় বলেন:

রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কেরামত।
হুকুম শানে শাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমক হারাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম ফয়েজ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম।
পাতশা হইলা খুশি কহিতে লাগিলা তুষি।
কহ রায় কি চাহ ইনাম।
কহে মানসিংহ রায় গোলাম ইনাম চায়
ইনাম সে যাহে রহে নামা
[...]
রাজ্য দিব কহিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায় দোয়া দিয়া ঘরে ঘরে
ফরমান ফরমাহ তায়।।
দেখা কৈল হযরতে বজা আনে খেদমতে
গোলামের এ বড় ইনাম।[৭৪]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন:

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ দিনেতে,
মজ্জাগত গোলাম সমঝ শেষ করে দে, শেষ করে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে,
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দেখে তুচ্ছ ক'রে।
দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় করতে খাটো,
হামবড়াই-এর সংহিতা কোড বেবাক কাটো, বেবাক কাটো ।
[...]
সাহেব ব'লেই করব সেলাম? মন্দ ভালো বাছবো না তো?
অন্যায় যে করবে কায়েম , বলব তারে সুখে থাক?
খুনিরে যে দেয় খোলাসা, আইন গড়ে রাতরাতি,
প্রশস্তি তার পড়ব কি হায়, প্রকাশ করে দন্তপাতি?
গোরা ব'লেই গৌরবে কি দিতে হবে শ্রীবুট মুড়ে?
বামুন ব'লেই নাহক প্রণাম করতে হবে হস্ত জুড়ে?
মরদ বলেই মর্দ্দানি কি সইবে নিরব মাতৃজাতি?
আত্মলাভের প্রসাদ পবন জাগছে রে নাই ক রাতি।
সঙ্কুচিত চিত্তে জাগে দেখিস কি আর চিতার ঢেরি,
হিসাব নিকাশ করতে হবে, আজ আখেরী আজ আখেরী।[৭৫]

---

[৭৪] শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজীবকান্ত দাস (সম্পা.), *অন্নদা মঙ্গল* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১২৫০ বাংলা), পৃ. ১৮৫।

[৭৫] আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *নজরুলের সাহিত্যচিন্তা ও তাঁর সাহিত্য* (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০১০), পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা

বাংলা ভাষা-সাহিত্যে পারস্য দর্শন এবং ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত বেশ কয়েকটি ধারা সৃষ্টি হয় যেমন: বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য, বাংলা জীবনী সাহিত্য, বাংলা সওয়াল সাহিত্য, বাংলা সূফী সাহিত্য এবং বাংলা পুঁথি সাহিত্য। ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

১.৮.১ বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

বাংলায় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনার ধারাও মূলত ফারসি কাব্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণাতেই শুরু হয়। ফারসি সাহিত্যের প্রেমোপাখ্যান ও বীরত্বগাথা অবলম্বনে পঞ্চদশ শতকে শাহ্ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* ও *আমীর হামজা*, ষোড়শ শতকে দৌলত উজীর বাহরাম খানের *লাইলী-মজনু*, মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী*, সাবিরিদ খানের *হানিফা ও কয়রা পরী*, দোনাগাজীর *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, সপ্তদশ শতকে আলাওলের *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, *ইউসুফ-জোলেখা*, আবদুল হাকীমের *লালমতি ও সয়ফুলমুলুক*, *ইউসুফ-জোলেখা*, নওয়াজিস আলী খানের *গুলে বকাওলী*, সৈয়দ মুহাম্মদ আকবরের *জবলমুলুক শামারেখ*, অষ্টাদশ শতকে আহাম্মদ মুকীমের *গুলে বকাওলী*, সৈয়দ হামজার *মধুমালতী*, ফেরদৌসীর *শাহ্নামার* গল্প অবলম্বনে সোহরাব-রুস্তম উপাখ্যান, আলাওলের *পদ্মাবতী* ও *সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল*, হায়াত মাহমুদের (১৬৯৩-১৭৬০ খ্রি.) *জঙ্গনামা* প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়।

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারায় কবি সাবিরিদ খান (১৪৮০-১৫৫০ খ্রি.) *হানিফার দিগ্বিজয়* বা *মোহাম্মদ হানিফা ও কয়রাপরী* রচনাতেও ফারসি উৎসের সাহায্য নিয়েছেন। *জঙ্গ নামা* ধাচের এ কাব্যটিতে মূলত কারবালার শোকাবহ ঘটনার পরবর্তী পর্ব তুলে ধরা হয়েছে। সাবিরিদ খান আরবী-ফারসি উৎস অবলম্বনে *রসুল বিজয়* কাব্যও রচনা করেন। ইরানের প্রখ্যাত কবি আবদুর রহমান জামীর কাব্য অবলম্বনে দৌলত উজীর বাহরাম খান বাংলায় *লাইলী-মজনু* কাব্য (১৫৬০-১৫৭৫ খ্রি.) রচনা করেন। ফারসি সাহিত্যে এ কাব্যের সূফীতাত্ত্বিক রূপ থাকার কারণে বাংলাতেও কাব্যটি অশ্লীলতা মুক্ত এবং শালীন হয়েছে।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* হলো অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল* নামক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ২২টি পুঁথির কথা বর্ণনা করেছেন। চাঁদপুরের কবি দোনাগাজী চৌধুরী হলেন বাংলায় এ কাব্যের প্রথম রচয়িতা। ফারসি উৎস অবলম্বনে দোনাগাজীর *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* রচিত হওয়ার পর আলাওল, ইব্রাহিম এবং মালে মুহাম্মদও একই কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরাকান রাজসভা কেন্দ্রিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অন্যতম প্রধান পুরুষ কবি আলাওলও (১৬০৭-১৬৮০ খ্রি.) এক সময়ে শাহ্ শুজার সভাকবি ছিলেন বলে জানা যায়। হিন্দী ও ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞ এ কবি হিন্দী হতে মালিক মুহম্মদ জায়সীর কাব্য *পদুমাবাৎ* এবং ফারসি হতে কবি নিজামীর *সিকান্দার নামা* ও *হাফতে পেইকার* কাব্য দু'টি বাংলায় অনুবাদ করেন। বিষয়বস্তু, উপমা, বাচনভঙ্গীর দিক হতে আলাওলের অন্যান্য কাব্যগুলোও ফারসি কাব্যরীতির অনুসারী ছিল। বিশেষত তাঁর হামদ-নাত ছিল হুবহু ফারসিরই অনুকরণ। বাংলা অনুবাদ ও মৌলিক কাব্যে তিনি ব্যাপকভাবে আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ফারসি কবি জামীর লেখা *ইউসুফ-জোলেখার* আরেক বাংলা অনুবাদক হলেন সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০ খ্রি.)। তাঁর লেখা *লালমতি* ও *সয়ফুলমুলুক, নূরনামা, নসিয়তনামা, চারিমোকাম ভেদ, দুররে মজলিস* প্রভৃতি কাব্যও ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনেই রচিত। সে সময়ে শাস্ত্রকথা বাংলায় লেখা দূষণীয় বলে বিবেচিত হওয়ার কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে *নূর নামা* গ্রন্থে কবি আবদুল হাকীম লিখেছেন:

সর্ব বাক্য বুঝ প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী
বঙ্গদেশী কাব্য কিবা যত হস্ত বাণী ॥
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ ॥
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুরা এ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যা এ ॥[৭৬]

আর ইউসুফ জোলেখার উৎস সম্পর্কে লিখেছেন:

মোল্লা জামির বাক্য সিরেতে লইয়া।
আবদুল হাকিমে কহে বাংলা রচিয়া ॥
ইছুপ জোলেখার কিচ্ছা হইল সমাপ্ত।
ফারসি কিতাব ভাঙ্গি বাঙ্গালা পদস্ত ॥[৭৭]

বাংলার জনগণ এবং কবিকুলের মধ্যে আরেকটি প্রিয় কাহিনী হলো '*গুলে বকাওলী*'। এ কাহিনীর উৎস হলো আরবী এবং ফারসি। শেখ ইজ্জতুল্লাহ নামে একজন বাঙ্গালী কবি ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দী অবলম্বনে ফারসি গদ্যে '*গুলে বকাওলী*' রচনা করেন। এ ফারসি সূত্র অনুযায়ীই চট্টগ্রামের নওয়াজিস খান

---

[৭৬] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫-২০৬।
[৭৭] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৯), পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

(মৃ.১৭৬৫ খ্রি.) বাংলায় '*গুলে বকাওলী*' (১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে) কাব্য রচনা করেছিলেন। বাংলায় '*গুলে বকাওলী*'র আরেক রচয়িতা ছিলেন চট্টগ্রামের আরেক কবি মুহম্মদ মুকীম। তিনি ১৭৬০-১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এ কাব্য রচনা করেন। মুহাম্মদ মুকীম তাঁর '*গুলে বকাওলী*' কাব্যের উৎস সম্পর্কে বলেন:

তাজে বকাওলী কেচ্ছা ফারসী বয়ান।
বংগ ভাষে মোহাম্মদ মুকিমে সে ভান ॥[৭৮]

রাসুল চরিত অবলম্বনে কাব্য রচনা এবং *নবীবংশ*, বিশেষ করে ইমাম হোসেনের কারবালায় শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত সাহিত্যও ফারসি সাহিত্যের প্রভাবেরই ফসল। সৈয়দ সুলতানই বাংলা ভাষায় প্রথম রাসুল চরিত অবলম্বনে *নবীবংশ* কাব্য রচনা করেন, যাতে রাসুলের জীবনের সূচনা থেকে শুরু করে তাঁর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের কারবালায় শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়। তারও আগে দৌলত উজীর *মাকতুল হোসেন* শিরোনামে একটি কাব্য রচনা করেন, যাতে ইমাম হোসেনের শাহাদতের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কারবালা ঘটনা কেন্দ্রিক আরও একটি গ্রন্থ হচ্ছে কায়কোবাদের *মোহাররম শরীফ।* এতে ইমাম হোসেনের শাহাদাতকে অনুসরণ করে রচিত একটি মর্সিয়াও ঠাঁই পেয়েছে। কারবালার বেদনাবিধূর ঘটনা অবলম্বনে পরবর্তীকালে মীর মোশাররফ হোসেন *বিষাদসিন্ধু* শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করে অমরত্ব লাভ করেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও কারবালার ঘটনা অবলম্বনে বেশ কিছু মর্সিয়া রচনা করেছেন এবং *ফাতেহায়ে ইয়ায দাহোম* ও *ফাতেহায়ে দোয়ায দাহোম* শীর্ষক সম্পূর্ণ ফারসি শিরোনামে কাব্য রচনা করতেও দেখা যায় । বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামই সর্বাধিক আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৭৯]

১.৮.২ বাংলা সূফী সাহিত্য

বাংলায় পারস্য দর্শন এবং ফারসি ভাষা-সাহিত্য প্রভাবিত আরেকটি সাহিত্যধারা হলো সূফী সাহিত্য। মধ্যযুগে বাংলায় রচিত এ জাতীয় প্রায় বিশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে শেখ ফয়জুল্লাহর (ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ) *গোরক্ষ বিজয়*, অজ্ঞাত নামা কবির *যোগকলন্দর*, সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞান প্রদীপ*, *জ্ঞান চৌতিশা*, চট্টগ্রামের হাজী মুহাম্মদের (১৫৬৫-১৬৩০ খ্রি.) *সুরতনামা*, মীর মুহাম্মদ সফীর *নূরনামা*, শেখ চান্দের *হর গৌরী সম্বাদ* ও *তালেবনামা*, আবদুল হাকিমের *চারি মোকাম ভেদ* ও *শিহাবুদ্দীন পীরনামা*, আলী রেজার (১৬৯৫-১৭৮০ খ্রি.) *ধ্যানমালা*, *সিরাজ কুলুব*, *আগাম জ্ঞান সাগর*,

---

[৭৮] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১।
[৭৯] আবদুস সাত্তার, *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২), পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

বালক ফকীরের *জ্ঞান চৌতিশা*, গরীব নেওয়াজের *যোগ কলন্দর*, মোহসেন আলীর *মোকাম মঞ্জিল কথা*, কাজী শেখ মনসুরের *সিরনামা*, শেখ জাহিদের *আদ্য পরিচয়*, শেখ জেবুর *আগাম*, রমজান আলীর *আদ্যবক্ত*, রহিমুল্লাহর *তন-তেলাওত* এবং সিহাজুল্লাহর *যুগীকাচ*।[৮০]

ফারসি ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবেই যে উপর্যুক্ত সূফী সাহিত্যের গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে; এতে প্রচুর ফারসি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় নিচের উদাহরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে তা প্রতীয়মান হয়।

সৈয়দ সুলতান তাঁর *জ্ঞান প্রদীপে* বলেন:

প্রথমে জানিব যত দরবেশী বিচার
দ্বিতীএ জানিব যত এবাদত খোদার।
তৃতীএ জানিব সব তনের বিচার
চতুর্থে জানিব সেই তত্ত্ব আপনার।[৮১]

হাজী মুহম্মদ তাঁর *সুরতনামায়* বলেন:

আল্লা হোন্তে বান্দা সব হৈছে পয়দাএ
এ থেকে সে বান্দা সব সুরত আল্লার।[৮২]

মীর মুহম্মদ শফী তাঁর *নূরনামায়* লিখেন:

কি রূপে হৈল নুর আল্লার দিদার।
কোন মতে হৈল স্বর্গ ক্ষিতি উতপন
কেমতে হৈল বোল জীবের সৃজন।
আব আতস খাক বাত কোথা হোন্তে হৈল
ভিহিস্ত দোজখ বোল কেমতে হইল।[৮৩]

কাজী শেখ মনসুর তাঁর গ্রন্থের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন:

বচন আরবী ভাষে সব শাস্ত্র মূল
বুঝিতে ফারসীভাষে কিতাব বহুল।
বাঙ্গালে না বুঝে সব ফারসি কিতাব
না বুঝি কিতাব কথা মনে পাএ তাপ।
সবে বোলে বাঙ্গালের ভাষে এ কিতাব
শুনিতে পারিএ যদি যাএ মনস্তাপ।
তেকাজে বাঙ্গালা ভাষে ফারসী বচন
পদবন্দী [পদবন্ধ] করি কৈলুঁ পুস্তক গ্রথন।[৮৪]

---

[৮০] আহমদ শরীফ. *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ১ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ৩৮৯।
[৮১] *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৯।
[৮২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৪।
[৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৫।
[৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

আলী রজা লিখেন:

জানিলা দর্পণে ছায়া আপনা সুরত
নুর মুহম্মদ কায়া সেরূপ সৃজিলা।[৮৫]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দরবেশ, খোদা, তন, বান্দা, পয়দা, সুরত, দিদার, আব, আতস, খাক, বাত, বেহেশ্‌ত, দোজখ ও ছায়া ইত্যাদি ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফারসি তথা ইরানী মরমীবাদ ও সূফী মতবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা সূফী সাহিত্যে ইরানী সূফী মতবাদের প্রভাব সম্পর্কে অধ্যাপক আহমদ শরীফের নিম্নোক্ত উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

> লখ অঞ্চলের ভাবপ্রবণ লোক মনে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাবও পরোক্ষ মানসক্ষেত্র রচনায় সহায়তা করেছিল বলে মনে করি। তাই ভারতে যেসব সূফী সাধক প্রবেশ করেন, ভারতিক অধ্যাত্ম তত্ত্বও সাধনার প্রভাব এড়ানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল বাঙলাদেশে সূফীতত্ত্ব ও সূফী সাধনা একটি স্থানিক রূপ লাভ করেছিল। বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈততত্ত্ব ও যোগের প্রত্যক্ষ প্রভাবই এর মুখ্য কারণ। অবশ্য মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রভাবে সিরিয়া, ইরাক ও ইরানে গুরুবাদী, বৈরাগ্য প্রবণ ও দেহচর্যায় উৎসুক কিছু সাধকের আবির্ভাব বারো শতকের আগেই সম্ভব হয়েছিল। ইরান ও বনা। তাঁদের কাছে দীক্ষিত দেশী জনগণও পূর্ব ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত অদ্বৈতচেতনা ও যোগপ্রীতি ত্যাগ করতে পারে নি। বিশেষ করে বিলুপ্ত বৌদ্ধ সমাজের 'যৌগিক-কায়-সাধনা' তত্ত্ব তখনো জনচিত্তে অম্লান ছিল।[৮৬]

১.৮.৩ বাংলা সওয়াল সাহিত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মুসলিম তথা ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত আরেকটি শাখা হলো 'সওয়াল সাহিত্য'। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন বা নীতিশাস্ত্র প্রচারের প্রথা সুপ্রাচীন। এ প্রথা অনুসরণ করে বাংলায় রচিত হয় মুহাম্মদ আকীলের *মুসানামা* বা *মুসার হাজার সওয়াল*, ত্রিপুরার কবি শেখ সাদীর *গদামল্লিকা সংবাদ*, এতিম আলমের *আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল*, আলী রেজার *সিরাজ কুলুব*, শেখ শেরবাজ চৌধুরীর *ফক্কর নামা* বা *মল্লিকার হাজার সওয়াল* সৈয়দ নুরুদ্দীনের *মুসার সওয়াল* প্রভৃতি কাব্য।[৮৭] এ ধারার আরো কয়েকজন কবি হলেন মুহম্মদ আকিল, শেখ সাদী, এতিম আলম, আলি রজা, আবদুল করিম খোন্দকার, নসরুল্লাহ খোন্দকার, মুহাম্মদ আলী প্রমুখ।

---

[৮৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৭।
[৮৬] আহদ শরীফ (সম্পা.),*বাঙলার সূফী সাধক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ভূমিকা।
[৮৭] খন্দকার মুজাম্মিল, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সওয়াল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ বলেন:

> মধ্যযুগের এই গ্রন্থের লেখকরা লোক-শিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ দৃষ্টিতে এঁদের 'সওয়ালসাহিত্য'কে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। সেকালে কথকতার মাধ্যমে অথবা শ্রুতিস্মৃতির মাধ্যমেই নিরক্ষর মানুষ জগৎ ও জীবন, ধর্ম ও সমাজ, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো। আর এভাবে লব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে মানুষ পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে হত যত্নবান। সেদিক দিয়ে এ সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিমেয়। কেননা, এতে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটলেও সমাজশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছিল, একটি স্থুল নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা মানুষের পতন-পথরুদ্ধ রেখেছিল।[৮৮]

এ জাতীয় গ্রন্থের ফারসি উৎস সম্পর্কে শেখ শেরবাজ চৌধুরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেন:

> ফক্করনামা করি এক আছ এ কিতাব
> কহিমু যথেক কথা আছে পরস্তাব।
> সকলে না বুঝে দেখি ফারসী বচন
> কহিমু বাঙ্গালা ভাষে বুঝিতে কারণ।[৮৯]

সওয়াল সাহিত্যের প্রকৃতি বিষয়ে আহমদ শরীফ বলেন:

> গ্রীক পণ্ডিতদেরও আগের কাল থেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান আহরণের রীতি চালু রয়েছে। ফলে সেকালের গ্রন্থে গুরুশিষ্যের কিংবা জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ঐহিক ও পারত্রিক সব রকমের বিষয় ও শাস্ত্র আলোচিত হত। আঠারো শতক অবধি আমাদের বাংলা ভাষায়ও উক্ত প্রাচীন রীতির অনুসরণে শাস্ত্রকথা ও তত্ত্বচিন্তা প্রশ্নোত্তরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৯০]

১.৮.৪ বাংলা জীবনী সাহিত্য

হিন্দু কবিদের লেখা চরিত সাহিত্যের অনুকরণে বাংলায় মুসলমান কবিরা যে জীবনী সাহিত্য রচনা করেন তার মূল উৎস এবং তথ্যসূত্র ছিল আরবী-ফারসি। এ ধারার প্রধান কবি ছিলেন সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.)। তাঁর রচিত জীবনী কাব্যগুলো হলো: *নবীবংশ*, *শব-ই-মিরাজ*, *রসুল বিজয়*, *ওফাৎ-ই-রাসুল*। তেতাল্লিশজন ওলী-দরবেশের জীবন কাহিনী নিয়ে জনাব আলীর লেখা *কিসাসুল আম্বিয়া* হলো আরেকটি উল্লেখযোগ্য জীবনী কাব্য। এ ধারায় আরো যারা কাব্য রচনা করেছেন তাদের মধ্যে মুহাম্মদ খাতের, শেখ চাঁদ, শেখ মনোহর, মুহাম্মদ উজির আলী, আবদুল করীম খোন্দকার, নুরুল্লাহ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

---

[৮৮] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ৩৪১।
[৮৯] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান* (চট্টগ্রাম: জিলা কাউন্সিল বই, ১৯৬৫), পৃ. ১২৮।
[৯০] আহদ শরীফ (সম্পা.), *সওয়াল সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ নসরুল্লাহ খান (১৫৭০-১৬২৫ খ্রি.) হযরত আলী (রা.) এর জীবনীভিত্তিক *জঙ্গনামা* এবং হযরত মুসা (আ.) এর কাহিনীভিত্তিক *মূসার সওয়াল* নামক কাব্য লিখেছিলেন। সপ্তদশ শতকে আরাকানের বাঙ্গালী কবি আবদুল করীম খোন্দকার *দাহ্ মজলিস* নামে দশজন নবীর কাহিনী ফারসি হতে বাংলায় অনুবাদ করেন। চট্টগ্রামের কবি আবদুন নবী *আমীর নামা* (১৬৮৪-১৬৯২ খ্রি.) নামে যে কাব্য রচনা করেন গরীবুল্লাহ মূলত তার অনুসরণেই *দাস্তানে আমীর হামজা* রচনা করেছিলেন। এ ধরনের জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ বলেন:

> চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের চরিতকথাগুলো যেমন একাধারে জীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও রূপকথাজাতীয় কাহিনীকাব্য এগুলোও তেমনি গ্রন্থ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও চৈতন্যচরিত্রগুলোর অনুকরণে এগুলো রচিত। নবীবংশ, রসুলবিজয়, জঙ্গনামা, মক্তুলহোসেন, হানিফার লড়াই, কাসাসুল আম্বিয়া, সিফতুল আম্বিয়া, হাতেমতাই, আমীর হামজা প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা সাধারণভাবে জীবনী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।[৯১]

১.৮.৫ বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য

মর্সিয়া শব্দটি আরবী। এর অর্থ শোক করা, মাতম করা, ক্রন্দন করা, বিলাপকরা। কারবালাযুদ্ধ-পূর্ব যুগে কোন মৃত ব্যক্তির জীবনের গৌরবমর অংশের প্রশংসা কীর্তন প্রসঙ্গে পনের হতে বিশটি শ্লোক বিশিষ্ট শোকগাথা লিখিত হলে তা মর্সিয়া নামে অভিহিত হতো। কিন্তু পরবর্তীতে মর্সীয়ার অর্থে পরিবর্তন ঘটে। কারবালার মরুপ্রান্তরে নিহত ইমাম হুসেন এবং অন্যান্য বীর শহীদগণের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশংসা সূচক কবিতাই বিশেষভাবে মর্সিয়া নামে অভিহিত হয়।[৯২]

কারবালার শোকাবহ কাহিনীকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা গড়ে উঠে। শিয়া-ভাবধারার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ার ফলে এবং সুন্নী মুসলমানদের মনে ধর্মবোধ ও ধর্মপ্রবৃত্তি জাগরুক থাকার কারণে বাঙ্গালী কবি-সাহিত্যিকগণ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কারবালার ইমাম হোসেনের আত্মত্যাগসম্পর্কিত ঘটনাকে ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করেন।[৯৩] এ দেশে মোগলদের আগমনের সাথে শিয়া মতাবলম্বী মুসলমানদের বসতি স্থাপন ও তাদের মত প্রচারের ফলে মর্সিয়া সাহিত্য বা কারবালার ঘটনাকেন্দ্রিক গ্রন্থ রচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মোগলদের আগমনের পূর্বে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্য ছিল একেবারেই অজ্ঞাত।[৯৪]

---

[৯১] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩।

[৯২] ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য*, সংস্করণ ২ (ঢাকা: পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯), পৃ. ১।

[৯৩] ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পা.), *মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত সংগ্রাম হুসন* (ঢাকা: জ্যোতি প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ভূমিকা।

[৯৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, সং-৩য় (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৯৬৫), পৃ. ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ শতকের দৌলত উজির বাহরাম খানের *জঙ্গনামা*, শেখ ফয়জুল্লাহর লেখা *জয়নাবের চৌতিশা*, মুহাম্মদ খানের *মক্তুল হোসেন* (১৬৫৪ খ্রি.) হায়াত মামুদের *জঙ্গনামা* (১৭২৩ খ্রি.), কবি শেরবাজের *ফাতেমার হাজার সওয়াল*, *কাশিমের লড়াই*, কবি জাফরের *শহীদ-ই-কারবালা*, *সখিনার বিলাপ*, কবি হামিদের *সংগ্রাম হুসন* প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্যের ধারা তৈরি করে যা মূলত ফারসি সাহিত্যের মর্সিয়া সাহিত্যধারারই প্রভাব-জাত।

মুহাম্মদ খান (১৬৩৫-১৬৪৫ খ্রি.) ফারসি সূত্রাবলি অবলম্বনে কারবালার কাহিনী নিয়ে *মাকতুলে হোসেইন* কাব্য রচনা করেন। সমসাময়িক আরেক ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি লিখেন *জঙ্গে শেরবাজ ব কাশেম* এবং*ফরিয়াদে সাকিনা*। ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি মুহাম্মদ ইয়াকুব *জঙ্গনামা* রচনা করেন। এটিও ফারসি উৎস অবলম্বনে রচিত হয়েছিল এবং এতে প্রচুর আরবী-ফারসি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। মুহাম্মদ ইয়াকুব লিখেন:

ফার্সী কিতাব ছিলে মক্তুল হোসেন
তাহা দেখি করি আমি বাংলা রচন।[৯৫]

মর্সিয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. গোলাম সাকলায়েন বলেন:

> এই কাব্যগুলির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তাঁহাদের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলেন ও তাঁহারা ইহার মারফত অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিলেন। বাংলা মর্সিয়া কাব্যগুলি প্রধানত অনুবাদ সাহিত্য হিসেবেই গড়িয়া উঠে। বাঙালি কবিগণ যদিও মূলত ফারসি ও উর্দু কাব্যগুলির ভাবকল্পনা ও ছায়া আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন তথাপি এগুলির মধ্যে তাঁহাদের মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ফলে এই কাব্যগুলি এক প্রকার অভিনব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদুর আরব পারস্যের মানুষের কাহিনী কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া কবিগণ যে বাগভঙ্গি ও পরিকল্পনা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব ও উদ্ভট হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, বাঙালি কবিগণ মাটির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।[৯৬]

সময় এবং বিষয়ের দিক বিবেচনায় মর্সিয়া সাহিত্যকে নিম্নোক্ত চার ধারায় বিভক্ত করা যায়–

প্রথম ধারা : মোগল আমলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মর্সিয়া সাহিত্য।

দ্বিতীয় ধারা : মুসলমানি বাংলায় রচিত মর্সিয়া সাহিত্য।

তৃতীয় ধারা : আধুনিক বাংলায় রচিত মর্সিয়া সাহিত্য।

চতুর্থ ধারা : লোক সাহিত্যে মর্সিয়া[৯৭]।

---

[৯৫] *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

[৯৬] ড. গোলাম সাকলায়েন, *প্রাগুক্ত*।

[৯৭] মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬), পৃ. ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

পারস্যের শিয়া মতাবলম্বী ইতিহাস-দর্শন এবং ফারসি ভাষা ও কাহিনী সূত্র অবলম্বনে রচিত এ মর্সিয়া সাহিত্যের ধারা ফকির গরিবুল্লাহর দোভাষী পুঁথি *জঙ্গনামা* এবং মীর মুশাররফ হোসেনের গদ্যগ্রন্থ *বিষাদ সিন্ধুতে* পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। অপরদিকে মর্সিয়া সাহিত্যের জনপ্রিয়তা হিন্দু কবিদেরও এ ধরনের কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে। সে কারণে অষ্টাদশ শতকের হিন্দু কবি রাধারাম গোপ রচনা করেন *ইমামগণের কেচ্ছা* এবং *'আফৎনামা'*।

১.৮.৬ বাংলা পুঁথি সাহিত্য

ফারসি প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের শায়েরী বা পুঁথি সাহিত্য ধারার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায় অষ্টাদশ শতকে। পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেন:

> ১৮৩৯ খ্রি. থেকে বাংলাদেশে শাসনকার্যে ফারসির স্থান নিলে বাংলা। সেই থেকে আরবী ফারসী শব্দের আমদানী তো বন্ধ হলই উপরন্ত স্বল্প পরিচিত আরবী ফারসী শব্দের রপ্তানি শুরু হল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তন হল সংস্কৃত শিক্ষিতদের দ্বারা আর গদ্য রচনারীতিকে রসায়িত করলেন ইংরেজী শিক্ষিতেরা। তার ফলে ইসলামি বাংলাসাধারণ সাহিত্যের ভাষা থেকে যেন দূরে সরে গেল।[৯৮]

শহর-নগর-বন্দরে ফারসি চর্চার প্রভাব ব্যাপকতর হওয়ার কারণে গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মালেক মুহাম্মদ, জনাব আলী, মুহাম্মদ খাতের, আবদুর রহিম, মনিরুদ্দীন, আয়েজুদ্দীন, মুহাম্মদ মুনশী, তাজউদ্দীন, দানেশ, আরিফ, রেজাউল্লাহ, সাদ আলী, আবদূল ওহাব এর ন্যায় আড়াইশ কবির হাতে রচিত অর্ধসহস্রাধিক পুঁথিতে ফারসি শব্দ এবং কাহিনী ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার সাথে ফারসির এহেন মিশ্রণের কারণে এ রীতির কাব্য 'দোভাষী সাহিত্য' নামে পরিচিত হয়। চব্বিশ পরগণার অমুসলিম কবি কৃষ্ণরাম দাসের লেখা *রায় মঙ্গলে* (১৬৮৬-৮৭ খ্রি.) এ রীতির প্রথম প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। *ইউসুফ জুলেখা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, লায়লী মজনু, গুলে বকাওলীর* মত প্রণয়োপাখ্যান, *জঙ্গনামা, আমীর নামা, আমীর হামযা, সোনাভান*, কারবালার যুদ্ধে'র ন্যায় সমর কাব্য; *গাজী-কালু-চম্বাবতী*, 'পীরের পুঁথি'র মত জীবনী, ধর্ম, মাসলা-মাসায়েল জাতীয় কাব্য প্রভৃতি এ রীতিতে রচিত।[৯৯]

এ ধারার প্রথম সার্থক জনপ্রিয় কবি ছিলেন বালিয়া পরগণার হাফিজপুর গ্রামের কবি ফকীর গরীবুল্লাহ। ১৭৬০-১৭৮০ খ্রি. মধ্যে তিনি ফারসি সূত্র অবলম্বনে এবং ব্যাপক ফারসি শব্দ ব্যবহার করে

---

[৯৮] সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০০ বাংলা), পৃ. ১৮৬।
[৯৯] ডক্টর হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ৩য় সংস্করণ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ জুলেখা, আমীর হামযা, (প্রথম অংশ) *জঙ্গনামা, সোনাভান* এবং *সত্য পীরের পুঁথি* রচনা করেন। তাঁর রচনায় ফারসি শব্দের ব্যবহার নিম্নরূপ:

পাহলওয়ান হামজা গোর্জ্জ হাতে করে লিয়া।
সামাল সামাল চোট কহেন হাঁকিয়া ॥
....
করার করিয়া বাদশা ধরিল কোমর।
উঠাইতে জোর করে ছেরের উপর [১০০]॥

শাহ গরীবুল্লাহর পূর্ববর্তী কবি রংপুরের হায়াত মাহমুদ (১৬৮০-১৭৭০ খ্রি.) কারবালার শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে *জঙ্গনামা* কাব্য রচনা করেন। *জঙ্গনামার* পুঁথির সূচনাতেই আমরা তাঁর ফারসি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন:

সর্বত্র খোদার নামে শুকুর হাজার
যাহাতে উৎপত্তি হইল সৃষ্টির প্রচার ॥[১০১]

অষ্টাদশ শতকের দোভাষী পুঁথি সাহিত্যধারার ফকীর গরীবুল্লাহর অনুসারী আরেক জনপ্রিয় কবি হলেন হুগলীর ভুরসুর্ক পরগণার উদনা গ্রামের সৈয়দ হামজা (১৭৩৩-১৮১১ খ্রি.)। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফারসি সূত্র অবলম্বনে *মধুমালতী* কাব্য রচনা করেন।

এরপর গুরু ফকীর গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত *আমীর হামজা* কাব্যের দ্বিতীয় বা সমাপ্তি খণ্ড রচনা করেন। ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ হামজার হাতে রচিত হয় *জৈগুনের পুঁথি*। তাঁর লেখা আরেকটি পুঁথি কাব্য হলো *হাতেম তাই*। সৈয়দ হামজা রচিত কাব্যে ফারসি শব্দের ব্যবহার-

খুশীতে মাতিয়া দুইজন, কাঁদে দোহে খুশীর কাঁদন।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে দোহে, ক্ষণে পেরেশান হালে রহে
ক্ষণে দোহাকার কহা শোনা, ক্ষণে যায় ভুলিয়া আপনা ॥[১০২]

প্রধানত পারস্য কবি মোল্লা জালাল, ফৈজী, ফেরদৌসী, মোহতাশাম প্রমুখের লেখা কাহিনীই দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রধান উৎস ছিল। এসব গ্রন্থের নামকরণে 'কিসসা' (قصه), 'জঙ্গ' (جنگ), 'নামা'(نامه), 'দাস্তান'(داستان) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারেও ফারসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়।

---

[১০০] মোমেন চৌধুরী (সম্পা.), *মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০-১৯১।
[১০১] *মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।
[১০২] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (ঢাকা: হাসি প্রকাশনালয়, ২০০২), পৃ. ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে পীর-ফকিরদের প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়ে বহু কাব্য রচিত হয়েছে। ফেরদৌসী, জামী, নিজামী প্রমুখের অনুসরণে লেখা এসব কাব্যের মধ্যে আবদুল গফুর, আবদুল হাকিম প্রমুখের লেখা *'গাজী-কালু-চম্পাবতী'* জাতীয় কাব্য উল্লেখযোগ্য।

চরিত্র এবং কাহিনীর প্রয়োজনে এ ধরনের *যাবনী মিশাল* ভাষা ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* (১৭৫১ খ্রি.) কাব্যেও ব্যবহার করেছেন। এছাড়া বিপ্রদাস পিপলাইর *'মনসামঙ্গল'* (১৪৯৫ খ্রি.) কৃষ্ণনাম দাসের *রায়মঙ্গল* (১৬৮৬ খ্রি.) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *সত্যপীরের পাঁচালী*, ঘনারাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গলেও* (১৭১০ খ্রি.) ফারসি মিশ্রিত বাংলার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। দোভাষী পুঁথিকাররা এ রীতিকে ভাষাগত পূর্ণাঙ্গতা দান করেন এবং অনেকে ফারসির অনুকরণে ডান থেকে বামে পঠনরীতি এতে ব্যবহারেরও প্রয়াস পান।

১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের ফার্স ও খোরাসান অঞ্চলের কাহিনী নিয়ে মুহাম্মদ বাকির আগা ফারসিতে *গুলজারে এশক* নামে যে কাব্য রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে সেটি অবলম্বনেই চট্টগ্রামের কবি শমশের আলী বাংলায় *রিজওয়ান শাহ* নামে কাব্য রচনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পুঁথি সাহিত্য বা ইসলামী বাংলা সাহিত্যের পরিচয় সম্পর্কে বলেন:

> এই পুঁথি সাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি এক শ্রেণীর বাংলা কাব্য, যাহার বিষয় বস্তু হইতেছে মুসলমানের ধর্মীয় বা জাতীয় ঐতিহ্য। এই জন্য ইহাতে আমরা পাই পয়গম্বরদের (আ.) জীবন, হযরত রসূলুল্লাহের (দঃ) জীবনী, কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত, আমীর হামজার যুদ্ধ কাহিনী, হযরত আলীর পুত্র হানিফার যুদ্ধের বর্ণনা, সোনাভান-জৈগুন প্রভৃতির বীর রমণীদের লাভের জন্য হানিফার জঙ্গ, দাতা হাতেম তাই-এর কেচ্ছা, আরবের প্রেমিক যুগল লায়লী মজনুর অপূর্ব প্রেমোখ্যান, ইরানের প্রেমিক প্রেমিকা শিরী ফরহাদের করুণ প্রণয় কাহিনী, কুরআন শরীফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৃত্তান্ত অবলম্বনে রোমান্টিক কাব্য য়ুসুফ-যোলায়খা প্রভৃতি। এইগুলি পাক ভারতের বাহির হইতে আমদানী। পাকভারতের ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা পাই কালুগাজী চম্পাবতীর কাহিনী। ইসমাইল গাযী, গোরাচাঁদ পীর , মোবারক গাযী, শাহজালাল, বনবিবি, বড়খাঁ গাযী, প্রভৃতি পীরগণের ঐতিহ্যমূলক কাব্য।
>
> বাংলাদেশের মুসলিম শূরবীরগণও বাদ পড়েন নাই, যেমন ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলী, শমশের গাযী প্রভৃতি। এই পুঁথি সাহিত্য নারীগণকে অবহেলা করে নাই; যেমন দেওয়ানা মদিনা, ভেলুয়া, সুন্দরী মহুয়া, কাজল রেখা, নুরন্নেহার প্রভৃতি। বাংলায় কতকগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যমূলে হিন্দু বা বৌদ্ধ সমাজে উৎপন্ন হইলেও পুঁথি লেখকেরা সেগুলি ত্যাগ করেন নাই। এই জন্য আমরা মুসলমানি পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে সত্যপীরের কাহিনী, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, গোরক্ষবিজয়, প্রভৃতি বিষয়ের কাব্য দেখিতে পাই। মোট কথা, এই পুঁথি সাহিত্যকে বাংলার মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বলা যাইতে পারে।[১০৩]

---

[১০৩] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, খণ্ড ২ (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. ২৭০-২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

পুঁথি সাহিত্যকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করার চেষ্টা হয়েছে ; এ বিষয়ে বিতর্ক ও হয়েছে। কিন্তু নামের সংখ্যা বেড়েছে তবে সমাধান হয়নি। পুঁথি গুলোতে নানান ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার ফলে পুঁথির নামের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নামগুলো নিম্নরূপ:

দোভাষীপুঁথি, কলমীপুঁথি, এসলামি বাংলা, মুসলমানি বাংলা, মিশ্ররীতির সাহিত্য, মাঝিমাল্লার ভাষা, দোভাষী রীতি, বটতলার পুঁথি, চলতি বাংলা ইত্যাদি।[১০৪] এসব পুঁথিতে বাংলার সাথে আরবী-ফারসি ও হিন্দী-উর্দুর শব্দ ও বাক্রীতি মিশ্রিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কলকাতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গলের বড় খাঁ গাজীর উক্তি স্মরণ করা যায়। যেমন:

বেমান কাফের তোম বেসোর কমজাত।
শুন রে আহম্মক গিধি মেরি এক বাত ॥
খাওকে জঙ্গুলি হুয়াকে মাতআলা।
এতে বড়ে কুদরথ দেওএ গালিগালা ॥
আভি নাই জাহ্নে বড়ে খাঁ গাজী পীর।
খোদায় মাদার দিয়া দুনিয়াকু জাহির ॥[১০৫]

ভুরশুট পরগনার কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলের সেলিম বাদশাহর উক্তি উল্লেখ করা যায়। যেমন:

ওরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কাঁহা ভূত
হি তুঝে করুঙ্গা দো টুক।
ন হয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াও লেকে
জাতি লেউ খেলায়কে থুক ॥[১০৬]

বিষয় ও রসের বিচারে পুঁথি সাহিত্য ছয় ভাগে বিভক্ত ।

১. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য:
'ইউসুফ জোলেখা', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল', 'লাইলী মজনু', 'গুলে বকাওলী', 'শিরি ফরহাদ' প্রভৃতি।

২. জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য:
'আমীর হামযা', 'সোনাভান', 'জৈগুনের পুঁথি', 'হাতেম তাই' প্রভৃতি।

৩. নবী-আউলিয়ার জীবনীকাব্য:
'কাসাসুল আম্বিয়া', 'তাজকিরাতুল আউলিয়া', 'হাজার মসলা' প্রভৃতি ।

৪. লৌকিক পীর পাঁচালি:
'সত্যপীর', 'গাজী', 'কালু ও চম্পাবতী', 'বনবিবির জহুরনামা', 'লালমোহনের কেচ্ছা' প্রভৃতি।

---

[১০৪] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬), পৃ. ২৮২।
[১০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৮।
[১০৬] মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬), পৃ. ৩৫৮ ॥

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম, রীতি-নীতি বিষয়ক শাস্ত্রকাব্য:
'নসিহত নামা', 'ফজিলতে দরুদ' প্রভৃতি ।

৬. সমকালের ঘটনাশ্রিত কাব্য:
হাজী শরিয়তুল্লাহর মতো চরিত্র এবং ওয়াহাবি-ফারায়েজি আন্দোলনের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ সমুহ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।[১০৭]

উল্লেখ্য যে আলোচ্য পুঁথি সাহিত্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক প্রায় শতাধিক হিন্দু ও মুসলমান কবি ও তাঁদের কাব্য আবিস্কারের ফলেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়।[১০৮] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা ২হাজার ছাড়িয়ে যায়। একই শিরোনামের একাধিক পুঁথি থাকায়, শিরোনামের ভিত্তিতে পুঁথির সংখ্যা ছিল ১হাজার সাতচল্লিশ।[১০৯] এ পুঁথি নির্ভর করেই বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ।[১১০] অতএব ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের পুঁথি সাহিত্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অবদান অনস্বীকার্য।

---

[১০৭] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬), পৃ. ৪২০।

[১০৮] আবদুল করিম, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৫৪।

[১০৯] ফরহাদ খান ও মো. সৈয়দুর রহমান, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারকে নিবেদিত প্রবন্ধ সংকলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১০।

[১১০] আহমদ শরীফ, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ২
বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্রমবিকাশ

আবহমানকাল থেকেই রয়েছে বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য। যদিও এ ভূখণ্ডটির সাথে ইরানের ভৌগোলিক দূরত্ব বিদ্যমান, আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক জগতে এ দু'জাতির মধ্যে বাহ্যিক দূরত্ব কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এদেশের চিন্তা-চেতনায় সব সময়ই ইরানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরশ লেগেছিল। অনেক শতাব্দী ধরে ফারসি ভাষার সুমিষ্ট চিনির দানা এ বাংলায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং ভারত উপ-মহাদেশের সকল তোতাই তার স্বাদ গ্রহণ করেছে। যুগ যুগ ধরে ইরানী জাতির সাথে এ উপ-মহাদেশের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক দৃঢ় সম্পর্ক এবং পরস্পরের সাথে সম্মানজনক ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। কয়েকশত বছর পূর্বে ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক শুরু হয়েছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির মাধ্যমে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিজয়ের পর থেকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এতদঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। ছয়শত বছরের (১২০৩-১৮৩৭ খ্রি.) অধিক সময় ধরে ফারসি সরকারী ভাষা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ফলে আজও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা এ দেশের মানুষের রক্তকণিকায় মিশে আছে। ফারসি ভাষা বিশ্বের কয়েকটি গর্বিত ভাষার অন্যতম। মহাকাব্য *শাহনামা* রচয়িতা ইরানের জাতীয় কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসী[১], *রুবাইয়াত* খ্যাত কবি ওমর খৈয়াম[২], পঞ্চরত্ন রচয়িতা নিযামী গানযাভী[৩], সূফী কবি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার[৪], সূফী জগতের অন্যতম তাপস শ্রেষ্ঠ কবি মাওলানা

---

[১] **ফেরদৌসী:** ইরানের জাতীয় কবি এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি। তাঁর উপনাম আবুল কাশেম এবং উপাধি ফেরদৌসী। তিনি ৩২৯/৩৩০হি. মোতাবেক ৯৪০/৯৪১খ্রি. ইরানের 'তুস' নগরের 'তাবরান' এলাকার 'বায' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৪১১হি. মোতাবেক ১০২০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে শাহনামা ও *ইউসূফ-জোলেখা* অন্যতম। বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য শাহনামার মাধ্যমে তিনি ইরানীদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে সুরক্ষিত ও কালজয়ী করে নিজেও কালজয়ী হয়েছেন। [দ্রষ্টব্য: ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান*, ১ম খণ্ড, ১২তম সংস্করণ (তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৩৭১ ইরানী সাল), পৃ. ৪৫৮-৪৫৯; ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, ১ম সংস্করণ (তেহরান: এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ ইরানী সাল), পৃ. ৭৯; আল্লামা শিবলী নোমানী, সাইয়েদ মোহাম্মদ তাকী খরদায়ী গিলানী (অনু.), *শে'রুল আজম*, ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড (তেহরান: দুনিয়ায়ে কিতাব, ১৩৬৩ ইরানী সাল), পৃ. ৭১।]

[২] **খৈয়াম:** তাঁর পুরো নাম আবুল ফাতাহ ওমর বিন ইবরাহীম আল খৈয়াম, খৈয়াম তাঁর উপাধি। তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায়নি। তবে অনেকের মতে ১০৩৮-১০৪৮ খ্রি. এর মধ্যে তিনি নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১২৩-১১২৪ খ্রি. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *মাকালাতু ফি'ল জাবরী ওয়াল মুকাবিলা, মুসাদিরাতু কিতাব-ই-উকলিদাস, মুশকিলাতুল হিসাব, রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম* উল্লেখযোগ্য। [দ্রষ্টব্য: মীর্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদব নামেয়ে ইরান* (লাহোর: এস ডি প্রিন্টার্স তা.বি.), পৃ. ২২৭-২৩৪; ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, ১ম খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে কোকনুস, ১৩৭৩ ইরানী সাল), পৃ. ২৬৩- ২৬৬; আল্লামা শিবলী নোমানী, *শেরুল আজম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

[৩] **নিযামী গান্‌জুবী:** তাঁর পুরো নাম হাকীম আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস ইবন ইউসুফ নিযামী। তিনি ৫৩০/ ৫৩৫হি. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মাত্র সতের বছর বয়সে আধ্যাত্মিকতায় সফলতা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আলী আসকর যাদেহ ৬০৫হি., কাজবীনী তাঁর *আসারে বেলাদ* গ্রন্থে ৫৯০ হি. ড. মুহাম্মদ মুঈন ও ড. যবীহ উল্লাহ সাফা ৬১৪ হি. বলে উল্লেখ করেন। তিনি গাঞ্জ শহরেই মৃত্যুবরণ করেন। নিযামী গান্‌জুবীর পাঁচটি মাসনবী গ্রন্থ রয়েছে যা পাঞ্জেগাঞ্জে

Dhaka University Institutional Repository

জালাল উদ্দীন রূমী[৫], নীতিবাদী কবি শেখ সাদী[৬], গযলসম্রাট হাফেজ শিরাজী[৭], ব্যতিক্রমধর্মী গীতিকাব্য রচয়িতা মাওলানা আব্দুর রহমান জামী[৮] প্রমূখ মহান ব্যক্তিদের কারণেই ফারসি সাহিত্য সুদীর্ঘ অতীত থেকে কালের গতিধারায় নিজেকে অক্ষত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বিশ্বের অনেক ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেই ফারসির প্রতি বিশেষ আগ্রহ বিদ্যমান। বক্ষ্যমান অধ্যায়ে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ফারসি ভাষা-সাহিত্য চর্চার সূচনা ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত

নিযামী বা পঞ্চরত্ন হিসেবে সমধিক পরিচিত। এ পঞ্চরত্ন ছাড়াও দীওয়ানে নিযামী নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন রয়েছে। [দ্রষ্টব্যঃ ড. বারায়াৎ যানযানি, *আহওয়াল ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, ৩য় সংস্করণ (তেহরানঃ মুআসসেসেয়ে এন্তেশারাত ভা চাপে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৭২. ইরানী সাল), পৃ. ১-২, ১৩-১৪; Edward G. Browne, *A Literary History of Persia*, Vol. 2 (London: Cambridge University Press, 1928), p. 401.

[৪] **আত্তারঃ** সালজুকী যুগের (১০৩৯-১১৫৭ খ্রি.) বিখ্যাত সূফী ও দার্শনিক শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার নিঃসন্দেহে ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক ভাবরসে সিক্ত এক অভিজ্ঞ ও ইতিহাস খ্যাত কবি। তিনি ৫১২/৫১৩ হি. নিশাপুরের কাদকান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরোনাম ফরিদ উদ্দীন হামিদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইব্রাহীম বিন ইসহাক আত্তার কাদকানী নিশাপুরী, তবে তিনি আত্তার নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ৬২৭/৬৩২/৬২৯ হি. মৃত্যুবরণ করেন। আত্তারের রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *দিওয়ানে আত্তার, মানতেকুত্তায়ের, পান্দেনামা ও তাযকিরাতুল আউলিয়া*। ফরিদউদ্দীন আত্তারই একমাত্র কবি যিনি ব্যক্তি বিশেষের উপর কোন স্তুতিবাচক কবিতা লিখেননি। [দ্রষ্টব্যঃ সাঈদ নাফিসী, *জুসতজু দার আহওয়াল ওয়া আসারে ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরী* (তেহরানঃ কিতাব ফুরূশী ওয়া চাপ খানেয়ে ইকবাল, ১৩২০ ইরানি সাল), পৃ. ১৯, ৬১-৬২; ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান*, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ (তেহরান কিতাব খানেয়ে ইবনে সিনা, ১৩৩৯ ইরানী সাল), পৃ. ৮৫৯-৮৬৪।]

[৫] **রুমীঃ** বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সূফী সাধকের অন্যতম মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর আসল নাম মুহাম্মদ উপাধি জালাল উদ্দীন, পিতার নাম মুহাম্মদ সুলতান বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ। দার্শনিক এ মরমী কবি পারস্যের খোরাসান প্রদেশের বালখ শহরে ৬০৪ হি. মুতাবেক ১২০৭ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭২ হি. মোতাবেক ১২৭৩ খ্রি. পরলোকগমন করেন। কল্পনার মৌলিকতা, বৈচিত্র সম্ভব, পরিমিতিবোধ, পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছতা সাবলীল আকর্ষণ অনুভূতি ও চিন্তার গভীরতা ছিল তাঁর রচনা শৈলীর বৈশিষ্ট্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে *মাসনবীয়ে রুমি, রুবাইয়্যাত, ফীহে মা ফীহ, মাকাতীব, মাওয়াযে মাজালিসে খামসা*। [ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, ২য় খণ্ড (তেহরানঃ রামীন প্রকাশনী, দশম মুদ্রণ ১৯৯৫), পৃ. ৯৭; ড. তাওফিক হা. সুবহানী, *তারীখে আদাবিয়্যাত* (তেহরানঃ পায়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, প্রথম মুদ্রণ ১৯৯০), পৃ. ২৫১-২৫২।]

[৬] **শেখ সা'দীঃ** ফারসি ভাষার অন্যতম এ শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন একাধারে একজন সাধক, দার্শনিক, পর্যটক, ও মানব দরদী জনসেবক। তাঁর পুরো নাম আবু মুহাম্মদ মুশাররফ উদ্দিন (শারফুদ্দিন) মুসলেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুশাররফ আস্ সা'দী আশ শিরাজী। তবে সর্ব সাধারণের কাছে তিনি সা'দী নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১৮৪ খ্রি. মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১ ও ১১৯৩ খ্রি.। সা'দ ইবন জঙ্গী (৫৯৯-৬৩২হি.) কবির প্রতি অনুগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ সাদী কাব্যনাম গ্রহণ করেন। ৬৯১হি. মুতাবেক ১২৯২ খ্রি. শিরাজ নগরে মৃত্যুবরণ করেন। সাদীর রচনাবলীর মধ্যে *কারীমা, বুস্তান ও গুলিস্তান* অন্যতম। [দ্রষ্টব্যঃ Edward G. Brown, *A Literary History of Persia*, Part: II (London: The Syndics of Cambridge University Press, 1969), pp. 526-528; ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়্যাত দার ইরান*, ১১তম সংস্করণ (তেহরানঃ এন্তেশারাতে ফেরদৌস, চাপখানেয়ে রামীন, ১৩৭৩ ইরানী সাল), পৃ. ৫৮৪-৫৮৫।

[৭] **হাফিজঃ** তাঁর পুরোনাম খাজা শামসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজ শিরাজী। তিনি ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জন্মস্থানের নাম অনুযায়ী তাঁকে শিরাজী বলা হয়। তবে বিখ্যাত গযল কাব্যের রচয়িতা হিসাবে তাঁর স্বদেশবাসী আরো দুঁটি সম্মান সূচক *লিসানুল গায়েব* (অজ্ঞাতের বাণী) এবং *তরজমানুল আসরার* (রহস্যের মর্মসন্ধানী) উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্ত করে গৌরবের হাফিজ উপাধি অর্জন করেন। হাফিজের কাব্য প্রতিভার একমাত্র নিদর্শন *দীওয়ান (কাব্য সমগ্র) যা গযল, কাসীদা, রুবাঈ ও মসনবীর* সমাহার। [দ্রষ্টব্যঃ ড. রেজা যাদেহ শাফাক, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান* (তেহরানঃ চাপ খানে আরমান, ১৩৬৯ ইরানী সাল), পৃ ৩০৭; A. J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London: Geprge Allen and Unwin Ltd., 1958), p. 330; শিবলী নোমানী, *শে'রুল আজম* (লাহোরঃ আল ফয়সাল, ১৩২৫ হিজরী), পৃ. ১৬৯।]

[৮] **জামীঃ** এ মনীষীর পুরো নাম নূরুদ্দীন আবুল বারাকাত আব্দুর রহমান ইবনে নিযামুদ্দীন আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ জামী। তবে তিনি মোল্লা জামী নামে সর্বাধিক পরিচিত। জামী খোরাসান প্রদেশের জাম নামক ক্ষুদ্র নগরীর খারজেদে ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৯৪ মতান্তরে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে হেরাতে পরলোকগমন করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে *নাফহাতুল উনস, ইউসুফ-জুলেখা, হাফত আওরাঙ্গ, বাহারিস্তান, সালামান ও আবসাল, লাইলী ও মাজনুন* উল্লেখযোগ্য। [দ্রষ্টব্যঃ মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদাব নামায়ে ইরান* (লাহোরঃ ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, তা.বি.), পৃ. ৫৮২-৫৮৩; ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারীখে আদাবিয়্যাতে দার ইরান*, ৪র্থ খণ্ড (তেহরানঃ ফেরদৌসী পাবলিকেশন্স, ১৩৮৫ ইরানী সাল), পৃ. ৩৪৭; E. G. Brown, *A Literary History of Persia*, Vol. 3 (Cambridge: At The University Press, 1969), p. 507.

Dhaka University Institutional Repository

হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ফারসি চর্চার বিকাশধারায় অনুবাদ কর্মের বিশাল ভূমিকা রয়েছে; তবে এ বিষয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে কোন আলোচনা সন্নিবেশিত হবে না। ভিন্ন অধ্যায়ে এ আলোচনা উপস্থাপিত হবে।

২.১ বাংলায় ফারসি ভাষা চর্চার পটভূমি ও বিকাশ

বাংলাদেশে ফারসি চর্চার সূচনা-ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের সুদূর অতীতে ফিরে যেতে হয়। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণেই ঐতিহাসিক বাংলা ভূখণ্ডের জনগণের ফারসি ভাষার সাথে সম্পর্ক সুপ্রাচীন। ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই ইরান ও বাংলা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। ভারতের নৌবন্দরসমূহ[৯] তৎকালীন বাংলার নৌ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[১০] এসব বন্দর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলোর বণিক ও নাবিকদের আকৃষ্ট করত। বাংলার সাথে মধ্যপ্রাচ্য ও গ্রেকো-রোমান বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে খ্রিষ্টীয় অব্দের শুরু থেকেই তাম্রলিপ্তির[১১] গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এর ফলে বাংলার সাথে মধ্যপ্রাচ্য ও ইরানের কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয়, সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। অপর দিকে খ্রি. পূর্ব ৩৩১ অব্দে ইস্কান্দার বা সেকেন্দার শাহ্ (Alexander the Great) যখন আরবেলার যুদ্ধে ইরানীদের পরাজিত করে পারস্যে গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আর্য ইরানীদের একটি বৃহৎ অংশ ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে।[১২] ফলে তাদের সাথে করে আনা মাতৃভাষা ফারসির সাথে এদেশের লোকজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উপমহাদেশের সঙ্গে ইরানের এ গভীর সম্পর্কের কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে জওহরলাল নেহেরুর নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

> Among the many nations and people that have come into contact with India and left their mark on her life and culture, the oldest and the most consistent are the Iranians.[১৩]

---

[৯] যথা- দেবল, নিরুন, সুপারাকা, বাড়িগাজা, টাগারা, মুজিরিস, নেলকিনডা, আরিয়েক, তাম্রলিপ্তি, গাঙ্গে, সাপ্তগ্রামা, সরন্দিপ প্রভৃতি ভারতীয় নৌ-বন্দর থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের নৌ-যান পারস্য উপসাগরের উবুলা, ওমানা, ইউডেইমান, সিরফ, কাইস, হরমুজ, সকোট্টা এবং গেড্রসিয়া উপকূল অতিক্রম করতো। বাংলার প্রাচীন নৌবন্দরসমূহ যথাঃ তাম্রলিপ্তি, গাঙ্গে এবং সাপ্তগ্রামা।

[১০] কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ও মুহাম্মদ আব্দুস সবুর খান, *ফারসি সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৫৬৪।

[১১] **তাম্রলিপ্তিঃ** প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সিংহলি গ্রন্থ এবং গ্রিক ভৌগলিক ও চৈনিক তীর্থযাত্রীদের বিবরণে উল্লিখিত প্রাচীন মানব বসতিস্থল। এ সকল গ্রন্থ ও বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পূর্ব উপকূলবর্তী তাম্রলিপ্তি গঙ্গা নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে তার কাছে অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্তি তৎকালীন বাণিজ্যপথের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এখানে ব্যবসায়ী, পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এখানকার মানববসতির কালসীমা মোটামুটিভাবে চতুর্থ/তৃতীয় খৃ.পূর্বাব্দ থেকে অষ্টম খৃ.পর্যন্ত বলে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এটিকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন বন্দর হিসেবে গণ্য করা হয়। [দ্রষ্টব্যঃ *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৪ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৫০।]

[১২] কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ও মুহাম্মদ আব্দুস সবুর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৪।

[১৩] Shojakhani, M. & Rikhtehgaran, M.R, *Indo-Iranian Thought: A World Heritage*, (সম্) (দিল্লীঃ ১৯৯৫), পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে ইরানী অভিবাসী, বণিক এবং বাণিজ্যপণ্যের সাথে সাথে সেনাবাহিনী, প্রকৌশলী, কারিগর, সুফি-দরবেশ, চিকিৎসক, শিল্পী এবং কবি-সাহিত্যিকদের বাংলায় আগমন ঘটে। ক্রমান্বয়ে তাদের সম্পর্ক বাংলার রাজদরবার, সমাজ, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে। ফলে তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এদেশে বাংলার পাশাপাশি ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা চলতে থাকে। তবে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মঈজুদ্দিন মুহাম্মদ সাম (শিহাবুদ্দীন ঘুরী)-এর সিপাহসালার ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকেই এদেশে ফারসি চর্চা ইতিহাসে স্বীকৃত স্থান লাভ করে।[১৪] বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১২০৩-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে।[১৫] তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিরাট এলাকা অধিকার করে রংপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে খানকা, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করে ফারসি শিক্ষাদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১৬] পরবর্তীকালে বঙ্গের মুসলিম শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজীকে ভারতের দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণা করেন।[১৭] তখন থেকে বঙ্গে ফারসি ভাষার প্রচলন ও চর্চা কিছুটা স্তিমিত হলেও তা একেবারে মিটে যায়নি। কারণ সমগ্র মুসলিম যুগ ও ঔপনিবেশিক শাসনকালের কিছু সময় সহ সুদীর্ঘ ছয়শ বছর (১২০৩-১৮৩৭ খ্রি.) এদেশের দাপ্তরিক ভাষা ফারসি ছিল বলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এখানকার মাটি ও মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে। ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যাপকভাবে ফারসি ভাষার ব্যবহার ও চর্চা অব্যাহত থাকে।

২.২ মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে ফারসি সাহিত্য চর্চা

ভারতে মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে বঙ্গে ফারসি সাহিত্য চর্চা ও ফারসি কাব্যের বঙ্গানুবাদ হতে দেখা যায়। এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম যে ফারসি গ্রন্থটি রচিত হয়, তা ছিল সংস্কৃত থেকে ফারসি অনুবাদ। আলী মর্দান খলজীর শাসনামলে (১২০৯-১২১৬ খ্রি.) প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী ব্রাহ্মণ

---

[১৪] J. N Sarker, *History of Bengal*, Vol. 2 (Dacca: Dacca University, 1948).

[১৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১; তবে ড. আব্দুর রহিম তাঁর *Social and Cultural History of Bengal*, গ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গ বিজয়ের সাল ১২০১ বলে উল্লেখ করেছেন, আর. এস. এম. আলী. *Dr. A. N. Choudhury*-এর *Dynmic History of Bengal* গ্রন্থের উদ্ধিতির মাধ্যমে বঙ্গ বিজয়ের সাল ১২০৪ খ্রি. বলে উল্লেখ করেন। [দ্রষ্টব্যঃ *Journal of the Asiatic Society of Pakistan Dacca*, Vol. XIII, No.1, April 1968, p. 122]

[১৬] S.M. Ikram & Spear (ed.), *Cultural Heritage of Pakistan* (*London*: Oxford University Press, 1955), p. 3.

[১৭] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিব্রাজক ভোজর[১৮] কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ *অমৃতকুন্ড* গ্রন্থটি *বাহরুল হায়াত* (بحر الحياة) নামে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।[১৯] আলোচ্য অনূদিত গ্রন্থই বাংলায় ফারসি চর্চার সূচনাকর্ম হিসেবে পরিগণিত। এ গ্রন্থটি মুসলিম সূফী সাধকদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে জানা যায়। এ গ্রন্থটি নিম্নোক্ত ১০টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত:

باب اول : در معرفت عالم صغیر و ماهیت آن

باب دوم : در معرفت تأثیرات عالم صغیر

باب سوم : در معرفت کیفیت دل و حقیقت و واردات و تخیلات

باب چهارم : در معرفت ریاضت و کیفیت آن

باب پنجم : در معرفت ایجاد انسان و انواع دم

باب ششم : در معرفت چگونگی جسد و ماهیت آن و محافظت منی

باب هفتم : در معرفت وهم

باب هشتم : در معرفت فساد جسد و شدن علامت مرگ

باب نهم : در معرفت تسخیرات روحانی

باب دهم : در معرفت حکایت مبدا و معاد[২০]

অর্থাৎ এ গ্রন্থে মানব দেহকে একটি ক্ষুদ্র জগতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানবদেহ সম্পর্কে জ্ঞান, মানব দেহের রহস্য, আত্মা এবং তার রহস্য, যোগসাধনার রীতিনীতি, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ ও এ সম্পর্কে জ্ঞান, শুক্র সংরক্ষণ, ইচ্ছাশক্তি, মৃত্যুর লক্ষণ ও মৃত্যুকে এড়াবার উপায়, রিপু দমন এবং আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অনুমিত হয় যে, সেই সময় থেকেই বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মবাদ তথা সূফীতত্ত্বের চর্চা ছিল এবং এ নিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিয়মিত বাহাসও হতো। মুসলমানদের আগমনে এ চর্চায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয়।

---

[১৮] **কাজী রুকন উদ্দিন সমরকন্দি:** তিনি ছিলেন মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিক যুগের খ্যাতনামা পন্ডিতদের অন্যতম। আলী মর্দান খিলজির শাসনামলে (১২১০-১২১৩ খ্রি.) লক্ষৌ শিক্ষা দীক্ষায় যথেষ্ঠ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যার ফলে দূর দূরান্ত থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এখানে লোকজনের আগমন ঘটে। লক্ষৌর দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজী রুকন উদ্দিন আগত লোকদের সাথে ধর্মীয় ও দার্শনিক বিষয়ে আলোকপাত করতেন। এ ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ধর্মীয় বিষয়ে বোঝা-পড়া করার লক্ষ্যে কামরূপ থেকে নৌ পথে বঙ্গের রাজধানী লক্ষৌ আগমনকারী ব্যক্তিটিই হলেন ভোজর নামক ব্রাহ্মন। ভোজর কাজী রুকন উদ্দীনের সাথে আলোচনা করে নবী (সা.) এর মোরাকাবা-মুশাহাদা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ভোজর তাঁর যোগ শাস্ত্রীয় *অমৃতকুণ্ড* গ্রন্থটি কাজীকে উপহার দেন। যা পরবর্তীকালে কাজী ফারসি ভাষায় *বাহরুল হায়াত* ও আরবী ভাষায় *হাউজুল হায়াত* নামে অনুবাদ করেন।

[১৯] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, খণ্ড ৩ (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৩৮৮।

[২০] ড. কলিম সাহসারামি, *খিদমাত গুযারানে ফারসি দর বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৯), পৃ. ১২-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের পুত্র নাসির উদ্দিন বুগরা খানের আমলে (১২৮১-১২৮৭ খ্রি.) বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় দিল্লী থেকে বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শামসুদ্দীন দাবীর (মৃ. ১২৬৮ খ্রি.), ও আমীর খসরু দেহলবী[২১] (১২৫৩-১৩২৪ খ্রি.) বঙ্গে আগমন করে ফারসি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন।[২২] শামসুদ্দীন দাবীর, বুগরা খানের মীর মুনশী তথা প্রধান সচিব হিসেবে স্থায়ী ভাবে বাংলায় বসবাস করেন। তিনি বুগরা খানের প্রশংসায় বেশ কিছু ফারসি *কাসীদা* (قصیده) রচনা করেন। বুগরা খানের পুত্র রুকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে (১২৯১-১৩০১ খ্রি.) সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত হাম্বলী ধর্মতত্ত্ববিদ শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা[২৩] (মৃ.৭০০ হি.) ফিকহ শাস্ত্র বিষয়ে একশ আশিটি বায়ত সম্বলিত *নাম-এ-হক* (نام حق) শীর্ষক ফারসি গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।[২৪] এ গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত । তিনটি ভূমিকা সংক্রান্ত অধ্যায়ে হামদ বা খোদার প্রশংসা, নাত বা রাসূল (সা.) এর প্রশস্তি স্থান পেয়েছে। বাকি দশটি অধ্যায় অযু, গোসল, নামাজ এবং রমজান মাসের রোযার মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এতে ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব, মুস্তাহাব এবং মাকরূহ ইত্যাদি বিধানাবলীরও আলোচনা রয়েছে এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পালনের ক্ষেত্রে দোষত্রুটি সংশোধনের নিয়ম সম্পর্কে উপদেশ দেয়া হয়েছে। মূলত পয়গম্বরের শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপন অনুশীলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে এর প্রথম সংস্করণ এবং ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে কানপুর থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[২৫] বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী উৎকর্ষ সাধিত হয় গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.)। এটি ছিল বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।[২৬] সুলতান একদিকে ছিলেন ফারসি কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক; অন্যদিকে তিনি নিজেও ছিলেন ফারসি কবি। তিনি ইরানের মহাকবি হাফিয শিরাজীর (১৩১৫-১৩৮৯ খ্রি.) বিশেষ

---

[২১] **আমীর খসরু:** তিনি ১২৫৩ খ্রি. ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত ইতাহ জিলার পাতিয়ালী (মুমিনাবাদ)-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। কর্মজীবনে আমীর খসরু আমীর মালিক আলাউদ্দিন কিসলু খাঁন ও দিল্লির সুলতান কায়কোবাদ এর পিতা বোগরা খাঁন এর অধীনে কর্মরত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো *দীওয়ান* ও *কিরান-উস-সাদাইন*। তিনি একজন ঐতিহাসিক দার্শনিক কবির পাশাপাশি একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। [দ্রষ্টব্য: মীর্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদব নামেয়ে ইরান* (লাহোর: এস ডি প্রিন্টার্স, তা.বি.), পৃ. ৪৮৫; আল্লামা শিবলী নোমানী, *শেরুল আজম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২; খন্দকার আব্দুর রহমান, *জীবনী গ্রন্থমালা* (আমীর খসরু) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭), পৃ. ১৭-৫০।

[২২] আল্লামা শিবলী নুমানী, *শে'রুল আজম*, খণ্ড ৫ (লাহোর: আল ফয়সাল, ১৩৮৫ হি.), পৃ. ৬৯।

[২৩] **শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা:** ১৩শ শতকের বিখ্যাত হাম্বলী ধর্মতত্ত্ববিদ শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি গিয়াস উদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.) দিল্লীতে আগমন করেন (১২২৬ খ্রি.)। বিদ্বান, আমীর, সাধারণ লোক সকলেই বহুগুণে গুণান্বিত তাওয়ামার প্রতি আকৃষ্ট হন। এতে সুলতান ঈর্ষান্বিত হয়ে সুকৌশলে তাঁকে সোনারগাঁয়ে প্রেরণ করেন (১২৭৭ খ্রি.)। তাওয়ামার তত্ত্বাবধানে সোনার গাঁ তৎকালীন সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হতো। শায়খ শারফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরী (র.) (১২৬৩-১৩৭১ খ্রি.) তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১২৭৬ খ্রি.)*, বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১১৭; আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭), পৃ. ২৪-২৫।

[২৪] ড. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৪০৯।

[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫১।

[২৬] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৬ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরক্ত ছিলেন। স্বরচিত একটি ফারসি পংক্তি পাঠিয়ে তিনি সিরাজীকে বঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং ঐ পংক্তির ছন্দে একটি গযল রচনা করে দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। কবি স্বয়ং আসতে অপারগ হওয়ায় সুলতানের জন্য স্বরচিত একটি গযল উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।[২৭] সিরাজীর দেয়া গযলটি[২৮] বাংলার ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাবধি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কাব্য ও কবির সমাদর তৎকালীন সময়ে পাক ভারত উপমহাদেশে খ্যাতি লাভ করে ছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পাক ভারত উপমহাদেশে মহাকবি হাফিয শিরাজীর আমন্ত্রণ সম্পর্কে ই. জি. ব্রাউন বলেন:

> Two wings of India also sought to persuade Hafiz visit their courts. One of these was Muhammad Shah Bahmani of the Decean, a liberal patron of poets, who, through his favourite Mir Fadlullah invited Hafiz to his capital, and sent money to him for his journey.[২৯]

সুলতানের বন্ধু ও সহপাঠী সূফী নূরুল হক নূর কুতুব-এ-আলম পাণ্ডুবী[৩০] বিশিষ্ট ফারসি কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি রাসূল (সা:) এর চল্লিশটি হাদীসের ফারসি তরজমা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সহ *আনীসুল গুরাবা* (انیس الغراباء) শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩১] এটি প্রায় ষাট পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। গ্রন্থটি লখণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। ফারসি ভাষায় তাঁর রচিত ১২১টি চিঠিপত্রের সংকলন *গুলযারে*

---

[২৭] আল্লামা শিবলী নুমানী, *শেয়েরুল আজম* (লাহোর: আল ফয়সাল, ১৩৮৫ হিজরী)

[২৮]

حدیث سر و گل لاله می رود — وین بحث با ثلاثه غساله می رود

شکر شکن شوند همه طوطیان هند — زین قند پارسی که به بنگاله می رود

حافظ زشوق مجلس سلطان غیاث دین — غافل مشوکه کار تو از ناله می رود.

'হে সাকী ! দেবদারু, ফুল ও টিউলিপের আলোচনা চলছে
পান-পিয়ালাসহ তিন প্রেয়সীকে নিয়ে এ আলোচনা চলছে।
আজকে পাঠাই বাংলায় যে ইরানের এই ইক্ষু শাখা
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টি মাখা।
হাফিজ ! সুলতান গিয়াস উদ্দীনের দরবারে আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে
উদাসীন থেকো না। কারণ ক্রন্দন দিয়েই তোমার কার্য সফল হবে। আজকে .... মিষ্টি মুখ এ চরণ দু'টি কাজী নজরুল ইসলাম অনু. [দ্রষ্টব্য: আব্দুল কাদির (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনঃমুদ্রণ ১৯৯৬), পৃ. ৪৫।

[২৯] E. G. Brown, *A Literary History of Persia*, Vol. 3 (Cambridge: The Cambridge University Press, 1969), p. 285.

[৩০] **শায়খ নুর কুতুবুল আলম:** তিনি ছিলেন শেখ আলাউল হকের পুত্র। শেখ আলাউল হক সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহের সমসাময়িক ছিলেন আর নুর কুতুব আলম ছিলেন গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের সমসাময়িক। বিনয় আয়ত্ত করার মানসে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত হন এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস এর ভাষ্যানুযায়ী তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা একশত একুশটি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল রাজা গণেশের নিপীড়ন থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করে বাংলায় মুসলিম শাসন বহাল রাখা। তিনি ৮১৮ হি. মেতাবেক ১৪১৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দরগাহকে শশহাজারী বা ছয় হাজারী বলা হয়ে থাকে। [দ্রষ্টব্য: *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৯ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৫৪; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় প্রকাশ ১৯৮৭), পৃ. ১৯৬-২২৪; মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১০০।

[৩১] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবরার (گلزار ابرار) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ পত্রই নূর কুতুব এর শায়খ ফযলুল্লাহর নামে লিখিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্র-সংকলনে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে লেখা ১৩টি পত্রও রয়েছে। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের আমলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) মওলানা ইব্রাহীম ইবন কাওয়াম ফারুকী সংকলিত *ফারহঙ্গে ইব্রাহীমী* (فرهنگ ابراهیمی) শীর্ষক অভিধানটি এতদঞ্চলে রচিত প্রথম ফারসি অভিধান। অভিধান হওয়া সত্ত্বেও তিনি এতে বারবক শাহের বেশ কিছু প্রশংসা এবং ফারসি ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও পরিভাষার ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উচ্চ সাহিত্যমান সম্পন্ন স্বরচিত অসংখ্য পংক্তি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ফেরদৌসী সহ সমকালীন বহু কবির পংক্তিও তিনি এতে সংযোজন করেছেন।[৩২] এসব কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন: আমীর যয়নুদ্দীন হেরাবী, আমীর শিহাবুদ্দীন হাকীম কিরমানী, মাখমুর সিরাজী, মালেক ইউসুফ, সৈয়দ জালাল, সৈয়দ মুহাম্মদ রুকনুদ্দীন, সৈয়দ হাসান, শেখ ওয়াহেদী প্রমুখ। ফারুকী এ গ্রন্থটি সংকলন করেন ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে রুকনুদ্দিন বরবক শাহের শাসনামলে। হয়তো এ কারণেই এটি অভিধান গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও এতে বারবক শাহের প্রশংসাও রয়েছে। এ গ্রন্থটি ফারুকী তাঁর মুর্শিদ বিহারের প্রখ্যাত সূফী শেখ শরফুদ্দিন আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়াহ মানীরীর নামে উৎসর্গ করেছিলেন বলে এটি *শরফনামা* বলেও অভিহিত। বায়ান্নটি পংক্তি বিশিষ্ট একটি মাসনবী দিয়ে শুরু ইব্রাহীম ফারুকীর *ফারহঙ্গে ইব্রাহীমী* অভিধানের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ শেষে ফারসিতে প্রচলিত তুর্কী শব্দের স্বতন্ত্র তালিকা দেয়া হয়েছে। অনেকে মনে করেন এ অভিধান রচনার উদ্দেশ্যে ইব্রাহীম ফারুকী ইরান ভ্রমণেও গিয়েছিলেন; কারণ তার অভিধানে এমন সব শব্দ ও অর্থ পাওয়া যায় যা ইরানের মূল ফারসি-ভাষীদের মধ্যেই শুধু প্রচলিত। এ অভিধানে উল্লিখিত কবি-সাহিত্যিকদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এবং রচনাবলী উদ্ধার করা গেলে বাংলাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে আরো অনেক প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যেতো। বাংলায় ফারসি চর্চার ইতিহাসে *শরফনামা* একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র উপমহাদেশে ফারসি সাহিত্য ও জ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ বড় রকমের কৃতিত্বের দাবিদার। এ গ্রন্থটি আরো একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এতে লেখকের সমকালীন বাংলার কিছু কিছু পণ্ডিত ও কবিদের নাম পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে অসামান্য প্রতিভাবান লেখক ও যশস্বী চিকিৎসক আমির শাহাবুদ্দিন হাকিম কিরমানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ফারুকীর উস্তাদ শেখ ওয়াহেদী ফারসি ভাষায় *হাবলুল মাতিন* (حبل المتین) শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বারবক শাহের দরবারের সবচেয়ে খ্যাতনামা কবি আমীর যয়নুদ্দীন মালিকুশ শুয়ারা বা কবি সম্রাট উপাধি পেয়েছিলেন। তার দরবারের অপর প্রতিভাধর লেখক ও যশস্বী চিকিৎসক আমীর শিহাবুদ্দীন *ফারহাঙ্গে আমীর শিহাবুদ্দীন* (فرهنگ امیر شهاب الدین) নামে একটি ফারসি অভিধান সংকলন করেন।[৩৩]

---

[৩২] কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ও মুহাম্মদ আব্দুস সবুর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৩।

[৩৩] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৬ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৩৭; ড. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৫১৮-৫১৯।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) মুসলিম পণ্ডিতদের তার রাজ্যে বসতি স্থাপনের আমন্ত্রণ জানান। তিনি ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের[৩৪] *গুররা-এ-শহীদ* নামক স্থানে একটি উচ্চমানের মাদরাসা এবং পাণ্ডুয়া[৩৫]-এ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৬] এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে আরবী ও ফারসি চর্চা হত। এখানকার সৌধরাজীর গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ[৩৭] সে সময়ে বঙ্গে আরবী- ফারসি চর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করে। মুসলিম শাসনামলে ফারসি সাহিত্য চর্চা যে গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের বাংলা কাব্যে; বিশেষ করে চৈতন্যমঙ্গল-এ অসংখ্য ফারসি শব্দ ও বয়াতের ব্যবহার দেখে। যেমন- চৈতন্য মঙ্গলের একটি শ্লোক নিম্নরূপ:

মসনবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহা পাপী জগাই-মাধাই দুই জনে।[৩৮]

২.৩ মোগল আমল (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.)

মোগল আমলে ভারতের রাজভাষা রূপে ফারসি জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। এ সময়ে বাংলার মুদ্রাপৃষ্ঠে, মসজিদগাত্রে, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে, রাজস্ব বিভাগে, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ আলোচনায় সর্বত্রই ফারসি ভাষার প্রচলন হয়। ফারসি বিদ্যাবত্তা, চাকরী-বাকরি সভ্যতা ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। মোগল আমলে ফারসি ছিল এ অঞ্চলের রাজভাষা। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ফারসি চর্চা সম্পর্কে লিখেন:

---

[৩৪] **গৌড়:** ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগীয় অন্যতম বৃহৎ নগরী। আনুমানিক ১৪৫০ খ্রি. থেকে ১৫৬৫ খ্রি. পর্যন্ত এটি বাংলার রাজধানী ছিল। নগরটি বর্তমান ভারতের মালদা শহরের দক্ষিণে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের পূর্বাংশে ২৪° ৫২ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮° ১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় চার মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। [দ্রষ্টব্য: *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৩ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২১৭।

[৩৫] **পাণ্ডুয়া:** ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের গৌড় থেকে প্রায় ২০ মাইল এবং বর্তমান মালদা শহর থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি শহর। শহরটি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময়ে (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রি.) টাকশাল এবং রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৪২ খ্রি. রাজধানীর মর্যাদা লাভের পূর্বেই পাণ্ডুয়া উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এখানে প্রাপ্ত বহু হিন্দু ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন এটির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ১৩৫৩ খ্রি. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সম্ভবতঃ বাংলার প্রথম দিকের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ এর (১৩০১-১৩২২ খ্রি.) নামানুসারে শহরটির নতুন নাম দেন ফিরুজাবাদ। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এটি প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু টাকশাল শহর হিসেবে এর মর্যাদা শেরশাহ এর আমল (১৫৪০-৪৫ খ্রি.) পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। পাণ্ডুয়ার শহরতলী শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজি (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং নূর কুতুব আলম প্রমুখ বিখ্যাত দরবেশদের আকৃষ্ট করে। তাঁরা এখানে খানকাহ (ধর্মশালা) স্থাপন করেন। এ কারণে শহরটি হজরত পাণ্ডুয়া নামেও পরিচিত। মহানন্দা নদীর গতি পরিবর্তন এবং ১৪৫০ খ্রি. দিকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরকরণের কারণে পাণ্ডুয়ার পতন হয়। [দ্রষ্টব্য: *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৫ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৪০; অধ্যাপক কাজী মো. শহীদুল ইসলাম ও অধ্যাপক মো. আবুল কাসেম ভুঁইয়া (অনু.), *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭)।]

[৩৬] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।

[৩৭] **বড় আরবাইন খানা:** লক্ষণসেনী দালান, ভাণ্ডার খানা, তনুর খানা বা পাক ঘর, কুতুব শাহী মসজিদ, আদিনা মসজিদ।

[৩৮] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, সং-৩য় (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৯৬৫), পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

'মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসী, মসজিদ-গাত্রে ফারসী, গৃহ নির্মাণ লিপিতে ফারসী, শাহী ফরমানে ফারসী, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফারসী, রাজস্ব বিভাগে ফারসী, শিক্ষা দীক্ষায় ও আলাপ আলোচনায় ফারসী দেদার চলিতে লাগিল। বিদ্যাবত্তা, চাকরী-বাকরী এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসী হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু মুসলমান সকলেই ফারসী শিখিতে শুরু করিল।'[৩৯]

সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) অনেক ফারসি কবি ও সাহিত্যিক বাংলার অধিবাসী হন। তাদের অন্যতম মীর্জা জাফর বেগ কাজবীনি (মৃ. ১০২১ হি.) ইরানের বিখ্যাত কবি নিযামী গানজুভীর কাব্যরীতি অনুসরণ করে *শিরিন ও খসরু* (شیرین و خسرو) শীর্ষক একটি মসনভী[৪০] রচনা করেন।

সুবেদার আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করলে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফারসি কবি সাহিত্যিকগণ এখানে আগমন করে সাহিত্য চর্চায় মন দেন। তাদের মধ্যে আবুল বারাকাত মুনীর লাহোরী[৪১] (১৬০৯-১৬৪৫ খ্রি.) সুবাদার সায়েফ খাঁর সভাকবির মর্যাদা লাভ করেন। তিনি সুবাদারের সাথে সারা বাংলা ভ্রমণ করে যেসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন, তার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে ফারসি ভাষায় একলক্ষ শে'র রচনা করেন। এ সকল শে'র সম্বলিত তার কাব্যগ্রন্থ *কাওয়ায়েদে উরফী* (قواعد عرفی) ও *গুলদাস্তে* (گلدسته) সুধী মহলে বেশ সমাদৃত হয়। তিনি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় ভিন্ন-ভিন্ন শিরোনামে বেশ কিছু চমৎকার *মসনবী* রচনা করেন; যা পরবর্তীকালে *মসনবী দার সিফাতে বাঙাল* (مثنوی در صفت بنگاله) নামে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৪২] মোগল সুবাদারগণ ফারসি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি নিজেরাও সাহিত্য চর্চা করতেন। সুবাদার নওয়াব কাসিম খাঁ জুয়াইনী (মৃ. ১৬৩২ খ্রি.) ফারসি ভাষায় একটি *দীওয়ান* (دیوان) রচনা করেন।[৪৩] তাঁর দরবারের বিখ্যাত সাহিত্যিক মির্জা মুহাম্মদ সাদিক *সুবহে সাদিক* (صبح صادق) শিরোনামে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও জীবনচরিত রচনা করেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটি তিনি শাহজাদা সুজাকে উৎসর্গ করেন। ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত এ গ্রন্থে উপমহাদেশের বিভিন্ন নগরে ও

---

[৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-১৩২।

[৪০] **মাসনভী**: মাসনভী দ্বিপদী বিশিষ্ট মোটামুটি দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য। যার প্রতিটি শ্লোকেরই ভিন্নতর অন্ত্যমিল বিদ্যমান থাকে এবং ধ্বনি/মাত্রা একই হয়ে থাকে (এ ধরনের কবিতার বিষয়বস্তু কাহিনী, আধ্যাত্মবাদ বা চরিত্র বিষয়ক হয়ে থাকে। [দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক মোহাম্মদ ময়েজ উদ্দীন, *রাহনুমায়ে সুখান* (ঢাকা: কোরআন মঞ্জিল, তা.বি.), পৃ. ৫৯।]

[৪১] **আবুল বারাকাত মুনির লাহোরী**: তিনি ১৬০৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল জলিল তিনি তাঁর ভাই সায়েফ খাঁর কর্মচারী জমিরের সাথে সুবাদার সায়েফ খাঁর শাসনামলে (১৬৩৯খ্রি.) ঢাকায় আগমন করেন। সায়েফ খাঁর মৃত্যুর পর তারা এদেশ ছেড়ে চলে যান। ১৬৪৫ খ্রি. তিনি আগ্রায় মৃত্যুবরণ করলে লাহোরে তাকে সমাধীস্থ করা হয়। [দ্রষ্টব্য: ড. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ২৯।]

[৪২] ড. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

[৪৩] আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ, 'ফারসি দার বাংলাদেশ', *রাহ আভারদ* (তেহরান: গুজারেশে নাখুস্তিনে মাজমায়ে বাইনাল মিলালী উস্তাদানে যবানে ফারসি ইরান, ১৩৭৬ ইরানী সাল), পৃ. ৩০৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় তার পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, শিল্পী, কবি, পণ্ডিত ও অন্যান্যদের সম্পর্কে লিখেছেন। বাংলায় তিনি ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বসবাস করেছেন। বাংলার বহু পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের উঠাবসার কারণে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল। সেগুলোর প্রামান্য বর্ণনাই তাঁর এ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এছাড়া *শাহেদ সাদেক* (شاهد صادق) শীর্ষক অপর একটি ফারসি গ্রন্থে তিনি প্রবাদ-প্রবচন, বিভিন্ন ফারসি কবির কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তুলে ধরেছেন।

সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ শূজা বাহাদুরের আমলে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.) বাংলায় ইরান ও ভারত থেকে অসংখ্য ফারসি কবি ও সাহিত্যিক আগমন করেন।[৪৪] বিশেষ করে ঢাকায় আগমন করে ফারসি চর্চার উন্নতি সাধন করেন। এ ক্ষেত্রে যদুনাথ সরকারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। যেমন তিনি বলেনঃ

> Names of the many of his officers in Bengal suggest they were Persians and Shias……The prince could not help appreciating the highly cultured and intellectual society of many able Persian scholars and administrators whom he met in Bengal.[৪৫]

বাংলার মহাকবি আলাওল (১৬০৭-১৬৮০ খ্রি.) এক সময় সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ শূজা বাহাদুরের সভাকবি ছিলেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় ইরানের কবি নিযামী গানজুবীর *এসকান্দার নামা* (اسکندر نامه)[৪৬] ও *হাফত পেইকার* (هفت پیکر)[৪৭] এর বাংলা অনুবাদ করেন। তাছাড়া বিষয়বস্তু, উপমা ও বাণী চয়নের দিক থেকে আলাওলের কবিতায় ফারসি কাব্যের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তার বাংলা হামদ না'তগুলো বলা যায় ফারসি হাম্‌দ না'তেরই রূপান্তর। শাহজাদা শুজা নিজেও মাঝে মাঝে ফারসি কাব্যচর্চা করতেন। তার একটি কবিতা নিম্নরূপঃ

در دیست اجل که درمیان اورا   برشاه و گداست حکم وفرمان اورا
شاهی که به حکم دوش کرمان می خورد   خوردند امر و زحیف کرمان اورا[৪৮]

---

[৪৪] ড. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাসঃ মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)* (ঢাকাঃ বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৬৬।

[৪৫] J. N Sarker, *History of Bengal*, Vol. II, p. 335.

[৪৬] **সিকান্দার নামাঃ** এর মূল ফারসি উচ্চারণ *এসকান্দার না'মে*। গ্রন্থটি দু'টি অংশে বিন্যস্ত। প্রথম অংশের নাম *ইকবাল নামে* বা *ইকবাল নামা* দ্বিতীয় অংশের নাম *খেরাদ নামে* গ্রন্থটি ৫৯৭ হি. অনুযায়ী ১২০০ খ্রি. রচনা করা হয়। [দ্রষ্টব্যঃ মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদব নামায়ে ইরান* (লাহোরঃ এইচ ডি প্রিন্টার্স, তা.বি.), পৃ. ৩৮৪।]

[৪৭] *হাফ্‌ত পয়কর* নামের মূল গ্রন্থটির ফারসি উচ্চারণ, *হাফ্‌ত পেইকার* এর বাংলা অর্থ সপ্তদেহ। *বাহরাম নামা* নামেও গ্রন্থটির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। বইটি মসনবী বা দ্বিপদী কবিতাকারে রচিত। নিযামী গান্‌জুবী ৫৯৩ হি. মোতাবেক ১১৯৬ খ্রি. গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে মোট ৪৭০০ টি পংক্তি রয়েছে। [দ্রষ্টব্যঃ মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *প্রাগুক্ত;* পারভীন শাকিবা, *শে'রে ফারসি আ'য অ'গা'য তা এমরোয*, ২য় সংস্করণ (তেহরানঃ এন্তেশারাতে হিরমান্দ, ১৯৯৪), পৃ. ১০৬।]

[৪৮] আলী হাসান, *সুবহে গুলসান* (ভূপালঃ ১২৯৫ হি.), পৃ. ২২২।

শাহজাদা শূজার প্রবীণ কর্মচারী ও ঘনিষ্ঠ সহচর মুহাম্মদ মা'সুন বিন হাসান বিশিষ্ট ফারসি লেখক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি রাজদরবারের অভিজ্ঞতা নিয়ে *তারিখে শাহ শূজাই* (تاریخ شاه شجاعی) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৯] এতে তিনি শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে শাসন ক্ষমতা নিয়ে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয় এবং পরবর্তী আরো কিছু ঘটনাবলির উল্লেখ করেছেন। *তারিখে শাহশুজাই*-ই একমাত্র গ্রন্থ, যাতে শাহজাদা শুজার শাসনামলের বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা সবিস্তারে পাওয়া যায়, যেগুলোর বর্ণনা ঐ সময়কালে রচিত আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অপরদিকে সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তার নির্ভুল এবং তথ্যপূর্ণ বর্ণনা এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কারণ যে সময়কালে এ ঘটনা সংঘটিত হয় সে বছরই মুহাম্মদ মা'সুম তাঁর এ গ্রন্থ সংকলন করেন। যে কারণে কোন তথ্য বিস্মৃতি কিংবা বাদ পড়ার অবকাশ সৃষ্টি হয়নি। এ গ্রন্থে বাংলার আবহাওয়া, প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাও পাওয়া যায়। কারণ মুহাম্মদ মা'সুম দীর্ঘ প্রায় ছাব্বিশ বছর বাংলায় অবস্থান করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ে খুব কাছ থেকে বাংলার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক যে স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করেছেন তার ছাপ তাঁর এ গ্রন্থেও পরিলক্ষিত হয়। এর মূল পাণ্ডুলিপির মাত্র তিনটি কপি ভারতের বাঙ্কিপুর লাইব্রেরী, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী এবং লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এর মূল পাণ্ডুলিপির জেরক্স কপি সংরক্ষিত রয়েছে। আবেদা হাফিজ এ গ্রন্থটির সম্পাদনা করে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

বাংলার সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.) এবং শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৩-১৬৭৭ খ্রি.) মোগল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ফারসি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার সাথে সাথে নিজেরাও সাহিত্য চর্চা করতেন। মীর জুমলা বিশ হাজার ফারসি পংক্তি সম্বলিত একখানি *কুল্লিয়াত* (کلیات) রচনা করেন।[৫০] শাহাবুদ্দীন তালিশ ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে *ফাতহে ইবরিয়া* (فتح ابریه) শীর্ষক আসামের একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। যাতে আসামে সংঘটিত ঘটনাবলির প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এটিকে বাংলার বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলীল হিসেবে গন্য করা হয়। তার এক সৈনিক মির্জা নাথান[৫১] সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) বাংলা ও আসামে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা সম্বলিত *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* (بهارستان غیبی) শীর্ষক এক চমৎকার প্রামান্য গ্রন্থ রচনা করেন।[৫২]

---

[৪৯] আবেদা হাফিজ, 'তারীখে শাহ শুজাঈ', অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮, পৃ. ১।

[৫০] কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ও মুহাম্মদ আব্দুস সবুর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৫।

[৫১] **মির্জা নাথানঃ** আলাউদ্দীন ইসফাহান ওরফে মির্জা নাথান ছিলেন মীর জুমলার শাসনামলের (১৬৬০-১৬৬৩খ্রি.) একজন সৈনিক কবি। তাঁর পিতা মালিক আলী (পরবর্তীকালে ইহতিমাম খান) রাজকীয় নৌবহরের মীর বহর বা এডমিরাল হিসাবে ১৬০৮ খ্রি. সুবাহদার ইসলাম খান চিশতীর সাথে বাংলায় আগমন করেন। মির্জা নাথান পিতার সাথে এসে রাজকীয় প্রশাসনে যোগদান করে প্রায় বিশ বছর বাংলায় চাকুরী করেন। [দ্রষ্টব্যঃ *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৭ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৬৪-৬৫।]

[৫২] কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ও মুহাম্মদ আব্দুস সবুর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত: মীর্জা নাথানের *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* ই এ অঞ্চলে রচিত প্রথম ফারসি গ্রন্থ যাতে বাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সে আমলে কিভাবে পালিত হতো তার মোটামুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে সে আমলে বাংলার মুসলিম সমাজে পবিত্র রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা কিভাবে উদযাপিত হতো তার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঈদুল ফিতরের নতুন চাঁদ দর্শনে মুসলমানদের আনন্দ উৎসবের ইঙ্গিতও মীর্জা নাথানের এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। নাথানের এ গ্রন্থে সন্তানের জন্মের পর সেকালে বাংলায় কি ধরনের উৎসব উদযাপিত হতো তারও বর্ণনা পাওয়া যায়। *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* কয়েকটি অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি অংশের নাম 'দফতর'। প্রথম 'দফতর' -এর নাম ইসলামনামা। এ অংশে সুবাহদার ইসলাম খানের সুবাদারির বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দফতরের কোন নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু এ অংশে কাশিম খান চিশতির সুবাহদারির বর্ণনা আছে। তৃতীয় দফতরের নাম ইবরাহিমনামা । এতে আছে সুবাহদার ইবরাহিম খান ফতেহ জঙ্গ এর সময়কালের বর্ণনা। চতুর্থ এবং সর্বশেষ দফতরে বিদ্রোহী শাহজাদা শাহজাহানের জোরপূর্বক বাংলা দখলের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ দফতর ওয়াকিয়াত-ই-জাহানশাহী নামে পরিচিত।[৫৩] সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলাকে পদানত করার সমসাময়িক বর্ণনা একমাত্র *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* তে পাওয়া যায়। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল সম্পর্কে যেমন বিশদভাবে জানা যায়, বাংলার অন্য কোন সময়ের ইতিহাস তত ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে জানা যায় না এ সত্য থেকেই *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*র গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়।

তৎকালীন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭১৩-১৭২৭ খ্রি.) সুবাদার শূজাউদ্দীন খাঁ (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) ও আলীবর্দী খাঁর শাসনামলে (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) মুর্শিদাবাদ, আজমাবাদ, হুগলী ও ঢাকা মুসলিম সংস্কৃতি ও ফারসি সাহিত্য চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময় ইরান ও ইরাকের বহু কবি সাহিত্যিক বাংলায় আগমন করে ফারসি সাহিত্য সাধনায় রত হন। অধিকন্তু অনেক হিন্দু পণ্ডিতও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করে সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে যদুনাথ সরকারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> Under Murshid Quli Khan and the succeeding Nawabs, Bengali Hindus, by the force of their talents and mastery of Persian, came to occupy the highest civil posts under the faujdars. There had been Bengali Hindu diwans and qanungoes, well-versed in the Persian language and in M0uslim court etiquette, as early as the days of Husain Shah (C.1510).[৫৪]

---

[৫৩] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৭ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৬৫।

[৫৪] J.N Sarker, *History of Bengal*, Vol. II, p. 410.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার শেষ নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.) দরবারেও অনেক খ্যাতিমান ফারসি কবি সাহিত্যিক আসর জমাতেন। তিনি নিজেও বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বানদের আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। জ্ঞানসেবা ও সাহিত্য চর্চায় তিনি বিশেষভাবে সহায়তা করতেন। তাঁর দরবারে অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক আসর জমিয়েছিলেন। তন্মধ্যে শাহ কুদরাতুল্লাহ কুদরত (মৃ. ১৭৯০ খ্রি.) ও ফারহাতুল্লাহ ফারহত খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।[৫৫] তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সুষমা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকে উপজীব্য করে ফারসি ভাষায় *দীওয়ান* (دیوان) রচনা করেন।

২.৪ ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ইংরেজরা বাংলা উড়িষ্যার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। বাংলা বিহারের রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘদিন এতদঞ্চলের অফিস-আদালতের ভাষা ও রাজভাষা ফারসি থাকায় এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে ইংরেজরা ফারসি, উর্দু ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থ দিয়েই ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলে।[৫৬] তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ফারসি শিক্ষা দেয়ার জন্য বিখ্যাত ফারসিবিদদের নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁরা ফারসি গ্রন্থাদি ও কাগজ-পত্রের অনুবাদ করতেন। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্সন (১৭৪৯-১৮৩৭ খ্রি.) কর্তৃক ফারসি উর্দু টাইপ প্রবর্তিত হয়; যা এ দু'ভাষায় গ্রন্থাদি ও সংবাদপত্র প্রকাশে বেশ সহায়ক হয়। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিতি হলে অনেক পুরনো ফারসি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা সহকারে প্রকাশের সুযোগ অবারিত হয়।[৫৭] ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ফারসি, উর্দু ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় চর্চা আরো বেড়ে যায়। তৎকালীন বাংলার সমাজে ফারসির এ গুরুত্ব বিবেচনা করেই ইংরেজ সরকার এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পরও ১৭৫৭-১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত সুদীর্ঘ আশি বছর ফারসিকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়।[৫৮]

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় ফারসি ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। মুন্সী সলিমূল্লাহ ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাস, এখানকার ঐতিহ্য

---

[৫৫] ওফা রাশেদী, *বাঙ্গাল মে উর্দূ* (হায়দারাবাদঃ ইশাআতে উর্দূ প্রেস, ১৯৫৫), পৃ. ৩০।

[৫৬] শামীম বানু, *তারীখচেহ অ'মুযাশে যবানে ফারসি দর বাংলাদেশ ভা মুশকিলাতে কানুনীয়ে অ'ন*, রাহ আভারদ (তেহরানঃ গুজারিশে নাখুস্তিনে মাজমায়ে বাইনাল মিলালী উস্তাদানে যবানে ফারসি, ১৩৭৬ ইরানী সাল), পৃ. ৭১।

[৫৭] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

[৫৮] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৬ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ও সংস্কৃতির বর্ণনা সম্বলিত *তারিখ-এ-বাঙ্গালা* (*تاریخ بنگالہ*) শীর্ষক একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। গুলাম হোসাইন তাবাতাবাই (জ. ১৭২৭/১৭২৮ খ্রি.) ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ *সিয়ারুল মুতাআখখিরিন* (*سیرالمتأخرین*) প্রণয়ন করেন। *সিয়ারুল মুতাআখখিরিন* অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশে সংকলিত উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। এ গ্রন্থের রচয়িতা গোলাম হোসাইন তাবাতাবাঈ কে মুসলিম ভারতের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মনে করা হয়। অপরদিকে গুলাম হোসাইন সালীম যয়েদপুরী (মৃ. ১৮১৮ খ্রি.) ১৭৮৬-১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাংলার ইতিহাস সম্বলিত *রিয়াজুস সালাতিন* (*ریاض السلاطین*) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।[৫৯] *রিয়াজুস সালাতিন*-এ ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে। গুলাম হোসেন সলীম মূলত অযোধ্যার জাইদপুরের অধিবাসী হলেও তিনি বাংলায় এসে বসতি গড়েন এবং সারা জীবন এখানেই কাটান। তিনি মালদহের ইংরেজ কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জর্জ উডনীর অধীনে ডাক বিভাগে ডাক-মুনশীর (বর্তমান পোস্ট মাস্টারের) চাকরি করেন এবং জর্জ উডনীর নির্দেশেই *রিয়াযুস সালাতিন* গ্রন্থ রচনা করেন।[৬০] এ গ্রন্থ রচনায় তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিশেষ করে গৌড় ও পাণ্ডুয়া হতে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেন এবং এমনকি শিলালিপির তথ্যাদিও সংগ্রহ করেন। তার এ গ্রন্থে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থা, উৎপন্ন কৃষি ও শিল্প দ্রব্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়। একই সাথে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠির জীবনধারা সম্পর্কেও ধারনা মেলে। গুলাম হোসাইন সলীম *রিয়াজুস সালাতিন* (*ریاض السلاطین*) গ্রন্থ রচনায় ফারসি ভাষায় লিখিত সমসাময়িক কালের গ্রহণযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[৬১]

১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে মীর্জা শেখ ই'তিসামুদ্দীন (আনু. ১৭৩০-১৮০০ খ্রি.) এতদঞ্চলের প্রথম ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বলিত ফারসি গ্রন্থ *শিগুরফ নামা-এ-বেলায়েত* (*شیگروف نامه ولایت*) রচনা করেন। শিক্ষিত ভারতবর্ষীদের মধ্যে যারা ইউরোপ ভ্রমণ করে ভ্রমণকাহিনী লিখে গেছেন, নদীয়া জেলার পাঁচনুর গ্রামের মির্জা শেখ ই'তিসামুদ্দীন তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বক্সার যুদ্ধের পরের বছর তিনি রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক প্রেরিত দূতের অন্যতম সদস্য হিসেবে ইংল্যান্ড যান এবং প্রায় তিন বৎসর পরে দেশে ফিরে বন্ধুদের অনুরোধে ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নিজ অভিজ্ঞতা ফারসি ভাষায়

[৫৯] আবূ মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ, *খিদমাতে দা'নেশমান্দানে শিবহে ক্বারেহ বেযাবানে আদাবিয়্যাতে ফার্সী* (ইসলামাবাদ: ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৯৪।

[৬০] ড. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১৮।

[৬১] তন্মধ্যে মিনহাজুস সিরাজ রচিত *তবকাতে নাসিরী* (طبقات ناصری) জিয়াউদ্দীন বারনী ও শামস ই সিরাজ আফিফ রচিত *তারীখে ফিরোজ শাহী* (تاریخ فیروزشاهی), ইয়াহিয়া আহমদের *তারীখে মোবারক শাহী* (تاریخ مبارک شاهی) , আব্বাস শিরওয়ানীর *তারীখে শাহী* (تاریخ شاهی), আবুল ফযলের *আইন এ আকবরী* (آئین اکبری) ও *আকবর নামা* (اکبر نامه), বদাউনী রচিত *মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ* (منتخب التواریخ), নিজামুদ্দীন বখশীর *তবকাতে আকবরী* (طبقات اکبری), দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজসভায় রচিত *তারীখে ফিরিশতা* (تاریخ فرشته), গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈর *সিয়ারুল মুতাআখখারিন* (سیرالمتأخرین) ও মুন্সী সলিমুল্লাহার তারীখ-এ-বাঙ্গালা (تاریخ بنگالہ) উল্লেখযোগ্য। [দ্র: *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৯ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১০৩।]

Dhaka University Institutional Repository

লিপিবদ্ধ করেন।[৬২] এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে মনে করা হয় মীর্জা শেখ ই'তিসামুদ্দিনই হলেন প্রথম হিন্দুস্তানী, যিনি বৃটেন গিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম প্রাচ্যদেশীয় প্রাশ্চাত্য ভ্রমণকারী।[৬৩] এ অঞ্চলে ফারসি ভাষায় রচিত এটিই প্রথম ভ্রমণবৃত্তান্ত বা সফর নামা। ঐ একই সময়ে মির্জা মুহাম্মদ ইসমাঈল ওরফে মীর্জা জান তাপিশ (মৃ. ১৮১৪ খ্রি.) উর্দু বাগধারা, পরিভাষা ও প্রবাদ-প্রবচন সম্বলিত *শামসুল বায়ান ফী মুসতালাহত এ হিন্দুস্তান* (*شمس البیان فی مصطلحات هندوستان*) শীর্ষক একটি ফারসি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৬৪] অপরদিকে নওয়াব আলী ইবরাহীম খাঁ খলীল (মৃ. ১৭৯৩ খ্রি.) ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করে *গুলজার এ ইবরাহীম* (*گلزار ابراهیم*) শীর্ষক একটি ফারসি গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৫] ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার শাহনূরী (মৃ. ১৭৮৫ খ্রি.) নামক একজন বড় আলেম ও আল্লাহর ওলী ফারসিতে *কিবরিত এ আহমার* (*کبریت احمر*) শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৬] তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এবং তাঁর পীর, পীরভাই ও পীরের খলীফাদের জীবনচরিত আলোচনা করেন। *কিবরিত-এ-আহমার* এর ভাষ্য মতে, ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ গ্রন্থটি রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তা সমাপ্ত হয় ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে। শাহ নূরী তাঁর পীরকে *কিবরীত-এ-আহমার* বা লাল গন্ধক অর্থাৎ লাল গন্ধকের ন্যায় বিরল ও অতুলনীয় বস্তু বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর পীর সম্পর্কে রচিত গ্রন্থটিকেও সেই নামে নামাংকিত করেন।[৬৭] সৈয়দ মুহাম্মদ বাকির ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে *তাফসীর-এ-কুরআন* (تفسیرقرآن) নামে ফারসি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মাওলানা আবুল ফরীদ মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন কর্তৃক ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় *তাফসীর-এ-আযীযী* (تفسیر عزیزی) নামে অপর একটি তাফসীর রচিত হয়।[৬৮] মাওলানা মুবাশিশর কর্তৃক *নাকুদুল জাওয়াহির* (نقدالجواهر) নামে ফারসি ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র গ্রন্থটি কলকাতার গাউসিয়া প্রেস থেকে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।[৬৯] ইতিহাস চর্চায় অনুরাগী সৈয়দ এলাহী বখশ হোসাইনী *খুরশীদ-এ-জাঁহানুমা* (*خورشید جهان نما*) নামে বৃহৎ একটি ইতিহাস গ্রন্থ ফারসি ভাষায় রচনা করেন।[৭০] তিনি গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে এবং সমাপ্ত করেন ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে; যদিও ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি গ্রন্থটি সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন কিন্তু ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পরবর্তী কোন ঘটনাই

---

[৬২] আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *বিলায়েতনামা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮১), পৃ. ভূমিকা।

[৬৩] *প্রাগুক্ত*।

[৬৪] কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ও মুহাম্মদ আব্দুস সবুর খান, 'ফারসি সাহিত্য', *ভাষা ও সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৫৬৭।

[৬৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।

[৬৬] হাকীম হাবিবুর রহমান, *আসুদেগানে ঢাকা* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৪৬), পৃ. ১১৬।

[৬৭] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

[৬৮] ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৩৫-৩৬।

[৬৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

[৭০] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪), পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থে তিনি অন্তর্ভূক্ত করেননি। এ গ্রন্থে তিনি হযরত আদম (আ:) এর সময় থেকে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পযর্ন্ত সময়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য এক অংশ (প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠা) জুড়ে রয়েছে বাংলার ইতিহাস। এলাহী বখশ তাঁর বর্ণনার জন্য মুসলিম শাসকদের নির্দশনাদিতে আরবী ও ফারসি ভাষায় লিখিত প্রাপ্ত শিলালিপির উপর নির্ভর করেন। এলাহী বখশ *খুরশীদ-এ-জাঁহানুমা* (خورشید جهان نما) গ্রন্থটিকে বারটি বুরূজ বা রাশিচক্রে বিভক্ত করেন; প্রথম বুরূজে পৃথিবীর ইতিহাস; পরের পাচঁটিতে আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং পলিনেশিয়ার (অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহা সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ) ইতিহাস এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম বিষয়ে বর্ণনা উপস্থাপন করেন; সপ্তম বুরূজে নবী রাসূল; অষ্টমে দার্শনিক; নবমে সূফী-দরবেশ; দশমে শিক্ষক, ছাত্র বা শিক্ষা; একাদশে ইমারতাদি এবং দ্বাদশে নিজের জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৭১] এলাহী বখশ এ গ্রন্থে গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্থাপত্যশিল্প এবং আরবী ফারসির শিলালিপির বর্ণনা উপস্থাপন করেন। তিনি পরিভ্রমণ করে শিলালিপির সন্ধান করেন। তাঁর আবিস্কৃত ৪২ টি[৭২] শিলালিপির মধ্যে তিনি ৩৯ টির পাঠ সম্পূর্ণরূপে দিতে সক্ষম হন। বাকি তিনটির মধ্যে ১ টির তারিখ ও প্রবর্তকের নাম এবং অন্য দু'টির তারিখ দিতে পেরেছেন এ বাস্তবতার আলোকে সৈয়দ এলাহী বখশ হোসাইনী কে প্রথম স্থানীয় লিপি বিশারদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ বলে অভিহিত করা যায়।[৭৩] উনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন ও আধুনিক ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ায় ফারসি গ্রন্থ প্রণয়ন, পত্রিকা প্রকাশনা ও সংরক্ষণের সুযোগ অনেকগুণে বেড়ে যায়। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ও কলকাতা থেকে বেশ কয়েকটি ফারসি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে *মিরআতুল আখবার* (مرأة الاخبار) (১৮২২-১৮২৩ খ্রি.), *জাম এ জাহানুমা* (جام جهان نما) (১৮২২-১৮৪৫ খ্রি.), *শামসুল আখবার* (شمس الاخبار) (১৮২৩-১৮২৭ খ্রি.), *আখবার-এ-সিরামপুর* (اخبار سرام پور)

[৭১] আবদুল করিম, *গৌড়-পান্ডুয়ার ইতিহাস*, খণ্ড ৭ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ১৯৮৯), পৃ. ৮।

[৭২] আলাউদ্দীন হোসেন শাহর মাদরাসার লিপি, ৯০৭ হি.; আলাউদ্দীন হোসেন শাহর চক আম্বিয়ার লিপি, ৯১৩ হি.;পুরাতন মালদহের জামে মসজিদের লিপি, ১০০৪ হি.; শাহ গদার দরগাহর লিপি, ৯১১হি.; মালদহের ফুটী মসজিদের লিপি, ৯০০ হি.; সাঁক মোহন লিপি, তারিখ অস্পষ্ট, শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহর সময়ে উৎকীর্ণ; পাণ্ডুয়ার শায়খ জালাল তাবরেজীর আবরাইন খানার লিপি, ১০৭৫হি.; পাণ্ডুয়ার শায়খ জালাল তাবরেজীর আবরাইন খানার দ্বিতীয় লিপি; ঐ একই স্থানের লক্ষণ সেনী দালানের লিপি, ১১৩৪ হি.; ঐ একই স্থানের ভান্ডার খানার লিপি, ১০৮৪ হি.; ঐ একই স্থানের তনুর খানার লিপি, ১০৯৩ হি.; শায়খ নূর কুতুব আলমের দরগার চিল্লা খানার লিপি, ৯১৫ হি.; ঐ একই দরগার আর একখানি লিপি, ৮৪৭ হি.; ঐ একই দরগার আর একখানি লিপি, ৮৯৮ হি.; ঐ একই দরগার সিজদাহ গাহের লিপি, ৮৮৪ হি.; ঐ একই দরগার মিঠা তালাও লিপি, ১১৭০ হি.; ঐ একই দরগার রান্না ঘরের লিপি, ৮৬৩ হি.; ঐ একই দরগার স্তম্ভের লিপি, ১০২০ হি.; ঐ একই দরগার ইনায়েত উল্লাহর কবরের লিপি, ১০১৭ হি.; কুতুবশাহী মসজিদের লিপি, ৯৯০, ৯৯৩ হি.; আদিনা মসজিদের লিপি,৭৭০ হি.; চালিশ পাড়া লিপি, ৮৯৯ হি.; মলনাতলীর লিপি, ৯১৮ হি.; ঐ একই স্থানের আর একখানি লিপি, ৯৩০ হি.; শাহ লক্কাপতির মাজারের লিপি , ৯৩৫ হি.; পুরাতন মালদহের লিপি, ৯১৪ হি.; শাহপুর শিলালিপি, ৯৪৩ হি.; গিলাবারি লিপি, ৯১০ হি.; গোয়া মালতী লিপি,৭১১ হি.; গৌড়ের কদম রসুলের লিপি, ৯৩৭ হি.; তাঁতী পাড়া মসজিদের লিপি, ৮৮৫ হি.; গৌড়ের কোতোয়ালী দরজার পার্শ্বস্থ পুলের লিপি, ৬৬২ হি.; দরস বাড়ী মসজিদের লিপি, ৮৮৪ হি.; শাহ নেয়ামত উল্লাহর দরগাহর লিপি, ৯১৮ হি.; খান জাহানের লিপি, ৮৭০ হি.; ছোট সোনা মসজিদের লিপি (তারিখের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে), শায়খ আঁখি সিরাজের দরগার তোরণের লিপি, ৯১৬ হি.; ঝনঝনিয়া মসজিদের লিপি, ৯৪১ হি.; বড় সোনা মসজিদের লিপি, ৯৩২ হি.। আবদুল করিম, *গৌড়-পাণ্ডুয়ার ইতিহাস*, খণ্ড ৭ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ১৯৮৯), পৃ. ৭৬-৭৭; আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৮০-১৮১।

[৭৩] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৩ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮২৬-১৮২৮ খ্রি.), *আইনা-এ-সিকান্দার* (آئینه سکندر) (১৮৩১-১৮৪০ খ্রি.), *মাহ-এ-আলম আফরোয* (ماه عالم افروز) (১৮৩৩-১৮৪১ খ্রি.), *সুলতানুল আখবার* (سلطان الاخبار) (১৮৩৫-১৮৫৭ খ্রি.), *মিহির-এ-মুনীর* (مهیر منیر) (১৮৪১ খ্রি.), *দূরবীন* (دوربین) (১৮৫৩ খ্রি.), *গুলশান-এ-নওবাহার* (گلشن نوبهار) (১৮৫৪-১৮৫৭ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য।[৭৪] এসব পত্রিকায় সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। প্রকাশনা ও সংরক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থার কল্যাণে বঙ্গদেশে রচিত শুধু উনিশ শতকের যে পরিমাণ ফারসি গ্রন্থ পাওয়া যায় তা পূর্ববর্তী সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনামল থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে।

ব্রিটিশ সরকার ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর এক ফরমান জারী করে অফিস-আদালতে ক্রমান্বয়ে ইংরেজীকে ফারসির স্থলাভিষিক্ত করার উদ্যোগ নেন। এভাবে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ইংরেজী ভারতের বাণিজ্যিক ভাষার রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাতেও বঙ্গে ফারসি চর্চা একেবারে থেমে যায়নি; বরং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা হতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ফারসি ভাষার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেই প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রি.) কলকাতার ইংরেজ এলাকায় 'দেশীয় কলেজ' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ব্রিটিশ কর্মচারী ও ভারতীয়দের ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৭৫] বৃটিশ শাসকগণ ফারসিকে মুসলিম শাসন ও মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতীক মনে করে তাদের শাসনামলের গোড়া থেকেই এ ভাষাকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা করছিলো। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ লর্ড ম্যাকলের উদ্যোগে সরকার কর্তৃক এ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় যে, একমাত্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়া হবে। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে এক বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ফারসি ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। অধ্যাদেশটি ছিল নিম্নরূপ:

> 1. It is hereby enacted, that from the First Day of December 1837,it shall be lawful for the Governor-General of India in Council, by an Order in Council, to dispense, either generally, or within such local limits as may to him seem meet, with any provision of any Regulation of the Bengal Code which enjoins the use of the Persian language in any Judicial proceeding, or in any proceeding relating to the Revenue and to prescribe the language and character to be used in such proceedings.
>
> 11. And it is hereby enacted, that from the said day it will be lawful for the said Governor-General for India in Council, by an Order in Council, to delegate all or any of the powers given to him by this Act, to any Subordinate Authority, under

---

[৭৪] *প্রাগুক্ত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১৩৯।

[৭৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

> such restrictions as may to the said Governor-General of India in Council seem meet.(Act No. XXIX of 1837 Passed by the Hon'ble the President of the Council of India in Council, on the 20th November 1837)[৭৬]

তখন উক্ত অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে কলকাতার মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রায় আট হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করা হয়। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে চারশত একাশি জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত আরেকটি স্মারকলিপি ঢাকার বিচারপতি জে. এফ. জি. কোকের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্বাক্ষরকারীদের মাঝে একশত নিরানব্বই জন ছিল হিন্দু। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কলকাতা ও ঢাকার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের দাবী উপেক্ষা করে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ফারসি দাপ্তরিকভাষা থেকে বিলুপ্ত করে ইংরেজীকে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ভাষায় রূপান্তরিত করেন।[৭৭] কিন্তু তাই বলে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তখনও পর্যন্ত আরবী ফারসি জানাকেই পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি বলে বিবেচনা করা হতো। ইংরেজীকে সরকারী ভাষা রূপে ঘোষণা করার পরও বহুদিন পর্যন্ত বঙ্গের অফিস আদালতে ফারসি ভাষার যথেষ্ঠ প্রচলন ছিল। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'হান্টার শিক্ষা কমিশন'-এ সাক্ষ্যদানকালে আরবী ফারসি তৎকালিন সামজিক গুরুত্ব প্রসংগে নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.) বলেন:

> Unless a Mohamedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mohamedan society, i.e. he will not regarded as a scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mohamedan community.[৭৮]

এ রূপ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেও বাংলায় ফারসি চর্চার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাদেশের মাধ্যমে ফারসিকে সরকারী ও অফিস-আদালতের ভাষা থেকে অপসারিত করা হলেও ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আজ অবধি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত থাকে। এ সুদীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলের অনেক কবি-সাহিত্যিক ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন এবং প্রচুর গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রসংগে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দিল্লীস্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এম. বি কারিমিয়ানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

---

[৭৬] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

[৭৭] আব্দুস সাত্তার, *তারীখে-মাদ্রাসা-এ- আলীয়া* (ঢাকা: মাদ্রাসা-এ আলীয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৫৯), পৃ. ১০৫, ২৪০।

[৭৮] Enamul Hoque, *Nawab bahadir Abdul Latif: His Writings and Related Documents* (Dhaka: Samudra Prokashani, 1968), p. 196.

Dhaka University Institutional Repository

> "Many Iranian books were translated into Persian and similarly books were published in India. So much so that the number of Persian books published in India was sometimes larger than the number of Persian books published in Iran in particular period of time. Even the number of books brought out by some publisging house in India like the munshi naval kishore printing press,Lucknow, was larger than that of the publications of the biggest publishing centres in Iran and what is more important is the fact that the first editions of some Persian texts were published in India.[৭৯]

উদাহরণস্বরূপ: *ইকবাল নামায়ে জাহাঙ্গীরী, আকবরনামা, তারীখে ফিরোজ শাহী, তারীখে মোবারকশাহী, তারীখে ফেরেশতা, তারীখে আদেল শাহী, জাওয়াহিরুল আজায়েব, লুবাবুল আলবাব, নাফায়েসুল মা'সার, মাজমাউল ফুযালা, খুলাসাতুল আশয়ার, রিয়াদুস শুআরা, মাকামাতুস শু'আরা, সুহুফে ইবরাহীমী, মাখযানুল গারায়েব, হাফতে আকলীমা, গিয়াসুল লুগাত, ফারহাঙ্গে আনন্দ রাজ, ফিরুযুললুগাত, জাওয়াহিরুল মাসাদের, বুরহানে কাতে, ফারহাঙ্গে জাহাঙ্গীরী, ফারহাঙ্গে রশীদী, দাস্ত নেহায়ে ফারসি ও আরবী, উলূমে পেযেশকী, ফালসাফা ও মানতেক, হুনারেখুশনাবেসী* প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায়।[৮০] বর্তমানে এ সমস্ত কর্মের নির্দেশনাবলী বা মুদ্রিত গ্রন্থের আকারে উপমহাদেশের লাইব্রেরী সমূহে সংরক্ষিত আছে।[৮১]

২.৫ বাংলায় পরিবার কেন্দ্রিক ফারসি চর্চা

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ফারসি সাহিত্য চর্চায় ব্যক্তি ছাড়াও কিছু কিছু সাহিত্যমোদী পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য তন্মধ্যে ঢাকার খাজা পরিবার, ফরিদপুরের কাজী পরিবার এবং সিলেটের মজুমদার পরিবার অন্যতম।

২.৫.১ ঢাকার খাজা পরিবার

মূলতঃ ঢাকার খাজা পরিবারটি বাংলাদেশে এসেছিলো সুদূর কাশ্মীর থেকে। এ পরিবারের ইতিহাস জানা যায় *তারিখ-এ-কাশমীরিয়া-এ-ঢাকা* (تاریخ کشمریان داکا) ও *তওয়ারিখ-এ-খান্দান-এ-কাশমীরিয়া* (تواریخ خاندان کشمریه) শীর্ষক ফারসি গ্রন্থ থেকে। এ গ্রন্থদ্বয়ের কোনটিই প্রকাশিত হয়নি। এগুলোর একটি করে কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। খাজা পরিবারের পূর্ব পুরুষ

---

[৭৯] Shojakhani, M. and Rikhtehgaran, M.R, *Indo-Iranian Thought: A World Heritage* (Dilhi: 1995), pp. 5-6.

[৮০] আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ, 'খিদমাতে দানেশ মান্দানে শিবহে ক্বারেহ বেযাবানে আদাবিয়তে ফারসি', *মাজমুয়ায়ে সুখানরানীহায়ে নাখুস্তীনে সেমিনার পেইওয়াস্তেগীহায়ে ফারহাঙ্গীয়ে ইরান ও শিবহে ক্বারেহ* (ইসলামাবাদ: ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩), পৃ. ১৮৮-১৮৯।

[৮১] আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ, 'বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ ও অভিধান', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা-৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২ বাংলা, পৃ. ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

খাজা আবদুল হাকীম ছিলেন কাশ্মীরের শাসনকর্তা। কিন্তু দিল্লীর বাদশা মুহম্মদ শাহের (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি.) আদেশে তাঁর স্থলে অন্য একজন শাসনকর্তা অপ্রত্যাশিতভাবে কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হন। দেশবাসীর সহায়তায় খাজা আব্দুল হাকীম তাঁকে বলপূর্বক কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করেন। মুহম্মদ শাহ এ সাহসী বীরপূরুষের বীরত্বের কথা শুনে তাঁকে পত্রযোগে অভিনন্দিত করেন।[৮২] কিন্তু কয়েকদিন পর তিনি অপর একজন শাসনকর্তাকে কাশ্মীর অভিমুখে প্রেরন করেন। খাজা এ শাসনকর্তার আগমন-বার্তা শুনে ভাবলেন, বারবার শাসনকর্তাদের বেদখল করার মানে বাদশার সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে তিনি নিজ ভাই মারফত তাঁর আত্মীয় পরিজনকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন এবং নবনিযুক্ত শাসনকর্তা কাশ্মীরে পদার্পন করার পূর্ব মুহুর্তে তিনি নিজেও দিল্লীর পথে রওয়ানা হন।[৮৩] দীর্ঘদিন যাবত এ পরিবারটি দিল্লীতেই বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নাদির শাহ (জ. ১৬৮৮ খ্রি.) দিল্লী আক্রমন করলে তার গণহত্যা ও জোর জুলুমের ফলে দিল্লীর জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় খাজা আব্দুল হাকীম তাঁর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৮৪]

খাজা পরিবারের ফারসি কবি খাজা আবদুর রহীম সাবা (মৃ. ১৮৭৮ খ্রি.) তিনি ছিলেন তদানীন্তন বাংলার অন্যতম ফারসি ও উর্দূ কবি। তিনি খাজা পরিবারের ইতিবৃত্ত সম্বলিত *তারিখ-এ কাশমিরিয়া-এ-ঢাকা* (تاریخ کشمریان ڈاکا) শীর্ষক একটি ফারসি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৪ পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপি গ্রন্থে তিনি কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশে খাজা পরিবারের আগমনের বৃত্তান্ত, তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ, ধন-সম্পদ ও জমিদারি অর্জনের বিবরণ, পারস্পরিক কুটুম্বিতা, যুগানুক্রমে খান্দানের গুণ-গরিমা ও ধ্যান-ধারনণার রূপরেখা, খান্দানী আচার-অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।[৮৫] উল্লেখ্য এ গ্রন্থটি এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত। এটি প্রকাশিত হলে তদানীন্তন সময়ের ঢাকার অভিজাত পরিবার সমুহের রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যেত। আবদুর রহিম সাবা ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরন করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এ গ্রন্থটি ১৮৬৫-১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক সময় রচনা করেন। তাছাড়া খাজা পরিবারের ইতিহাস নিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ (১৮৪৫-১৯০১ খ্রি.) ফারসিতে *তাওয়ারিখ-এ-খান্দান-এ-কাশমিরিয়া* (تواریخ خاندان کشمریه) শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । এ গ্রন্থে তিনি খাজা আবদুর রহীম সাবার ফারসি-উর্দু গযল, ফারসি কাসীদা ও চিঠি পত্রের অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন। খাজা আহসানুল্লাহ শাহীন একজন স্বভাব কবি ছিলেন। দৈনন্দিন

---

[৮২] আব্দুর রহীম সাবা, 'তারীখে কাশ্মীরিয়ানে ঢাকা', অপ্রকাশিত বই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, পৃ. ৪-৫।

[৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

[৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।

[৮৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মাঝে মধ্যে শখ করে কবিতা রচনা করতেন। তার বেশির ভাগ কবিতা ছিল বন্ধুবান্ধবদের আসরে উপস্থিত প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত।[৮৬] তাঁর কবিতায় চিত্তবিনোদন, সফরের বিবরণ, শিকার ও খেলাধুলার রঙ্গ-রস আস্বাদন, এক কথায় আনন্দের দ্যোতনা, সুরের মূর্ছনা, উৎসবের জীবন্ত ও প্রানবন্ত প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর ফারসি কাব্য ছিল ফারসি ভাষাভাষী কবিদের ন্যায়। তা ছিল খুবই মাধুর্যমণ্ডিত।[৮৭] তাঁর রচিত কাব্যসমগ্র *কুল্লিয়াতে-এ-শাহীন* (کلیات شاهین) নামে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এর একটি কপি সংরক্ষিত আছে। তবে এর শীর্ষ পাতা ছেড়া থাকায় প্রকাশনার সাল-তারিখ এবং প্রেস ও প্রকাশকের নামধাম নির্ণয় করা যায় না। শাহীন নিজে যেমন গীত রচনা করতেন তেমনি গীত গাইতেনও। খাজা পরিবারের অন্যতম সদস্য খাজা হায়দার জান শায়েক (মৃ. ১৮৫২ খ্রি.) ছিলেন তৎকালীন সময়ে উর্দু ফারসি কবিদের মধ্যে অগ্রগামী কবি। তাঁর মির্যা গালিবের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল, গালিব তাকে তুতীয়ে বাঙ্গাল (طوطی بنگال) খেতাবে ভূষিত করেন।[৮৮] তাঁর ফারসি চিঠিপত্রের একটি সংকলন রয়েছে যা *ইনশা-এ-শায়ক* (انشاء شایق) নামে অভিহিত। এ পরিবারের অপর ফারসি কবি খাজা আসাদুল্লাহ কাওকাব (মৃ. ১৮৫৯ খ্রি.) তিনি একজন উঁচু মানের ফারসি কবি ছিলেন।[৮৯] তাঁর কবিতা কলকাতার দূরবীন পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তাঁর একটি সুবৃহৎ ফারসি *দীওয়ান* (دیوان) ও ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ঢাকার খাজা মুহাম্মদ আফযালের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে *দীওয়ানটি* সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তার হদীস এখন আর পাওয়া যায় না। খাজা আবদুল গাফ্ফার আখতার উর্দু, ফারসি উভয় ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। ফারসি চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি বিখ্যাত কবি আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) থেকে কবিতা সংশোধন করিয়ে নিতেন।[৯০] তিনি *কুল্লিয়াতে আখতার* (کلیات اختر) নামে একটি কাব্য সংকলন প্রস্তুত করেন। ছন্দ বিশারদ কবি খাজা মুহাম্মদ আফযাল (জ. ১৮৭৫ খ্রি.) তৎকালীন ঢাকা শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ তারীখ রচয়িতা বলে খ্যাত ছিলেন।[৯১] তিনি চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে ছোট-বড় ঘটনার ইতিহাস ফারসিতে আবজাদ (আরবী বর্ণমালার মান-নির্ণয় অক্ষরের বিন্যাস প্রণালী) অক্ষরের বিন্যাসে মুহূর্তের মধ্যে রচনা করে ফেলতেন। এরূপ তারীখ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে সব শে'র রচনা করেছেন, সেগুলো তিন খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া খাজা আহসানুল্লার মৃত্যু উপলক্ষে তিনি *গাম-এ-মাহ পায়কার* শীর্ষক

---

[৮৬] আহসান উল্লাহ, 'তাওয়ারীখ-এ-খান্দান-এ-কাশ্মীরিয়া', অপ্রকাশিত, উর্দূ গ্রন্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, পৃ. ৩৩৫।

[৮৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭।

[৮৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।

[৮৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

[৯০] সৈয়দ ইকবাল আযীম, *মাশরেকী বাঙ্গাল মে উর্দু* (ঢাকা: মাশরিক কো-অপারেটিভ পাবলিশার্স, ১৯৫৪), পৃ. ৫১।

[৯১] ড. মুহাম্মদ কলিম সাহসারামী, *খিদমাত গুযারানে ফারসি দার বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৯), পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ নির্ণয়কারী অপর একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। তাঁর একটি ফারসি *দীওয়ান* রয়েছে। তবে এগুলোর কোনটিই প্রকাশিত হয়নি। মুনশি রহমান আলী তায়েশ এ সব রচনার পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে এ সবের কোন হদীস পাওয়া যায় না। মুনশী রহমান আলী কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে আফযালের তারিখ নির্ণয়কারী শে'র এবং ফারসি *দীওয়ান* ও উর্দু *দীওয়ান* থেকে বেশ কিছু সংখ্যক গযল উদ্ধৃত করেছেন। তায়েশের *তাওয়ারিখ-এ-ঢাকা* গ্রন্থের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ ঢাকার উর্দু-ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্বলিত অংশটি খাজা আফযালের নির্দেশনা ও সহায়তায়ই সংযোজিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৯২] তার রচিত একটি ফারসি *দীওয়ান* (دیوان) ও ছিল।

২.৫.২ ফরিদপুরের কাজী পরিবার

কাজী পরিবারের অন্যতম সাহিত্যিক মহাপুরুষ কবি আবদুল গফুর নাস্‌সাখের *আত্মজীবন-চরিত* গ্রন্থের তথ্যানুসারে আলোচ্য বংশের আদিপুরুষ হলেন ইসলামের ইতিহাসের মহাবীর হযরত খালেদ ইবন ওলীদ (রা.)। এ খান্দানের অন্যতম পূর্বপুরুষ জ্ঞানী মৌলবী আবু আবদুল্লাহ কীরানীর (মৃ. ৫৪৮ হি.) বংশধর সুশিক্ষিত সাধক শাহ আইনুদ্দিন মুহম্মদ সিরিয়া থেকে হিজরত করে বাগদাদে এসে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের গভর্ণর শাহ আব্বাস কর্তৃক বাগদাদ বিজিত হলে তিনি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাগদাদ ছেড়ে ভারত আগমন করেছিলেন। তাঁর পুত্র মৌলভী আবদুর রসুল বাদশাহ শাহজাহানের রাজদরবারে প্রতিপত্তি অর্জন করেন এবং সম্রাটের সনদ-বলে বাংলার বার ভূঁইয়ার রাজ্য (ফরিদপুরে) ভূষণা চাকলার অন্তর্গত ফতেহাবাদ পরগণার কাজী পদ লাভ করেন। এখান থেকেই এ কাজী খান্দানের ফরিদপুরে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু।[৯৩]

কাজী পরিবারের কাজী ফকীর মুহম্মদ (১৭৭৪-১৮৪৪ খ্রি.) ফারসি ভাষায় বিভিন্ন প্রামান্য ইতিহাস গ্রন্থ অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্ব ইতিহাস সংক্রান্ত *জামিউত তাওয়ারীখ* (جامع التواریخ) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। ফকীর মুহম্মদ বিভিন্ন প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ অবলম্বনে সংক্ষিপ্তাকারে এ গ্রন্থে বিশ্ব-ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। ৪১০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার মুনশী ইরাদাতুল্লার মুদ্রণালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে নওয়াব আবদুল লতীফের নির্দেশে তাঁর ভূমিকাসহ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে লখনৌর নওয়াল কিশোর প্রেস থেকে। একই প্রেস থেকে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। এ সংস্করণের কলেবর ছিল ২৯৫ পৃষ্ঠা। *জামিউত তাওয়ারিখ* গ্রন্থের প্রধান প্রধান বিষয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন:

---

[৯২] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

[৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০-৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

জামিউত তাওয়ারিখ গ্রন্থের প্রধান প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে: মানব সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বে জিন জাতির আধিপত্য ও ফেরেশতাদের উপর ইবলিসের শ্রেষ্ঠত্বের ইতিহাস, পূর্ববর্তী নবীদের ইতিকথা, হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের বৃত্তান্ত, ইয়াজুজ-মাজুজ ও আসহাবে কাহাফ এর ইতিবৃত্ত, বনী ইস্রাঈল গোত্রীয় পাদরীদের ও প্রাক-ইসলাম যুগের দার্শনিকদের জীবনালেখ্য, প্রাচ্যের অনাগত জাতী ও পারস্য-সম্রাটদের ইতিহাস, নবীজীর জীবন-চরিত, তাঁর মুজিযা সমুহের বর্ণনা, তাঁর নির্মলা সহধর্মিণী ও আওলাদদের বিবরণ, আসহাবে ফীল সংক্রান্ত ঘটনার বৃত্তান্ত, কাফেরদের সাথে নবীজীর যুদ্ধ-বিগ্রহ, খেলাফতে রাশেদার বিবরণ, খেলাফত যুগের যুদ্ধ ও বিজয়াভিযান, হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর খেলাফত, চার ইমামের আলোচনা, বুনু উমাইয়া ও বনু-আব্বাসদের শাসনযুগ এবং সমকালীন অন্যান্য শাসনকর্তাদের কার্যাবলীর ওপর আলোকপাত, প্রাচ্য অঞ্চল ও তুরস্কের মহাপুরুষদের পরিচিতি, তৈমুর বংশীয় বাদশাদের রাজত্বকাল ও তাঁদের প্রতি মারাঠা জাতির আচরণ। অযোদ্ধা ও বাংলার নওয়াব এবং তথাকার নায়েব নাযিমদের প্রশাসনিক কার্যাবলী, ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুত্থান, বিশ্বের স্থলভাগের মানচিত্রাঙ্ক-প্রণালী এবং এই শিল্পের ক্রমবিকাশ, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভূ-খণ্ডের আঞ্চলিক বিভক্তি, বিভিন্ন দেশের আয়তন নির্ণয়, হিন্দু রাজত্বের অবসান ও মুসলিম শক্তির অভ্যুত্থান, ভারত-উপমহাদেশ ও আমেরিকায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির খতিয়ান ইত্যাদি।[৯৪]

এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট তথ্যসমুহের সূত্র বর্ণনা করে ফকীর মুহম্মদ এর ভূমিকায় বলেছেন তিনি *রওযাতুস সাফা* (روضه الصفا), *মাআরিজুন নবুওয়াত* (معارج النبوة), *আখলাকুল আরেফীন* (اخلاق العارفين), *তাফসীরে হোসাইনী* (تفسير حسينى), *তাযকিরায়ে হাফতে ইকলীম* (تذكرۂ هفت اقليم), *কুল্লিয়াতে খুলাফায়ে বনু উমাইয়া ওয়া খুলাফায়ে আব্বাসিয়া* (كليات خلافه بنى اميه و عباسيه خلافه),*তারীখে ফেরেশতা* (تاريخ فرشته), *তারীখে নাদেরী* (تاريخ نادرى), *লুব্বুস সিয়ার* (لب السير), *সিয়ারুল মুতাআখখিরীন* (سير المتأخرين), *আকবরনামা* (اكبر نامه), *খুলাসায়ে তারীখে হিন্দ* (خلاصه تاريخ هند), *মহাভারত* (مهابهارت), প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এটি রচনা করেন। ফারসি গদ্য রচনায় ছিল তার বিশেষ দক্ষতা। *খুলাসাতুন নুজুম* (خلاصت النجوم) শিরোনামে ফারসি ভাষায় তার অপর একটি গ্রন্থ রয়েছে। এ পরিবারের অপর ফারসিবিদ কাজী খান বাহাদুর আবু মুহাম্মদ আবদুল গফুর নাস্সাখ (১৮৩৩-১৮৮৯ খ্রি.) ছিলেন সাহিত্যিক-চরিতকার, সাহিত্য সংগ্রাহক ও সাহিত্য সংকলক। তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় কাব্য রচনা করতেন। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। নাস্সাখ ছিলেন কাজী ফকীর মুহম্মদের পুত্র। কৈশোর থেকেই তার কাব্যচর্চার ঝোঁক ছিল। অপর দিকে তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের ডেপুটি কালেক্টর। সে কারণে চাকরির প্রয়োজনে তাঁকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বদলি হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি যখন যেখানেই বদলি হয়ে যেতেন সেখানেই নিয়মিত কবিতার আসরের আয়োজন করতেন এবং সাহিত্যচর্চা করতেন। নাস্সাখ ছিলেন ছন্দের যাদুকর কবি ইকরাম আহমদ যায়গমের শিষ্য। এ দেশের ফারসি সাহিত্যে নাস্সাখের সবচাইতে বড় অবদান হচ্ছে ফারসি ভাষায় রচিত *তাযকিরাতুল মুআসিরীন* (تذكرة المعاصرين) গ্রন্থটি। এতে তিনি অভিধানের নিয়মানুসারে কবিদের

---

[৯৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫-৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যনামের বর্ণক্রমে সমসাময়িক ভারতীয় ফারসি কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রচনার প্রতিক-উদ্ধৃতি এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ফারসি 'আইন ' অক্ষর পর্যন্ত আসার পর আর অগ্রসর হতে পারেননি, মৃত্যু তাঁকে থামিয়ে দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর ২০৮ পৃষ্ঠার এ অসম্পূর্ণ গ্রন্থটি অসমাপ্ত অবস্থায়ই প্রকাশিত হয়। পূর্ববাংলার প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজন ফারসি কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁদের রচনার নমুনা এতে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় আর কোন গ্রন্থে তা নেই। যতদূর জানা যায়, তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী, যিনি সমকালীন বাংলার ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের জীবন ও কার্যাবলীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর এ আরাদ্ধ কাজ আজও কারো হাতে পূর্ণতা লাভ করেনি।

এছাড়া তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে *দাফতারে বেমাসাল* (دفتر بی مثال), *আশআরে নাস্‌সাখ* (اشعار نساخ), *সুখানে শুয়ারা* (سخن شعراء), *আরমুগান* (ارمغان), *ইনতিখাবে নাকস্‌* (إنتخاب نقش), *মারগুবে দিল* (مرغوب دل), *গাঞ্জে তাওয়ারীখ* (گنج تواریخ) , *কাঞ্জে তাওয়ারীখ* (كنج تواريخ) অন্যতম।[৯৫] নাস্‌সাখের পুত্র আবুল কাসেম মুহম্মদ শামস (জ. ১৮৬১ খ্রি.) ও ছিলেন ফারসি কবি।[৯৬] শামস রচিত ২০২পৃ. সম্বলিত কাব্য সংকলন *দীওয়ানে শামস* (ديوان شمس) তাঁর মৃত্যুর পনের বছর পর প্রকাশিত হয়।

কাজী পরিবারের বাইরে ফরিদপুরের সিরাজুদ্দীন সিরাজ ১৩৭ পৃষ্ঠার একখানি ফারসি কাব্যের *দীওয়ান* (ديوان) রচনা করেন। *দীওয়ানের* পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকীম হাবীবুর রহমান সংগ্রহশালায় রয়েছে। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে আছে দু'টি ফারসি কাসিদা[৯৭], চৌদ্দটি রুবাঈ[৯৮], সাতটি মুখাম্মাস।[৯৯]

২.৫.৩ সিলেটের মজুমদার পরিবার

এ দেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় সিলেটের মজুমদার পরিবার বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। এ পরিবারের ব্যাপক ফারসি সাহিত্য চর্চার অন্যতম কারণ হলো হুসাইন শাহ শরকী যখন জৌনপুরে দেশ

---

[৯৫] সৈয়দ ইকবাল আযীম, *মাশরেকী বাঙ্গাল মে উর্দু* (ঢাকাঃ মাশরিক কো-অপারেটিভ পাবলিশার্স, ১৯৫৪), পৃ. ৫৪-৫৮; ওফা রাশেদী, *বাঙ্গাল মে উর্দু* (হায়দারাবাদঃ ইশাআতে উর্দু প্রেস, ১৯৫৫), পৃ. ৪০-৪৫।

[৯৬] ওফা রাশেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

[৯৭] **কাসিদাঃ** এমন সব কবিতাকে কাসিদা বলা হয় যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা রাজা-বাদশাহর গুণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। [দ্র. অধ্যাপক মোহাম্মদ ময়েজউদ্দীন, *রাহনুমায়ে সুখান* (ঢাকাঃ কুরআন মনযিল, তা.বি.), পৃ. ৫১।]

[৯৮] **রুবাইঃ** চার চরণ বিশিষ্ট ও দুই শ্লোকের কবিতাকে রুবাই বলা হয়, যা একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ধরনের কবিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের একই অন্ত্যমিল থাকা আবশ্যক। কখনো কখনো চারটি চরণই একই অন্ত্যমিলের হয়ে থাকে। [দ্র.: অধ্যাপক মোহাম্মদ ময়েজউদ্দীন, *রাহনুমায়ে সুখান*, পৃ. ৫৭।]

[৯৯] **মোখাম্মাসঃ** যেসব কবিতা পাচটি পাঁচটি চরণ করে একেকটি স্তবকে লেখা হয়ে থাকে এবং প্রথম স্তবকের পাঁচটি চরণই একই অন্ত্যমিলের হয় আর অবশিষ্ট স্তবকগুলোর প্রত্যেক পাঁচটির অন্ত্যমিল প্রারম্ভিক চরণের অন্ত্যমিলের ন্যায় হবে এবং সম্পূর্ণ কবিতাটি একই মাত্রায় হবে। [দ্রষ্টব্যঃ অধ্যাপক মোহাম্মদ ময়েজউদ্দীন, *রাহনুমায়ে সুখান*, পৃ. ৬৩।]

Dhaka University Institutional Repository

শাসন করছিলেন, মজুমদার বংশের আদি পুরুষ সরওয়ার খাঁ তখন শাহজাদাদের শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন সিলেট নিবাসী ভবানন্দ রায় গুপ্তের পুত্র সর্বানন্দ গুপ্ত। জৌনপুরে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সরওয়ার খাঁ নাম ধারণ করেন এবং মুসলিম পত্নী গ্রহণ করেন।[১০০] হাজী এলাহ বখশ হামেদ মজুমদার (মৃ. ১৮৬০ খ্রি.) ছিলেন সিলেটের একজন জমিদার। তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় কাব্য রচনা করতেন। আব্দুল গফুর নাস্‌সাখ রচিত *তাজকেরাতুল মুআসেরীন* (تذکرة المعاصرین) গ্রন্থে উল্লেখিত তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে *তুহফাতুল মুহসিনীন* (تحفة المحسنین), *তুহফাতুল আহবাব* (تحفة الاحباب), *লুব্বুল আকায়েদ* (لب العقائد), *ফাওয়াইদুল মুমিনীন ফী আকাইদিল হাক্কে ওয়াল ইয়াকীন* (فوائد المؤمنين فى عقائد الحق و اليقين), *দীওয়ানে হামেদ* (ديوان حامد), *কিস্‌সায়ে সাম* (قصه سام), *বুরহানুল মুআহহিদীন* (برهان المؤحدين), *অসিয়তনামা* (وصيت نامه), *হুজ্জাতুল আখইয়ার ফী কাবাইহিল ফুয্যার* (حجت الاخيار فى قبائح الفجار), *বুরহানুল মুআহ্‌হিদীন ফী তারদীদিশ শুবহাতিল মুফসিদীন* (برهان الموحّدين فى ترديد الشبهت المفسدين) এবং *ফওযুল মুনা* (فوز المنا)।[১০১] তবে তাঁর একমাত্র *তুহফাতুল মুহসিনীন* (تحفۂ المحسنين) পুস্তিকাটি ছাড়া আর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। ৪৮ পৃষ্ঠা সংবলিত এ পুস্তিকাটি ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয়। সাঈদ বখত মজুমদার (১৮৩৪-১৮৭৮ খ্রি.) তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন; তবে তার কোন কাব্য সংকলন নেই *মাসাইলুল মাউতা* (مسائل الموتى) ও *মুখাল্লিসুল আকাঈদ* (مخلص العقائد) নামে তার দু'টি গ্রন্থ রয়েছে।[১০২] এ পরিবারের অন্যান্য কবি সাহিত্যিকরা হলেন হামীদ বখত মজুমদার (১৮৪০-১৮৮৯ খ্রি.), আশরাফ আলী মাসত মজুমদার (জ. ১৩৩৬ হি.)।

এ শতাব্দীতে উপর্যুক্ত তিন পরিবার ছাড়াও ফারসি সাহিত্য চর্চায় ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, খুলনা, পাবনা ও অন্যান্য স্থানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়।

খাজা পরিবারের বাহিরে ঢাকার অন্যান্য ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে নওয়াব নুসরত জঙ (মৃ. ১৮৮২ খ্রি.) ফারসি ভাষায় *তারিখ-এ-জাহাঙ্গীর নগর ওরফে ঢাকা* (تاریخ جهانگیر نگر عرف ڈاکا) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি পরবর্তীকালে ঢাকার ইতিহাসের মৌলিক আকর হিসেবে বিবেচিত হয়। এ গ্রন্থে মোগল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) থেকে আরম্ভ করে নওয়াব হাশমত জং (১৭৮৫-১৭৮৬ খ্রি.) পর্যন্ত ঢাকার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য। কারণ এতে এমন অনেক ঐতিহাসিক তথ্যাদি স্থান পেয়েছে, যা থেকে তদানীন্তন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ঢাকার

[১০০] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।
[১০১] সৈয়দ ইকবাল আযীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।
[১০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

হাফেয ইকরাম আহমদ যয়গম (মৃ. ১৮৬৯ খ্রি.) তদানিন্তন বাংলার উসতাযুল আসাতিযা ফারসি কবি ছিলেন। এ দেশের অনেক কবি সাহিত্যিক ছিল তাঁর শিষ্য। কিন্তু যে মহৎ কবির শিক্ষা লাভ করে বাংলার উর্দু-ফারসি কবিকূল সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর রচনাবলীর কোন অংশই অবশিষ্ট নেই। তাঁর প্রায় সব সাহিত্যকর্মই বিনষ্ট হয়ে গেছে। ঢাকার আহমদ আলী (১৮৩৯-১৮৭৩ খ্রি.) একজন ফারসি গদ্য সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি *মুওয়াইয়েদ-এ-বুরহান* (مؤید برهان) শীর্ষক একটি পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর তিনি *শামশীর-এ-তীযতার* (شمشیر تیزتر) শীর্ষক আরো একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ফারসি ভাষাতত্ত্ব ও অভিধানের বিবর্তন ধারা সম্পর্কিত এ দু'খানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এছাড়া তিনি ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি রুবাঈর ইতিহাস, সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও ফারসি রুবাঈর চব্বিশটি ছন্দ সম্পর্কিত *রিসালা-এ-তারানা* (رسالۂ ترانه) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফারসি ব্যকরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ *রিসালা-এ-ইশতেকাক* (رسالۂ اشتقاق) প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি *রিসালা-এ-মুখতাসারুল ইশতেকাক* (رسالۂ مختصر الاشتقاق) নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করেন।[১০৩] এছাড়া তিনি অনেক ফারসি সাহিত্য-পুস্তকের সম্পাদনা করেন। তার সর্বশেষ রচনা *মসনবী*সমুহের মূল্যবান ইতিহাস সম্বলিত কিতাব *হাফত আসমান* (هفت آسمان)। এছাড়া *তারীখ-এ-ঢাকা* (تاریخ ڈھاکا) নামে ঢাকার একটি প্রামাণ্য ইতিহাসও রচনা করেন। ঢাকার ওবায়দুল্লাহ ওবায়দী (১৮৩৪-১৮৮৫ খ্রি.) তিনি আরবী ফারসি উর্দু তিন ভাষায় উঁচু মানের কাব্যরচনা করেন।[১০৪] মূলত: তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ঢাকায় এসেছিলেন ইরান থেকে। ইরানের প্রখ্যাত সূফি ও *আওয়ারিফুল মাআরিফ* গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীই ছিলেন উবায়দীর পূর্ব পুরুষ।[১০৫] তিনি ৩০১ পৃষ্ঠার একটি ফারসি *দীওয়ান* রচনা করেন। এ ফারসি *দীওয়ানটি* ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বানিয়া পুকুরস্থ সিতারা-এ-হিন্দ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এতে আবু নসর গীলানীর ১৫পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা স্থান পেয়েছে। এ ভূমিকায় তিনি সংক্ষেপে উবায়দীর জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। উবায়দী আরবী, উর্দু, ফারসি ভাষার পাশাপশি বাংলা, সংস্কৃত, হিব্রু ল্যাটিন, গ্রীক এবং ইংরেজী ভাষাও ভালভাবে জানতেন। সেকারণে মূলগ্রন্থের পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু গ্রন্থের অনুবাদও করেন। রাজা রাম মোহন রায়ের *তুহফাতুল মুওয়াহহিদীন* (تحفـــة الموحدين) পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদে যেমন সাফল্যের পরিচয় দেন তেমনি তার উস্তাদ আবদুর রহীম দাহরী ইংরেজী কবি ও নাট্যকার জন গ্যে (John Gay [১০৬] যে উপকথা গ্রন্থের ফারসি পদ্যানুবাদ শুরু করে ছিলেন *মাশরিকুল আনওয়ার* (مشرق الانوار) *শিরোনামে* তিনি এর ফারসি অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তাঁর কাব্যচর্চার ফলে এদেশের ফারসি চর্চা অনেকটা প্রসার লাভ করে। তাঁর

---

[১০৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৫, ওফা রাশেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৫০।

[১০৪] সৈয়দ ইকবাল আযীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

[১০৫] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মওলানা ওবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ ১-২।

[১০৬] জন গ্যে (১৬৮৫-১৭৩২): ইংরেজ কবি, নাট্যকার ও গল্পকার।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলীর মধ্যে *দিওয়ানে ওবায়দী* (دیوان عبیدی), *গুলশানে দা'নেশ* (گلشن دانش), *দাসতুরে ফারসি অ'মুয* (دستور فارسی آموز) অন্যতম। উনিশ শতকের বাঙ্গালী ফারসি সাহিত্যিক সৈয়দ মাহমুদ আযাদ (জ. ১৮৪২/১৮৪৩ খ্রি.) বংশগত দিক থেকে ছিলেন ইরানী । তার প্রপিতামহ সৈয়দ মীর আশরাফ আলী ইরান থেকে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করে ছিলেন। সৈয়দ মাহমুদ আযাদ ছিলেন বৃটিশ সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। ছোটবেলা থেকেই কাব্যচর্চার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। বাংলাদেশের যে দুজন কবি গালিবের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন তারা হলেন সৈয়দ মাহমুদ আযাদ এবং হায়দারজান শায়েক। তাঁর সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের সাথে যদি তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এবং তার সৃজনশক্তি, শিল্পনৈপুণ্য, কল্পনার গভীরতা, ভাষার সাবলীলতা ও কাব্যের হৃদয়গ্রাহীতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় তবে তাকে উনিশ শতকের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি রূপে স্বীকৃতি দিতে হয়। আযাদ ১১২ পৃষ্ঠার একটি ফারসি *দীওয়ান* (دیوان) প্রণয়ন করেন। তার আরও অনেক অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। জমিদার কবি সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের তাবাতাবাই (মৃ. ১৯০৯ খ্রি.) মূলত ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভুত। বাকের ও তার পরিবারের মাতৃভাষা ছিল ফারসি। সে কারণেই ফারসি ভাষায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।[১০৭] *গাঞ্জীনা-এ-বাকের* (گنجینه باقر) নামে তার একটি ফারসি *দীওয়ান* রয়েছে। *দীওয়ান*টি কলকাতার হাবলুল মতীন প্রেস থেকে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৭৫ পৃষ্ঠার *দীওয়ান*টিতে *রুবাই, গযল, তারজীবান্দ, কাসীদা* সহ সব ধরনের কবিতা রয়েছে। গযলকবি রূপে ইরানের আধুনিক কবিদের সাথে বাকেরের তুলনা করা যায়। তাঁর বাড়ীতে নিয়মিত কবিতার মুশায়ারা হতো। এতে তিনি স্বরচিত *কাসীদা* ও *গযল* পাঠ করতেন। ঢাকার সৈয়দ ওয়াহীদ আলী খন্দকার ফারসি ভাষা ও ব্যাকরণে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত ফারসি পুস্তক *সিহ্হাতুল লুগাত* (صحت اللغات), ৩৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটিতে যে সব আরবী-ফারসি শব্দের উচ্চারণে সাধারণত লোকেরা ভুল করে থাকে সেগুলোর সঠিক উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে এবং ভুল উচ্চারণের ফলে শব্দের অর্থে যে তারতম্য ঘটে তাও নির্দেশ করা হয়েছে। *শাজারাতুল ইযাফত* (شجارة الاضافت), ৬পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটিতে ইযাফত বা সম্বন্ধ পদের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং ইযাফতের ফলে শব্দের মধ্যে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয় তাও তুলে ধরা হয়েছে। *রওযাতুল ইফাদাত* (روضة الافادات), এর ভাষা উর্দু । ৪পৃষ্ঠার পুস্তিকাটিতে উর্দু ও ফারসি শব্দের লিঙ্গ-পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। *মা'দানুল ফযীলত* (معدن الفضیلت) ৮পৃষ্ঠার এ ফারসি পুস্তিকাটিতে আরবী-ফারসি শব্দের সাথে উপসর্গ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং সর্বশেষ *বাহরুল ইবারত* (بحرالعبارت) নামে প্রকাশিত হয়।[১০৮] ৮পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটিতে বিশেষ একটি ভাবকে বিভিন্ন শব্দে কিভাবে প্রকাশ করা যায় বা উচ্চারণে হের-ফের করে বিশেষ একটি বাক্য থেকে কিভাবে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা যায় তা উদাহরণের মাধ্যমে

---

[১০৭] আহসান উল্লাহ, 'তাওয়ারীখ-এ-খান্দান-এ-কাশ্মীরিয়া', পৃ. ২০৬।

[১০৮] সৈয়দ ইকবাল আযীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে শেখ সা'দীর একটি কবিতার পংক্তিকে ২৪ আকারে পাঠ করে ২৪ প্রকারের অর্থের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই রচনাসমূহ পাঠ করলেই অনুমিত হয় যে, ফারসি ভাষায় সৈয়দ ওয়াহিদ আলীর পাণ্ডিত্ব কতটা গভীর ছিল। সুফী কবি শাহ বুরহানুল্লাহ কাদেরী (মৃ. ১৯১৪ খ্রি.) অসংখ্য ফারসি ও উর্দু হামদ-না'ত রচনা করেন। তার ফারসি গদ্য গ্রন্থ *বোরহানুল আরেফীন* (برهان العارفين) এবং ফারসি দীওয়ান *মাখযান-এ-হাকীকত* (مخزن حقيقت) শিরোনামে পরিচিত। কাদেরী *ফুয়ুযাত-এ-ওয়াজিদ* (فيوضات واجد) নামে আরও একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।[১০৯] বুরহানুল্লাহ কাদেরীও আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যথেষ্ঠ পরিমাণ গযল কাব্য সৃষ্টি করে বাংলার সূফী সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কাদেরীর *মাখযান-এ-হাকীকত* (مخزن حقيقت) শীর্ষক ফারসি *দীওয়ান* ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাতেই রচিত হয়। এটি দু'খণ্ডে কলকাতার হাদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ৩৬পৃষ্ঠা সংবলিত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং ৮৮ পৃষ্ঠা সংবলিত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি *ফুয়ুযাতে-এ-ওয়াজিদ* (فيوضات واجد) নামে আরো একটি ফারসি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। যা কলকাতার রিদওয়ানী প্রেস থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুও খোদাপ্রেম ও আধ্যাত্মিক চেতনা। তাঁর এসব গ্রন্থের কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ঢাকা জেলার আর একজন ফারসি লেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল করীম খাকী (জ. ১৮২৯ খ্রি.)। তিনি বাক্যালংকার ও ছন্দপ্রকরণ বিষয়ে *ফুয়াদুল কালিম* (فواد الكليم) শীর্ষক ১১৯ পৃষ্ঠার ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফারসি গ্রন্থ রচনা করেন। যা ১৪৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার উর্দু গাইড প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।*তানবিরুল কুলুব* (تنوير القلوب) নামে তার অপর একটি ফারসি গদ্যগ্রন্থ রয়েছে। যা ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় *রুমুযুল আখলাক* (رموز الاخلاق) নামে খাকীর অপর একটি গ্রন্থ। এটি মূলত *তানবিরুল কুলুব* (تنوير القلوب) গ্রন্থেরই সারসংক্ষেপ। তার অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে *দীওয়ান-ই-খাকী* (ديوان خاكى) ই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপুর্ণ।[১১০] ৪৩০ পৃষ্ঠার ফারসি দীওয়ানটিতে কাসীদা, মুসাদ্দাস, মুসাব্বা, মাসনবী, রুবাঈ ও কিতয়া সমুহ স্থান পেয়েছে। এ গুলোর সাহিত্যমান ইরানী কবিদের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। তার কাব্য পাঠে প্রতীয়মান হয় তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। সে সময়ের আরেক ফারসি কবি আসাদুয্যামান খান গরহর ছিলেন স্বনামধন্য প্রফেসর আদালত খানের পুত্র। তিনি ফারসি ও উর্দুতে কাব্য চর্চা করতেন। তিনি *তুহফা-এ-আউয়াল* (تحفۂ اول) শীর্ষক একখানি গযল গ্রন্থ রচনা করেন। ৪৪পৃষ্ঠার গ্রন্থটি ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার উসমানিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

---

[১০৯] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮।

[১১০] কে এম সাইফুল ইসলাম খাঁন ও তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, *আব্দুল করিম খাকি: জীবন ও সাহিত্য-প্রতিভা*, একবিংশ খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট জেলার ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে আবুল হুসাইন আবদুর রহমান যিয়া কাব্য রচনায় সিলেটের হাকীম আশরাফ আলী মাসত ও ঢাকার আব্দুল গাফ্ফার ওফার শিস্য ছিলেন। তিনি*সাইফুল আবরার আল মাসরূল ফুজ্জার* (سیف الابرار المسر الفجار) শীর্ষক ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্বলিত একখানি ফারসি গ্রন্থ রচনা করেন। ৬৮পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কানপুরের নিযামী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ফারসি ভাষার অধ্যাপক আবদুল মুনইম যওকী *তাসবীবুল বায়ান ফী শরহিদ দীওয়ান* (تصبیب البیان فی شرح الدیوان) শীর্ষক গ্রন্থখানি রচনা করেন। যা কানপুরের মুহাম্মদী প্রেস থেকে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । যওকী রচিত অপর দু'টি গ্রন্থ হলো *দাবিস্তানে দানেশ* ও *আবওয়াবুল মুয়াল্লালা* । সিলেট জেলার একজন খ্যাতিমান ফারসি কবি ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা তফয্যল আলী ফযলী দীর্ঘ বিশ পঁচিশ বছরের শিক্ষকতার জীবনে আরবী, উর্দু ও ফারসি ভাষায় ২৩টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এগুলোর বিষয়বস্তু ছিল হাদীস, ফিকাহ, সাহিত্য, মানতিক, আকায়েদ, তাসাউফ, নৈতিকতা, ভাষা ইত্যাদি সংক্রান্ত । তন্মধ্যে *শূবাতল ঈমান* (شبات الایمان), *নাজতুন নূহাত* (نجت النهات), *আইনুল হক* (عین الحق) বা *আইনায়ে হকনুমা* (آئینه حق نما), *গজলিয়াতে ফযলী* (غزلیات فضلی) এবং *আবকারুল আফকার* (ابکار الافکار) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১১১] এ জেলার হাজী নাযের মুহম্মদ আবদুল্লাহ আশোফতা, আবদুল মুনইম যওকী, আবদুল করীম, ইসমাঈল আলম, আবু নসর ওহীদ প্রমুখ ।

চট্টগ্রামের খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ (১৮০৯-১৮৭১ খ্রি.) ফারসিতে *আহাদীসুল খাওয়ানীন* (احادیث الخوانین), *তারীখে হামীদ* (تاریخ حمید), *আনওয়ারুন নাইয়েরাইন ফী আখবারিল খাইয়েরাইন* (انوار النایرین فی اخبار الخایرین) শীর্ষক বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (১৮২৫-১৮৮৬ খ্রি.) বাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষাভাষীদের ন্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ওয়াইসী ২০৮পৃষ্ঠার একটি ফারসি *দীওয়ান* (دیوان) রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ১২বছর পর তাঁর দৌহিত্র মৌলবী মীর হাসানের উদ্যোগে প্রথম বার ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার গাউসিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কাইউম মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ১৭৫টি গযল ২৩টি কাসিদা ও ৬টি বিবিধ কবিতা রয়েছে। গোটা দীওয়ানে ৩৩৪৭টি পংক্তি রয়েছে।[১১২] এগুলো সবই সূফী ভাবধারায় রচিত।

এ জেলার আবদুল আলী দুররী (জ. ১৮৪৫ খ্রি.) *সহীফাতুল আ'মাল ওয়া মিরআতুল আহওয়াল* (صحیفت الاعمال و مرئة الاحوال) শীর্ষক ২৭৬পৃষ্ঠার একটি ফারসি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি চারটি অধ্যায় বিভক্ত প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে

---

[১১১] কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ও মুহাম্মদ আব্দুস সবুর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০।

[১১২] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল আলী দুররীর আত্মজীবনীর বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর লোকদের রীতি নীতির বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদি বর্ণনার পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেনী পেশার বিশদ বর্ণনা রয়েছে তাছাড়া এ অধ্যায়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। *সহীফাতুল আ'মাল ওয়া মিরআতুল আহওয়াল* (صحیفت الاعمال و مرئة الاحوال) শীর্ষক ফারসি গ্রন্থটি মূলত তিনি তাঁর চার বছরের পুত্র আহমদ আযীযুর রহমানের উদ্দেশ্যেই রচনা করেন। চট্টগ্রামের আরেক জন ফারসি পণ্ডিত মুফতি ফয়যুল্লাহ (১৮৯২-১৯৭৬ খ্রি.) ফারসিতে বহু গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি কাব্যচর্চা করতেন। হাটহাজারী মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি *পান্দে ফায়েয* (پند فیض) নামে একটি ফারসি পুস্তিকা রচনা করেন। মুফতি ফয়যুল্লাহ ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে হাটহাজারী মাদরাসায় প্রায় ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি ফারসি গদ্যে ও পদ্যে বেশ কিছু পুস্তিকা রচনা করেন। তবে ধর্মীয় অনুষঙ্গই হচ্ছে তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে *কান্দ-এ-খাকী* (قند خاکی) *আল কালামুল ফাসেলু বাইনা আহলিলহক্বে ওয়াল বাতিল* (الکلام الفاصل بین اهل الحق و الباطل) অন্যতম।[১১৩] মুফতি ফয়যুল্লাহ খাঁটি বাঙ্গালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে যেভাবে ধর্মীয় ও নীতিমূলক বিষয়কে ফারসি গদ্য ও পদ্যাকারে সাবলীল ভাবে উপস্থাপন করেছেন নিঃসন্দেহে তা তাঁর বিরল কৃতিত্ব।

ময়মনসিংহ জেলার ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে গোলাম সরোয়ার, মোহাম্মদ নুর শাকের, বেলাল উদ্দীন আম্বার, সাইয়্যেদ নাযমুদ্দীন হুসাইন নাদের, মোহাম্মদ আবদুল হাই আখতার সিদ্দীকী, আবদুল করীম খান, হামীদ উদ্দীন আহমদ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবদুল হাই আখতার সিদ্দীকী (১৮৪১-১৯২০ খ্রি.) আরবী, ফারসি ও উর্দু ভাষায় ৫৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।[১১৪] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফারসি গ্রন্থ হচ্ছে *তাবসিরাতুল আতফাল* (تبصیرۂ الاطفال) ২৮ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটি মূলত তাঁর পুত্রকে ফারসি শিখানোর উদ্দেশ্যেই রচনা করেছিলেন। প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত এ গ্রন্থটি কলকাতার কালিমী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। আখতার সিদ্দীকী রচিত ২২ পৃষ্ঠার *মাসলাকুল আহনাফ ফী মাসায়েলিল ইতিকাফ* (مسلک الاحناف فی مسائل الاعتکاف) ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কানপুরের আহমদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় । ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এ গ্রন্থে তিনি হানাফী মাযহাবের আলোকে ইতেকাফের যাবতীয় বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। তার ফারসি পত্র সংকলনের নাম *নাসীমে সাহার রুকআতে পিদার ওয়া পিসার* (نسیم سحر رقعات پدر و پسر) নামে পরিচিত। ১১৪পৃষ্ঠার পত্র সংকলনটি কলকাতার সাঈদী প্রেস

---

[১১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১-৩০২।

[১১৪] সৈয়দ ইকবাল আযীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রকাশিত হয়। এ জেলার ফারসি শিক্ষক আবদুল করীম *গোলশানে ফযল* (گلشن فضل) শীর্ষক একটি ফারসি গ্রন্থ রচনা করেন।

কুমিল্লা জেলার ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে আবু মুঈন আয়ুদুদ্দীন মুহাম্মদ আয়ুদ, শাহ সৈয়দ রিয়াযাতুল্লাহ আওয়ায আল হুসাইনী, সমীরুদ্দীন আহমদ, সামুদ্দীন সামসাম, আশরাফুদ্দীন আশরাফ, মুহাম্মদ বাশারাতুল্লাহ বশীর, আবদুর রহমান সাঈদ, গোলাম নবী, হাফেয সাগীর আহমদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে সমীরুদ্দীন আহমদ ফারসি ভাষায় *গুলবানে আখতার* (گلبن اختر) নামে একটি চমৎকার প্রণয় উপাখ্যান রচনা করেন। ২৩৯পৃষ্ঠার প্রণয় উপাখ্যানটি ৩৬টি পৃথক গল্পে ৩৯৮৬টি শে'র এর সমন্বয়ে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে লখনৌর মুজতবাই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ।

নোয়াখালী জেলার নাসির উদ্দীন হায়দার সামী ছিলেন ইংরেজ শাসনামলের বাংলার একজন খ্যাতিমান ফারসি কবি। তিনি হযরত শাহ জালাল এর জীবনী সম্বলিত ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে *সুহায়েলে ইয়ামেন* (سهیل یمن) শীর্ষক একটি ফারসি গ্রন্থ রচনা করেন। ৫২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থ অনেকটা কিংবদন্তী নির্ভর। এ গ্রন্থে হযরত শাহ জালাল এর অনেক কারামতের বর্ণনা রয়েছে। ১৪৬১ খ্রিষ্টাব্দে এলাহ বখশ হামেদ মজুমদার *সুহায়েলে ইয়ামেন এর বাংলা অনুবাদ করেন।*

বরিশালের মুনশী মুহাম্মদ ফাযেল ফারসি ও উর্দু ভাষায় কাব্য চর্চা করতেন। *তিনি দীওয়ানে ফাযেল* (دیوان فاضل) নামে একটি ফারসি কাব্যের দীওয়ান রচনা করেন। ৬৩পৃষ্ঠার দীওয়ানটিতে ৫৩টি *গযল*, ২টি *কাসীদা*, ১১টি *মুখাম্মাস* এবং বর্ণনামূলক ১২টি *মাসনবী* সন্নিবেশিত হয়েছে। ফাযেল রচিত ৯৬পৃষ্ঠার *কানযুস সাআদাত* (کنز السعادت) তার নীতি বিষয়ক অপর একটি ফারসি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কানপুরের আহমদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি *মসনবীয়ে লতীফা* (مثنوی لطیفه) শীর্ষক একটি শিশুতোষ সাহিত্য গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।[১১৫] এটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার সাঈদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এভাবে ইংরেজ শাসনামলের দু'শ বছরের প্রথম শতাব্দী তথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাজভাষা থাকার বদৌলতে বঙ্গে ফারসি সাহিত্য চর্চা ও ফারসি গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ ব্যাপক পরিসরে চলতে থাকে।

২.৬ পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

বিশ শতকের গোড়া থেকেই একদিকে যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ফারসি চর্চার আগ্রহ ভাটা পড়তে থাকে। প্রশাসনের ভাষা হিসেবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ইংরেজী শিখা বাধ্যতামূলক হিসেবে মনে করতে থাকে। কারণ ইংরেজী না জানলে

---

[১১৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

কোন চাকরি বাকরি পাবার সুযোগ নেই। স্থানীয় ভাষা হিসেবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলার চর্চা বাড়তে থাকে পুরোদমে। আগে যেখানে ফারসি জানা ছিল আভিজাত্য এবং পাণ্ডিত্যের প্রতীক এখন সেখানে জায়গা করে নেয় ইংরেজী। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান হলেও এতদঞ্চলে ইংরেজদের চাপিয়ে দেয়া ইংরেজীর প্রভাবে বঙ্গে ফারসি সাহিত্য চর্চায় ভাটা পড়তে থাকে। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায় বেশ কিছু ব্যক্তি সীমিত পরিসরে ফারসি চর্চা ও ফারসি সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ করেন, তাদের মধ্যে শিক্ষাবিদ, বহুভাষাবিদ, গবেষক ও সাহিত্যিক শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১ খ্রি.) রচিত ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় '*Perso-Arabic Elements in Bengali*' শীর্ষক গ্রন্থ। হিলালী তার দীর্ঘ কর্মজীবনে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কয়েক হাজার আরবী ফারসি শব্দ চিহ্নিত করে এসব শব্দের পরিচিতি এবং বাংলা ভাষায় কোন কোন অর্থে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে তাও উল্লেখ করেন তিনি। হিলালী ফারসি ভাষায় প্রায় পঞ্চাশটি কাব্য রচনা করেছেন যা *জাম-ই-জাম* (جام جام) নামে নামকরণ করেছেন।[১১৬] তিনি *আশআরে তারান* (اشعار تران) নামে একটি ফারসি পুস্তিকা সম্পাদনা করেন; যাতে রাম তারণ মুখোপাধ্যায়ের ফারসি কবিতা রয়েছে।[১১৭] ইসলামি সাহিত্য, ভাষা ও অভিধান চর্চায় হিলালীর অবদান অনন্য ও অনস্বীকার্য। তাঁর রচনায় ইসলামী আদর্শ, ভাষাতত্ত্ব, অভিধানগত ব্যুৎপত্তি, ঐতিহাসিক তত্ত্বকথা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়।

ডক্টর আন্দালিব সা'দানী ভারতের মুরাদাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোট গল্পকার, সাহিত্য সমালোচক, গবেষক ও ঐতিহাসিক আলেখ্যকার সা'দানী ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়েই ফারসি ও উর্দুর শিক্ষকতায় কাটিয়েছেন। আন্দালীব সা'দানী ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা কবি, পণ্ডিত, গবেষক ও সমালোচক ছিলেন। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সমকক্ষ ছিলেন। সাদানী ছাত্র জীবনেই *নাক্বশে বাদী* (نقش بدی) শীর্ষক আধুনিক ফারসি শব্দাবলীর একটি ফারসি অভিধান গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। এ গ্রন্থটি ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। সা'দানীর সবচেয়ে উল্ল্যেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল *ওয়াজ্বেহায়ে ফারানসে দার ফারসিয়ে জাদীদ* (واژه های فرانسه در فارسی جدید) (আধুনিক ফারসিতে ফরাসী শব্দাবলী) শীর্ষক অভিধান গ্রন্থ।[১১৮] সাদানী হিজরী ষষ্ঠ শতকের ইরানের ইতিহাসের অন্যতম উৎস গ্রন্থ নিযামী আরুযী সামারকন্দী রচিত *চাহার মাকালাহ* (چهارمقاله) উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি নিয়মিত কাব্য চর্চা করতেন এবং ঢাকায় তাঁর বাসভবনে নিয়মিত 'মুশাআরা'র আসর বসতো, যাতে ঢাকার বিখ্যাত কবিরা কবিতা পাঠ করতেন।

---

[১১৬] ড. আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, ড. *গোলাম মাকসুদ হিলালী কর্মজীবন ও চিন্তাধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃ. ৩৮।

[১১৭] মোমেন চৌধুরী (সম্পা.), *মুহম্মদ মনসূর উদ্দীন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃ. ৪৮৫।

[১১৮] সৈয়দ ইকবাল আযীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

পাটনায় জন্মগ্রহণকারী মওলানা তামান্না এবাদী যিনি পরবর্তীকালে ঢাকার অধিবাসী হয়েছিলেন তিনি দীর্ঘ প্রায় ১২-১৩ বছর পাটনার হানাফী মাদ্রাসায় ফারসি ও আরবীর শিক্ষকতায় থাকা অবস্থায়ই নিয়মিত ফারসি ও উর্দু ভাষায় কাব্য রচনা করেন। আরবী, ফারসি ও উর্দু ভাষায় রচিত গদ্যে ও পদ্যে তাঁর একুশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও বাইশটি গ্রন্থ অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে।[১১৯] তাঁর একটি ফারসি *দীওয়ান* (دیوان) প্রকাশিত হয় যার মধ্যে দু'শ গযল ও তিনটি *মসনবী* রয়েছ। ঢাকায় তিনি বিভিন্ন মুশায়ারা বা কবিতা পাঠের আসরে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন।

ডক্টর মোয়াইদুল ইসলাম বোরাহ জন্মেছিলেন ভারতের আসামে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগের শিক্ষক। ফারসি ভাষায় বোরাহর কোন গ্রন্থ না থাকলেও ফারসি বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর বেশ কটি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে তিনি *বাহরিস্তানে গাইবি* (بهارستان غیبی) ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ভৌগলিক স্থানের নির্দেশনাসহ ডক্টর মোয়াইদুল ইসলাম বোরাহর ইংরেজী অনুবাদ খুবই মানসম্মত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে সর্বজন স্বীকৃত। প্রায় একহাজার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গ্রন্থটি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আসাম সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।[১২০]

449955

পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল বৃহত্তর ময়মনসিংহে কিশোরগঞ্জ জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি হুগলী মহসীন কলেজে ফারসি ও উর্দু বিষয়ে অধ্যাপনার সময়ই তাঁর *'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস'* গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে ইরানের সালজুকী যুগ থেকে তার সমকালীন যুগ পর্যন্ত ফারসি কবি-সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের রচনার পরিচিতি ও পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। ড. পালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে *'বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসি শব্দাবলী'*। এ গ্রন্থে বিভিন্ন গ্রন্থকার কে কিভাবে বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন ড. পাল তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ধ্বনি প্রকৃতিতে শব্দগুলো কি পরিবর্তন লাভ করেছে এবং আরবী ও ফারসি ভাষায় শব্দ গুলোর মৌলিক রুপ কি ছিল তাও তিনি দেখিয়েছেন। তবে কোন শব্দটি সর্ব প্রথম কে কি অর্থে ব্যবহার করেছেন, কালক্রমে সে শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য লাভ করেছে কিনা , এ ধরনের আবিষ্কার সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং কারো একার পক্ষে তা করাও সম্ভব নয়। সম্ভবত তাই তিনি কাজটি করতে পারেননি। *বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসি শব্দাবলী* প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্য পত্রিকা'য়[১২১] ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয় এবং পরে এ বিভাগের উদ্যোগেই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

---

[১১৯] কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ও মুহাম্মদ আব্দুস সবুর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭২।

[১২০] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৭ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৬৫।

[১২১] শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, "বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ সংকলন', *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৬৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; *প্রাগুক্ত*, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৯; *প্রাগুক্ত*, ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৬৯; *প্রাগুক্ত*, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৭০; *প্রাগুক্ত*, সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৭০; *প্রাগুক্ত*, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা

Dhaka University Institutional Repository

ইরানের সাতাশ[১২২] জন বিখ্যাত কবির জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ *ইরানের কবি* মুহম্মদ মনসূর উদ্দীনের (ফারসি বিষয়ে) অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে। ৫৬৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে সাতাশ জন ইরানী কবির জীবনী ও তাদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। মুহম্মদ মনসূর উদ্দীন রচিত *ইরানের কবি* গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে প্রচুর পরিমাণে ফারসি কবিতার উপস্থাপন। *অধ্যাপক ব্রাউন ও পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস* শীর্ষক একটি সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১২৩]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর সাহিত্য জীবন ছাত্রাবস্থায় শুরু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন পারস্য-সাহিত্য এবং পারস্যের বিভিন্ন কবি সম্পর্কে তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ *মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* এবং *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধগুলো পরবর্তীতে *পারস্য-প্রতিভা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১২৪] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ *সওগাত* পত্রিকায় লিখতেন দার্শনিক প্রবন্ধ আর *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় লিখতেন শেখ সা'দী, ওমর খাইয়াম প্রমুখ ফারসি কবি সাহিত্যিকদের জীবনী ও কাব্যালোচনা।[১২৫] ফারসি ভাষায় বিশেষ দক্ষতার অধিকারী বরকতুল্লাহ সহজ সাবলীল বাংলা গদ্যে পারস্য কবিদের কবিতাকে স্বার্থকভাবে পাঠক সাধারনের বোধগম্যতায় এনেছিলেন। এ বিষয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বক্তব্যটি স্মর্তব্য:

> পারস্য বা ইরানের সাহিত্যের সাথে কখনো আমাদের দেশের সাহিত্যমনাদের কোন পরিচয় ছিলনা, এ-কথা সত্য নয়। মুসলমান শাসন-আমলে ফারসি সাহিত্যের সাথে এদেশের বিদগ্ধজনদের পরিচয় সুনিবিড় ছিল; কিন্তু পরবর্তী বৃটিশ আমলে তা একেবারে ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইউরোপীয়, বিশেষ করে, ইংরেজী সাহিত্যের সাথে আমাদের পরিচয় খুব ঘন হয়ে ওঠে। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ফারসী সাহিত্যের সাথে আমাদের পরিচিতির সেই ছিন্ন সূত্র জোড়া লাগাবার ভার নিয়ে এই 'পারস্য-প্রতিভা' রচনা করেন এবং স্বার্থকভাবেই ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি-প্রতিভাসমুহের পরিচয় আমাদের চোখে তুলে ধরেন।[১২৬]

১৩৭১; *প্রাগুক্ত*, অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৭১; *প্রাগুক্ত*, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৭২; *প্রাগুক্ত*, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৭২।

[১২২] অন্ধ কবি রুদাকী, ফেরদৌসীর অগ্রদূত কবি দাকিকী, আনসারী, ফররোখী, ফেরদৌসী, সুফি কবি আবু সাইদ ইবন আবিল খয়ের, মনুচেহেরী, নাসির খসরু, ওমর খৈয়াম, আনোয়ারী, কামাল ইসমাইল, খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার, ইরাকী, শেখ সাদী, মাওলানা জালালউদ্দনি রুমী, নেজামী, আমির খসরু, সালমান সাওজী, শামসুদ্দীন হাফিজ, জামী, ফৈজী, উরফী, মির্জা সায়েব, আমীর খসরু, তালেব আমুলী, নজিরী, কা'নী, বাবা ফেগানী, পারস্য কবি আসাদী তুসী, ইবনে ইয়ামীন, আবু তালেব কলিম, ওবায়েদ ই জাকানী, ইমামী, আওহাদুদ্দীন, জহীর ফারইয়াবী, আওহাদী মারাঘী, খাকানী, খাজু কিরমানী, কামাল খুজন্দী, মাগরিবী, কাতিবী, কাসিমুল আনোয়ার, শাহ নিয়ামতুল্লাহ, মাজদুদ্দীন হামগর, সুফি কবি হাকিম সানায়ী।

[১২৩] মোমেন চৌধুরী, *জীবনী গ্রন্থমালা* ১৬ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৪১।

[১২৪] গোলাম সাকলাম সাকলায়েন, *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১০; মুহম্মাদ আব্দুল কাইউম, *বরকতুল্লাহ রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৩৮৬।

[১২৫] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, 'জীবন স্মৃতি', অপ্রকাশিত বই।

[১২৬] মোহম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে যাঁরা সীমিত আকারে ফারসি চর্চা অব্যাহত রেখে ছিলেন তাদের মধ্যে আবুল মোকাররম সলিমুল্লাহ ফাহমী, ড. খাজা মঈনুদ্দীন, জামিল ইব্রাহীম আলী, হাজী মোহাম্মদ হোসাইন, হুরমুযুল্লাহ শায়দা (জ. ১৯০৩ খ্রি.), মালেক রিয়াযুদ্দীন হায়দার, মাওলানা ফযলুল্লাহ ফযল (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.), প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২.৭ স্বাধীনতা উত্তরকালে ফারসি চর্চা

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ তদানিন্তন পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। মূলত পাকিস্তান সরকারের সাথে বাঙ্গালীর লড়াই শুরু হয়েছিল সেই '৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পর থেকেই। স্বাধীনতা উত্তর কালে পাকিস্তান সরকার যখন একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে তখন থেকেই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে, বিশেষ করে ভাষার অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী। পরবর্তীতে ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। যেহেতু দ্বন্দ্বটা শুরু হয়েছিল ভাষাকে কেন্দ্র করে এবং প্রতিপক্ষ ভাষা ছিল উর্দু। আর উনিশ ও বিশ শতকে বাংলায় উর্দু ফারসি চর্চার সম্পর্ক ছিল যমজের মত, যারাই উর্দু চর্চা করতেন তারাই ফারসি চর্চা করতেন। তাই স্বাধীনতা উত্তর কালে প্রথম দিকে স্বাধীন বাংলাদেশে ফারসি চর্চার ইতিহাস খুব একটা দেখা যায়নি। স্বাধীনতা উত্তর কালে ফারসি ভাষায় যতটা ফারসি চর্চা হয়েছে তার চেয়ে বাংলা ভাষায় ফারসি চর্চা হয়েছে বেশি যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলাদেশ ফারসি সাহিত্য চর্চায় যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে মনির উদ্দিন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭ খ্রি.), আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ, কালীম সাহসারামী (১৯৩০-২০০৭ খ্রি.), আব্দুল করিম, আব্দুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০ খ্রি.), ড. আবেদা হাফিজ, ড. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ (১৯৩২-২০০৮ খ্রি.) ড. উম্মে সালমা (১৯৪৭-২০০৮ খ্রি.) ড. কুলসুম আবুল বাশার (১৯৪৭-) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হল:

মনির উদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭ খ্রি.)

মনির উদ্দীন ইউসুফ ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জ জেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মিসবাহ উদ্দীন আহমদ ছিলেন আরবী, ফারসি ও উর্দু ভাষার সুপণ্ডিত। পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে ছোট বেলা থেকেই তিনি শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে উর্দু-ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর *মসনবী*র বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ রুমীর *মসনবী*তে তাঁর পাণ্ডিত্যের নির্দশন পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ওসমানিয়া বুক ডিপোর মালিক নূরুল ইসলাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে 'মাসিক পূবালী'তে ধারাবাহিকভাবে *রুমীর মসনবী* প্রকাশিত হয়।[১২৭] ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত *রুমীর মাসনবীর* বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে *রুমীর মসনবী* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখেন ড. এনামুল হক। তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে ড. এনামুল হক বলেন:

> "বাংলা-ভাষায় মসনবী-শরীফ-এর ভাল মন্দ অথবা উদাসীন প্রকৃতির কোন ভাষ্যই আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। এই দিক হইতে বিচার করিলে জনাব মনির উদ্দীন ইউসুফ সাহেবের রুমীর মসনবী বাংলা সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইবে, কেননা 'মসনবী'র ভাষ্য-রচনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম, অবশ্য ইহা সমগ্র 'মসনবী'র ভাষ্য নহে। আংশিক হইলেও 'মসনবী'র সম্পূর্ণটিই ইহাতে 'গোস্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ'এর মতো প্রতিফলিত হইয়াছে। যিনি এই ক্ষুদ্র ২২৩ পৃষ্ঠার ভাষ্য আয়ত্ত করিতে পারিবেন, তিনি সমগ্র 'মসনবী' অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন; আমি তাঁহাকে এই আশ্বাস নিঃসঙ্কোচে দিতে পারি।
>
> বলিতে কি, ফারসী ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা এদেশ হইতে একরূপ লোপ পাইয়াছে। ইহার সহিত এ-দেশের ঘনিষ্ট সংযোগ আর কখনও স্থাপিত হয় কিনা বলা যায় না। তাই আজ সৌন্দর্য, মাধুর্য ও হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইতে আমরা একরূপ বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। এমন অবস্থায়, জনাব মনিরউদ্দীন ইউসুফ সাহেব 'মসনবী-শরীফ'এর আলোচ্য ভাষ্যটি রচনা করিয়া ফারসি সাহিত্যের যে অজ্ঞাত দিকটির সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলেন, তাহার সহিত আর কোনদিন আমরা পরিচিত হইতে পারিতাম কিনা, সন্দেহ। অধিকন্তু, ফারসি সাহিত্য-চর্চা হারাইয়া ফেলিয়া আমরা যে সৌন্দর্য, মাধুর্য ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম ইউসুফ সাহেবের গ্রন্থটি যথেষ্ট ক্ষীণভাবে হইলেও আমাদের সহিত এই বৃত্তিগুলির সংযোগ করিয়া দিয়াছে। এইজন্য সংস্কৃতি সেবিরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"[১২৮]

আল মুজাহিদী বলেন:

> "পৃথিবীর এক একটি ভাষা এক একটি জাতির আত্মঅর্জন পরিচিতি বহন করে। ভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে মনিরউদ্দীন ইউসুফ সে মহৎ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। রুমীর মসনবীর ভাষ্য আলোচনা করতে গিয়ে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ফারসি সাহিত্যের বিশাল সরোবর রোমন্থন করেছেন। রুমীর মসনবী একটি মহা বৈপ্লবিক গ্রন্থ। মসনবীর মধ্য দিয়ে মওলানা জালালুউদ্দীন রুমী সুগভীর হৃদয় ধর্মিতা প্রবর্তন করেন। যে মর্মবাদী ধারণা ও চৈতন্য কবি ইউসুফকে প্রভাবিত করে, সে প্রভাবটা ধারণ করেছিলো তাঁকে আমৃত্যু। মসনবীর মর্যাদা এতোটা সুগভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে যে এই উপমহাদেশের মানুষ একে 'মসনবী শরীফ' বলে থাকে। প্রকৃত পক্ষেই মসনবী প্রেম ধর্মের অন্তঃসলিলা। যেন এক অতলান্ত সমুদ্র। রুমীর মসনবীর আলোচনা ও ফেরদৌসীর শাহনামার অনুবাদ মনিরউদ্দীন ইউসুফের অনন্য অবদান।"[১২৯]

---

[১২৭] আবদুল হাই শিকদার, *মনিরউদ্দীন ইউসুফ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৪৬।

[১২৮] বেলাল চৌধুরী (সম্পা.), *মনিরউদ্দীন ইউসুফ সংকলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।

[১২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৮৪ খ্রি.)

আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর বর্তমান পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার রায়না থানার বামুনিয়া গ্রামে আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন।[১৩০] তাঁর পিতা মৌলভী আবদুল লতিফ ছিলেন বর্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক। পিতামহ মুহম্মদ মিয়া ছিলেন আরবী ফারসির অধ্যাপক। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হুগলী কলেজ থেকে ইতিহাস শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে হবিবুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'লিটন স্মৃতি' বৃত্তি নিয়ে ইতিহাস শাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদানের মধ্যদিয়ে হবিবুল্লাহ কর্মজীবন শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ, এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। হবিবুল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে শেষ দিকে তিনি নাফিল্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশীপ নিয়ে ইংল্যান্ডে যান এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এক বছর ইরানী চিত্রকলার উপর গবেষণা করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার হবিবুল্লাহকে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে চাকুরিচ্যুত করে। চাকুরিচ্যুতির পর তিনি উলফসন ফেলোশীপ নিয়ে সপরিবারে লন্ডন চলে যান। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর তিনি তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর আমন্ত্রণে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুন তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৩১]

মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দীন কর্তৃক ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় রচিত *শিগার্ফনামা এ বিলায়েত* গ্রন্থটি আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ *বিলায়েতনামা* শিরোনামে বঙ্গনুবাদ করেন। অনূদিত *বিলায়েতনামা* গ্রন্থটি

---

[১৩০] রতনলাল চক্রবর্ত্তী, *আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৯।

[১৩১] নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ২৬৪-২৬৬; সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৫১-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

'মুক্তধারা' প্রকাশনী, ঢাকা থেকে জুন ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১৩২] যা ফারসি ভাষায় আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহর অনন্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত। মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দিন ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বক্সার যুদ্ধের পরবর্তী বছর ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে মোগল সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি তিন বছর সেখানে অবস্থান করে পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন। এটা বলাই বাহুল্য যে, *বিলায়েত নামা* গ্রন্থটি ব্রিটেন ও ভারত সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য দলিল।

ড. কালিম সাহ্সারামি (১৯৩০-২০০৬ খ্রি.)

বাংলাদেশে ফারসি ও উর্দু ভাষার একজন বড় মনীষী ড. কালিম সাহ্সারামী তিনি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের বিহার প্রদেশে সাহ্সারামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উর্দু বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সের পাশাপাশি ফারসিতেও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি. লিট প্রাপ্ত হন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগে ফারসি ও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[১৩৩] তাঁর অসংখ্য সাহিত্যকর্ম ও প্রবন্ধ প্রসিদ্ধি পেয়েছে। তাঁর প্রকাশিত কিছু সাহিত্যকর্ম নিম্নরূপ:

- বিমারে বুলবুল
- রেওয়ায়েত ও দেরায়েত
- গা'লেব শেনা'সী দর বাঙ্গাল
- তাসাওফ দর বাঙ্গাল
- ফারহঙ্গে হেলালী
- খিদমাত গুযা'রা'নে ফারসি দর বাংলাদেশ

আবদুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০ খ্রি.)

আবদুস সাত্তার ছিলেন একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ভাষাবিদ, শিশু–সাহিত্যিক, সম্পাদক, স্মৃতিকথক, কলামিস্ট এবং অনুবাদক। তিনি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানার গোলারা গ্রামে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মক্তবে তিনি আরবী-ফারসি শিক্ষার ভিত রচনা করেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে জুনিয়র মাদরাসা ও ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আই.এ, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে বি. এ পাশ করেন। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে আবদুস সাত্তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজস্ব বিভাগে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।[১৩৪] গবেষক আবদুস সাত্তারের ফারসি চর্চার অন্যান্য নিদর্শন গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

---

[১৩২] আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ, *বিলায়েতনামা* (ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৮১), পৃ. ২।
[১৩৩] প্রফেসর কলিম সাহসারামী, *রেওয়াত ও দেরায়েত* (পাটনা: নুক্কাদ পাবলিশার, ১৯৯১), পৃ. কভার পৃষ্ঠা।
[১৩৪] মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, *জীবনী গ্রন্থমালা আবদুস সাত্তার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, ফারসী সাহিত্যে লৌকিক উপাদান, আলোকের সন্ধানে শেখ সা'দী, মওলানা রুমী, মসনবীর গল্প, শেখ সা'দীর গল্প ইত্যাদি। শিশু কিশোরদের জন্য তিনি আরবী-ফারসি-তুর্কী রূপকথা উপহার দিয়ে আরবী-ফারসি-তুর্কী ভাষা-সাহিত্যকে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

ড. আবিদা হাফিজ

ডক্টর আবিদা হাফিজ ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বৃত্তি লাভের পাশাপাশি ইংরেজী ভাষায় *কাবুস নামা* গ্রন্থ অনুবাদ শুরু করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল 'ইংরেজী ভাষায় শাহ্ সূজার ইতিহাস সংকলন'। এছাড়াও ডক্টর আবিদা হাফিজের সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে *ফারসি উচ্চারণে বাংলা-ফারসি অভিধান*-যা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্ম এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

ড. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ (১৯৩২-২০০৮ খ্রি.)

তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান উর্দু-বাংলা সাহিত্যিক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক, গবেষকদের পথপ্রদর্শক কীর্তিমান একজন আদর্শ শিক্ষক। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা ও মসি চালনা করেছেন। তিনি উর্দু সাহিত্যের একজন শিক্ষক; কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চা ও গবেষণার এলাকা ইতিহাস, রাজনীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি একাধারে বাংলা, উর্দু, ইংরেজী, ফারসি ও আরবী ভাষায় দক্ষতার অধিকারী। উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি পুস্তক রচনা করেছেন। গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সুধী মহলের স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেছেন।

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে তদানীন্তন যুক্ত বাংলায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। চট্টগ্রাম আই. আই. কলেজ (বর্তমানে হাজী মুহসিন কলেজ) থেকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান পেয়ে আই.এ. পাস করেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি উর্দু বিষয়ে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একই বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে এম.এ. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে তিনি যথাক্রমে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগ হতে লাভ করেন প্রথম শ্রেণীর আরো দু'টি এম.এ. ডিগ্রি । বিদগ্ধ গবেষক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা' বিষয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখে এম.ফিল. এবং ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য' শীর্ষক গবেষণা থিসিস রচনা করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাশেষে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর নিজ এলাকার মান্দারী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। পর্যায়ক্রমে সিলেট সরকারী মাদ্রাসা, রাজশাহী সরকারী কলেজ, ঢাকা সরকারী কলেজ ও সরকারী বি. এম. কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিশ বছর শিক্ষকতার পর ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বিভাগের স্বার্থে সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক, খণ্ডকালীন শিক্ষক রূপে নিয়োজিত থাকা সহ তিনি এ বিভাগে মোট ছত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেন ।

গবেষণাই প্রফেসর আবদুল্লাহর জীবনব্রত। গবেষণার পাশাপাশি তাঁর অনুবাদ কাজও চলেছিল সমতালে। তিনি একজন দক্ষ অনুবাদকও বটে। তাঁর অনুবাদের ভাষা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁর অনুবাদে রয়েছে সাবলীলতা ও গতিশীলতা। অনেক সময় তাঁর অনুবাদগুলো অনুবাদ বলে মনে হয় না; সেগুলো মৌলিক রচনা বলেই পাঠকদের ধারণা হয়। রচনা-তালিকায় লক্ষ্য করা যাবে, তিনি মোট চৌত্রিশটি বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[১৩৫]

---

[১৩৫] *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০; *হাকীম হাবীবুর রহমান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮১; *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২; *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৩; *মওলানা ওবায়দুলাহ সুহ্‌রাওয়ার্দী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৪; *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৬; *নওয়াব সলিমুলাহ্*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৬; *নওয়াব আলী চৌধুরী: জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা , ১৯৮৭; *মওলানা মুহম্মদ আলী জওহর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭; *নওয়াব স্যার সৈয়্যদ শামসুল হুদা*, ব্র্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৭; *স্যার আব্দুর রহিম: জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯০; *বাংলাদেশের দশ দিশারী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯০; *ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯১; *মওলানা ওবায়দুলাহ সিন্ধী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯২; *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য*, ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪; *মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৫; *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৫; *বাংলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬; মুসলিম (সম্পা.), *বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫; *নওয়াব আবদুল গনী ও নওয়াব আহসানুল্লাহ: জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ১৮৩, ১৯৯৮; *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০; *মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫; *ইকবাল ও নজরুল কাব্যে ভাবধারা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৩; *হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.): জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৫; *নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫; *ইকবাল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা*, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০৬; *আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম*, ঝিঙ্গেফুল। দ্র.: রশিদ আহমদ, 'ডক্টর

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন[১৩৬] সাময়িকীতে শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আবদুল হাকীম ক্যানটব সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ (খণ্ড ৪, ঢাকা: ১৯৭১-৭৫) তিন শতাধিক ছোট-বড় প্রবন্ধ এবং আবদুল হক ফরীদী সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা, ১৯৮২-৮৫) ৮/১০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অনন্যসাধারণ গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে 'ইব্রাহীম স্মারক স্বর্ণপদক'-এ ভূষিত করেন।

ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ফারসি ভাষায় যেসব সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং ফারসি ভাষায় যে পরিমাণ চর্চা হয়েছিল, তা কোনো লেখকই স্পর্শ করেননি। প্রফেসর আবদুল্লাহই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের ফারসি সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করে *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* নামে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে অনেক তথ্য ও ঘটনার সন্নিবেশ ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক মফিজুল্লাহ্ কবীর বইটি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন:

> বইটিতে আমাদের ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যের নির্দেশ এবং অনেক জানা ঘটনা ও মতবাদের সমর্থনে নতুন তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে। ... আবদুল্লাহ্ সাহেব এ গ্রন্থটি লিখে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।[১৩৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু-ফারসি বিভাগের প্রাক্তন ইরানী ভিজিটিং প্রফেসর মোরতেযা সাররাফ বইটি সর্ম্পকে বলেন:

> ÒIn fine, I feel pleasure to say that I have enjoyed much while reading the Persian texts of the book and I hope that scholars as well as general readers will obtain new facts and information for their research when the manuscript comes out in printed form.[১৩৮]

ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফারসি কবি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে *'পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য'* শিরোনামে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন; যা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ওয়াকিল আহমদ এ গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন:

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ: ইসলামী রেনেসাঁয় তাঁর অবদান', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ১, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ১৩০-১৩২।

[১৩৬] *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা; Journal of The Asiatic Society of Bangladesh*, Dhaka; *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা; মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা; *মাসিক সওগাত*, ঢাকা; *মাসিক মদীনা*, ঢাকা; *মাসিক সাইয়্যারা*, লাহোর; *মাসিক ফারান করাচী; মাসিক সাকী*, করাচী; *মাসিক মাহে নও*, করাচী। দ্র.: রশিদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-১৩৮।

[১৩৭] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), অভিমত অংশ।

[১৩৮] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

আঠার ও উনিশ শতকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য আমাদের জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করে, তা কারো অজানা নেই। তবে এ প্রভাবের পরিমাণ ও গভীরতা আমাদের অজানা থেকে গেছে। বর্তমানে ভাষা-জ্ঞানের অভাবে বিষয়টি ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থে সর্বমোট ৬৩ জন ফারসি ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনা আছে।....অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ শ্রম স্বীকার করে নিষ্ঠার সঙ্গে এ ধারার গবেষণা করেছেন এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমিক প্রবীণ গবেষককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং তাঁর গ্রন্থের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।[১৩৯]

ড. কুলসুম আবুল বাশার (১৯৪৭-)

ড. কুলসুম আবুল বাশার ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মুম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ (বাংলাদেশের) নোয়াখালীর অধিবাসী ছিলেন। প্রাথমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত মুম্বাইতেই তিনি পড়াশোনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে উর্দুতে এবং ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ফারসিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল "ড. আন্দালিব শাদানী ও তাঁর সাহিত্যকর্ম"-যা গ্রন্থ আকারে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। ড. কুলসুম আবুল বাশার রচিত তাঁর গবেষণামূলক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধসমহের মধ্যে রয়েছে :

- শেখ সা'দী ও তাঁর গুলিস্তান
- শেখ সা'দীর জীবনী ও তাঁর গুলিস্তান
- মুসলিম বাঙ্গালমে ফারসি যবা'ন ও আদব
- বাঙ্গাল কী ফারসি, উর্দু আওর আরবী তাসানীফ কী ফেহেরস্ত
- বাংলাদেশ কী সিয়াসী সমাজী আওর আদাবী পাসমানযার মে ফারসি আদব কা ইরতেক্বা
- হাফিজ শিনাসী দর বাংলাদেশ
- ড. আন্দালীব সাদানী আওর উনকী গযল
- সাহমে খা'জেগা'নে ঢাকা দর আদাবিয়্যাতে ফারসি
- পেইওয়ান্দহায়ে মাওজুদ দরমিয়ানে দু যবা'ন ফারসি ও বাঙ্গালী
- তরজমাহ ও মাতূনে ফারসি দর যবা'নে বাঙ্গালী
- আত্তার ও আসারে উ দর বাঙ্গাল

---

[১৩৯] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪), অভিমত অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

- পেইওয়ান্দে যবা'নে ফারসি বা বাঙ্গালী
- তাহাওয়ুলাত ও রুশদে যবা' ন ও আদাবিয়্যাতে ফারসি দর বাংলাদেশ
- বাংলা ভাষায় অনূদিত ফারসি গ্রন্থ সম্ভার
- ড. আন্দালীব সাদানী দর ইরান ও বাংলাদেশ
- আদাবিয়্যাতে ফারসি দর বাংলাদেশ
- মাসনুভিয়াতে আমীর খসরু

ড. উম্মে সালমা (১৯৪৭-২০০৮ খ্রি.)

ড. উম্মে সালমা ২ জুন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মফস্বল শহর ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা পাকিস্তানে সমাপ্ত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারসি সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রির অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল "বাংলাদেশে ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি (বিশেষত: উনিশ শতক)"। এছাড়াও তাঁর উর্দু, ফারসি ও ইংরেজী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ রয়েছে-যার অধিকাংশই বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্যের চর্চা সম্পর্কিত বিষয়ে রচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী নিম্নরূপ:

- মৌলভী আব্দুর রহিম গৌরখপুরির সাহিত্যকর্ম ও চিন্তা-দর্শন
- ঢাকায় ফারসি সাহিত্যের সোনালী যুগ
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষার প্রভাব
- আবুল বারকাত, মুনির লাহোরী ও তাঁর মাসনভীতে বাংলার গুনগান
- বাংলায় ফারসি টেক্সট-এর অনুবাদ ও বিশেষণ
- সাইয়্যেদ কারামত আলী জৈনপুরি : ফারসি ও উর্দু লেখক
- ফারসির সেবা ও প্রসারে ঢাকার খাজা পরিবার।
- মর্সিয়া রচয়িতা আব্দুল গফুর নাসাখ।

উপর্যুক্ত বর্ণনামতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারের মাধ্যমে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের বিকাশের পাশাপাশি যুগেযুগে বাংলায় ফারসি চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ধারাও ছিল ব্যাপক। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা বিশেষত দরসে নিজামী ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কোথাও নৈর্বাচনিক, ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠদান অব্যাহত ছিল, এখনও রয়েছে। এ ধারা অব্যাহত ছিল পাকিস্তান

Dhaka University Institutional Repository

আমল পর্যন্ত। স্বাধীনতা উত্তরকালে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কিছুটা দুর্বল হলেও আশির দশকে এসে ইরানের ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে এ ধারায় পুনর্জাগরন সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র । তাদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর নিয়োগ, এ দেশের ফারসি শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইরানে বিভিন্ন ভাষা কোর্সে অংশ গ্রহনের সুযোগ দানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে ইরানে যাবার ব্যবস্থা করে সেখানকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে নিকট থেকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দেয়া, বিশেষত নূতন করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি বিভাগ খোলার উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে এদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য র্চচার প্রসারে তাদের অবদান দেদীপ্যমান।

এছাড়াও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক ফারসি অভিধান রচনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থাবলী অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় ফারসি ভাষা-সাহিত্য চর্চার সমকালীন ধারা এগিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এ অঞ্চলে ফারসি চর্চার গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ফারসিকেও আলাদা বিভাগের মর্যাদা দিয়ে পাঠ্যধারার অন্তর্ভূক্ত করে। এ বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ফারসি ভাষা-সাহিত্য চর্চায় অনন্য অবদান অব্যাহত রেখেছে। সাম্প্রতিক কালে এ বিভাগ থেকে *মাজাল্লায়ে ফারসি দানেশগাহে ঢাকা* (مجلّه فارسی دانشگاه داکا) নামে একটি ফারসি গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দের পর ফারসি এ দেশের অফিস আদালতের ভাষা রূপে বহাল না থাকলেও দীর্ঘ সোয়া ছয়শত বছরের বহুল চর্চার ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মন-মানস ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যে গভীর ছাপ ও প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তা মুছে যাবার নয়। অনাদিকাল পর্যন্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকগণ তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনে এ জাতীয় রচনা ভাণ্ডারের মুখাপেক্ষী থাকবেন। ফারসি সাহিত্যকর্মও সকল শ্রেণী ও পেশার চাহিদা পরিপূরণে নিরন্তর অবদান রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৩
বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্য-অনুবাদের ক্রমবিকাশ

পৃথিবীর সমৃদ্ধতম সাহিত্যগুলোর মধ্যে ফারসি অন্যতম। ১২০৪ থেকে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয়শত বছরকাল ভারত উপমহাদেশের রাজভাষা ছিল ফারসি। তাই এতদঞ্চলের সাহিত্য-প্রেমীদের ফারসি সাহিত্যের সাথে পরিচয় দীর্ঘদিনের। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে পুঁথি ও প্রণয়োপাখ্যান মূলত ফারসি সাহিত্যের প্রভাবপ্রসূত। সাদী, হাফিজ, রুমী, খৈয়াম, জামী, আত্তার এবং *শাহনামার* রচয়িতা ফেরদৌসীর সাথে পরিচয় নেই এমন বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্য প্রেমীর সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফারসি সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কারণে এর প্রতি বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্য পাঠকের আগ্রহেরও কমতি নেই। বহু প্রাচীনকাল হতেই অনুবাদ-এর প্রচলন। কারণ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের এক দেশ হতে অন্য দেশে যাতায়তের ফলে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে প্রবেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় যেমন সাহিত্যকর্ম অনূদিত হয় তেমনি ফারসি সাহিত্য থেকেও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। মধ্যযুগের পুরোটা জুড়ে শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিশ্ব সাহিত্য দরবারের সিংহাসনও ফারসি কবি-সাহিত্যিকগণের অধিকারে ছিল। তাই পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষায়ও এ সব সাহিত্য-নক্ষত্রের কালজয়ী সাহিত্যকর্মসমূহ অনূদিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্য ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধতর।

৩.১ অনুবাদ পরিচিতি

ভাষার ভিন্নতা থেকে অনুবাদের সূচনা ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং তথ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সবখানেই অনুবাদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অনুবাদ শিল্প বর্তমানকালে জাতিবর্গের অপরিহার্য কার্যক্রমের অংশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে রেনেসাঁসের আমদানি ঘটিয়ে অনুবাদ এ পর্যন্ত তার সবচেয়ে বড় ভূমিকাটি পালন করেছে। প্রাচীন গ্রীক, রোমান, পারসিক-সভ্যতা থেকে মধ্যযুগে আরব সভ্যতা এবং আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সূচনায় অনুবাদের এ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা দৃশ্যমান। যে কোন জাতির সভ্যতার উপাদান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য অনুবাদের মাধ্যমেই অন্য জাতির নিকট স্থানান্তরিত হয়। রেনেসাঁর অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পিছনে এটিই প্রধান কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন জাতির চিন্তা ও গবেষণার ফল জ্ঞান-বিজ্ঞান, আর সাহিত্য হচ্ছে তার মননশীলতার প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অনুবাদ যতটা সহজ, সাহিত্যের অনুবাদ ততোটাই কঠিন। প্রতিটি ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারের স্বতন্ত্র প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গিজনিত কারণে সাহিত্য বিষয়ক অনুবাদের মাধ্যমে পাঠককে মূলের স্বাদ দেয়া অনুবাদকের জন্য দুঃসাধ্য। সোনালী ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠক যেমন বিদেশী সাহিত্যের রস আস্বাদন করে তেমনি সাহিত্যেও আসে নবজাগরণের জোয়ার। এভাবে অনুবাদ পৃথিবীর প্রায় সকল সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। অনুবাদের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে এবং এ নিয়ে গবেষণাও হচ্ছে। বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে অনুবাদতত্ত্বের পঠন-পাঠন হয়।

অনুবাদ বিশ্ব সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাখা । অনুবাদ বলতে বাংলায় আমরা বুঝি ভাষান্তর বা কোন রচনা কর্মের অন্য ভাষায় প্রদত্ত বিবরণ। আরবীতে অনুবাদের প্রতিশব্দ হচ্ছে তারজমা (ترجمة) এর অর্থ অনুবাদ, ভাষান্তর ইত্যাদি। এ শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এক. কোন কথা বা বাণীকে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া, যার নিকট তা পৌঁছেনি।[১]

দুই. কোন কথা বা বাণীকে স্বভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।[২]

তিন. কোন কথা বা বাণীকে অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।[৩]

চার. এক ভাষার কথা বা বাণীকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা।[৪] অর্থাৎ কোন কথা বা বাণীকে এমনভাবে ভাষান্তরিত করা, যাতে মূল ভাষার অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণ অর্থ, ভাব ও উদ্দেশ্যাবলী অনূদিত ভাষায় যথাস্থাপিত হয়।[৫]

প্রাচীন বিভিন্ন অভিধানে এর অর্থ বিবর্তনের বর্ণনা এসেছে এভাবে:

> الترجمان و الترجمان:المفسر........ويقال قد ترجمه كلامه اذا فسره بلسان آخر و منه الترجمان[৬]

> 'যে ব্যক্তি বাক্যকে তারজমা করেন অর্থাৎ বাক্যকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বর্ণনা করেন তিনিই অনুবাদক। التراجم হলো এর বহু বচন। এখানেتاء ও نون অতিরিক্ত।'

---

[১] মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আল যারকানী, *মানাহিল আল ইরফান ফী উলুম আল কুরআন*, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ (বৈরূতঃ দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮), পৃ. ১১৯।

[২] *প্রাগুক্ত*।

[৩] *প্রাগুক্ত*।

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

[৫] *প্রাগুক্ত*।

[৬] ইবন মানজুর, *লিসান আল আরব*, খণ্ড ১২ (বৈইরুতঃ দারে সাদের, তা.বি.), পৃ. ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

يقال:قد ترجم كلامه إذا فسر بلسان أخر و منه الترجمان والجمع التراجم مثل: زعفران و زعافر[৭]

কারো মতে শব্দটির মূল হলো رجم । তবে *কামূসুল মুহীত* গ্রন্থকার ফিরোজাবাদী শব্দটির ক্রিয়াপদ হিসেবে ترجم ব্যবহার করেছেন যা প্রমাণ করে 'তা' অক্ষরটি অতিরিক্ত নয়, এটি শব্দমূলেরই অন্তর্গত। ইবনুন নাদিম ترجمة তারজমা শব্দটিকে অনুবাদ অর্থে ব্যবহার করেননি। তিনি النقل শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষায়

اسماء النقل من الفارسى الى العربى এবং نقل من .... الى[৮]

كتاب ترجمة শব্দটিকে তিনি العنوان বা শিরোনাম অর্থে ব্যবহার করেছেন যেমন: الترجمة (كتاب عنوانه) অর্থাৎ কিতাবের তারজমা হলো কিতাবের শিরোনাম।[৯]

'Translation' অনুবাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ। ভাষান্তর প্রক্রিয়া অথবা ভাষান্তরিত কোন রচনাকর্ম বুঝাতে Translation শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অনুবাদ একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া। একটি ভাষার তথ্য, ভাব অন্যভাষায় রূপান্তর করাকে এক কথায় অনুবাদ বলা হয়। কোন ভাষায় সংরক্ষিত সংবাদ, তাৎপর্য অর্থাৎ অর্থ, বিষয়, উপাত্ত অন্য ভাষায় স্থানান্তর বা রূপান্তর করার নাম অনুবাদ। অন্যভাবে বলা যায়, একটি ভাষা সংগঠন ও এর অর্থকে অন্য একটি ভাষায় রূপান্তর প্রক্রিয়াকে অনুবাদ নামে অভিহিত করা যায়।[১০] যেমন এ প্রসঙ্গে S.K.Verma.n Krishraswamy বলেন:

> "Translation is the transfer of a text from a source objectives being a perfect equivalence of meaning between the two texts"[১১]

অনুবাদে অর্থের স্থানান্তর হয় মৌলিক, লিখিত অথবা চিহ্ন ভাষার মাধ্যমে। যেমন এ প্রসঙ্গে David crystal বলেন:

> ÒThe term translation is the natural term used for all tasks where the meaning of expressions in one language (the source language) is turned into the meaning of another (target language) where the medium is spoken, written or signed."[১২]

---

[৭] ইসমাইল বিন হাম্মাদ আল জাওহারী, *তাজ আল লুগাহ ওয়াছিহা আল আরাবিয়া*, পৃ. ১৯২৯।

[৮] ইবনুন নাদীম, *আল ফিহরিস্ত* (মিশর: আল মাকতাবা আল তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, ১৩৮৪ হি.), পৃ. ৩০৫।

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৮।

[১০] মনসুর মুসা, *প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা* (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী, ২০০০), পৃ. ৩৩।

[১১] S.K.Verma.n Krishraswamy, *Modern linguistics: An Introduction*, Oxford University Press, 1989, p. 346.

Dhaka University Institutional Repository

তবে অনুবাদের সবচেয়ে কার্যকর সার্থক সংজ্ঞা দিয়েছেন Petrus Danielus Huetieus. তাঁর ভাষায়:

"A Translation is a text written in a well known language which refers to and represents a text in a language which is not as well known."[১৩]

অনুবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুঈন বলেন:

گزاردن، گزارش کردن، گردانیدن، از زبانی بزبان دیگر نقل کردن[১৪]

'পরিবেশন করা, সম্পন্ন করা, বর্ণনা করা, প্রতিবেদন দেয়া, আবর্তিত করানো, এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় বর্ণনা করা, উদ্বৃতি প্রদান করা।'

ড. মাহশীদ মাশীরীর ভাষায়:

ترجمه کردن مفاهیم از زبانی به زبان دیگر، بیان کردن مطلبی از یک زبان (زبان منبع) به زبان دیگر (زبان هدف)، برگردان متنی از یک زبان به زبان دیگر[১৫]

'কোন বিষয়ের তাৎপর্য-ভাবার্থ সমুহ এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় উপস্থাপন করা। কোন বিষয়বস্তু তার উৎস বা মূল ভাষা হতে লক্ষ্যস্থিত ভাষায় বর্ণনা করা। এক ভাষার মূল টেক্সট্ অনুবাদকের লক্ষ্যস্থিত ভাষায় প্রতিধ্বনিত করা।'

আব্বাস আরিয়'ন পুরের ভাষ্যমতে:

تلفظ کلمه ای را با حروف زبان دیگری نشان دادن ، حرف بحرف نقل کردن[১৬]

'উক্তি বা বাণীর ভাষা ও ধ্বনি উচ্চারণসহ অন্য ভাষায় পরিচিত করানো কিংবা অক্ষরে অক্ষরে পরিবর্তন করা বা প্রতিধ্বনি তোলা।'

আলী আকবর দেহখোদার মতে:

.تفسیر کردن زبانی را بزبان دیگر ، بیان کردن صخن کسی را بزبان دیگر ، لغتی را بلغت دیگر آوردن ، بیان کلامی از زبانی بزبان دیگر[১৭]

---

[১২] David crystal, *The Cambridge Encyclopedia of Language*, second edition, Cambridge University Press, p. 346.

[১৩] Translation/History/culture, ed.Andre Lefevere, Routeledge, London, 1992, p. 1.

[১৪] ড. মুহাম্মদ মুঈন, *ফারহাঙ্গে ফারসি* (তেহরান: মুয়াসসেসেয়ে এন্তেশারাতে আমীরে কাবীর, ১৩৭৫ ইরানী সাল), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪৬।

[১৫] ড. মাহশীদ মাশীরী, *নাখুস্তীন ফারহাঙ্গে যবানে ফারসি*, ৩য় সংস্করণ (তেহরান: সোরূশ, ১৩৭৪ ইরানী সাল), পৃ. ২৪০।

[১৬] Abbas Aryanpur, *THA NEW UNABRIDGED ENGLISH – PERSIAN DICTIONARY* (Tehran: Amir-kabir Publishing & Printing Institution, 1996), p. 5849.

Dhaka University Institutional Repository

'একটি ভাষা আরেকটি ভাষায় ব্যখ্যা করা, কারো বক্তব্য বা বিষয়বস্তু আরেকটি ভাষায় তুলে ধরা, এক শব্দকোষ হতে অন্য শব্দকোষে নিয়ে আসা, এক ভাষার বাক্য আরেক ভাষায় বর্ণনা করা।'

দানেশনামেয়ে যবান ওয়া আদবে ফারসি দর শিব্বে ক্বারেহ গ্রন্থে অনুবাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় বর্ণনায় বলা হয়েছে:

در لغت به معنی گزارش کردن،گزاردن،تعبیر تفسیر،شرح احوال واخلاق و سیرت اشخاص[১৮]

'আভিধানিক দিক থেকে অনুবাদ হচ্ছে বর্ণনা করা, প্রতিবেদন দেয়া, পরিবেশন, ব্যাখ্যা, কারো বংশ পরিচয়, জীবন-চরিত ব্যাখ্যা করা।'

دراصطلاح بدیع آن است که شاعر بیتی یا سخنی را از زبان دیگر، به شعر فارسی درآورد در قدیم به علت این که جامعهٔ فرهنگی ایران تنها با فرهنگ عربی و تاحدودی ترکی نزدیک بوده است، تقریبا تمامی ترجمه های صورت گرفته ، از این زبانها. واغلب از عربی بوده است.[১৯]

'পারিভাষিক দিক থেকে অনুবাদ হচ্ছে ঐ ছন্দ বা বক্তব্য যা অন্য ভাষা হতে ফারসি ভাষায় কাব্যাকারে বর্ণিত হয়। প্রাচীনকাল হতেই ইরানী অভিধান আরবী ও তুর্কী অভিধানের কাছাকাছি ছিল। আর ইহা সম্পূর্ণভাবে এ ভাষাগুলো হতেই অনুবাদের আকার ধারণ করেছে। যার অধিকাংশই ছিল আরবী।'

৩.২ অনুবাদ প্রকরণ

অনুবাদের প্রকারভেদ আলোচনার পূর্বে অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

অনুবাদে রয়েছে দুটি ভাষা–

ক. উৎস ভাষা বা উভা (Source language)

খ. লক্ষ্য ভাষা বা লভা (Target language)

অনুবাদ সাধারণত: দু'প্রকার । (ক) আক্ষরিক অনুবাদ (খ) ভাবানুবাদ

---

[১৭] আলী আকবর দেহখোদা, *লুগাত নামেয়ে*, খণ্ড ২৮ (তেহরান: এন্তেশারাতে মাজলিসে শুয়ারায়ে মিল্লী, ১৩৩৫ ইরানী সাল), পৃ. ৫৫৯।

[১৮] ফারহাঙ্গেস্তানে যবান ওয়া আদবে ফারসি, *দা'নেশনামায়ে যবান ওয়া আদবে ফারসি দার শেবহ খ্'ররে*, ১০ম সংস্করণ (তেহরান: ফারহাঙ্গেস্তানে যাবান ওয়া আদবে ফারসি, ১৩৮৪ ইরানী সাল), পৃ. ৩৩৯।

[১৯] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) আক্ষরিক অনুবাদ (Word for word)

আক্ষরিক অনুবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একের পর এক শব্দের অনুবাদ, অতঃপর পূর্ণ বাক্য গঠন এবং এভাবেই পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্নকরণকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায়।[২০] আরবীয় অনুবাদকগণ যখন গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ করতেন তখন আক্ষরিক অনুবাদ প্রচলিত ছিল। এছাড়া টলেডো নগরী পতনের পর সেখানের ইহুদী ও ল্যাটিন অনুবাদকগণ যখন আরবী থেকে ইবরানী ও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করতেন তখন সেখানেও আক্ষরিক অনুবাদ প্রচলিত ছিল।

(খ) ভাবানুবাদ (Sence for sence)

এ জাতীয় অনুবাদের বেলায় অনুবাদ্য গ্রন্থের বাক্যের সার্বিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, বাক্যসমুহের মাঝে অর্থের বন্ধন রক্ষা করেই অনূদিত গ্রন্থে মূল রচনার যথার্থ বক্তব্য ও বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হয়।[২১] এখানে শাব্দিক অনুবাদ মূল লক্ষ্য নয়। বাক্যের মর্মার্থ আর ভাবের পরিস্ফুটনই এ ধরনের অনুবাদের মূল লক্ষ্য।

ড. সালেহ আল সাফাদি বলেন:

الطريق الثانى فى الترجمه فهو طريق حنين بن اسحاق و الجوهرى و غير هما- ويقوم هذا النهج على استعاب الناقل لجملة فى ذهنه ثم يعبر عنها من اللغة الاخرى بجملة يطابقها سواء ساوت الالفاظ او خالفتها و هذا الطريق أجود و لهذا لم تحتج كتب حنين بن اسحاق---- كتب الطب و المنطق الطبيعى و الالهى فان الذى عربه منها يحتاج الى الاصلاح[২২]

'অনুবাদের দ্বিতীয় পদ্ধতি যা হুনাইন বিন ইসহাক, জাওহারী ও অন্যান্যরা অনুসরণ করেছেন। তা হল, অনুবাদক প্রথমে মূল বাক্যের অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করবেন। অতঃপর তিনি তা অন্য ভাষায় যথোপযুক্ত বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করবেন। এতে তিনি অর্থ প্রকাশ মূল শব্দের সমার্থবোধক শব্দের আশ্রয় নিলেন নাকি বিপরীতার্থক শব্দের মাধ্যমে সেটি সম্পন্ন করলেন তা কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। এ পদ্ধতিটি অধিক উত্তম। এ জন্য হুনাইন বিন ইসহাক এর অনূদিত গ্রন্থসমূহ পরবর্তীতে আর পরিশোধনের প্রয়োজন পড়েনি। চিকিৎসা, যুক্তিবিদ্যা ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাবলীকে যারা আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন পরবর্তীতে সেগুলিকে সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে।'

---

[২০] ইব্রাহিম যাকী খুরশিদ, *আত-তারজামা ওয়া মুশকিলাতুহা* (মিশর: আল হাইয়্যাহ আল মিসরিয়্যাহ আল আম্মাহ লি আল কুত্তাহ, ১৯৯৫), পৃ. ৮-৯।

[২১] ড. রশীদ জামিলী, *হারাকাত আত তারজমাহ ওয়া আন নাকুল ফিল মাশরিক আল ইসলামী ফিল ক্বারনাইন আল আউয়াল ওয়া আস সানী লিল হিজরা* (মানশুরাত জামিয়া কার ইউনুস), পৃ. ২৭।

[২২] *আত তারজামাহ ওয়া মুশকিলাতুহা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের অনুবাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা নিয়ে লেখা-লেখি বেশী পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক যুগে এসে আরবরা এ ধরনের অনুবাদের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এ বিষয়ে আহমদ হাসান যায়্যাত আব্বাসী যুগে অনুবাদের ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার পর বলেন:

> ইসলামের ইতিহাসে অনুবাদের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পদ্ধতিদ্বয়ই ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। আরবদের কাছে এছাড়া তৃতীয় কোন পদ্ধতি ছিল না । অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি নিজে এ দু'টির মাঝে সামঞ্জস্যশীল একটি উত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করেছি, তবে সাহিত্য কর্মের অনুবাদে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো লেখক এবং কবির আবেগ অনুভূতিকে ধারণ করা যাতে অনুবাদে লেখকের আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তার বলিষ্ট উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আমি প্রথমে বিদেশি রচনাকে সে ভাষার বিন্যাস রীতি অনুযায়ী আরবীতে আক্ষরিক ভাষান্তর করি। এরপর আমি আবার সেটিকে মৌলিক আরবী বিন্যাস রীতি অনুযায়ী অনুরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ব্যতিরিকে আগপিছ করে নতুন করে সাজাই । অতঃপর তৃতীয়বার আমি এর ভিতর গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে যাই লেখকের প্রাণ, রস ও অনুভূতিকে সাবলীল শব্দ, উপযুক্ত রূপক ও সুশৃঙ্খল বিন্যাস পদ্ধতির মাধ্যমে তুলে আনতে। আমি এ তিনটি পর্যায়ের কখনো কোন ব্যত্যয় ঘটাই না, যতক্ষণ না আমি পুরোপুরি নিশ্চিত না হই যে, লেখক যদি স্বয়ং এ গল্প বা কবিতাটি আরবী ভাষায় লিখতেন তবে তিনি এতদ্ভিন্ন অন্যকোন রূপে লিখতেন না।[২৩]

আহমদ হাসান যায়্যাতের এর বক্তব্য অনুযায়ী এ ধরনের অনুবাদ কঠিন ও দুঃসাধ্য। কেননা লেখক সরাসরি নিজের মনের কথাকে কলমে তুলে আনেন। আর অনুবাদক এমন ভাষা থেকে ভাষান্তর করেন যে ভাষা তার নিজের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র বাক্য বিন্যাস ও শব্দের গাথুনির অধিকারী এবং সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রথাগত চর্চার চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশ ও প্রকৃতির বিবরণও ভিন্নতর। কাজেই অনুবাদকের প্রথম প্রচেষ্টা হচ্ছে নিজের ভাষাকে বিদেশী ভাষার অর্থ গ্রহণে এমন ভাবে প্রস্তুত করা যাতে সেখানে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা, সমন্বয়হীনতা ও খাপছাড়া ভাব ফুটে না উঠে। অনুবাদকের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও শিল্প স্বত্ত্বায় নিমজ্জিত হওয়া যাতে সে লেখকের সুর ভাব অনুধাবন করতে পারে, লেখকের দু'চোখ দিয়ে দেখতে পায় এবং লেখকের ভাষায় কথা বলে। এ ধরনের সমন্বয় ও আত্মলীনতায় অনুবাদের যথার্থতা ও সততা নিশ্চিত হয় এবং দর্পনে লেখক ও অনুবাদক একই ব্যক্তিত্ব ও চেহারায় হাজির হয়।[২৪] অন্যদিকে 'হবস' বৃদ্ধ বয়সে তার দার্শনিক মেজাজে অর্থাৎ সত্যের বিন্দু মাত্র অপলাপ না ঘটিয়ে মূলের প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বস্ততা সহযোগে যে অনুবাদ করেছিলেন, বলড (bald) বা কাঠখোট্টা, এই একটি শুষ্ক বিশেষণে ড্রাইডেন তা খারিজ করে দিয়েছেন।[২৫] আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের

---

[২৩] ড. ফওজী আতিয়্যাহ মুহাম্মদ, *ইলম আত তারজামাহ মাদখালুন লুগাবিয়্যিন* (কায়রো: দার আস সাফা আল জাদীদাহ, তা.বি.), পৃ. ৯-১০।

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

[২৫] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *অনুবাদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে রোমান জ্যাকবসন, জে. সি. ক্যাটফোর্ড তিন ধরনের অনুবাদের উল্লেখ করেছেন, যথা: অন্তর্ভাষী অনুবাদ (Intralingual Translation), আন্তর্ভাষী অনুবাদ (Interlingual Translation) ও আন্তঃসংকেত অনুবাদ (Intersemiotic Translation or Transmulation)। নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা করা হলো।

অন্তর্ভাষী অনুবাদ (Intralingual Translation)

একই ভাষার বিভিন্ন মৌখিক সংকেতের মাধ্যমে এ অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়। একই ভাষার মধ্যে সংঘটিত অনুবাদ প্রক্রিয়া এ ধরনের নূতন শব্দ প্রয়োগ করে বা শব্দাবলী নতুনভাবে সাজিয়ে অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে এখানে সহজবোধ্য করে তোলা হয়। এক শব্দ থেকে অন্য শব্দের, এক বা একাধিক সামর্থ শব্দের অনুবাদকে বলা হয় আন্তঃভাষাতাত্ত্বিক বা অন্তর্ভাষী অনুবাদ। [২৬]

আন্তর্ভাষী অনুবাদ (Interlingual Translation)

এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন মৌখিক বাকসংকেত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ ধরনের অনুবাদকে সত্যিকারের অনুবাদ বলা হয়। ভাষান্তরের মাধ্যমে এখানে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়। এ অনুবাদকে উপযুক্ত অনুবাদ **(Translation Perfect)**ও বলা হয়।[২৭]

আন্তঃসংকেত অনুবাদ (Intersemiotic Translation or Transmulation)

অমৌখিক সংকেত সংশ্রয়ের মাধ্যমে গঠিত অনুবাদ এ পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত। একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমের সাহায্যে এখানে বক্তব্য তুলে ধরা হয়; যেমন–গল্প থেকে ছবি বা থিয়েটার অনুবাদ।[২৮]

এছাড়াও অনুবাদ আরও কয়েক শ্রেণীতে বিন্যস্ত হতে পারে। যেমন: ধারণ এবং সীমিত অনুবাদ, ব্যাকরণিক এবং আভিধানিক অনুবাদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক অনুবাদ, সাধারণ ও আংশিক ধ্বনিতাত্ত্বিক অনুবাদ এবং লিপিগত অনুবাদ। নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হল:

ধারণ এবং সীমিত অনুবাদ

সাধারণ অনুবাদের অর্থ প্রকাশ, এতে লক্ষ্য ভাষার Content form এবং আভিধানিক শব্দের মধ্যে সমতাবিধান করা হয়।

---

[২৬] মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, *অনুবাদের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৩০-৩১।
[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।
[২৮] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাকরণিক এবং আভিধানিক অনুবাদ

উৎস ভাষার আলোচ্য বিষয় যথাসম্ভব পরিবর্তন না করে দু'টি উপাদানের মধ্যে সীমিত অনুবাদ সম্ভব। আধেয় বা কনটেন্ট স্তরে এক বা একাধিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনুবাদ ব্যাকরণিক এবং আভিধানিক-এ দু'ভাগে বিভাজিত হতে পারে। *অনুবাদের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান আলোচ্য অনুবাদের উদাহরণে বলেন:

> এরূপ অনুবাদে দেখা যাবে, ইংরেজী ভাষায় বাক্যের পদক্রম এবং ব্যাকরণিক উপাদান সমভাবে তুর্কী ভাষায় পাওয়া যাবে। তবে ইংরেজী আভিধানিক আইটেম এখানে থাকবে অপরিবর্তিত। বিদেশী ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে এসব অনুবাদ কম ব্যবহৃত হয়। কেননা, শিক্ষার্থীদের ভাষা এবং তাদের শিক্ষণের ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। কেউ যখন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে, তখন সে কেবল ঐ ভাষার কিছু শব্দ, বিশেষ করে কনটেন্ট ওয়ার্ড, আভিধানিক আইটেম প্রভৃতি ব্যাকরণিকভাবে তার মাতৃভাষার বাক্যে ব্যবহার করে। এ ধরনের অনুবাদ অনানুষ্ঠানিক আভিধানিক অভিধা নামে খ্যাত। [২৯]

ধ্বনিতাত্ত্বিক অনুবাদ

লক্ষ্য ভাষার কিছু শব্দের মাধ্যমে উৎস ভাষার শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদান-উপস্থাপিত অনুবাদকে বলা হয় ধ্বনিতাত্ত্বিক অনুবাদ। নিয়ন্ত্রিত অনুবাদে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। এক্ষেত্রে উৎস ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদান ও লক্ষ্য ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদানের সাম্যতা অত্যাবশ্যক।[৩০]

সাধারণ ও আংশিক ধ্বনিতাত্ত্বিক অনুবাদ

এসব অনুবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎস ভাষার কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে উৎস ও লক্ষ্য ভাষার মধ্যে সমতাবিধান। এ সম্পর্কে *The Encyclopedia of Language and Linguistics* গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> "The normal + partial phonological translation that is the subject of this section is different in that here the first intention is to make a regular, normal translation, but with some concession to the needs of phonology."[৩১]

লিপিগত অনুবাদ

উৎস ভাষার লিপিগত সাদৃশ্য বজায় রেখে লক্ষ্য ভাষায় কোনো টেক্সট অনূদিত হলে সে অনুবাদকে বলা হয় লিপিগত অনুবাদ। যেমন এ প্রসঙ্গে *The Encyclopedia of Language and Linguistics* গ্রন্থে বলা হয়েছে:

---

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

[৩০] *প্রাগুক্ত*।

[৩১] R E Asher (ed.), *The Encyclopedia of Language and Linguistics* (Oxfored: Pergamam Press, 1994), p. 4741.

Dhaka University Institutional Repository

"This is graphological translation, in which TL equivalents are sought for the graphological units of the SL, that is to say TL graphological items related to as nearly as possible the same graphic substance at the SL items."[৩২]

হিলেয়ার বেলক তাঁর *সিলেকটেড এসেজ* গ্রন্থে অনুবাদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন: শিক্ষাদানের জন্য অনুবাদ ও সাহিত্যিক অনুবাদ। শিক্ষাদানের জন্য অনুবাদ মূলপাঠের কোন বিষয় বা মূলপাঠ সরাসরি অনুবাদ করাই এ অনুবাদের লক্ষ্য। এ অনুবাদে আক্ষরিক অনুবাদ গুরুত্ব পায়। আর সাহিত্যিক অনুবাদে মূলপাঠের বাইরেও অতিরিক্ত কিছু সাহিত্যিক রূপক এ অনুবাদে ব্যবহার করা হয়। এ অনুবাদে আক্ষরিক অনুবাদ গুরুত্ব পায় না; গুরুত্ব পায় ভাবানুবাদ। ইংরেজ কবি, নাট্যকার ও সমালোচক জন দারিদান অনুবাদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যথা:

ক. শাব্দিক অনুবাদ

যেখানে অনুবাদক কর্তৃক মূল পাঠের পরিভাষা ও লাইন উৎস ভাষা হতে অনুবাদের ভাষায় পরিচালিত হয়।

খ. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

যেখানে অনুবাদক মূলপাঠের অর্থের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখবে এমনকি তা শব্দে শব্দে। এ পদ্ধতিতে অনুবাদক মূলপাঠের লেখকের বর্ণনার বাইরে বর্ণনা করে তা তুলে ধরবে।

গ. উৎস অনুকরণ অনুবাদ

যেখানে অনুবাদক মূলপাঠের শব্দ ও অর্থ আয়ত্বে নিয়ে কখনো তাই তুলে ধরবে অথবা মূলপাঠ থেকে অনুবাদকের চিন্তায় যে এলহাম আসে তদানুযায়ী তা পূর্নবিন্যাস করবে।

৩.৩ কবিতার অনুবাদ সমস্যা

কবিতার অনুবাদ হচ্ছে সবচেয়ে জটিল, অনুবাদ কবিতার সুর-ছন্দালংকার, ভাব আর রূপকতাই এর জন্য দায়ী। কবিতার বার্তা কখনো প্রত্যক্ষ; কখনো ইঙ্গিতময়। প্রত্যক্ষ বার্তাবহ কবিতার অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ। পরোক্ষ বার্তাবহ কবিতার মর্ম ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসে না। যখন কবিতা কিছু বলে না, এক শুদ্ধ সত্তায় ধরা দেয়, তখনই অনুবাদ এক অসম্ভব প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়।[৩৩] কোন ভাষায় কবিতার ছন্দ অলংকার-ঐতিহ্য এর অনুবাদকে অসাধ্য করে তোলে। যেমন আরবদের কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদের বেলায় এর ছন্দের চমৎকারিত্ব বিনষ্ট হতে বাধ্য।[৩৪]

---

[৩২] *Ibid.*, p. 4742.

[৩৩] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০।

[৩৪] ইব্রাহীম যাকী খুরশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোন ভাষার প্রকৃতিও সমস্যার কারণ হতে পারে। রুশ ভাষায় কবিতা সম্পর্কে এ ধরনের সমস্যার কথা শোনা যায়। রুশ ভাষার প্রকৃতিই এমন যে, অন্যভাষায় রুশ কবিতা চরিত্রভ্রষ্ট হতে বাধ্য। এর অনুবাদ অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য। এর বিশেষ কারণ হিসেবে বলা হয়েছে:

> "It is earthy, permeated with sound common sense and has a curious matter of fact quality. It is plastic, adaptable, comprehensive. Russian poets don't use literary or poetical expressions but the poetry conveys poignant feelings and consummate poetic art."[৩৫]

রুশ কবিতার ভূমি লগ্নতা (earthiness), প্রত্যক্ষতা ও সরলতাই এর জন্য দায়ী। তবু কবিতার অনুবাদ, অনুবাদের ইতিহাসে একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে। অনুবাদ দুঃসাধ্য বলেই অনুবাদক নিরস্ত্র হননি।

তথ্যাবিজ্ঞমহল কবিতার অনুবাদে আলাদা কিছু শর্তারোপ করেছেন, যিনি কবিতাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করবেন, তার জন্য অত্যাবশ্যক হলো উভয় ভাষার সুরের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা ভালভাবে উপলব্ধি করা। তেমনি তার উপর দায়িত্ব হচ্ছে কবির ব্যক্তি সত্তায় নিমজ্জমান এবং কবির পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থানকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। কারো মতে কবিতার অনুবাদককে মৌলিকভাবে কবি হতে হবে অথবা তার মাঝে কবিত্ব শক্তি থাকতে হবে।[৩৬]

তবে কবিতার অনুবাদে সাধারণ যে সমস্যা তা হচ্ছে কবিতার অনুবাদ কি কবিতায় হওয়া অত্যাবশ্যক? আরবী অনুবাদকেরা কবিতার অনুবাদ কবিতাতেই করেছেন, তবে কেউ প্রয়োজনের তাগিদে কবিতার অনুবাদ গদ্যে করার কথা বলেছেন। অবশ্য কবিতার অনুবাদ আরবরা খুব বেশী একটা করেনি এবং তাদের অভিজ্ঞতাও কম। কবিতার ব্যাপারে আরবরা নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়েই তৃপ্ত থেকেছে। আর পাশ্চাত্যে রেনেসাঁস পর্বে কবিতার অনুবাদ কবিতাতেই হয়েছে। এরপর অষ্টাদশ শতক থেকে এ পর্যন্ত, অর্থ্যাৎ বিগত তিনশ বছর উত্তরটা দ্বিধাগ্রস্থ। গদ্যের জন্য গদ্য, এবং পদ্যের জন্য পদ্য এ নীতির উপরই সে যুগের কৃতি অনুবাদকমন্ডলী তাঁদের বিখ্যাত কাজগুলো করেছেন।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন:

> পদ্য রচনার গদ্যানুবাদ আরো পরবর্তীতে শুরু হয়েছে। পদ্যকে পদ্যে রূপান্তরিত করার সমস্যা কবিরাই ভাল বুঝতে পারেন। তাই দেখা যায় ইয়েটস-এর সফোক্লিস (রাজা ইডিপাস) এবং রবার্ট গ্রেভস-এর হোমার (অ্যাকিলিসের রোষ, ইলিয়াডের নামান্তর) পদ্যের ত্রিসীমানায় নেই। পুরোটাই গদ্যে করেছেন বিংশ শতকের এই দু'জন কবি। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ

---

[৩৫] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

[৩৬] ড. ফওজী আতিয়্যাহ মুহাম্মদ, *ইলম আত তারজামাহ মাদখালুন লুগাবিয়্যুন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনার দাবি রাখে। ইয়েটস নিজে বিশটির উপর কাব্যনাটক লেখেননি, কাব্যনাট্যের সমর্থনে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন বিভিন্ন জায়গায়। এবং মঞ্চে কাব্য নাটকের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান তর্কাতীত। কাব্য সংলাপ গঠনের কলা-কৌশল তিনি জানতেন, কিন্তু সফোক্লিসের অনুবাদে তিনি কোন ঝক্কি নিতে চাননি। অপরপক্ষে গ্রেভস শুধু একজন সার্থক কবি নন, তিনি একজন সিদ্ধহস্ত অনুবাদকও। কিন্তু হোমার অনুবাদে তিনি সচেতনভাবেই গদ্য পথের পথিক। অগ্রজ অনেক কবির পদস্খলন দেখেই সম্ভবত তাঁদের এই সাবধানতা। তবে এই সতর্ক ও বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। গীতাঞ্জলির গদ্যানুবাদই তার প্রমাণ।[৩৭]

কবিতার অনুবাদ বিভিন্ন ধরনে সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমনঃ ধ্বনিগত অনুবাদ, আক্ষরিক অনুবাদ, ছন্দগত অনুবাদ, গদ্যানুবাদ, অন্ত্যানুপ্রাস অনুবাদ, অমিত্রাক্ষর অনুবাদ, ভাষ্যানুবাদ।[৩৮] এ বিষয়ে নিম্নে বর্ণনা উপস্থাপন করা হল।

ক. ধ্বনিগত অনুবাদ

উভা কবিতায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোকে লভায় রূপান্তরের মাধ্যমে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গদ্যরূপ দিয়ে সম্পাদিত অনুবাদই ধ্বনিগত অনুবাদ।

খ. আক্ষরিক অনুবাদ

আমরা জানি ভালো কবিতার পূর্ব শর্ত হলো যথোপযুক্ত শব্দের সর্বোত্তম ব্যবহার। কবিতার আক্ষরিক অনুবাদের কারণে মূল পাঠে ধ্বনি মাধুর্য বিনষ্ট হয়। কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করাই এ জাতীয় সমস্যার সহজ সমাধান।

গ. ছন্দগত অনুবাদ

যে ছন্দে উভা রচিত অনুবাদের বেলায় সেই ছন্দ লভায় অনুসৃত হলে সেই অনুবাদকে বলা হয় ছন্দগত অনুবাদ।

অনুবাদের মাধ্যমে কবিতার বক্তব্য উপস্থাপন করাই এ সব অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য। এ জাতীয় অনুবাদকগণ মনে করেন কবিতা গদ্যে রূপান্তর অসম্ভব।

ঘ. অন্ত্যানুপ্রাস অনুবাদ

এ জাতীয় অনুবাদে ছন্দ-বন্ধন ও পঙক্তির মিল এ দু'টি বিষয় রচকের ন্যায় গুরুত্ব পায়।

ঙ. অমিত্রাক্ষর অনুবাদ

অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুবাদে অনুবাদক রচকের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রতিভাবান ব্যক্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলো কাজে লাগিয়ে স্বার্থক অনুবাদে প্রয়াসী হন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুবাদক কেবল কবিতার গঠনশৈলীতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না।

---

[৩৭] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪।

[৩৮] ডক্টর মোহিতকুমার রায়, *ভাষাবিজ্ঞানের গোড়ার কথা* (কলকাতাঃ মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮), পৃ. ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

চ. ভাষ্যানুবাদ

উৎস ভাষার সারাংশ বা মূলভাব গ্রহণ করে নতুন ভাবে কাব্যরূপ দেয়া হয় ভাষ্যানুবাদে। এ অনুবাদ কেবল কাব্য ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য গদ্যানুবাদেও সমভাবে প্রযোজ্য।[৩৯]

৩.৪ ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ

যে কোন সাহিত্যের পূর্ণতা সাধনে অনুবাদ কর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। এ দেশে মুসলিম শাসন ও ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণের সাথে সাথে আরবী-ফারসি সাহিত্যের ঐতিহ্য এখানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যযুগে এ দেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-শিক্ষা-রাজতন্ত্রের কারণে যে কয়টি ভাষার সাথে পরিচিত হয় তন্মধ্যে ফারসি অন্যতম।[৪০] এ সময়ে মুসলমানদের রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রধান অংশই অনুবাদ, মৌলিক রচনা খুবই সীমিত। অনুবাদের বিষয়বস্তু হিসাবে ধর্মশাস্ত্র, সূফীতত্ত্ব ও দর্শন, কাহিনীকাব্য, শোকগাথা, জঙ্গনামা, ইতিহাস ইত্যাদি অনুসৃত হয়।[৪১] আরবী-ফারসির সম্পদ অনুবাদ-অনুসরণের মাধ্যমে জনসমাজে তুলে ধরার লক্ষ্য সামনে রেখে এমনটি করা হয়েছে। সাধারণত অধিক উন্নত সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতি অনুন্নত জনগোষ্ঠী অনুকরণ করে থাকে। সমাজনীতির এ রূপ বৈশিষ্ট্য থেকেই মধ্যযুগের কবিগণ সংস্কৃত ও ফারসির উপাদান নিয়ে কাব্য রচনা করেন। হিন্দু কবিগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিরক্ষার ও সংস্কারের চেতনা থেকে সংস্কৃতের অনুবাদ করেন, মুসলমান কবিগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও বিকাশের চেতনা থেকে আরবী-ফারসির অনুবাদ করেন। মুসলমান কবিগণ অনুবাদভিত্তিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত করেন। তাছাড়া তাঁরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত সাহিত্যও বাংলায় অনুবাদ করেন। বাংলা কাব্য চর্চায় সূফী-সাধক অনুরাগীরাই প্রথমে এগিয়ে আসেন। ধর্মতত্ত্ব ও সাধনার কথা সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার নৈতিক দায়িত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা থেকে তারা অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেন। এ ভাবে ব্যাপকভাবে মধ্যযুগের বিচিত্রধর্মী অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

সাধারণ মানুষের উপভোগ্য করার দিকে কবিরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন বলে এ সব অনুবাদ তেমন আক্ষরিক ভাবে সম্পাদিত হয়নি। কোথাও কিছুটা আক্ষরিক, অধিকাংশ ভাবানুবাদ; আবার কখনও

---

[৩৯] মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৩।

[৪০] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬), পৃ. ১৯১।

[৪১] ওয়াকিল আহমদ, "সুফী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খণ্ড ৭ (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

কখনও কল্পিত ভাব পরিবেশনের মাধ্যমে কবিগণ নিজেদের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে অনুবাদ সাহিত্য মৌলিক গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয় হতে পেরেছে।

বিভিন্ন ভাষা থেকে মধ্যযুগে যে সব কাব্য অনূদিত হয়েছে তার সংখ্যা কম নয়। সংস্কৃত থেকে একটা বিরাট অংশ গৃহীত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্য হল *রামায়ণ, মহাভারত* ও *ভাগবত*। এছাড়া কিছু প্রণয়োপাখ্যান ও নাটক সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। মুসলমান কবিদের হাতে ফারসি থেকে অনেকগুলো প্রণয়োপাখ্যান বাংলায় অনূদিত হয়। তন্মধ্যে *ইউসুফ-জোলেখা, লাইলী-মজনু, গুলে বকাওলী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সপ্তপয়কর* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৪২]

বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ প্রভাবের ফলে এ রূপ ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে পঞ্চদশ শতক-ষোড়শ শতকে ফারসির প্রভাব গুরুতর আকার ধারণ করতে পারেনি। সপ্তদশ শতকের সূচনা থেকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে নতুন করে ফারসির প্রভাব পড়ে। এ প্রভাব ক্রমান্বয়ে গুরুতর হয়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করেছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের দলিলপত্রের ভাষায় এ প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হয়। উনবিংশ শতক থেকে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে, মানসম্মত বাংলা গদ্যভাষায় এ প্রভাব আবার সঙ্কুচিত হতে থাকে। প্রাচুর্যের দিক দিয়ে বিচার করলে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকে উপাখ্যানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এ সময়টাতেই বেশিরভাগ ফারসি উপাখ্যানের বাংলা অনুবাদ হয়। ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে যে সকল লেখক, কবি ও সাহিত্যিক সূচনাকাল থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যাঁরা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের শতক ভিত্তিক বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৩.৪.১ পঞ্চদশ শতক

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কবিতা বিশেষত প্রণয়োপাখ্যান দিয়েই আরম্ভ হয়েছে। আদি মুসলিম কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত শাহ মুহম্মদ সগীর এ ধারার প্রবর্তক এবং তাঁর *ইউসুফ-জোলেখা* এ ধারার প্রথম কাব্য। মধ্যযুগে মুসলিম সাহিত্যের স্বর্ণযুগ আসার প্রস্তুতিপর্ব চলে প্রধানত এ পঞ্চদশ শতকে এবং ষোড়শ শতক পর্যন্ত তা প্রসারিত হয়। সূফী মনন ও মানসিকতায় ভাবপুষ্ট কবিগণ তাদের কাব্যে এ ধারার চমৎকার বিকাশ ঘটিয়েছেন। পঞ্চদশ শতকের অনুবাদক কবি ও ফারসি থেকে অনূদিত কাব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

---

[৪২] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৯), পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মুহম্মদ সগীর

শাহ মুহম্মদ সগীর মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রাচীনতম মুসলিম কবি হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীর বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য অনুযায়ী শাহ মুহম্মদ সগীর মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি।[৪৩] শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের কোন অনুলিপিতেই তাঁর ব্যক্তি পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁর কাব্যে এমন কতগুলো শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা বর্তমানে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত আছে। এ থেকে অনেকে অনুমান করে বলেন যে, শাহ মুহম্মদ সগীর চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[৪৪] শাহ মুহম্মদ সগীরের সবকটি অনুলিপি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে পাওয়া যায় বলে তাঁকে পূর্ববঙ্গের লোক হিসেবে গণ্য করা যায়।[৪৫]

১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে হাজী ইলিয়াস শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে বাংলার স্বাধীন সুলতান রূপে নিজেকে ঘোষণা করার ফলে এদেশে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটে। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ের শাহী দরবার বাংলা ভাষা সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪৬] ইলিয়াস শাহের পৌত্র গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের আমলে বাংলার সাথে বর্হিবিশ্বের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পারস্য কবি হাফিজকে দাওয়াত করেছিলেন।[৪৭] শাহ মুহম্মদ সগীরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ।[৪৮] শাহ মুহম্মদ সগীরই প্রথম বাংলা ভাষার মাধ্যমে আরবী ফারসি সাহিত্যের বিষয় ভাবানুবাদের মাধ্যমে এদেশের পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ জোলেখার কাহিনী অবলম্বনে ইরানের যে সকল সূফী কবিগণ কাব্য রচনা করেছেন; মহাকবি ফেরদৌসী ও সূফীকবি জামী তন্মধ্যে অন্যতম। ফারসি ভাষায় রচিত ইউসুফ-জোলেখা কাহিনী অবলম্বনে শাহ মুহম্মদ সগীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের নির্দেশে

---

[৪৩] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, সং-৩য় (ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৯৬৫), পৃ. ৫৬।

[৪৪] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান* (চট্টগ্রাম: জিলা কাউন্সিল বই ঘর, ১৯৬৫), পৃ .১৫।

[৪৫] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

[৪৬] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

[৪৭] E. G. Brown, *A Literary History of Persia*, Vol. 3 (Cambridge: The Cambridge University Press, 1969), p. 285.

[৪৮] গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) আমলে বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী উৎকর্ষ সাধিত হয়। এটি ছিল বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সুলতান একদিকে ছিলেন ফারসি কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক; অন্যদিকে তিনি নিজেও ছিলেন ফারসি কবি। তিনি ইরানের মহাকবি হাফিয শিরাজীর (১৩১৫-১৩৮৯ খ্রি.) বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। স্বরচিত একটি ফারসি পংক্তি পাঠিয়ে তিনি সিরাজীকে বঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং ঐ পংক্তির ছন্দে একটি গযল রচনা করে দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। কবি স্বয়ং আসতে অপারগ হওয়ায় সুলতানের জন্য স্বরচিত একটি গযল উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সিরাজীর দেয়া গযলটি বাংলার ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাবধি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। [দ্র. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, খণ্ড ২ (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. ৫।]

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনা করেন।[৪৯] সগীর বেশ কয়েক জায়গায় কাব্যকাহিনীর উৎসের কথা বলেছেন।[৫০] বাংলা ভাষায় মুসলিম কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শাহ মুহম্মদ সগীর বলেন:

কহে শাহা মোহাম্মদ ইছুপ জুলেখা পদ
দেশী ভাষা পয়ার রচিত।[৫১]

শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ইউসুফ জোলেখা কাব্যে গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের প্রশংসা ছাড়াও কবির পিতা-মাতা গুরুজনদের প্রশংসা রয়েছে , তবে তাদের নাম বা আবাসস্থলের কোন বর্ণনা এতে আলোচিত হয়নি।[৫২] শাহ মুহম্মদ সগীর কেবল কাব্যরস পরিবেশনের জন্যেই এ কাব্য রচনা করেননি; এ কাব্য রচনার অন্তরালে ধর্ম প্রেরণা ও ধর্ম কাহিনী প্রচার অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও দেশী ভাষায় ধর্ম প্রচারে ভয়েরও কমতি ছিলনা। সৎ সাহস প্রদর্শনেও তিনি পিছপা হননি। ভয়কে উপেক্ষা করে দেশী ভাষায় ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

চতুর্থে কহিমু কিছু পোথার কথন
পাপ ভয় এড়ি লাজ দৃঢ় করি মন ॥
নানা কাব্য কথা রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধায় সন্তোষ করে মন ॥
ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ
দোষিব সকল তাক ইহ ন জুয়াএ ॥
গুণিয়া দেখিলুঁ আক্ষি ইহ ভয় মিছা
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা ॥
শুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন
রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন ॥
বচন রতন মণি যতনে পুরিয়া
প্রেমরসে ধর্ম বাণী কহিমু ভরিয়া ॥

---

[৪৯] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৬ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৩৫।

[৫০] কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ/ইছুফ জলিখা কথা অমিয়া অশেষ ॥
কহিব কিতাব চাহি সুধারস পুরি/শুনহ ভকত জন শ্রুতি-ঘট ভরি ॥ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।
ইছুপ সমান রূপ ত্রিভোবনে নাই/হেন মতে কহিলাম শাস্ত্রেত লেখা পাই ॥
কোরানেতে আছে তান জন্ম বিবরণ/আপনে কহম নাহি এসব বচন ॥ সুলতান আহমদ ভূঁইয়া, *কবি শাহ মোহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল* (ঢাকা: মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৬৪ বাংলা), পৃ. ১৯৬।
ইছুপ জলিখা কির্ছা কিতাব প্রমাণ/দেসি ভাসে মোহাম্মদ ছগিরিএ ভান ॥ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রনয়োপাখ্যান* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৯) পৃ. ১২৩।

[৫১] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

[৫২] দ্বিতীয় প্রণাম করোঁ মাও বাপ পায়/যান দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধরায় ॥
পিপিড়ার ভয়ে মাও ন থুইলা মাটীত/কোল দিয়া বুক দিআ জগতে বিদিত ॥
না খাই খাওয়াএ পিতার না পরি পরাএ/কত দুক্ষ এক এক বছর গোঞ্চাএ ॥
পিতাক নেহায় জিউ জীবন যৌবন/কনে না সুধিব তান ধারক কাহন ॥
ওস্তাদে প্রণাম কঁরো পিতা হন্তে বাড়/দোসর জনম দিলা তিহঁ সে আক্ষার ॥ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (ঢাকা: হাসি প্রকাশনালয়, ২০০২), পৃ. ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা
ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা॥
....
দোষ খেম, গুণ ধর রসিক সুজন
মোহাম্মদ ছগীর ভনে প্রেমক বচন ॥"[৫৩]

ফারসি কাব্যাবলম্বনে শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ইউসুফ-জোলেখা কাব্য ধর্মোপাখ্যান নয়, মানবিক প্রেমোপাখ্যান। মুসলিম সুলতানগণ বাংলা সাহিত্যে যে *'Human interest'* সঞ্চার করতে চেয়েছেন, সগীরের কাব্য এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায় ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে সগীর এর উর্ধে থেকে সুরুচির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। সগীর অবলীলায় গল্প বলে পাঠক-শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন যা একজন কাহিনীকাররূপে তাঁর বিরল কৃতিত্ব।

৩.৪.২ ষোড়শ শতক

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে মানবীয় প্রণয়োপাখ্যান বাংলা সাহিত্যের একটি বড় সম্পদ। এ শতকের আদি মুসলিম কবি সগীরের কাব্য দিয়ে তার যাত্রা আরম্ভ হয়; ষোড়শ শতকে সাবিরিদ খানের রচনায়ও তার উপস্থিতি বিদ্যমান। ষোড়শ শতকের এ জাতীয় কবি দৌলত উজির বাহরাম খান, সাবিরিদ খান ও মুহম্মদ কবীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

দৌলত উজির বাহরাম খান

দৌলত উজির বাহরাম খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ও শের শাহের ভাই নিজাম শাহ শূরের (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রি.) দৌলত উজির বা অর্থ সচিব ছিলেন।[৫৪] দৌলত উজির বাহরাম খানের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় থেকে জানা যায় যে, তিনি চট্টগ্রামের ফতেহবাদ বা জাফরাবাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা মোবারক খান চট্টগ্রামের অধিপতির কাছ থেকে দৌলত উজির উপাধি পেয়েছিলেন। কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের প্রধান অমাত্য ছিলেন।[৫৫] বাহরাম খান শিশু বয়সে পিতৃহীন হন। 'চাটিগ্রাম অধিপতি মহামতি নৃপতি নেজাম শাহ সুর' কবিকে ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় দৌলত উজির খেতাব প্রধান করেন।[৫৬] ফারসি সাহিত্য হতে অনূদিত তাঁর কাব্যের নাম *লাইলী-মজনু*।

---

[৫৩] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯।

[৫৪] আহমদ শরীফ (সম্পা.), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-সংকলিত, *পুথি পরিচিতি* (ঢাকা: বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ৪৯৩; আবদুল করিম, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২৭।

[৫৫] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

[৫৬] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

লাইলী-মজনু

লাইলী ও মজনুর প্রেমকাহিনী সারা বিশ্ব জুড়ে পরিচিত। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবী লোকগাঁথা।[৫৭] কাহিনীটিকে ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য বিবেচনা করা হয়। ফারসিতে দশ জন কবি এ প্রেমকাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৫৮] ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দৌলত উজির বাহরাম খান *লাইলী-মজনু* কাব্য রচনা করেন বলে পণ্ডিতগণ ধারনা করেন।[৫৯] কবির রচিত *'লাইলী-মজনু'* কাব্য ফারসি কবি জামীর *লাইলী-মজনু* নামক কাব্যের ভাবানুবাদ।[৬০]

দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত *লাইলী-মজনুর* কাহিনী সংক্ষেপ হলো আমির-পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু বা পাগল নামে খ্যাত হয়। লাইলীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু উভয়ের বিবাহে আসে প্রবল বাধা; ফলে মজনু পাগলরূপে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে লাইলীর অন্যত্র বিয়ে হলেও তার মন থেকে মজনু সরে যায়নি। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এ মর্মস্পর্শী বেদনাময় কাহিনী অবলম্বনেই *লাইলী-মজনু* কাব্য রচিত। দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কাব্যের ভাবানুবাদ অবলম্বন করলেও তাঁর স্বাধীন রচনা এতে স্থান পেয়েছে। কাব্যটি সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করে বলেন:

> 'লায়লী-মজনু ফারসী কবি জামীর ঐ নামীয় কাব্যের ভাবানুবাদ। নিছক কাব্যরস, লিপিচাতুর্য, ভব্যতা ও শালীনতায় *'লাইলী মজনু'*র সমকক্ষ কাব্য খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে একটিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।' [৬১]

ড. আহমদ শরীফ লাইলী মজনু কাব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

> প্রথমত, এটি যথার্থ ট্র্যাজেডি.....এ কাব্য-কাহিনী অলৌকিকতামুক্ত প্রায় স্বাভাবিক জীবনভিত্তিক। কাব্যটি আশ্চার্যভাবে অশ্লীলতা মুক্ত। ফারসি প্রণয়কাব্যগুলি সাধারণত অধ্যাত্মরূপকাশ্রিত। কিন্তু দৌলত উজিরের কাব্য নিছক মানবিক প্রণয়োপাখ্যান। .....লোকশ্রুত পুরানো কাহিনীর স্বাধীন অনুসৃতি। গীতিনাট্যের আকারে বিন্যস্ত ঋতু পর্যায় বর্ণন।[৬২]

---

[৫৭] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, ৮ম সংস্করণ (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০০৯), পৃ. ১৩৮।

[৫৮] ১. নিযামী গানজুবী ৫৮৪ হি. বা ১১৮৮ খ্রি. ২. আমীর খসরু (দিল্লী) ১২৯৮ খ্রি. ৩. আবদুর রহমান জামী (ইরান) ১৪৮৪ খ্রি. ৪. আবদুল্লাহ হাতিভী (ইরান) ১৫১১ খ্রি. ৫. হিলালী আস্ত্রাবাদী (আস্ত্রাবাদ) ১৫৩৩ খ্রি. ৬. দামিরী (ইরান, শাহ-তামাম্পের সভাকবি) ১৫২৪-৭৬ খ্রি. ৭. মীর্জা মুহম্মদ কাসেম কাসেমী গুণাবাদী (খোরাসান) ৯৭৯ হি. বা ১৫৭২ খ্রি. ৮. মীর মুহম্মদ আমীর শাহ বোস্তানী ওরফে মীরজুমলা (ইরান, ভারতে শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সেনানী) ১৬৮৯ খ্রি. ৯. জনৈক হিন্দু কবি (শাহজাহানের আমলে) ১৬৪৫ খ্রি. ১০. আরিফ লাহোরী (আওরঙ্গজেবের নামে উৎসর্গিত গ্রন্থনাম মিহির-ই-ওয়াফৎ) ১৬৬০-১৭০৭ খ্রি.।

[৫৯] ড. মুহম্মদ এনামুল হক এর মতে ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ খ্রি. মধ্যে দৌলত উজির বাহরাম খান *লাইলী-মজনু* কাব্য রচনা করেছিলেন। (ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।) ড. আহমদ শরীফ ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ খ্রি. মধ্যে কাব্যের রচনাকাল বলে উল্লেখ করেন। ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮।

[৬০] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫; অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

[৬১] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

[৬২] ড. আহমদ শরীফ (সম্পা.), *লায়লী-মজনু* (ঢাকা: বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৬), পৃ. ৫৩-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের কবিদের কবিতায় অশ্লীলতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও এবং দৌলত উজির তাঁর কাব্যে অশ্লীল রস পরিবেশন করার সুযোগ পেলেও তা গ্রহণে বিরত থেকে তার কাব্যকে সুরুচির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন।

সাবিরিদ খান

রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি হিসেবে সাবিরিদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ কবির নাম শাহ বারিদ খান মনে করেন। তবে কবির প্রায় সব ভণিতায় তাঁর নামের বানান 'সাবিরিদ' পাওয়া যায়।[৬৩] কবির কাব্যের যে সব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা খণ্ডিত বলে তা থেকে কবির ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। কবি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, কবির পিতা নানুরাজা মলিকের কৃতিত্বেই চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ইছাপুর পরগনার নানুপুর গ্রাম স্থাপিত হয় এবং তাঁর নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ করা হয়।[৬৪] কবির অনুলিখিত পুঁথিগুলোও চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানেই কবির জীবন অতিবাহিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছে। ড. আহমদ শরীফের মতানুসারে সাবিরিদ খান ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।[৬৫] তিনি *বিদ্যাসুন্দর*, *রসূল বিজয়* ও *হানিফা-কয়রাপরী* কাব্য রচনা করেন।

হানিফা-কয়রাপরী

কবির কাব্যটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে বলে কাব্যের নাম নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ কাব্যের নামকরণ করেছেন *'হানিফার দিগ্বিজয়'*[৬৬] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ '*মোহাম্মদ হানিফা ও কয়রাপরী'* এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হক *'হানিফা ও কয়রাপরী'*[৬৭] নাম ব্যবহার করেছেন। কবির খণ্ডিত কাব্য থেকে কাহিনীর উৎস সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি। ফারসি সাহিত্যে হজরত আলী-তনয় মোহাম্মদ হানিফার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনে নানা উপাখ্যান রচিত হয়েছে। কবি ফারসি কাহিনী অবলম্বনেই তা রচনা করেছেন।[৬৮] এ কাহিনীর সার-সংক্ষেপ হলো হযরত আলীর পুত্র মুহম্মদ হানিফা কাহিনীর নায়ক। জয়গুনের সঙ্গে হানিফার পরিণয় হয় এবং দিগ্বিজয়ী হিসেবে উভয়েই বহু রাজাকে পরাজিত করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। তাঁদের এ বীরত্ব কাহিনী ছাড়াও হানিফার সঙ্গে কয়রাপরীর প্রণয়কাহিনী এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

---

[৬৩] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫।
[৬৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।
[৬৫] ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ১৮৩।
[৬৬] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *শা'বারিদ গ্রন্থাবলী* (ঢাকা: বাঙলা একাডেমী. বর্ধমান হাউস, ১৯৬৬), পৃ. হ।
[৬৭] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।
[৬৮] আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ কবীর

মুহম্মদ কবীর ষোড়শ শতকের শেষপাদের কবি। ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে মুহম্মদ কবীর *মনোহর মধুমালতী* নামে কাব্য রচনা করেন।[৬৯] মুহম্মদ কবীর রচিত কাব্যে কবির ব্যক্তিপরিচয় ও কোন পৃষ্ঠপোষকের কথা উল্লেখ না থাকার কারণে কবি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবির নামে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত হওয়ায় এবং তাতে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার কতগুলো শব্দের উল্লেখ থাকায় ড. আহমদ শরীফ কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে অনুমান করেছেন।[৭০]

মনোহর মধুমালতী

এ পর্যন্ত *মনোহর মধুমালতী*র রচয়িতা হিসেবে ছয়জনের সন্ধান পাওয়া যায়: মুহাম্মদ কবীর, শাকির মাহমুদ, সৈয়দ হামজা, গোপীনাথ দাস, মুহম্মদ চুহর ও জোবেদ আলী।[৭১] ড. ওয়াকিল আহমদ এর মতে মুহম্মদ কবীর ছাড়াও ফারসিতে নাসির আলী (১৬৪৯ খ্রি.) মীর আশকারী (১৬৫৫ খ্রি.) ও মুন্সী আলী রজা-এ কয়েকজন কবি মধুমালতী কাব্য রচনা করেছিলেন।[৭২] মধুমালতী কাব্য রচনা সম্পর্কে কয়েকজন গবেষকের মন্তব্য নিম্নরূপ। ড. ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন:

> 'বাংলা মধুমালতী রচনায় মুহম্মদ কবীর কার কোন গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুসরণ করেছিলেন তার স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, তবে তিনি কোন এক হিন্দি কবি অথবা ফারসি কবির কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন তা সুনিশ্চিত।'[৭৩]

এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন:

> কাব্যটি ফারসি হইতে অনূদিত হইয়াছিল, না হিন্দি হইতে অনূদিত হইয়াছিল, তাহাতে আর এক সমস্যা। মনে হয়, মূল গল্পটি হিন্দিতে ছিল, কোন ভারতীয় মুসলমান কবি এই মূল হিন্দি হইতে গল্পটিকে ফারসি ভাষায় কাব্যিক রূপ দিতে গিয়া পরী প্রভৃতি ইরানি উপাদান ঢুকাইয়া দেন। এই ফারসি কাব্য হইতেই বাংলায় কবি মুহম্মদ কবীর গল্পটি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।[৭৪]

মুহম্মদ কবীর *মধুমালতী* কাব্য যে কোন ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে রচনা করেছেন তার প্রমান প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। যেমন:

> মোহাম্মদ কবিরে কহে মনকুতুহলি।
> আছিল ফারসি ছন্দ রচিল পঞ্চলি ॥

---

[৬৯] আজহার ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।
[৭০] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।
[৭১] আহমদ শরীফ (সম্পা.), মুহম্মদ কবীর বিরচিত *মধুমালতী* (ঢাকা: বাঙলা একাডেমী, ১২৬৬ বাংলা), পৃ. ভূমিকা।
[৭২] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।
[৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯।
[৭৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ কবিরে কহে মনকুতুহলি।
আছিল ফারসি কিতাব করিল হিন্দুয়ালি॥[৭৫]

মধুমালতী কাব্যে বাস্তব অবাস্তব উভয় শ্রেণীর কাহিনী স্থান পেয়েছে। কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভান ও রানী কমলাসুন্দরীর পুত্র মনোহর মহারসরাজ্যের অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা মধুমালতীর প্রতি পরীজাদীদের ষড়যন্ত্রে প্রণয়াসক্ত হয়। ক্ষনিক মিলনের অবসানে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর দীর্ঘ দুঃখময় সাধনা শেষে তাদের মধুর মিলন ঘটে।[৭৬] কাব্যে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার সমাবেশও লক্ষ্য করা যায়।

৩.৪.৩ সপ্তদশ শতক

সপ্তদশ শতক মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদানে ধন্য। বিশেষ করে রোসাঙ্গে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের চর্চা তখন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ কবির গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি বাংলা সাহিত্যের জাতীয় সম্পদ। নিম্নে সপ্তদশ শতকের উল্লেখযোগ্য কবিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

আলাওল

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গ শহরকে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতকে বাংলা সাহিত্যচর্চার স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয়। আরাকানের অধিবাসীরা বাংলা ভাষায় কথা বলতো এবং এ ভাষাই ছিল তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির বাহন। রোসাঙ্গে যে কয়েকজন বাঙালি বাংলা ভাষায় সৃজনশীল সাহিত্যচর্চা করেন এবং যাদের কাব্যসৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তন্মধ্যে কবি দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন ঠাকুর অন্যতম।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাধর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল এর জন্ম সম্পর্কে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন যে, আলাওল ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৭] অনেকেই তাঁর এ মতকেই সমর্থন করেন, তবে মতান্তরের অবসান হয়নি। যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে আলাওল ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৮] ড. আহমদ শরীফের মতে আলাওল ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৯] মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এ শ্রেষ্ঠ কবি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারি

---

[৭৫] আহমদ শরীফ (সম্পা.), মুহম্মদ কবীর বিরচিত *মধুমালতী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ঘ।
[৭৬] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-১৬৮।
[৭৭] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১।
[৭৮] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, খণ্ড ২ (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. ২২০।
[৭৯] ড. আহমদ শরীফ, *তোহ্‌ফা* (ঢাকা: সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৪), পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার জোবরা গ্রামে (মতান্তরে ফরিদপুর জেলার ফতেয়বাদ পরগনার জারালপুর গ্রামে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের অধিপতি মজলিস কুতুবের একজন অমাত্য। অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসেবে আলাওল বাল্যকালে বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। যুদ্ধবিদ্যা ও সঙ্গীত বিষয়েও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। আলাওল ছোট বেলায় তাঁর পিতার সাথে নৌকাযোগে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁর পিতা নিহত হন এবং আলাওল আহত ও বন্দি অবস্থায় আরাকানে (বার্মা) উপনীত হন। আলাওলের কর্মজীবন শুরু হয় আরাকানে একজন দেহরক্ষী হিসেবে এবং পরবর্তীকালে মহন্তের গৃহে নাটগীত ও সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষকতা করেন।[৮০]

ফারসি থেকে বাংলায় অনূদিত আলাওলের রচনাবলী হল *সপ্তপয়কর*, *সিকান্দারনামা*, *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* এবং *তোহফা*।

সপ্তপয়কর

সপ্তপয়কর নিজামী গানজুবী রচিত ফারসি *হাফ্‌ত পেইকর* গ্রন্থের অনুবাদ। *হাফ্‌ত পেইকার* নামের মূল গ্রন্থটির ফারসি উচ্চারণ, *হাফ্‌ত পেইকার* যার বাংলা অর্থ সপ্তদেহ। *বাহরাম নামা* নামেও গ্রন্থটির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে *মসনবী* বা দ্বিপদী কবিতাকারে নিযামী গানজুবী ৫৯৩ হি. মোতাবেক ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেন।[৮১] এতে মোট ৪৭০০ টি পংতি রয়েছে।[৮২] এ গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে সাসানীয় (২৪০-৫৭৮ খ্রি.) শাহজাদা বাহরামগূর (৪২০-৪৪৪ খ্রি.) শাহী মহলের খুরনাক নামক একটি একান্ত ও গোপন কক্ষে সাতটি ভিন্ন রাজ্যের শাহজাদীর ছবি দেখতে পায়। সে সব শাহজাদীর সান্নিধ্য পেতে চায়। বাহরামগূরের পিতা ইয়াযদগারীদের মৃত্যুর পর সে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভাবতে থাকে: কবে এ অপরুপ সুন্দরীদের ছবির পরিবর্তে স্বয়ং তারা নিজেরাই এসে রাজ প্রাসাদের সৌন্দর্য বর্ধিত করবে। এ সাত রাজকন্যার কাহিনী নিজামী রচিত *হাফত্ পয়কর* বা আলাওল অনূদিত *সপ্তপয়কর* গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

আলাওল ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান রাজ্যের অন্যতম সচিব সৈয়দ মুহম্মদ মুসার আদেশে পারস্যের মহাকবি নিজামী গানজুবীর *হাফত্ পেইকার* নামক কাব্যের অনুবাদ করেন। সৈয়দ মুহম্মদের সহায়তায় যে তিনি কাব্যটি বাংলায় রূপান্তর করেছিলেন এ বিষয়ে কবির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

---

[৮০] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ১ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৮২।
[৮১] মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদবনামায়ে ইরান*, খণ্ড ১ (লাহোর: এইচ ডি প্রিন্টাস, তা.বি.), পৃ. ৩৮৪।
[৮২] পারভীন শাকিবা, *শে'রে ফারসি আ'য অ'গা'য তা এমরোয*, ২য় সংস্করণ (তেহরান: এন্তেশারাতে হিরমান্দ, ১৯৯৪) পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

তান সভাসদ থাকি সভাসদ হইয়া।
শাস্ত্রনীতি রস কথা প্রসঙ্গ কহিয়া ॥
একনিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশয়।
আমা প্রতি কৈল্যা আজ্ঞা হরষিত মনে।
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে ॥
সপ্তকর কথা অতি মনোহর।
....
ভকতি প্রণতি করি গুরুর চরণে
নিজ গুণে শোধিও বিচারী পাইলে দোষ।
বিনি অবধানে না হইও অসন্তোষ॥
গ্রন্থের গ্রন্থন কর্ম ছোট শক্তি নয়।
মহাজনে তার মাত্র মরম বুঝয়॥[৮৩]

আলাওল *হাফত্ পেইকারের* অনুবাদ করার সময় আক্ষরিক অনুবাদ করেননি; তিনি প্রয়োজনবোধে সংক্ষেপ করেছেন এ ক্ষেত্রে কবির স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য:

নিজামী গঞ্জবী শাহা পুরুষ মোহন্ত।
সেই সব বাখান বহুল কহিছেন্ত ॥
প্রয়োজন অল্প অল্প কহিলে সে কথা।
নানা কথা প্রবন্ধে বহুল হয় পোথ ॥
তেকারনে তেজিলুঁ সেসব আলঝাল।
কার্য অনুরোধ মাত্র কহিতে রসাল ॥[৮৪]

সিকান্দারনামা

সিকান্দার নামা-এর মূল ফারসি উচ্চারণ *এসকান্দার না'মে*। গ্রন্থটি দু'টি অংশে বিন্যস্ত। প্রথম অংশের নাম *ইকবাল নামে* বা *ইকবাল নামা* দ্বিতীয় অংশের নাম *খেরাদ নামে* গ্রন্থটি ৫৯৭ হি./ ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করা হয়।[৮৫]

নিজামী রচিত ফারসি *'সিকান্দর নামা'* কাব্য 'নবরাজ' উপাধিধারী মজলিস নামক রাজ-অমাত্যের নির্দেশানুযায়ী আলাওল অনুবাদ করেন। এ কাব্যের রচনা শুরু হয় আরাকান রাজকর্তৃক রাজা নিহত হওয়ার ১০/১১ বছর পরে অর্থাৎ ১৬৭০-৭১ খ্রিষ্টাব্দে।[৮৬] নিজামী রচিত *সিকান্দর নামা* কাব্য গ্রন্থটি

---

[৮৩] মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা (সংকলন ও সম্পা.), *আলাওল রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), ভূমিকা, পৃ. ৩৯।

[৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. বায়ান্ন।

[৮৫] মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদবনামায়ে ইরান*, পৃ. ৩৮৪।

[৮৬] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩; ওয়াকিল আহমদ, *মহাকবি আলাওল জীবন ও কাব্য* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১০), পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ করার সময় কবির ইচ্ছা ছিল আক্ষরিক অনুবাদ করা কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। যেমন আলাওল তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে বলেন:

> নিযামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ।
> ভাঙ্গিয়া কহিলে তাহে আছে বহুরস ॥
> সমুদ্র সঞ্চারসম গ্রন্থের গ্রন্থন।
> বিশেষ ফারসি ভাষের বয়াত ভাঙ্গন ॥
> মহন্ত নিযামীবাক্য ইঙ্গিত আকার।
> বিশেষতঃ পঞ্চভাষ কিতাব মাঝার ॥
> আরবী ফারসী আর নসরানী এহুদী।
> পহলবী সঙ্গে পঞ্চভাষের অবধী ॥[৮৭]

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

মাগন ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে আলাওল *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* কোনো এক ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে রচনা আরম্ভ করে সৈয়দ মুসার আদেশে এ কাব্য সমাপ্ত করেন। পরী ও মানুষের প্রেম কাহিনী নিয়ে *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* নামক কাব্যটি রচিত। কাব্যটি প্রায় রূপকথা ধরনের। তবে আলাওলের রচনায় চমৎকার বর্ণনার গুণে এ কাব্য বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* গ্রন্থকে ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ফারসি সাহিত্যের অনুবাদ বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে এ বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফের বক্তব্য নিম্নরূপ:

> সয়ফুলমুলুক ও বদিউজ্জামাল আলেফ লায়লার বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় উপাখ্যানগুলোর একটি। আলেফ লায়লার ৭৫৭তম রজনীতে এ উপাখ্যানের শুরু এবং ৭৭৮তম রজনীতে এর সমাপ্তি। এই রোমাঞ্চকর প্রণেয়োপাখ্যান নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে ফারসী ও তুর্কী ভাষায়। কবিগণ নিজেদের ভাষায় ও নিজেদের কথায় এই উপাখ্যান বিবৃত করেছেন বটে, কিন্তু এ কাহিনী জগদ্বিখ্যাত বলেই হয়তো কেউ সাহস করে নিজের নাম রচনার সঙ্গে যুক্ত করেননি।[৮৮]

তোহফা

আলাওল ফারসি সুফী কবি সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর (চর্তুদশ শতাব্দী) বিখ্যাত গ্রন্থ *তোহফাতুল নেসায়েহ* বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন *তোহফা* নামে। শেখ ইউসুফ তাঁর পুত্র আবুল ফতেহ এর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আরবী গ্রন্থ অবলম্বনে ফারসি কাব্যটি ১৩৯২ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন।[৮৯] আলাওল রাজ-অমাত্য শ্রীমন্ত সোলায়মানের নির্দেশে এ ফারসি কাব্য বাংলায় ভাষান্তর করেন।[৯০] ইসলামের

---

[৮৭] *আলাওল রচনাবলী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

[৮৮] দোনাগাজী বিরচিত, আহমদ শরীফ (সম্পা.), *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), ভূমিকা, পৃ. ১।

[৮৯] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১০২।

[৯০] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানুযায়ী 'ফরজ, সুন্নত এবং শিষ্টাচার' সম্বন্ধে আলোচনাই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বাংলা ভাষায় মুসলিম ধর্মীয় কাব্যের ইতিহাসে এ কাব্যের ঐতিহাসিক ও আদর্শিক মূল্য অপরিসীম। অনূদিত *তোহফা* গ্রন্থ সম্পর্কে আলাওলের বক্তব্য নিম্নরূপ:

শ্রীযুত ইউসুফ গদা পুরুষ মহন্ত।
কিতাব তোহফা নামে রচিলা সুছন্দ ॥
আবুল ফতেহ নামে পুত্রগুণবান।
রচিলা তোহফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান ॥
কিতাব তোহফা জান শরিয়ত ঘর।[৯১]

আলাওলের *তোহফা* কাব্যের দু'টি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পাঠটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকায় ১৩৬৪ সনের শীত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ড. গোলাম সামদানী কোরায়শী সম্পাদিত *তোহফা* কাব্যটি বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৯২] এ কাব্যে আলাওল বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কারের চরিত্র রূপায়ণ করতে গিয়ে হিন্দুর সমাজ-সংস্কৃতিরও যথাযথ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন তাঁর কাব্যমাধুর্য একটুও ম্লান হয়নি।[৯৩] নিঃসন্দেহ তা তাঁর অনন্য কাব্য প্রতিভার দৃষ্টান্ত বহন করে।

দোনা গাজী চৌধুরী

দোনা গাজী আলাওলের পূর্ববর্তী কবি। কবির বাসস্থান চাঁদপুর জেলার কোন এক গ্রামে ছিল বলে অনুমান করা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাল নির্ণয় ও তাঁর কাব্যের ভাষা প্রসংঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

> 'আমাদের ধারণা কবি দোনা গাজী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় প্রাকৃত-ভাব, ছন্দের শিথিলতা, অন্ত্যানুপ্রাসের শৈথিল্য এবং প্রাচীন শব্দপ্রয়োগের বাহুল্য সমস্তই এক সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতার যুগের মুসলিম কবিদের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।[৯৪]

ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে রচিত দোনা গাজীর গ্রন্থ হলো *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*।

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল

সয়ফলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যের কাহিনীর আদি উৎস *আলেফ লায়লা* বা আরব্য উপন্যাস।[৯৫] এ কাহিনী অবলম্বনে ফারসিতে কাব্য রচিত হয়েছিল। এ কাহিনীটি প্রেমমূলক কাহিনী কাব্য হিসেবে পরিচিত

---

[৯১] *আলাওল রচনাবলী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।
[৯২] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।
[৯৩] শরীফ হারুন (সম্পা.), *বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৪৩।
[৯৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।
[৯৫] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

যা দোনা গাজী ফারসি কাব্য অনুসরণেই রচনা করেন।[৯৬] এ কাহিনীর সার-সংক্ষেপ হলো পরীরাজকন্যা বদিউজ্জামাল এর ছবি দেখে মিশর রাজপুত্র সয়ফুলমুলুক তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। মন্ত্রীপুত্র সায়েদের সহায়তায় বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সয়ফুলমুলুক, বদিউজ্জামালের সাক্ষাৎ পায় এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। *সয়ফলমুলুক বদিউজ্জামাল* কাব্যের কাহিনী রচয়িতা হিসেবে দোনা গাজী, আলাওল, বিরাহিম (ইবরাহীম) ও মুনশী মালে মুহাম্মদ এ চারজনের নাম জানা যায়।[৯৭] তবে এদের মধ্যে দোনা গাজীই এ কাব্যের আদি কবি হিসেবে পরিচিত।[৯৮]

আবদুল হাকিম

আবদুল হাকিম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন পরিচিত কবি। কবি আবদুল হাকিম ১৬০০-১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। কবির নিবাস ছিল বর্তমান নোয়াখালী জেলার অধীন বাবুপুর।[৯৯] বাবুপুর সেকালে সমৃদ্ধ পরগনা বলে পরিচিত ছিল। কবির পিতার নাম আব্দুর রাজ্জাক এবং পীরের নাম শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ।[১০০] অনুমান করা হয়, কবির নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলো সপ্তদশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে সপ্তম দশকের মধ্যে রচিত।[১০১] আরবী, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী আবদুল হাকিম রচিত গ্রন্থের মধ্যে এ পর্যন্ত পাঁচটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[১০২] যথা: *ইউসুফ-জোলেখা*, *নূর নামা*, *দুররে মজলিশ*, *লালমোতি সয়ফুলমূলক* ও *হানিফার লড়াই*। উল্লেখ্য যে এর অধিকাংশই কুমিল্লা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে।[১০৩]

ইউসুফ-জোলেখা

মোল্লা জামীর ফারসি গ্রন্থ *ইউসুফ ওয়া জুলাইখা* অনুসরণে আবদুল হাকিম আনুমানিক ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনা করেন।[১০৪] যেমন এ প্রসঙ্গে আবদুল হাকিম বলেন:

> মোল্লা জামীর বাক্য সিরেত লইয়া।
> আবদুল হাকিম কহে বাঙ্গালা রছিয়া ॥
> ইসুফ জলিখা কিচ্ছা হইল সমপ্ত।
> ফারছি কিতাপ ভাঙ্গি পদস্থ ॥[১০৫]

---

[৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।
[৯৭] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৫।
[৯৮] আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৭৪।
[৯৯] রাজিয়া সুলতানা, *আবদুল হাকিমঃ কবি ও কাব্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৪৭।
[১০০] *প্রাগুক্ত*।
[১০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।
[১০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।
[১০৩] দ্র. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়-১* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)।
[১০৪] রাজিয়া সুলতানা, *আবদুল হাকিম: কবি ও কাব্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

লালমোতি সয়ফুলমুলক

আনুমানিক ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন লোক কাহিনী ও রূপকথার সমন্বয়ে আবদুল হাকিম *লালমোতি সয়ফুলমূলক* গ্রন্থটি রচনা করেন। *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যের ন্যায় এটিও রোমান্টিক উপাখ্যান। লালমোতির কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও কবি ফারসি কবি নিযামীর *সিকান্দর নামা* কাব্যের সাথে এ কাব্যের একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। এ কাব্যের কয়েকটি নামান্তর পাওয়া যায়। *যেমন লালমতির কিচ্ছা* ও *লালবানু*।[১০৬]

নুর নামা

নুর নামা ধর্ম বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি *নুর নামা* নামক ফারসি কাব্যের আংশিক বা পুরোপুরি ভাবানুবাদ।[১০৭] *নুরনামার* মূল বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, স্রষ্টা আপন আলো থেকে কিভাবে হজরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন তারই কাহিনী। এ কাব্যের শুরুতে রয়েছে আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা। অতঃপর তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী-অংশে নূরনবী মুহাম্মদের সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। তারপর বর্ণিত হয়েছে বাদ (বাতাস), আব (পানি), আতশ (আগুন) এবং খাক (মাটি)-এর সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহর কথোপকথন। আব, আতশ রসুলুল্লাহর যুক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে এবং নবীর ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরবর্তীতে কবি কলম ও কলেমা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এরপর *নুরনামা* গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।[১০৮]

দুররে মজলিশ

আবদুল হাকিমের বহুল পঠিত কাব্য। সাইফুজ জাফর রচিত ফারসি কাব্য *দুররুল মজলিশ*-এর ছায়া অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। *দুররে মজলিশ* নীতিশাস্ত্র বা ইসলামের বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত গ্রন্থ। এই সুবৃহৎ কাব্যটি ৩৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত। উক্ত অধ্যায় সমূহে মহানবী, বিভিন্ন পয়গম্বর, সাধক, খলিফা এবং মনীষীর হিতোপদেশ, জীবনাদর্শ অথবা আদর্শ জীবনযাপনের প্রণালী বর্ণিত হয়েছে।[১০৯] আবদুল হাকিমের এ কাব্যের কয়েকটি নামান্তর পাওয়া যায়। যেমন: *সাহার নামা*, *সভার মুক্তা*, *শাহনামা*, *শাহাবুদ্দীন নামা*, *শিহাবুদ্দীন নামা*, *নসিহত নামা* ইত্যাদি।[১১০] কারো কারো মতে *শিহাবুদ্দীন নামা* তাঁর একটি কাব্য যা

---

[১০৫] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।
[১০৬] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮।
[১০৭] রাজিয়া সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।
[১০৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১১৫।
[১০৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।
[১১০] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি ধর্মীয় পুস্তকের সারসংক্ষেপ। কবির পীর শিহাবুদ্দীনের নামে গ্রন্থটি উৎসর্গীত হয়।[১১১] কবি আরবী, ফারসি ও বাংলা সম্পর্কে যে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন তা নিম্নরূপ:

আরবি পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান ॥
আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিৎ
ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত ॥
ফারছি পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥
ফারছি এলেম হয় আরবী তনয়।
আরবির অনুরূপ ফারছি লিখয় ॥
হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারছি নন্দন।
পুস্তকের লিখিয়ে (আমি) ফারছি কথন ॥
এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার।
নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার ॥[১১২]

শাহ গরীবুল্লাহ

ইসলামী বাংলা সাহিত্য বা দোভাষী পুঁথির অদ্বিতীয় কবি শাহ গরীবুল্লাহ। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার হাফেজপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম শাহ সৈয়দ আজমতুল্লাহ। স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি ফুলওয়ারী শাহ ওরফে দুন্দি নামে পরিচিত। অদ্যাবধি হাফেজপুরে শাহ দুন্দির মাজার তাঁর বংশধরেরা সযত্নে রক্ষা করে আসছেন। গরীবুল্লাহর মাজার হাফেজপুরের সামান্য দূরে নাইকুলী গ্রামে অবস্থিত। শাহ গরীবুল্লাহর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন:

> শাহ গরীবুল্লাহ্ বালিয়া হাফিযপুর নির্বাসী ছিলেন। এই হাফিযপুর হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালিয়া পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই হাফিযপুর বর্তমানে ডাকঘর পাতিহালের অন্তর্গত। তাঁহার রচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি দুন্দির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বড়ে খান গাযী তাঁহার মদদগার বা সহায় ছিলেন।[১১৩]

কবি ছিলেন আত্মপরিচয় বিমুখ। যে কারণে তাঁর রচিত কাব্যের কোথাও কবির জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবুও তাঁর জন্মস্থান, পিতার নাম, পিতার কর্মজীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায় তাঁর রচিত *জঙ্গনামা* ও তাঁর শিষ্য সৈয়দ হামজা বিরচিত *আমীর হামজা* (দ্বিতীয় খণ্ড) কাব্য গ্রন্থে।[১১৪]

---

[১১১] আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ১২৬।
[১১২] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯।
[১১৩] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯।
[১১৪] আল্লাহ মকবুল শাহা গরীবুল্লাহ নাম/ বালিয়া হাফিজুর যাহার মোকাম ॥

Dhaka University Institutional Repository

কবি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী সম্ভবত বিনয় প্রকাশ করার জন্যই তিনি প্রতিটি কাব্যের ভণিতায় তাঁর নামের পূর্বে বা পরে ফকীর ও দেওয়ান উপাধি ব্যবহার করেন। *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যে কবি অসংখ্য ভণিতা ব্যবহার করেছেন।[১১৫] কবি তাঁর *সত্যপীরের পুঁথি* শীর্ষক কাব্যের একাধিক স্থানে 'দেওয়ান' ভণিতাটি ব্যবহার করেছেন।[১১৬]

ড. মুহম্মদ এনামুল হক গরীবুল্লাহর মাত্র তিনটি গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। এগুলো হলো- *ইউসুফ জোলেখা, সত্যপীর* এবং *মুক্তাল হোসেন* বা *জঙ্গনামা*।[১১৭] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গরীবুল্লাহর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি বলে উল্লেখ করেছেন যেমন- *ইউসুফ জোলেখা, জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি* ও *আমীর হামজা* (প্রথম খণ্ড)।[১১৮] তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা যে পাঁচটি সে সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান,[১১৯] ড. আহমদ শরীফ,[১২০] ড. গোলাম সাকলায়েন [১২১] প্রমূখ গবেষক একই মত প্রকাশ করেন।

গরীবুল্লাহর *'জঙ্গনামা'*র কাহিনী-উৎস ফারসি কাব্য। কবি নিজেই বলেছেন:

ফারসী কেতাব ছিল মোক্তাল হোসেন।
তাহা দেখি কবিতায় করিনু রচনা ॥
রচিতে কবিতা যদি খাতা মুঝে হয়।
মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায় ॥
রচনের জুট ছাচ্চা আমি নাহি দেখি।
কেতাবে যেমন আছে তাহা আমি লিখি ॥[১২২]

গরীবুল্লাহ রচিত পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনটিই ফারসি কাব্য অবলম্বনে রচিত। যেমন *ইউসুফ জোলেখা, আমীর হামজা* এবং *জঙ্গনামা*। এ তিনটি কাব্যের কোনটিই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, সবগুলোই মূল কাব্যের ভাবানুবাদ। এটিই হচ্ছে মধ্যযুগের মুসলিম রচিত অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এককালে তাঁর রচনা চট্টগ্রাম হতে বার্মা পর্যন্ত ব্যাপকভাবে পড়া হতো। সে সময়

আছিল রওশন দেল শায়েরি জবান/ যাহাকে মদদ গাজী শাহী বড় খান ॥
শায়েরি করিলেন পুথি আমীর হামজার/ না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেচ্ছার ॥ ড. অশোক কুণ্ড (সম্পা.), *শাহ গরীবুল্লাহ বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা* (কলকাতা: বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থা, ১৯৮৯), পৃ. ৪৩।

[১১৫] অধীন ফকির কহে কিতাব কালাম/ এই সব মিথ্যা নহে ইলাহীর নাম ॥
হামেশা মোরশেদ পায়ে করিয়া সালাম/ ফকির গরীব কহে কেতাবে বালাম ॥ ড. অশোক কুণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩।

[১১৬] শোন হে মোমিন ভাই কহেন দেওয়ান/ এইবারে সুন্দরে করিল সাতখানা ॥
দেওয়ান কহেন শুন সাধুর কুমার/ মককায় যাইব আমি তুমি যাও ঘর ॥ মুহম্মদ আবদুল জলিল *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ১৪।

[১১৭] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, সং-৩য় (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৯৬৫), পৃ. ২২০।

[১১৮] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, খণ্ড ২ (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. ২৯৬-৩০২।

[১১৯] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪), পৃ. ২৫-২৬।

[১২০] ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৯।

[১২১] গোলাম সাকলায়েন, *ফকীর গরীবুল্লাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৬৮ বাংলা), পৃ. ২০।

[১২২] মুহম্মদ আবদুল জলিল, *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পরাজিত মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে সামরিক স্পৃহা জাগ্রত করার জন্য এ সকল বীর কাহিনীগুলো ব্যাপকহারে প্রচারিত হয়েছিল।[১২৩] অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে শাহ গরীবুল্লাহর বড় পরিচয় দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের নির্মাতা হিসেবে। তিনিই প্রথম হাওড়া, হুগলী, ভুরসুট, কলকাতা ও মান্দারণ নগর কেন্দ্রিক অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত মুসলিম জনগণের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার সাথে আরবী-ফারসি উর্দু-হিন্দী ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে এক ভিন্ন ধারার কাব্যরীতি গড়ে তোলেন। তাঁর এ ধারার অনুসরণ করে প্রথমকাব্য রচনা করেন সৈয়দ হামজা; পরবর্তীকালে মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, আরিফ, জনাব আলী, আবদুর রহিম, মনিরুদ্দিন, আয়েজুদ্দিন, মহম্মদ মুনশী, তাজউদ্দিন, দানিশ, রেজাউল্লাহ, সা'দ আলী, আবদুল ওহাব প্রমুখ কাব্য রচনা করেছেন।[১২৪]

নওয়াজিস খান

সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রামে যে কয়জন কবি জন্মলাভ করেন তন্মধ্যে নওয়াজিস খান অন্যতম। কবি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার সুখছড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[১২৫] কবির বংশধর আতাউল্লাহ পণ্ডিতের কাছে রক্ষিত বংশ তালিকা থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[১২৬] নওয়াজিস খানের পেশা ছিল খোন্দকারী তথা মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে শিক্ষকতা ও পাল-পার্বণে মোল্লার কাজ করা।[১২৭] ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে তার রচিত গ্রন্থ হলো *গুলে বকাওলী*।

গুলে বকাওলী

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারায় *গুলে বকাওলী* কাব্যটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলা ভাষা ছাড়া হিন্দী ফারসি উর্দু ভাষায়ও এ কাব্য রচিত হয়েছিল। নওয়াজিস খান চট্টগ্রামের বানীগ্রামের জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে *গুলে বকাওলী* রচনা করেন।[১২৮] শেখ ইজ্জতুল্লাহ্ নামে জনৈক বাঙ্গালী লেখক ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় *গুলে বকাওলী* গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গদ্যে রচিত এ গ্রন্থের কাহিনী নওয়াজিস খান কাব্যরূপ দিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ড. আহমদ শরীফের মতে কবি নওয়াজিস খান কাব্যটি ফারসি থেকে অনুবাদ করেছিলেন।[১২৯]

---

[১২৩] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (ঢাকা: হাসি প্রকাশনালয়, ২০০২), পৃ. ২২৫।
[১২৪] ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ৪৮৫।
[১২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪; আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩১১।
[১২৬] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০।
[১২৭] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ২৪৮।
[১২৮] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।
[১২৯] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াজিস খান কিতাব দেখে তাঁর *গুলে বকাওলী* রচনা করেছেন। কবি বলেন:

> মহন্তের আজ্ঞা মন-পাটেত রাখিয়া
> হীন নওয়াজিসে কহে কিতাব দেখিয়া।[১৩০]

এ গ্রন্থ ফারসি ভাষায় রচিত বলেই মনে হয়।[১৩১] ফারসি ভাষায় রচিত একমাত্র কাব্য হচ্ছে শেখ ইজ্জতউল্লাহ্ বাঙ্গালী রচিত *বকাওলী* যা ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। ইজ্জতউল্লাহ্ বাঙ্গালী রচিত ফারসি *গুলে বকাওলির*ই অনুসরণ করে উর্দু ভাষায় কয়েকটি কাব্য ও নাটক রচিত হয়েছে।[১৩২] কাজেই মনে হয় নওয়াজিসের *গুলে বকাওলী*ও ইজ্জতউল্লাহ বাঙ্গালীর গ্রন্থেরই স্বাধীন অনুসৃতি। অতএব, কবি নওয়াজিস খান ১৭৩০ থেকে ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।[১৩৩]

গুলে বকাওলী কাব্যের অপরাপর রচয়িতাগণের মধ্যে রয়েছেন চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ মকীম ও কবি মুহম্মদ আলী। উনিশ ও বিশ শতকে পদ্যে গদ্যে কলকাতায় আরো কয়েকটি[১৩৪] *গুলে বকাওলী* রোমান্স রচিত হয়; যা এ কাব্যের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে।

সয়্যিদ মুহম্মদ আকবর

সয়্যিদ মুহম্মদ আকবর (১৬৫৭-১৭২০ খ্রি.) ত্রিপুরা জেলার কবি বলে জানা যায়। তাঁর পুঁথির সমস্ত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরা জেলা হতেই সংগৃহীত।[১৩৫] কবি ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি ফারসি হতেই *জেবলমুল্‌ক্- শামারুখ'* উপাখ্যানের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।[১৩৬]

জেবল মুলুক সামারোখ

একমাত্র *জেবলমুল্‌ক্-শামারুখ* ব্যতীত তাঁর অন্য কোন কাব্য আবিষ্কৃত হয়নি। কাব্যটি বহু দিন পূর্বে কলকাতার বটতলা হতে মুদ্রিত হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হত এবং পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[১৩৭] তাঁর কাব্যটি প্রেমমূলক উপাখ্যান গ্রন্থ। কবি হামদ ও না'ত অংশে মুসলমানদের আল্লাহ ও

---

[১৩০] *প্রাগুক্ত*।

[১৩১] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ২৪৯।

[১৩২] ক. উর্দু রেখতা কাব্য 'তুহফা-ই-মজলিসে সালাতিন' ১৭৩৮ খ্রি. রায়হান রচিত উর্দু 'মসনবী খইয়াবান' ১৭৯৮ খ্রি. আমানত রচিত উর্দু নাটক ইন্দারসভ ১৮৫২-৫৩ খ্রি.।

[১৩৩] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ২৪৯।

[১৩৪] ক. গোলেবকাওলি ও তাজলকুমারের পুঁথি-এরাদত আলী বা উল্লাহ (১৮৪০ খ্রী.) খ. গুলেবকাউলি ইতিহাস-উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র (১৮৪০ খ্রী.) গ. গোলে বকাওলি-আবদুস শুকুর ওর্ফে মানিক মিয়া ঘ. (গদ্যে.) গোলেবকাওলি-বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৪ খ্রী.) ঙ. গুলে বকাওলী-সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯৪৯ খ্রী.) চ. নাটক: গোলে বকাওলী-কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭৮ খ্রী.) ছ. গোলে বকাওয়ালী-কুঞ্জবিহারী বসু (১৮৮১ খ্রী.)।

[১৩৫] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২।

[১৩৬] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

[১৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

পীর-পয়গাম্বরদের সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবী ও অবতারগণের অভিন্নত্ব স্বীকার করে সকলের বন্দনা করেছেন। কবি মাত্র ষোল বৎসর বয়সে *জেবলমুলুক সামারোখ* কাব্যটি রচনা করেন। কাব্য রচনা ও গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন:

কহন না জাএ দেখি বাঙ্গালার ভাস ॥
পারসি হইত জদি কহিত বাখানি।
কলা অব্দ বএসেতে রছিল কাহিনী ॥[১৩৮]

শেখ পরান

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড গ্রামের অধিবাসী শেখ পরান রচিত দু'টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়; গ্রন্থ দু'টি *নসীহত নামা* ও *নুরনামা*। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে *নসীহৎনামা* গ্রন্থটি কোন মৌলিক রচনা নয়। এটি এ জাতীয় কোন ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ অথবা ফারসি ভাষায় রচিত ধর্মীয় বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।[১৩৯] এ বিষয়ে শেখ পরানের বক্তব্য নিম্নরূপ:

ফারছি ভাষে সেই কথা আছিল লিখন
বাংলা ভাষায় কৈলুং বুঝিতে কারণ॥[১৪০]

মোহাম্মদ নসরুল্লাহ

কবি মোহাম্মদ নসরুল্লাহ্ প্রাচীন বাঙ্গালী মুসলিম কবিদের অন্যতম। *জঙ্গনামা* ও *শরীয়ৎনামা* উভয় কাব্যেই কবির সুদীর্ঘ আত্ম-বিবরণী রয়েছে। জানা যায়, কবির পূর্বপুরুষ বোরহানুদ্দীন খান গৌড় দরবারের অমাত্য ছিলেন।[১৪১] *মুসার সওয়াল*-এ কুহ-ই-তূরে হযরত মূসার (আ.) এর সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি ঐ নামীয় কোনো ফারসি কাব্যের অনুবাদ।[১৪২]

কমর আলী

কমর আলীর জন্মস্থান হচ্ছে চট্টগ্রামের 'করলডেংগা'। করলডেংগায় কবির বংশধরেরা এখনো বসবাস করছেন।[১৪৩] কমর আলী ফারসি ভাষা থেকে একটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং ঐ গ্রন্থের নামকরণ করেন *সরসালের নীতি*। মুনাইর মুনশি নামক কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির আদেশে তিনি ফারসি ভাষা থেকে গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। কমর আলী ফারসি থেকে গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেন:

---

[১৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।
[১৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।
[১৪০] *প্রাগুক্ত*।
[১৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০।
[১৪২] *প্রাগুক্ত*।
[১৪৩] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই যে নোচকা জান ফারছি আছিল
সবে বুঝিবারে হীনে পাঞ্চালী রচিল ॥
নোচকা বলয়ে যারে ফারছি ভাষায়
তার্তিব কিতাব বলি বঙ্গভাষে কহে ॥[১৪৪]
....
"আমীর হামজা জিম্মা ফারসী কিতাব
ন বুঝিয়া লোকের মনেত পাই তাব (তাপ)।
বংগেতে ফারসী ন জানএ সব লোকে।
এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার
নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অংগীকার
মুসলমানি কথা দেখি মনেই ডরাই
রচিলে বাঙালী ভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভএ
দরবারে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ।[১৪৫]

আবদুন নবী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবি আবদুন নবী চট্টগ্রাম জেলার সিলিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ শরীফ।[১৪৬] কবির বংশের লোকেরা এখনো বর্তমান চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার জলদি গ্রামে বসবাস করছেন বলে জানা যায়।[১৪৭] কবির বংশ সিদ্দীক বংশ বলে পরিচিত।[১৪৮] কবি আবদুন নবীর একটি মাত্র কাব্য পাওয়া যায় যা ফারসি কাব্যের বঙ্গানুবাদ; কাব্যটির নাম *আমীর হামজা* ।

আমীর হামজা

বীরের বীরত্ব কাহিনী চিরকালই কবি কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে জগতের প্রত্যেকটি মহাকাব্য। হজরত মুহাম্মদ (স.) এর চাচা জগৎ বিখ্যাত আমীর হামজার বীরত্ব নিয়েও ফারসি ও বাংলা ভাষায় কাব্য রচিত হয়। ফারসি ভাষায় রচিত *দাসতান-ই-আমীর হামজা* অবলম্বন করে আশি পর্বে বিভক্ত *আমীর হামজা* নামক বিশাল কাব্যটি রচিত হয়।[১৪৯] কবি আবদুন নবীর *আমির হামজা* মৌলিক কাব্য নয়, ফারসি কাব্যের অনুবাদ। এদেশের লোকেরা যথেষ্ট পরিমাণে ফারসি জানতেন না বলেই কবিকে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এ মহাবীরের বীরত্ব কথাকে ফারসি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হয়। ফারসি গ্রন্থ অনুসরণ করে তিনি যে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন সেই সূত্রে বলেন:

---

[১৪৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।
[১৪৫] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।
[১৪৬] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।
[১৪৭] আজহার ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০।
[১৪৮] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।
[১৪৯] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর হামজার কিচ্ছা ফারছি কিতাব।
ন বুজিয়া লোকের মনে ত পায় তাব ॥
বঙ্গে ত ফারছি ন জানয়ে লোক সবে।
কেহ কেহ বুজি কেহ ভাবে জেনা সোঁকে ॥
এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার্
নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অঙ্গীকার ॥
মুছলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই।
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই ॥
লোক উপকার হেতু ত্যজি সেই ভয়।
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদয় ॥[১৫০]

আমির হামজা গ্রন্থের বিষয়বস্তু, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পিতৃব্য মহাবীর হামজা (রা.) এর কাল্পনিক-অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী আলোচিত হয়েছে।[১৫১] *আমির হামজা* কাব্যের এ বিরাট কলেবর নিঃসন্দেহে কাব্যটিকে এক অনন্যসাধারণ মহিমা দান করেছে।

শরীফ শাহ

এ কবির একমাত্র কাব্য *লালমতি সায়ফুল মুলুক*। আবদুল হাকিমও এ নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কে পূর্ববর্তী, তা জানার উপায় নেই।[১৫২] এ পুঁথিতে লালমতি ও জুল্‌কারনাইন সেকান্দারের পুত্র মুলুকের প্রণয় ও পরিণয় ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে। প্রেমমূলক কাব্য হলেও, পীর খোয়াজ খিজিরের মাহাত্ম্য প্রচারই এ কাব্যের উদ্দেশ্য।

মুরশিদ চরণ মিরে করিআ বন্দন
লালমতি কিস্‌সা লিখি করিয়া যতন।[১৫৩]

কাব্যটি একটি ফারসি উপাখ্যানের অনুবাদ।[১৫৪]

৩.৪.৪ অষ্টাদশ শতক

সপ্তদশ শতকে প্রণয়কাহিনীর যে ধারা বাংলা সাহিত্যকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে দেয়, অষ্টাদশ শতকে সে ধারার স্বাচ্ছন্দ গতি আর থাকে না। আলাওল-দৌলত কাজীর মতো কবির আবির্ভাবও আর ঘটেনি। যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য বিস্তারের অশুভ অবস্থায় দেশ তখন ক্ষতবিক্ষত। মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও কলকাতায় তখন ইংরেজের কায়েমী শাসন প্রায় আসন্ন। এ রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও একটি সাহিত্য সমাজ গড়ে ওঠে, যা

---

[১৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪-২১৫।
[১৫১] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।
[১৫২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭-৯৮।
[১৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০০।
[১৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে দোভাষী রীতির মুসলিম সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করে, অন্যদিকে বিকৃত নাগরিক রুচির গীতি ও কবিগানের বিকাশ লাভ করে। নিম্নে এ ধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

মুহম্মদ আলী

অষ্টাদশ শতকের কবি মুহম্মদ আলীর জন্ম চট্টগ্রামের উত্তরে ফটিকছড়ি থানার আসিম নগর এলাকার ইদিলপুর গ্রামে।[১৫৫] তিনি সকলের কাছে মুহম্মদ আলী মিয়াজী নামে পরিচিত ছিলেন।[১৫৬] পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার ইউসুফ হাফিজের সহযোগিতায় আলা উদ্দীন ওমর বোখারী কর্তৃক ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় রচিত *হায়রাতুল ফিকাহ* গ্রন্থটি *হায়রাতুল ফিকাহ নামেই* মুহম্মদ আলী বঙ্গানুবাদ করেন।[১৫৭] কাব্যের নাম ও উৎস সম্পর্কে কবির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

যে আলিমে এই এলম পাছে না পড় এ।
উত্তরে পদুত্তর দিতে না পার এ॥
পদুত্তর কিবা দিব শুনিতে তব্ব হ এ।
হায়রাতুল ফিকাহ নাম তেকাজে বোলএ॥
আছিল ফারসী কিতাব করিলুম বাঙ্গালা।
বুঝিতে সকল লোকে কিবা মন্দ ভালা ॥[১৫৮]

হায়রাতুল ফেকাহ গ্রন্থে ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কিত কিছু জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১৫৯] আলা উদ্দীন ওমর বোখারীর ফারসি ভাষায় রচিত *হায়রাতুল ফিকাহ* গ্রন্থটি মুহম্মদ আলী বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে মুসলমানের কতগুলি পরিস্থিতিগত সঙ্কট ও সমস্যা বিষয়ে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বালক ফকির

বালক ফকির অষ্টদশ শতকের সাধক কবি আলী রজা-এর শিষ্য ছিলেন। অধ্যাপক শাহেদ আলী রচিত বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে কবি আলী রজা যেহেতু অষ্টাদশ শতকের লোক অতএব বালক ফকিরও অষ্টাদশ শতকের লোক ছিলেন।[১৬০] কবি তার বাসস্থান সম্পর্কে কিছু বলেননি তবে তার গুরু আলী রজাও কবির মূল গ্রন্থের লেখক শাহাবুদ্দীনের আবাস চট্টগ্রামে হওয়ায় এবং

---

[১৫৫] ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, খণ্ড ২ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ২৫৩।
[১৫৬] *প্রাগুক্ত*।
[১৫৭] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।
[১৫৮] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৪।
[১৫৯] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।
[১৬০] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান* (চট্টগ্রাম: জিলা কাউন্সিল বই ঘর, ১৯৬৫), পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

বালক ফকিরের পাণ্ডুলিপিগুলো চট্টগ্রামে পাওয়া যায় বিধায় নিঃসন্দেহে তাকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলা যায়। বালক ফকির কর্তৃক ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের নাম *ফায়েদুল মুবতাদী* ।

ফায়েদুল মুবতাদী

চট্টগ্রামের অধিবাসী সৈয়দ শাহাবুদ্দীন একাধিক ফারসি শাস্ত্র গ্রন্থের সার সঙ্কলন করে ফায়েদুল মুবতাদী নামে ফারসি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে বালক ফকিরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

নানা শাস্ত্র হোতে এই বাছি বাছি মূল।
একস্থানে লিখিলেন্ত বচন বহুল।
.. ..
সরে বেকায়া ফতোয়ায়ে নক্সবন্দী।
জামিউ রমুজ আর কুঞ্জ আরাদি ॥
বোস্তান আবদুলাহ জামিউ সগিরি।
তর্জমায়ে এহুল উলুম ইতি নামধারি ॥
সরেআ আকায়েদ মকদুমুস সুন্নাত।
খোলাসাতুল গোফর হাদীস মেশকাতে ॥
তুহফাতুন নাসাই আর সিরাজকুলুব।
ফারসীর কিতাবে যথ বচন স্বরূপ ॥
অল্প অল্প কার্যনীতি লোকে আচরিতে।
মনে গুণি লেখিলেন্ত পার্সী এবারতে ॥[১৬১]

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন এর *ফায়েদুল মুবতাদী* গ্রন্থের একটি ফারসি অনুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। এ গ্রন্থের বর্ণনার সাথে বালক ফকিরের বর্ণনার যথেষ্ট মিল রয়েছে।[১৬২] বালক ফকির তাঁর গুরুর নির্দেশে মানুষের কল্যানার্থে *ফায়েদুল মুবতাদী* নামক ফারসি গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করেন। এ বিষয়ে বালক ফকির বলেন:

ফাএদুল মোপ্তাদি এই কিতাবের নাম।
বাঙ্গালা পায়ার ছন্দে লেখিলু উপাম॥[১৬৩]

বালক ফকিরের *ফায়েদুল মুবতাদী* কাব্যটি বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য। কাব্যে অধ্যায় সংখ্যার উল্লেখ না করে বিষয় শিরোনাম দ্বারা অধ্যায়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। শিরোনাম অনুযায়ী কাব্যের অধ্যায় সংখ্যা রয়েছে বিরাশিটি। এছাড়া গ্রন্থের সূচনায় প্রভুর গুণ-গান, নবীর মহিমা সাহাবীদের প্রশংসাও রয়েছে।[১৬৪] কাব্যে বর্ণিত কয়েকটি বিষয়-শিরোনাম নিম্নরূপ:

---

[১৬১] খন্দকার মুজাম্মিল হক কর্তৃক উদ্ধৃত *বাংলা একাডেমী পুথি*, পৃ. ১৬/খ।
[১৬২] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।
[১৬৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।
[১৬৪] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমান, অজু, তৈয়ম্মম, গোসল, আজান, নামাজে জামা'ত, রোগীর নামাজ, নৌকায় নামাজ, নামাজ কাজা, নামাজ মোসাফির, নামাজ জুমাহা, নামাজ কসর, নামাজ এস্তেখারা, রমজান রোজা, তারাবি নামাজ, ঈদের নামাজ, কোরবানী, চন্দ্রগ্রহণ, নফল নামাজ, কদরের নামাজ, বরাতের নামাজ, সালামের কথা, মালের জাকাত, নামাজ জানাজা ও শহীদ ইত্যাদি। মুসলমানদের জন্ম থেকে মৃত্যু পযর্ন্ত নিত্য পালনীয় আচার-আচরন, দায়-দায়িত্ব ও কর্ম-কতর্ব্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।[১৬৫]

বালক ফকির তাঁর *ফায়েদুল মুবতাদী* কাব্যে শরীয়ত, সংস্কার, ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতা সবকিছুরই সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এ দিক থেকে তাঁর সুবৃহৎ কাব্যটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

কবি নজীব

কবি নজীব অন্ত্যমধ্য যুগের এক বিশিষ্ট নীতিকবি। তাঁর কাব্যের নাম *আলীবন্দ*। কবির কাব্যের অনুলিপিকাল ১২৪৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কবিকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের কবি-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৬৬] কবি নজীবের ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের নাম *আলীবন্দ।* আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ *আলী বন্দ* রচয়িতা হিসাবে মোশারফ এর নামও উল্লেখ করেছেন।[১৬৭] তবে খন্দকার মুজাম্মিল তার *বাঙলা নীতিশাস্ত্র বার্তা* গ্রন্থে বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে বলেছেন যে কবি নজীবই *আলী বন্দ* গ্রন্থের রচয়িতা ।[১৬৮]

আলীবন্দ

এ গ্রন্থটি ফারসি *আলীবন্দ* নামীয় কাব্য থেকে অনূদিত হয়েছে। এ বিষয়ে গ্রন্থের মাঝে বর্ণনা রয়েছে।

> আলীবান্দ নামে এক কিতাব আছিল।
> সেহি কিতাব বোলেন্দা করি বাঙ্গলাতে রচিল ॥
> ফারসী কথা তোমরা না বুঝিবা কারণ।
> বাঙ্গালাতে সবের নিকট করিলাম নিবেদন ॥[১৬৯]

এ গ্রন্থে বিবিধ আচার ও নামাজ-রোজা প্রভৃতির নিয়মাবলী ও ধর্মোপদেশ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য শিরোনাম হচ্ছেঃ অসৎসঙ্গ, প্রবাস গমন, পবিত্রতা, জামাত, অন্নদান, সালাম বিনিময়, আহারবিধি, হালাল ভক্ষণ, মিথ্যা কথন, ইমারত নির্মাণ, সাদী, যৌনবিধি,

[১৬৫] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০।
[১৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৭।
[১৬৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
[১৬৮] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।
[১৬৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

পাদুকা পড়ন, আকাশ দর্শন, হাস্যরীতি, বস্ত্রধারণ, দান সদকা, সর্পমারণ, কুকুর পালন, প্রস্রাব রীতি, গুপ্তাঙ্গ দর্শন, জলপান, স্ত্রী-প্রহার, প্রদীপ নিভান, সুদ, সূর্যদর্শন, গোফ দাড়ি সংস্কার, বেহেস্তগামীর পরিচয়, উচিৎ কর্ম, রাতের পঞ্চকর্ম, কয়েকটি ছুরা ও দোয়ার মর্তবা ইত্যাদি।[১৭০]

ননাগাজী

কবি ননাগাজী সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানার উপায় নেই, কারণ কবির '*ইবলিসনামা*' কাব্যে আত্মপরিচয় বলতে কিছু নেই।

ইবলিসনামা

কাব্যটির উৎস কী ছিল সে সম্পর্কে কবির কোন বক্তব্য নেই। সম্ভবত ঐ নামীয় কোন ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে কবি *ইবলিসনামা* রচনা করেছিলেন। ড. ইথ ফারসি '*ইবলিসনামা*' গ্রন্থের যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে ননাগাজীর *ইবলিসনামার* ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন:

> The book Iblisnama, a curious dialogue between Satan and Muhammad with many good hints and advices.[১৭১]

শয়তানের ধোঁকা হতে বেচে থাকার জন্য মানুষ কিভাবে সাবধানতা অবলম্বন করবে তা এ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৭২] কাব্যের বিষয়বস্তুর বর্ণনায় দেখা যায় গ্রন্থের সূচনায় কবি আল্লাহ ও রসুলের প্রশংসা শেষে মূল বিষয়ের বর্ণনা শুরু করেছেন । বিষয়বস্তু বিবেচনায় এ কাব্যটিকে নীতিকাব্যের চমৎকার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যায়।

আবদুল গণি

রোসাঙ্গের অধিবাসী কবি আবদুল গণির জন্ম রোসাঙ্গের বন্নিক গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহের নাম শেখ হাসান খলিফা, পিতামহের নাম আলিম্বর এবং পিতার নাম উমর দরাজ।[১৭৩] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবদুল গণিকে অষ্টাদশ শতকের কবির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৭৪] কবি আবদুল গণি *ফালনামা* নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন কিন্তু কাব্যের রচনাকাল জানা যায় না। কবির এ কাব্যটি কয়েকটি ক্ষুদ্রকায় ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে রচিত বলে জানা যায়। কবি বলেছেন:

---

[১৭০] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
[১৭১] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।
[১৭২] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।
[১৭৩] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭।
[১৭৪] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

রোজনামা খেননামা কিতাব আছিল।
ফালনামা করি আর কিতাব শুনিল ॥
এ সব রচিয়া মুই করিতে পয়ার।
দীলেত বহুল শ্রধা হইল আমার ॥[১৭৫]

গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে কবির বক্তব্য:

কিতাবেতে দেখী ফালনামা বিবরণ।
করিলুবাঙ্গালা ভাসে পয়ার বন্দন ॥[১৭৬]

ফারসি পাণ্ডুলিপি তালিকাগ্রন্থে *ফালনামা-ই-সিকান্দার, ফালনামাই হুরুফ, ফালনামা* ইত্যাদি নামে একাধিক *ফালনামা* গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি আবদুল গণি সম্ভবত এসব ফারসি গ্রন্থেরই কোনও একটি অনুসরণ করে ছিলেন। *রোজনামা ও খেননামা* বলে যে স্বতন্ত্র গ্রন্থের উল্লেখ তিনি করেছেন, ফারসি *ফালনামা* গ্রন্থে ওগুলো দিন ও ক্ষণের শুভাশুভ বিষয়ক অধ্যায়মাত্র। আবদুল গণির কাব্যের উৎস যে ফারসি *ফালনামা* তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থে আল্লাহর নাম, নবী, আসহাব, হাসান-হোসেন, মাতা-পিতা ও পীর-গুরু বন্দনা দিয়ে গ্রন্থের সূচনা করা হয়েছে। এর পর 'স্থান স্থিতির' পরিচয় দিয়ে 'ফাল বৃত্তান্তের অলোচনা করা হয়েছে। ষোলটি 'ফালের' বর্ণনা করে কবি 'রোজনামা' ও 'খেননামা'র বিবরণ দিয়েছেন।

মুহম্মদ নকী (১৬৭৫-১৭৬৫ খ্রি.)

মুহম্মদ নকী তাঁর কাব্যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কবি চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার চরম্বা গ্রামের তদানীন্তন জমিদার ব্রাহিরাম চৌধুরীর আদেশে *তুতিনামা* নামে একটি কাব্য রচনা করেন। হিন্দু-জমিদারের নির্দেশে মুসলিম কবির রচিত এটিই দ্বিতীয় কাব্য।[১৭৭] কবি তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ফারসি *তুতিনামা* অবলম্বনে তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কাব্যের উৎস ও নাম সম্পর্কে কবির বক্তব্য:

শুন গুণিগণ কাব্যের উপমা।
আছিলেক ফারসী কিতাব তুতিনামা ॥[১৭৮]

তুতিনামা বঙ্গানুবাদের বিষয়ে কবি বলেন:

আমা প্রতি আঙ্গা দিলা পএআর রচিতে।
বলিলা না বুঝে সবে ফারসি কিতাব
দেসি ভাসে রচি কহ এই পরস্তাব ॥[১৭৯]

---

[১৭৫] খন্দকার মুজাম্মিল হক , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭।
[১৭৬] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৯।
[১৭৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯।
[১৭৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।
[১৭৯] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

তুতিনামা কাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলে কাব্যটি উপদেশমূলক কাহিনীর সমাহার হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। একটি কাহিনীর যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, এক বিবাহিতা রাজবালার স্বামী প্রবাসী হলে, রাজবালা কামনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখন তুতি পাখি রাজবালাকে তিনশত ষাট দিন ধরে উপদেশাত্মক কাহিনী শুনিয়ে নিরস্ত রাখতে সক্ষম হয়।[১৮০] প্রাপ্ত রচনাংশ অধ্যয়নে কবি নকীর কবিত্ব শক্তি, ভাষা এবং বর্ণনা-ভঙ্গীর সাবলীলতার প্রমান পাওয়া যায়।

হায়াত মামুদ

হায়াত মামুদ রচিত *জঙ্গনামা* কাব্যের আলোকে জানা যায় যে তিনি রংপুর জেলার ঝারবিসিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ কবির বা কবির উদ্দীন আর দাদার নাম কিতাব উদ্দীন ও পরদাদার নাম দোয়া খান। কর্মজীবনে হায়াত মামুদ কাজী পদে কর্মরত ছিলেন।[১৮১] ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁর রচিত গ্রন্থদ্বয় হলো *জঙ্গনামা* ও *সর্বভেদবাণী*।

জঙ্গনামা

হায়াত মামুদ রচিত প্রথম কাব্য হলো *জঙ্গনামা* বা মহরম পর্ব। *জঙ্গনামা* যুদ্ধ কাহিনীমূলক কাব্য, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম প্রচারক আদি ইমামদের ইরান-বিজয় এবং আত্মকলহ কাহিনী।[১৮২]

হায়াত মামুদের রচনার আদর্শ মূল ফারসি কাব্য। কবি বলেন:

শোন ভাই সর্বজন মিনতি আমার।
সকলের তরে মুই কর পরিহার ॥
পড়িনু শুনিনু ভাই আরবী ফারসী।
এমামের কথা শুনি দুঃখ মনে বাসি॥[১৮৩]

কবি অন্যত্র বলেছেন:

হেয়াত মাহমুদে কহে শুনহ সবায়
পারসীর কথা আমি রচিনু বাঙ্গালাএ ॥[১৮৪]

সর্বভেদবাণী

রাজা চন্দ্রসেন তাঁর পাঁচ পুত্রকে শিক্ষাদানের দায়িত্বভার বিষ্ণুরাম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ওপর অর্পন করেন। বস্তুতঃ বিষ্ণুরাম রাজপুত্রদেরকে শিক্ষাদানকালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন এ উপদেশমালা

---

[১৮০] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬।
[১৮১] ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।
[১৮২] সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০০ বাঙলা), পৃ. ৪৫।
[১৮৩] আজহার ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২।
[১৮৪] ড. মযহারুল ইসলাম, *কবি হেয়াত মামুদ* (রাজশাহী: বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১), পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে তাঁর *পঞ্চতন্ত্র* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা হিতোপদেশ গ্রন্থরূপে সঙ্কলিত হয়। বিষ্ণুরাম শর্মার 'হিতোপদেশ' বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।[১৮৫] পারস্যের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মোস্তফা দেওয়ান-এর নির্দেশে কবি তাজুল মুলক বিষ্ণুরাম শর্মার পঞ্চতন্ত্রকে ফারসিতে অনুবাদ করেন, এবং এর নাম দেন *মফরেহুল কুলুব*। কবি হায়াত মামুদ এ ফারসি অনুবাদকে অবলম্বন করেই তাঁর *সর্বভেদবাণী* কাব্যটি রচনা করেন।[১৮৬] কবি বলেন:

হেন পুস্তকের বাণী মস্তফা দেওয়ান শুনি
ফারসী করিতে আদেশিল।
তাহার আদেশ ক্রমে তাজল মুলক নামে
ফারসীতে কেতাব রচিল ॥
রাখিল কেতাবের নাম অতিবড় অনুপাম
মফরেহুল কুলুব সে প্রেমে।
আমি সে কিতাব দেখি বাংলাতে সারি লিখি
পুস্তক রচিনু বহু শ্রমে ॥ [১৮৭]

সর্বভেদবাণী কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রথমে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা, নবী মহিমা, আসহাব প্রশস্তি, হাসান হোসেন ও মা-ফাতিমার চরণ বন্দনা করা হয়েছে। এর পর গ্রন্থের উৎস প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কবি কাব্যের কাহিনী বর্ণনা শুরু করেছেন। এ কাব্যটি চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মিত্রলাভের বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে বৈরীভেদে মিত্রচ্ছেদের বর্ণনা। তৃতীয় খণ্ডে যুদ্ধ ও বাধা বিঘ্ন জয় করার এবং চতুর্থ খণ্ডে সিদ্ধাভাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।[১৮৮]

আবদুল করিম খোন্দকার

আবদুল করিম খোন্দকার অষ্টাদশ শতকের একজন বিশিষ্ট নীতি কবি। তাঁর *দুল্লা মজলিস* কাব্যের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, কবি আবদুল করিম খোন্দকার রোসাঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আলী আকবর ও দাদার নাম মোছেন আলী । তাঁর প্রপিতামহ রওশন মিয়া রোসাঙ্গ-রাজের প্রসাদ স্বরূপ 'বিষয় পদবী' পেয়ে ডিঙ্গার হাসিল বা নৌকাদির শুল্ক আদায়ের চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর 'মোছেন আলী' ছিলেন রোসাঙ্গ রাজ সরকারের ডিঙ্গার দোভাষী।[১৮৯] আবদুল করিম খোন্দকার কর্তৃক ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে রচিত কাব্যের নাম *দুল্লা মজলিশ* ও *হাজার মসাইল*।

---

[১৮৫] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।
[১৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮।
[১৮৭] ড. মযহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০।
[১৮৮] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮-২৫৯।
[১৮৯] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

দুল্লা মজলিশ

এ কাব্যের নাম ও উৎস সম্পর্কে কবি বলেন:

একদিন আমাকে ডাকিয়া সেই জন।
পড়াইয়া শুনিলেন্ত কিতাব কথন ॥
দুল্লা মজলিস নামে কিতাব প্রধান।
হরষিত হৈল মন শুনিয়া তাহান ॥
বোলিল ফারসী ভাষা নাবুঝে সকলে।
কেহ বোঝে কেহ লোকে শুনিয়া বিকলে ॥[১৯০]

উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, কাব্যটি ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত। মূল রচনা সম্পর্কে কবি এর বেশি কোন তথ্য দেননি। তবে বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপি তালিকা গ্রন্থাবলীতে দুল্লা মজলিশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এ গ্রন্থের এক ফারসি অনুলিপিতে লেখকের নাম সাইফুজ জাফর নওনেহাদী বলে উল্লেখিত হয়েছে।[১৯১] ড. হারম্যন ইথ লেখকের নাম সাইফ আল জাফর নওবাহারী বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯২] ড. আহমদ শরীফ বলেন, মূল গ্রন্থ রচয়িতার নাম সাইফ আল জাফর বাহারী।[১৯৩] ড. এনামুল হকের ভাষ্য মতে কবি রোসাঙ্গের রাজধানী শহরে বসে রোসাঙ্গ-রাজ প্রদত্ত সাদিউক-নানা উপাধীধারী আতিবর নামক এক ব্যক্তির আদেশে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।[১৯৪] আলোচ্য গ্রন্থটি তেত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত । কবি বলেন:

তিতিস আছ এ বাব কিতাবে নিশ্চএ।
কহিবম হযরত একে একে পশ্চাতে নিশ্চএ ॥[১৯৫]

কাব্যের বিষয় আলোচনায় দেখা যায় কাব্যে আদম সৃষ্টি, হযরত ইব্রাহীম, হযরত লুত, সুয়াইব, হযরত আইয়ুব, হযরত মুসা, হযরত সোলায়মান, হযরত মুহম্মদ (স.), পীর আউলিয়া এবং রোজা ও বেহেশ্তের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া কবির আত্মপরিচয়, গ্রন্থোৎপত্তি, রচনাকাল বিষয়েও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। [১৯৬] খন্দকার মুজাম্মিল এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন:

> "ক্ষমা, বিনয়, ধৈর্য, দান, সহানুভূতি, অহঙ্কার ও লোভ বর্জন, পিতা-মাতার আদেশমানা, চারিত্রিক সততা, সতীত্ব, আনুগত্য প্রভৃতি বিষয়ের বহু কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে এ কাব্যে।"[১৯৭]

---

[১৯০] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২।
[১৯১] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭।
[১৯২] *প্রাগুক্ত*।
[১৯৩] ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩।
[১৯৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬।
[১৯৫] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪।
[১৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০।
[১৯৭] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাজার মসাইল

ড. এনামুল হক তাঁর মুসলিম বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে *হাজার মসাইল* গ্রন্থের বর্ণনায় বলেন:

> "তাহার হাজার মসাইলও বিরাট গ্রন্থ। ইহাকে ফিকাহ শাস্ত্রের সার সঙ্কলণ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এই নামের ফারসী গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সম্ভবত পুস্তকটি তাহারই ভাবানুবাদ।"[১৯৮]

ড. আহমদ শরীফ কবির *দুল্লা মজলিশ* ও *হাজার মসাইল* ছাড়াও ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে রচিত *তমিম আনসারী* নামে অপর একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৯৯]

শেখ মনসুর

কবি শেখ মনসুরের পিতার নাম কাজী ঈশা খাঁ যার পেশা ছিল কাজীগিরি।[২০০] কবির পীরের নাম শাহ্ তাজদ্দিন। তাঁর কাব্য *সির নামার* রচনা কাল সম্পর্কে কবি বলেছেন

> যত হৈল মঘী সন লও পরিমানি
> এক পরে শূন্য ছ'ও পাঁচ দিয়া গোনি।[২০১]

কবি ছিলেন চট্টগ্রামের রামুর অধিবাসী। *সিরনামা, আসরারুল মসা* বা বীর্য রহস্য নামক কোনো ফারসি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।[২০২] কবির বক্তব্য:

> বচন আরবী ভাষে সব শাস্ত্রমূল
> বুঝিতে ফারসী ভাষে কিতাব বহুল
> যত গুণিগণে সবে মনে প্রীতি ভাসি
> আরবী ফারসী ভাষে দিলেক প্রকাশি
> বাংগালে নবোঝে সব ফারসী কিতাব
> নবোঝি কিতাব কথা মনে হয় তাব (তাব)
> সবে বোলে বাংগালের ভাষে এ কিতাব
> শুনিতে পারএ যদি যায় মনস্তাব।
> তেকাজে বাংলা ভাষে ফারসী জবান
> পদবন্ধি করি কৈলুং পুস্তক গ্রহণ ॥[২০৩]

কবি তাঁর অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> আছারল মসা এক কিতাব উপাম
> ছিরনামা রাখিলাম পুস্তকের নাম ॥[২০৪]

---

[১৯৮] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭।
[১৯৯] ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩।
[২০০] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।
[২০১] অধ্যাপক শাহেদ আলী. *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান* (চট্টগ্রাম: জিলা কাউন্সিল বই ঘর, ১৯৬৫), পৃ. ১২০।
[২০২] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।
[২০৩] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৬; অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

কবি আরও বলেন:

আছিল আরবি ভাসে কিতাব প্রধান।
আলিম চতুরে কৈল ফারসি বাখান ॥
আনিয়া ফারসি ভাস বাঙ্গালা করিলুং।
তার মধ্যে দোষ গোনা এক ন চাহিলুং ॥[২০৫]

শেখ সেরবাজ চৌধুরী

কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরীকে ড. এনামুল হক ত্রিপুরার কবি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর পুঁথিগুলো ত্রিপুরা থেকে পাওয়া যায় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২০৬] কিন্তু মরহুম সাহিত্যবিশারদ তাঁকে চট্টগ্রামের কবি বলে মনে করেন।[২০৭] তাঁর পুঁথিগুলোর প্রতিলিপি চট্টগ্রামেই পাওয়া গিয়েছে। কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরীর ফারসি থেকে বাংলা অনূদিত গ্রন্থের নাম *'ফক্করনামা'* বা *'মল্লিকার হাজার সওয়াল'*।

ফক্করনামা

সৈয়দ বায়েজিদের নির্দেশে, বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধার জন্য তিনি ফারসি থেকে কাব্যটি বাংলায় অনুবাদ করেন।[২০৮] গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে কবি বলেন:

ফক্কার নামা করি এক আছএ কিতাপ।
কহিমু যথেক কথা আছে পরস্তাব ॥
সকালে না বুজে দেখি ফারসি বচন।
কহিমু বাঙালা ভাসে বুজিতে কারণ ॥[২০৯]

সৈয়দ নুরুদ্দীন (১৭২৫-১৮০০ খ্রি.)

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ নুরুদ্দীন একজন বিখ্যাত শাস্ত্রকার কবি। তিনি ফারসি গ্রন্থাবলম্বনে *রাহাতুল কুলুব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

রাহাতুল কুলুব

রাহাতুল কুলুব সৈয়দ নুরুদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যটির পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক সংস্করণ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। তবে অনেক আগে এর বটতলার এক সংস্করণ বেরিয়েছিল বলে আবদুল করিম

---

২০৪ *প্রাগুক্ত*।
২০৫ আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৬।
২০৬ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫।
২০৭ আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭।
২০৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭।
২০৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যবিশারদ জানিয়েছেন। এ কাব্যের একাধিক খণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমী পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে। *রাহাতুল কুলুব* কাব্যের নামকরণ সম্পর্কে কবি বলেছেন:

নানা মত ফারসীর লেখা ছিল পরস্তাব
রাহাতুল কুলুব নামে আছিল কিতাব।[২১০]

রাহাতুল কুলুব কাব্যটি অনুবাদমূলক। তবে কোনও একক গ্রন্থানুসারে রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না; একাধিক আরবী-ফারসি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কবি তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন ; কাব্যে বহু আরবী-ফারসি গ্রন্থের বরাত দিয়ে কবি তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে এর মধ্যে ফারসি *রাহাতুল কুলুবই* ছিল কবির প্রধান অবলম্বন।[২১১] ফারসি সাহিত্যে একাধিক লেখকের *রাহাতুল কুলুব* প্রচলিত আছে যেমন শাহ নিজামউদ্দীন বদাউনী নামান্তরে নিজামউদ্দীন আউলিয়া [২১২]এবং মুবারক ফয়জুল্লাহ সুনামী বা শামী।

মুবারক ফয়জুল্লাহর *রাহাতুল কুলুব* এর সঙ্গে নুরুদ্দীনের *রাহাতুল কুলুব* এর বিষয়গত ও পর্বগত অনেক বেশি মিল থাকায় বলা যায় যে, মুবারক ফয়জুল্লাহর গ্রন্থই সৈয়দ নুরুদ্দীন মূলত অনুসরণ করেছেন। এছাড়া মূল বিষয়বস্তুর সমৃদ্ধি সাধনের জন্য কবি অনেকগুলো আরবী-ফারসি গ্রন্থের[২১৩] সহায়তা নিয়েছেন।

কবি বদিউদ্দীন

কবি বদিউদ্দীনের বাসস্থান চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার বাহুলী গ্রামে। বিভিন্ন অনুলিপিতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে কবির পিতার নাম তামাচতদীন। কবি একাধিক গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন, 'চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার বাহুলী গ্রামে কবির জ্ঞাতি ও বংশধরগণ বাস করেন। কবির পূর্বপুরুষ 'চিকন কাজীর' নামানুসারে গ্রামের যে অংশে তাঁদের বসবাস, তা 'চিকনকাজীর পাড়া' বলে অভিহিত।[২১৪] তিনি *সিফত-ই-ইমান* ছাড়াও আরও একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। সেটির নাম *কায়দানী কেতাব*। দুটো গ্রন্থেরই একাধিক অনুলিপি বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত রয়েছে।[২১৫]

---

[২১০] *পুথি পরিচিতি*, পৃ. ৪৮৫, খন্দকার মুজাম্মিল উদ্ধৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *পুথি নং ৪৩৭*, পৃ. ১/ক।

[২১১] খন্দকার মুজাম্মিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

[২১২] খন্দকার মুজাম্মিল (সম্পা.), *সৈয়দ নুরুদ্দীন জীবন ও গ্রন্থাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১০।

[২১৩] ক. এহিয়া উল উলুমত জেবুস্সালাতি/ কুঞ্জ আরাদি আর সলাত মাসুদী ॥
খ. কুঞ্জ দাকায়েকে হেন আছএ খবর/ সুন্নত জানিও হয় এতিন কাপড় ॥
গ. জামেউল উলু মধ্যে আছএ বয়ান/ যুক্ত নয় মৃত্যু কাছে পড়িতে কোরাণ ॥
ঘ. সরাহুল বকেয়া আর কিতাব বোরহান/ লেখিয়াছে এই তিন স্থানের বয়ান ॥
ঙ. আসবাবুন নাজাত আর বদরুস শাদত/ এ সব কিতাবে লেখিয়াছে রোয়াএত ॥ খন্দকার মুজাম্মিল উদ্ধৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *পুথি নং ৪৩৭*, পৃ. ১/ক, ৮২/ক, ৮০/ক, ৮১/ক।

[২১৪] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।

[২১৫] খন্দকার মুজাম্মিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

সিফত-ই-ইমান

সিফত-ই-ইমান কাব্যটি সম্ভবত ঐ নামীয় ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ। তবে আক্ষরিক অনুবাদ নয়। কবি গ্রন্থের বিষয়-বৈচিত্র্য সাধনের জন্য অন্যান্য পুস্তক থেকেও বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ে কবির স্বীকারোক্তিও পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন:

ছিপত ইমা নামে এক কীতাব জানএ।
ফেতবি জাহিজ হোন্তে নিকালি আছএ ॥
উত্তম মছালা সেই কীতাব হেরিআ।
অকহিমু ছআল কীছু পএআর রচিআ॥
ফারসি ভাসে জারে ছআল বোলন্ত।
আরবি জবানে তাকে মছআলা কহন্ত ॥[২১৬]

কাব্যের নাম থেকেই বোঝা যায় এ কাব্যে ইমানের সিফত বা গুণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'ইমান' সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। মোট কথা এ গ্রন্থে মুসলমানের অবশ্য-জ্ঞাতব্য শরা-শরিয়ত বিষয়ের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে।[২১৭]

কায়দানী কেতাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪০ নং পুঁথিটির কোন নাম নেই, কিন্তু এক জায়গায় কাব্যের উৎস নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "কহন্ত বদিউদ্দীন হেরিয়া কায়দানী।" অতএব বোঝা যায়, কাব্যের উৎস আরবী অথবা ফারসি *কায়দানী কিতাব*। সে সূত্রে এ কাব্যকেও *কায়দানী কেতাব* নাম দেয়া যায়। এ গ্রন্থে শরা-শরিয়ত বিষয়ক আলোচনা, নামাজের নিয়মাবলী তথা একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় উপদেশ আলোচিত হয়েছে।[২১৮]

মুহম্মদ কাসিম (১৭৩০-১৮১০ খ্রি.)

মুহম্মদ কাসিম অষ্টাদশ শতকের কবি। জানা যায়, কবি নোয়াখালী জেলার 'যুগীদিয়া শহরে' জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে যুগীদিয়া একটি গ্রাম মাত্র। জানা যায় ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং এর অব্যবহিত পরে ফরাসীগণ এখানে একাধিক কাপড়ের মিল স্থাপন করেন। ফলে ফেনী নদীর মোহনায় অবস্থিত এই যুগীদিয়া বিচিত্র জন সমাগমে একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। কবির পিতার নাম শাহ আজীজ এবং শিক্ষাগুরু ছিলেন গরীবুল্লাহ। কবি কাসিমের দীক্ষাগুরু বা পীর ছিলেন সৈয়দ মুনাইম।

---

[২১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।
[২১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।
[২১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২, ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যন্ত তাঁর তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্যগুলো হচ্ছে (ক) *সিরাজকুলুব*, (খ) *হিতোপদেশ* বা *বুরহানুল আরেফিন*, (গ) *সুলতান জমজমা*।

সিরাজকুলুব

কাব্যটি অনুবাদমূলক বটে। কিন্তু কোন একক গ্রন্থানুসারে রচিত বলে মনে হয় না। কেননা কাব্যে একাধিক[২১৯] আরবী ফারসি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে, কবি *সিরাজকুলুব* নামক কোন মূলগ্রন্থকেই তাঁর কাব্যের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর কাব্যের সবগুলো অনুলিপিই *সিরাজকুলুব* নামে প্রচারিত। অতএব, কবির এ কাব্যের নাম *সিরাজকুলুব*। *সিরাজকুলুব* গ্রন্থের মূল লেখক ছিলেন প্রখ্যাত সূফী নাজমুদ্দীন কুবরা ও নাজমুদ্দীন বাগদাদী এর শিষ্য নাজমুদ্দীন দয়া। আলী রজা ওরফে কানু ফকিরও *সিরাজকুলুব* নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।[২২০]

পনের অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী দিয়ে কাব্য শুরু হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে জিকিরের বর্ণনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিসমিল্লাহর বর্ণনা। এরপর সুরা ফাতিহা, নামাজ, রোজা। ষষ্ট অধ্যায়ে ঈমান, বেহেস্ত ও কিয়ামত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে কবরের আমলনামা দর্শনের বিবরণ। নবমে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। আরো ছয়টি অধ্যায় সহ মোট পনেরটি অধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

হিতোপদেশ বা বুরহানুল আরেফিন

মুহম্মদ কাসিমের দ্বিতীয় নীতিমূলক কাব্য *হিতোপদেশ*। কাব্যটি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি। এ কাব্যের দু'টি অনুলিপি এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অপরটি বাংলা একাডেমী পুঁথিশালায় সংগৃহীত।[২২১] কাব্যটি ফারসি *বুরহানুল আরেফিন* গ্রন্থানুসারে রচিত। কবি তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন সম্ভবত *হিতোপদেশ* যদিও অনুলিপিতে 'হিত-উপ' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

---

[২১৯] ক. পুনি আর রোয়াইত কর অবধান/ ফতাবি হুজ্জাত কিতাব যেমত বয়ান ॥
খ. পুনি আর রোয়াইত কর অবধান/ কেফায়া কিতাব মধ্যে যেমত বয়ান ॥
গ. সিরাজকুলুব মাঝে বারতা এহার/ নমাজ দাখিল হয় যেমন প্রকার ॥
ঘ. সিরাজকুলুব মাঝে বারতা এহার/ কহি শুন গুণীগণ বারতা এহার ॥
ঙ. হেদায়া কিতাবেত বারতা এহার।
চ. আরবী কোরান কথা/ পদবন্ধ করি গাথা
প্রচারিলুম সব পাইতে শুদ্ধি।

[২২০] খন্দকার মুজাম্মিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

[২২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

বোরহানুল আরেফিন কিতাব দেখিয়া।
কহিলুম হিত-উপ বাঙ্গালা রচিয়া ॥[২২২]

বাংলা একাডেমী তালিকায় কাব্যটিকে *নসিয়তনামা* বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবি আবদুস সামাদ

চট্টগ্রামের শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত 'সুলক বহর' নিবাসী কবি আবদুস সামাদ ইরানের বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ *গুলিস্তাঁর* কাব্যানুবাদ করেন। কবি অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তির দিকে এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন।[২২৩]

৩.৪.৫ উনবিংশ ও বিংশ শতক

উনবিংশ শতক প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী জীবনে নব-উন্মাদনার পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্য ও কাব্যের গতানুগতিক বন্ধন মুক্ত হয়ে গদ্যের ঋজুতায় শক্তিদীপ্তি লাভ করে। কিন্তু আরবী পড়ুয়া মুসলিম কবিদের পক্ষে সহসা বিশুদ্ধ সাহিত্যের ঐ নতুন ভাবোন্মাদনায় শরীক হওয়াও সম্ভব ছিল না। প্রথমত শরিয়তী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম কবিরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে গিয়ে মধ্যযুগীয় পুঁথির জগতেই আত্মনিমগ্ন থাকেন। সে জগত থেকে বেরিয়ে আসার স্বাদ ও সাধ্য কোনটাই তাদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহা তাদেরকে অগ্রসরমান শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কৌতুহল, উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা কোনটাই দেয়নি। ফলে নতুন সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে তারা থাকেন একেবারেই নির্লিপ্ত। এ অবস্থায় পুঁথির জগতেই তারা আবর্তিত হন। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো-

কবি মুহাম্মদ চুহর

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের চট্টগ্রামের কবিদের মধ্যে কবি চুহরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কবির পূর্ব-পুরুষের নাম আজমত যিনি গৌড় থেকে স্বপরিবারে চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। কবির পিতার নাম ওয়াইজুদ্দিন ও পীরের নাম মতি উল্লাহ।[২২৪] কবি চুহর মূলত পণ্ডিত কবি।[২২৫] কবি চুহরের

---

[২২২] খন্দকার মুজাম্মিল কর্তৃক উদ্ধৃত ঢা.বি. গ্রন্থগারে সংরক্ষিত *পুঁথি নং ৫৫৯*, পৃ. ৪/ক।

[২২৩] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-১২৬।

[২২৪] অধ্যাপক শাহেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫।

[২২৫] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় চল্লিশ বছর বয়সে তিনি *আজর শাহ সমনরোখ* রচনা করেন যা ফারসি কাব্য অনুকরণে রচিত।[২২৬]

আজর শাহ সমনরোখ্

চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার ইজ্জত নগর গ্রামের অধিবাসী মুনশী জাফর আলীর আদেশে কবি চুহর *আজর শাহ সমনরোখ* নামক উপাখ্যানটি রচনা করেন।[২২৭] কবি উপাখ্যানটি যে ফারসি হতে অনুবাদ করেছেন তা নিম্নোক্ত কবিতাংশ থেকে জানা যায়।

নৃপ জাফর আলি সাধু জ্ঞানমন্ত দাতা।
কুশলে রাখৌক কর্ত্তা শিরে স্বর্ন ছাতা।
তান আজ্ঞা পাই হীন দুঃখিত চুহর।
ভাঙ্গিয়া ফারছি ভাষা রচিল পয়ার ॥[২২৮]

কবি বাকের আলী চৌধুরী

জমিদার বংশে জন্মগ্রহণকারী কবি বাকের আলী চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত গহিরা গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম চৌধুরী রফি, দাদার নাম আজিজুল্লাহ ও পরদাদার নাম আবদুল মজিদ।[২২৯] কবির উস্তাদের নাম সাদেক মোহাম্মদ। কবির বংশধরেরা বর্তমানে গহিরা গ্রামে বাস করেন এবং বিত্তে ও আভিজাত্যে তাঁরা আজও সুখ্যাত।[২৩০] ফারসি কাব্যাবলম্বনে রচিত তার কাব্য গ্রন্থ হলো *মনুচেহের মা'সুমা পরী*।

মনুচেহের মা'সুমা পরী

কবি বাকের আলী *সপ্ত সোরাহ্*র ফারসি কাব্য অবলম্বনে *মনুচেহের মা'সুমা পরী* কাব্য রচনা করেন। তিনি বলেন:

সপ্ত সোরা পদে মোর হাজার সালাম।
যা হোন্তে যাহের হৈল ফারসি কালাম ॥[২৩১]

কবি বাকের আলী চৌধুরী রচিত *মনুচেহের মা'সুমা পরী* একটি অপ্রকাশিত পুঁথি। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তা রচিত হয়েছিল।[২৩২] বাংলা কাব্যটির কবি প্রদত্ত নাম *মনুচেহের কেচ্ছা*। কাব্যটি

---

[২২৬] আজহার ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭।
[২২৭] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।
[২২৮] *প্রাগুক্ত*।
[২২৯] আজহার ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০।
[২৩০] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।
[২৩১] *প্রাগুক্ত*।
[২৩২] আবদুল হক চৌধুরী, *প্রবন্ধ বিচিত্রা ইতিহাস ও সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

চৌদ্দ অধ্যায়ে সমাপ্ত। কবি তার গ্রামের অধিবাসী সফর আলীর অনুরোধে *মনুচেহের মা'সুমা পরী* উপাখ্যানটি *সপ্ত সোরাহর* ফারসি কাব্যাবলম্বনে অনুবাদ করেন। কাব্য-কাহিনীর সার-সংক্ষেপে বলা যায় যে মা'সুমা পরীর প্রতি মনুচেহেরের আসক্তি এবং নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রমের পর উভয়ের মিলনে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। কবির অবলম্বন ছিল ফারসি গ্রন্থ যেমন তিনি বলেন:

মনুচেহের কেচ্ছাবাণী ফারসী জবান।
কেতাবেতে লিখা আছে তাহার বয়ান ॥
বাঙ্গালার ভাষে তাকে করিনু পদবন্ধ।
সকলে জানিতে হেতু পয়ার সুছন্ধ ॥[২৩৩]

মুহম্মদ মুকিম

মুহম্মদ মুকিম উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের কবি। তাঁর পিতার নাম সয়্যিদ মুহম্মদ দৌলত, দাদার নাম মুহম্মদ আফজল।[২৩৪] কবির ছোট বেলায় তার পিতা মারা যাওয়ার ফলে স্থানীয় চৌধুরী পরিবারে লালিত পালিত হন।[২৩৫] ফারসি কাব্যাবলম্বনে তাঁর রচিত কাব্য হলো *গুলে বাকাওলী*।

গুলে বাকাওলী

ভারতীয় উপমহাদেশেই এ উপাখ্যানের উৎপত্তি। ধারনা করা হয় যে, মুসলমান আগমনের পরে এখানেই কাহিনীটির উৎপত্তি হয় এবং লোক মুখে চলতে থাকে। ইজ্জতউল্লাহ্ নামক এক বাঙ্গালীই প্রথম এ উপাখ্যানকে ফারসিতে কাব্যরূপ দান করেন (১৭২২ খ্রি.)। সম্ভবতঃ বাংলায় নওয়াজিস খানই এ উপাখ্যান নিয়ে প্রথম কাব্য রচনা করেন। তার পর মোহাম্মদ মুকিম কাব্য রচনা করেন। আর নওয়াজিস ও মুকিম উভয়েই চট্টগ্রামের অধিবাসী। ইজ্জতই একমাত্র ফারসি কবি তাই এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, তিনি ইজ্জতউল্লাহ্ বাঙ্গালীর ফারসি কাব্য অবলম্বন করেছিলেন। এ কাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে যা পরিলক্ষিত হয় তা হলো তাজুল মুলুকের সঙ্গে বকাউলি পরীর প্রেম, নগ-দী-গরী ও দেও রাক্ষস-জাত বাধা অতিক্রম করে তাজুলের বকাউলির সঙ্গে মিলনই এ উপাখ্যানের বিষয়বস্তু।[২৩৬] কবি মুকিমের আদর্শ ছিল ফারসি কাব্য। গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে কবির বক্তব্য নিম্নরূপ:

তাজুল বকাওলি কিসসা ফারসি বয়ান
বঙ্গভাষে মুহম্মদ মুকিম যে ভাণ।[২৩৭]

---

[২৩৩] আজহার ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০।
[২৩৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১।
[২৩৫] *প্রাগুক্ত*।
[২৩৬] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫।
[২৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যের সর্বত্রই কবির পাণ্ডিত্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। হামদ, না'ত, আসহাব, চারপীর, বারো ইমাম, চৌদ্দ খানদান, সাত আসমান, সাত দ্বীপ, সাত সমুদ্র, সাত খণ্ড ভূমি, পর্বত, রাজসিংহাসন প্রভৃতির বন্দনা রয়েছে। রাজসিংহাসন বর্ণনায় শাহজাহান পুত্রদের বিবাদ ও আওরঙ্গজেবের সিংহাসন প্রাপ্তির বর্ণনাও রয়েছে।[২৩৮] ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে মুকিম, আসহাবুদ্দীনের নির্দেশেই কাব্যটি ফারসি হতে বাংলায় অনুবাদ করে ছিলেন।[২৩৯] তাঁর রচিত *গুলে-বকাউলী* কাব্যের পাণ্ডুলিপি মরহুম মুন্সী আবদুল করিম কর্তৃক সংগৃহীত হয় এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।[২৪০]

সোলেমান

অছিয়ত নামা গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর আত্ম পরিচয় সম্পর্কে বলেন:

বলয়া (ভুলুয়া?) সহর জান য়তি দির্বস্থান।
সেই সে সহর হএ অতি ভাল জান॥
ছৈদ কাজী য়াছে যথা মোছলমান।
নানা জাতি আছে যথ ব্রাক্ষন সজ্জন॥
বহু জাতি য়াছে লোক নাজাএ কহন।
সেক ছোলতান (ছোলেমান?) খুদ্র একজন॥[২৪১]

অছিয়ত নামা

গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে কবি বলেন:

ইতি অছিয়ত নামা এক কিতাব য়াছিল।
নারি-পুরুষের কথা তাহাতে লেখিল।
ফারসি বচন কহি বুজ সর্বজন।
বাঙ্গালার ভাসে তাকে করহু রচন ॥ [২৪২]

নিত্য-আচরণীয় ইসলামী শরা-শরীয়ত বিষয়ক গ্রন্থ। এখানে নারী-পুরুষের পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও সম্পর্কাদি বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে।[২৪৩]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক কতিপয় ফারসি-কাব্যকারের গ্রন্থের কিংবা গজলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের এ সব কবি-সাহিত্যিকের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

---

[২৩৮] *প্রাগুক্ত*।
[২৩৯] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১।
[২৪০] আবদুল করিম, *আবদুল হক চৌধুরী ও তাঁর গবেষণাকর্ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৫৮।
[২৪১] আহমদ শরীফ (সম্পা.), *পুথি পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।
[২৪২] *প্রাগুক্ত*।
[২৪৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.)

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফারসি কবি হাফিজের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। হাফিজের *দীওয়ান* বা কবিতা তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী ছিল। সমকালীন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় হাফিজ সম্পর্কিত তাঁর বেশকিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪৪]

অক্ষয় কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮ খ্রি.)

কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক রুবাঈ অনুবাদের প্রায় ত্রিশ বছর আগে অক্ষয় কুমার বড়াল প্রথম বাংলা ভাষায় ওমর খৈয়ামের রুবাঈ অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত ৮০টি রুবাঈ তিনটি পর্যায়ে যথা: ১৩১১ বৈশাখে ২৯টি, ১৩১৮ বৈশাখে ৩০-৫৩টি রোবাঈ এবং ১৩২১ জৈষ্ঠে ৫৪-৮০টি রোবাঈ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২৪৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ খ্রি.)

বর্ধমানে জন্মগ্রহণকারী অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, জার্মান ও ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।[২৪৬] *তত্ত্ববোধিনী*-পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত প্রকাশ করেছিলেন সাদী, রুমী, ফৈজী ও আমীর খসরু-রচিত অনেকগুলো গজলের বঙ্গানুবাদ।[২৪৭]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খ্রি.)

বাংলা অনুবাদ কবিতার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ এর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলা সাহিত্যে কবি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই একমাত্র কবি যিনি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, সাহিত্য-তত্ত্ব, দেশ-প্রীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, হাস্য-রস, প্রেম, নারী-বন্দনা, বাৎসল্যরস, নীতিকথা, সামাজিক বৈষম্য, চরিত্র পূজা প্রভৃতি বিষয়ে অনুবাদ করেছেন।[২৪৮] *তীর্থ সলিল*, *তীর্থ রেনু*, *মনিমঞ্জুসা* তার অনুবাদ কাব্য হিসাবে পাঠক সমাজে সুপরিচিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ওমর খৈয়ামের রুবাঈ ও মহাকবি হাফিজের গযলের চমৎকার অনুবাদ করেছেন যা তার *তীর্থ সলিল* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২৪৯] তাছাড়া তিনি জেবুন্নেসার ফারসি কাব্যেরও অনুবাদ করেন।

---

[২৪৪] ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, 'কবি নজরুলের সাহিত্যকর্মঃ ইরানী সাহিত্যের প্রভাব' *প্রবন্ধ সমুচ্চয়* (ঢাকা: জ্যোতি প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ২৫৩।

[২৪৫] আবদুল কাদির, *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৯), পৃ. ২২৪।

[২৪৬] সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১।

[২৪৭] আবদুল কাদির, *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪।

[২৪৮] সনজিদা খাতুন, *কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত* (কলকাতা: নিতাই চন্দ্র দাস, ১৯৫৮), পৃ. ১৪১-১৪২।

[২৪৯] ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, *অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ* (কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৮ বাংলা), পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭ খ্রি.)

ঈশ্বর প্রেমিক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *সদ্ভাবশতক* ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নীতি ও উপদেশমূলক এ-কাব্যটি ইরানী কবি হাফিজ ও সাদীর কাব্যাদর্শে রচিত।[২৫০] এ বিষয়ে কবির বক্তব্য নিম্নরূপ:

"সমুদয় কবিতাই হাফেজকৃত গ্রন্থের মর্মাকর্ষণ করিয়া রচনা করা যায় নাই, স্থানে স্থানে অন্যান্য কবির এবং স্বকল্পিত ভাবাদিরও সন্নিবেশ করিয়াছি।"[২৫১]

কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮ খ্রি.)

কান্তিচন্দ্র ঘোষ বাংলাভাষায় *রুবাইয়াৎ-ই-খৈয়াম* ও *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* অনুবাদ করে খ্যাতিমান হয়েছেন। তবে কান্তিচন্দ্র এগুলোকে মূল ফারসি থেকে অনুবাদ করেননি। এ গ্রন্থগুলো ফিটজেরাল্ড-এর ইংরেজী অনুবাদের বাংলা-অনুবাদ।[২৫২]

নরেন্দ্রদেব (১৮৮৮-১৯৭১ খ্রি.)

নরেন্দ্রদেবের অনুবাদের ধরন অনেকটা ফারসি-অনুগ। নরেন্দ্রদেবকৃত ওমর খৈয়াম-এর কাব্যানুবাদ ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৫৩] নরেন্দ্রদেবকৃত খৈয়াম-এর কাব্যানুবাদ নিম্নরূপ:

জামশিরেদের জাকের প্রাসাদ,
মজলিশি-পান, আমোদ-আসাদ,
অফুরন্ত চ'লতো যেথা–
বলছে এখন সেথা
পশুরাজের বসছে আসর,
টিকটিকিরা জাগছে বাসর!
বাহ্রামও যে ভীম-শিকারী
দুঃসাহসী জোয়ন ভারি;
সেও বেধেছে আসকে খাসা,
মাঠির তলে শীতল বাসা,
বনের গাধা মাড়িয়ে যায়,
নাইক, তবু খেয়াল তায়![২৫৪]

---

[২৫০] ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, *সমুচ্চয়, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩।
[২৫১] মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *সাময়িক পত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ৫৬।
[২৫২] ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, *সমুচ্চয়, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩।
[২৫৩] *প্রাগুক্ত*।
[২৫৪] নরেন্দ্র দেব, *রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭), পৃ. ৯।
[২৫৪] কান্তি চন্দ্র ঘোষ, *রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.)

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে। নজরুল সাহিত্যকর্মে ফারসি ভাষা সাহিত্যের বিপুল প্রভাব রয়েছে। এ কথা সত্য যে কাজী নজরুল ইসলাম যতটা ফারসি ভাষা জানতেন, তার চেয়েও অধিকমাত্রায় ফারসি কাব্যের রসাস্বাদন করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফারসি ভাষা শিখার সুযোগ নজরুলের জীবনে সামান্যই ঘটেছিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময়ে নজরুল লেখাপড়া ছেড়ে ৪৯ নম্বর বাঙালিপল্টনে সৈনিকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। নৌশেরাতে তিনমাসব্যাপী সামরিক প্রশিক্ষণ লাভের পর তিনি করাচি সেনানিবাসে পোস্টিং পেয়েছিলেন। তিনি হাবিলদার পদে পদোন্নতিও লাভ করেছিলেন। এ সময়ে নজরুলের ফারসিচর্চার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল তাঁর কৈশোরের মক্তবশিক্ষা। যা তিনি বর্ধমানের চুরুলিয়ায় তাঁর বাড়িতে অবস্থানকালে অর্জন করেছিলেন। এর চেয়ে বেশি পরিমাণে ফারসি শিখার সুযোগ নজরুল পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না। ইরানী সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল মমত্ববোধ থাকার কারণে, নিজের অন্তরের তাগিদে ও স্বকীয় পন্থায় ফারসি ভাষা যথাসাধ্য শিখে নিয়েছিলেন। সুগভীর ফারসি ভাষাজ্ঞানের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও কবি নজরুল ফারসি কাব্যের বঙ্গানুবাদে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন।

নজরুলকৃত ফারসি কাব্যের বঙ্গানুবাদ

কবি কাজী নজরুল ইসলাম কয়েকজন বিখ্যাত ইরানী কবির কবিতাবলির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এখানে পর্যায়ক্রমে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল–

রুদাকী-র কবিতার বঙ্গানুবাদ

ইরানের অন্ধকবি রুদাকীকে এদেশের পাঠকের কাছে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল রুদাকীর ফারসিকবিতাগুলোর প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। এগুলোর কয়েকটি তৎকালীন 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ওমর খৈয়ামের কবিতার বঙ্গানুবাদ

কবি নজরুল ওমর খৈয়ামের ২০৭টি রুবাঈর বঙ্গানুবাদ করেন। ফিট্‌জেরাল্ডকৃত অনুবাদের মাধ্যমে ওমর খৈয়াম পাশ্চাত্যে সমধিক পরিচিত হয়েছেন। আবার নজরুলকৃত অনুবাদের কারণে ওমর খৈয়াম বাংলার পাঠকসমাজের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে কার্তিক, অগ্রাহায়ণ ও পৌষের মাসিক

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদী পত্রিকায় নজরুলের ৫৯টি রুবাঈ এর অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার ২৬ বছর পর তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থে ১৯৭টি রুবাঈএর অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।[২৫৫] নিম্নে সফল অনুবাদক নজরুলের কয়েকটি অনূদিত রুবাঈ ওমর খৈয়ামের মূল ফারসি সহ উপস্থাপিত হল:

"امروز ترادسترس فردانیست
واندیشه فردات بجزسودانیست
ضایع مکن این دم اردلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست" –[২৫৬] عمر خیام

আজ আছে তোর হাতের কাছে, আগামীকাল হাতের বার
কালের কথা হিসাব করে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-ক্ষরা ক্ষণিক জীবন- করিসনে আর অপব্যয়,
বিশ্বাস কি- নি:শ্বাস- ভরজীবন যে কাল পাবি ধার।[২৫৭]

خیام که خیمه های حکمت می دوخت
در آتش غم فتاده ناگاه بسوخت
مقراض اجل طناب عمرش ببرید
دلال ازل برایگانش فروخت[২৫৮]

খৈয়াম যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে সে আজ সইছে দহন অসহান।
তাঁর জীবনের সুত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটলো হায়,
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।[২৫৯]

گویند مرا که دوزخی باشد مست
قولیست خلاف و دل در آن نتوان بست

---

২৫৫ আবদুল কাদির, *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

২৫৬ ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ* (তেহরান: এন্তেশারাতে অনজুমান আসারে মিল্লী, ১৩৪২ ইরানী সাল), পৃ. ৩২২।

২৫৭ আবদুল কাদির (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১২০।

২৫৮ ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯।

২৫৯ আবদুল কাদির (সম্পা.) *নজরুল রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود

فردا بینی بهشت هم چون کف دست.[২৬০]

সুন্দরীদের তনুর তীর্থে এই যে ভ্রমণ, শারাব পান,
ভণ্ডদের ঐ বুজরুকি হয় কখনো তার সমান?
প্রেমিক এবং পান-পিয়াসী এরাই যদি যায় নরক,
স্বর্গ হবে মোল্লা পাদরি আচার্যদের "দাড়ি-স্থান"![২৬১]

گویند بهشت عدن با حور خوشست

من می گویم آب انگور خوشست

این نقد بگیر و دست از نسیه بدار

کآواز دهل شنیدن از دور خوشست.[২৬২]

করছে ওরা প্রচার-পাবি স্বর্গে গিয়ে হুরপরী,
আমার স্বর্গ এই মদিরা, হাতের কাছের সুন্দরী।
নগদ যা পাস তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিসনে,
দূরের বাদ্য মধুর শোনায় শূন্য হাওয়ার সঞ্চারী।[২৬৩]

آن قصر که بهرام در و جام دگرفت

آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت

بهرام که گور می گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.[২৬৪]

এই সে প্রমোদ-ভবন যেথায় জলসা ছিল বাহরামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম করে ঘুমায় শের!
চির-জীবন করল শিকার রাজশিকারি যে বাহরাম,
মৃত্যু-শিকারির হাতে সে শিকার হল হায় আখের![২৬৫]

---

[২৬০] ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫।
[২৬১] আবদুল কাদির (সম্পা.) *নজরুল রচনাবলী*, পৃ. ১২৯।
[২৬২] ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ*, পৃ. ৩৩৫।
[২৬৩] আবদুল কাদির (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, পৃ. ১২৪।
[২৬৪] ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ*, পৃ. ৩২১।
[২৬৫] আবদুল কাদির (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজ-এর কবিতার বঙ্গানুবাদ

বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ এ-ইরানী কবিকে তাঁর দরবারে রাজকীয় সমারোহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বাংলায় না এলেও, হাফিজ একটি কবিতা লিখে সুলতানের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজ-রচিত ৮৯টি কবিতার সফল বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি.)

মহাকবি হাফিজ শিরাজীর *দীওয়ান* নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *দিওআন-ই-হাফিজ*-এর অনুবাদ করেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রকাশক মাহমুদ যকীউল্লাহ কর্তৃক রেঁনেসা প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[২৬৬]

এর প্রথম সংস্করণে মূল ফারসিসহ হাফিজের নির্বাচিত গজলের কাব্যানুবাদ ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকৃত অনুবাদ অত্যন্ত মূলঘেষা ও নির্ভূল।[২৬৭]

الا یا آیّها الساقی ادر کاسا و ناولها   که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها
ببوی نافۀ کآخر صبا زان طرّه بگشاید   زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم   جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها
بمی سجّاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید   که سالك بیخبر نبود زراه و رسم منزلها
شب تاریك وبیم موج و گردابی چنین هایل   کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
همه کارم زخود کامی ببدنامی کشید ا آخر   نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها
حضوری گر همی خواهی از و غایب مشو حافظ   متی ما تلق من تهوی دع الدّنیا وآهملها[২৬৮]

সাকী

দাও গো সাকী ! পান-পিয়ালা, ঘুরে ফিরে মাতাল দলে,
প্রথমে প্রেম আসান ভেবে প'ড়েছি আজ কি মুশ্‌কিলে !
মলয় শেষে কেশ হ'তে তার কস্তুরী-বাস দিবে,-আশায়
তার সুরভি বেণীর পেঁচে কলিজা খুন্ ক'রে দিলে।
রঙা'স্ মদে নামায-আসন পার্শী পীরে ব'ল্‌লে তোর ;
পথিক কভু নয় বেখবর সরাইখানার পথ সকলে।
হায় ! বঁধুর এ সরাই ঘরে কি সুখ আমার, হরদম যবে
ঘন্টা বাজে,- "হাওদা বাঁধ, হে মুসাফির ! যাত্রী চলে।"

---

[২৬৬] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *দীওআন-ই হাফিয*, ২য় সং. (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৫৯), পৃ. কভার পৃষ্ঠা।

[২৬৭] মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ (সম্পা.), *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ* (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. ২২।

[২৬৮] ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রেযা জালালী নায়িনী (সম্পা.), *দীওয়ানে হাফিজ শিরাজী* (তেহরান: আন্‌জুমানে খোশ নাভেস্তানে ইরান, ১৩৭৫ ইরানী সাল), পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

আঁধার রাতি, ভীষণ ঊর্ম্মি, জলের ঘুর্ণি কি ভয়ঙ্কর !
জান্‌বে কিসে মোদের হাল গো ডাঙার হাল্কা- ভারের দলে ?
সব কাজে মোর খোদ গরজে হ'ল আখের খালি বদনাম ;
গোপন কথা রয় কি চাপা সভার মাঝে রাষ্ট্র হ'লে ?
মিলন যদি চা'স্ তাহারি, র'স্ নে দূরে, হাফিয ওরে !
পাবি যখন পরাণ সখা, দিস্ দুনিয়া ছুড়ে ফেলে।[২৬৯]

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রি.)

করাচীর ইকবাল একাডেমী কর্তৃক নির্বাচিত গোলাম মোস্তফা কর্তৃক অনূদিত উনিশটি কবিতার অনুবাদ *কালাম-ই-ইকবাল* নামে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে *রুমূয-ই-বেখুদী, আসরার-ই-খুদী, জাবিদনামা* ও *পায়াম-ই-মাশরিক* ছাড়াও উর্দু কাব্য গ্রন্থ *বাঙ্গ-ই-দারা* ও *জরব-ই- কলীম* এর কবিতা স্থান পেয়েছে।[২৭০]

সিকান্দর আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫ খ্রি.)

সিকান্দর আবু জাফর ওমর খৈয়ামের পঁচাত্তরটি রুবাঈয়াত *রুবাইয়াৎ ওমর খইয়াম* শিরোনামে অনুবাদ করেছেন। সিকান্দর আবু জাফর অনুবাদ করতে গিয়ে ওমরের জীবনী, দর্শন, বিভিন্ন দেশে ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াত এর অনুবাদ এবং অনুবাদের গুনাগুন প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা হতে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[২৭১]

কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩ খ্রি.)

মহাকবি হাফিজ শিরাজীর *দীওয়ান* নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *দীওয়ান ই হাফিজ*-এর অনুবাদ করেছেন কাজী আকরম হোসেন। প্রকাশক আযাদ জাহান কর্তৃক আযাদ প্রকাশনী ৫১ হোসেনী দালান, ঢাকা থেকে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৭২] তিনি সা'দীর কাব্য গ্রন্থ *কারিমায়ে সাদীর* বঙ্গানুবাদ করেছেন কাজী ইকামুদ্দীন কর্তৃক ইতিকথা বুক ডিপো, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা হতে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মাসনবীর বঙ্গানুবাদ করেন এবং *মসনবীয়ে রুমী* নামে গ্রন্থটি কাজী ইকামুদ্দিন নিউ মহামায়া প্রেস, কলেজ স্ট্রীট কোলকাতা থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করেন। *যুগবাণী* নামে ইকবালের কবিতার কাব্যানুবাদও প্রকাশ করেন।[২৭৩]

---

[২৬৯] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *দিওয়ান ই হাফিজ*, পৃ. ৩।
[২৭০] সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩) পৃ. ৩৪১।
[২৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪।
[২৭২] কাজী আকরম হোসেন, *দীওয়ান ই হাফিজ* (ঢাকা: আযাদ প্রকাশনী, ১৯৬১), পৃ. কভার পৃষ্ঠা।
[২৭৩] আলী আহমদ (সংক.), *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী আকরম হোসেন মহাকবি হাফিজ শিরাজীর দীওয়ান নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *দীওয়ান ই হাফিজ*-এর অনুবাদ গ্রন্থের সূচনায় এগার পৃষ্ঠা সম্বলিত পরিচিতি শিরোনামে মহাকবি হাফিজের পরিচয়, তাঁর চিন্তা দর্শন, গযল ও অনুবাদ সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা তুলে ধরেছেন। কাজী আকরম হোসেন অনূদিত *দীওয়ান ই হাফিজ* এ রয়েছে প্রথম পংক্তির সূচি শিরোনামে অনূদিত গজলের প্রথম লাইনের অনুবাদ। কাজী দু'শ চল্লিশটি গযল অনুবাদ করেন। কাজী আকরম হোসেনকৃত অনুবাদের নমুনা নিম্নরূপ:

পূর্ণ চাদে দেয় রে শোভা উজল কমল তব!
রূপ সে লভে চমক নব চিবুক-টোলে চপল তব।
তোমার দিদার লাভের আশায় পরাণ এলো ঠোঁটের আগায়,
হবে কি বার? ফিরবে আবার? দেহ নিবেশ কেবল তব।
সে দিন কবে আসবে হাতে হাত মিলাবে যখন সুখে
শান্তি ভরা পরাণ আমার অলক আর ওই উথল তব?
নয়নের ওই বিলোল লীলায় আরাম হারাম সবার প্রানে,
সাধুপনার নাশে ধরম দিঠি সুরার গজল তব।
নিদ ভরা এ নসীব আমার জাগবে বুজি আবার আজি,
ঝাপটা যেগো মারলো চোখে রূপের ঝলক অমল তব!
মলয় সনে দাও উড়ায়ে গালের তোমার গোলাপ গুছি,
পুরুক আশা লভি' তাহে কানন সুবাস বিভল তব।
ভাগ্যবন্ত রাজা ওগো! দোহাই খোদার হউক দয়া
আকাশ সম চুমি যেন রংমহলার উপল তব।
হাফিজের এই দোয়া শোন কহ আমীন সাথে সাথে,
ভোগে আমার রহুক নিতি রাঙা অধর যুগল তব।[২৭৪]

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি.)

ফররুখ আহমদ বাল্যকালে দাদীর কাছ থেকে *তাজকিরাতুল আউলিয়া* ও *কাসাসুল আম্বিয়া* পুঁথি শুনতেন এবং ফারসি জানা এক মহিলার নিকট ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেন।[২৭৫] তিনি বিভিন্ন সময়ে রুমী সা'দী, হাফিজ প্রমুখ ফারসি কবির কবিতা অনুবাদ করেন।[২৭৬] বিভাগ পূর্বকালেই ফররুখ আহমদ ফারসি উর্দু কবি আল্লামা ইকবালের কাব্যের অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। *ইকবালের নির্বাচিত কবিতা* নামে তাঁর অনূদিত গ্রন্থ, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৭৭] তিনি আল্ল-ামা ইকবালের কাব্যগ্রন্থ *আসরারে খুদী* থেকে *আসরারে খুদী ঃ সূচনা খণ্ড, আসরারে খুদী থেকে, ভিক্ষুক, শৃঙ্খলা, ঈমান, মর্দে মুমিন* ও *বু'আলী কলন্দর* শিরোনামে বঙ্গানুবাদ করেন। তাছাড়া তিনি ইকবালের উর্দু

---

২৭৪ কাজী আকরম হোসেন, *দীওয়ান ই হাফিজ*, পৃ. ২।

২৭৫ শাহাবুদ্দিন আহমদ (সম্পা.), *ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ২৪৬-২৪৭।

২৭৬ ড. মোহাম্মদ ছবিরুল ইসলাম হাওলাদার, *ফররুখ আহমদের কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ ও ইসলামী উপাদান: একটি মূল্যায়ন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ২৮।

২৭৭ আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার অনুবাদও করেন।[২৭৮] তিনি *দীওয়ানে হাফিজ* অবলম্বনে চারটি কবিতা লিখেছেন এবং শেখ সা'দী ও উর্দু কবি আলতাফ হোসাইন হালীর কবিতাও অনুবাদ করেন।[২৭৯]

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২ খ্রি.)

আল্লামা ইকবালের *আসরারে খুদীর* সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তার অনুবাদটি হয়েছে স্বাধীন অনুবাদ। অনূদিত কবিতাগুলোর শিরোনাম হচ্ছে ইঙ্গিত পর্ব, *আসরারে খুদী*, প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব ইত্যাদি।[২৮০] ১৩৫২ ও ১৩৫৩ সালের মাসিক মোহাম্মদীর বিভিন্ন সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। ধর্মবোধের পোষকতা এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার জন্য *আসরারে খুদী* অনূদিত হয়েছিল বলে কবি মন্তব্য করেছেন।[২৮১]

আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক

আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল রচিত *রুমূয-ই-বেখুদী* কাব্যের প্রথম বাংলা অনুবাদক হলেন আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক।

রুমূয-ই-বেখুদী

আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল রচিত *রুমূয-ই-বেখুদী* কাব্যগ্রন্থটি মূল ফারসি হতে বাংলা পদ্যানুবাদ করেন আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক। এটি পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্‌ ৬, পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক মূলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পদ্যানুবাদ করেছেন। এটিই বাংলা ভাষায় *রুমূয-ই-বেখুদীর* প্রথম অনুবাদ।[২৮২] গ্রন্থের শুরুতে সৈয়দ আলী আহসানের তিন পৃষ্ঠার একটি 'মুখবন্ধ' আছে। এরপর অনুবাদক 'ইকবালের জীবন কথা' শিরোনামে নয় পৃষ্ঠার একটি জীবনী মূলক আলোচনা পেশ করেছেন। এ গ্রন্থে একত্রিশটি বিষয়ের উপর রচিত কাব্যের অনুবাদ করা হয়েছে। *রুমূয-ই-বেখুদীর* মূল ভূমিকার পূর্বে 'ইসলামী সম্প্রদায়ের খিদমতে নিবেদন' শিরোনামে একটি কাব্যের অনুবাদ অন্তর্ভূক্ত আছে। এরপর মূলগ্রন্থ *রুমূয-ই-বেখুদী* কাব্যের অনুবাদ শুরু হয়েছে। আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক কর্তৃক অনূদিত কবিতার নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

---

[২৭৮] আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. সূচীপত্র।

[২৭৯] নিতাই দাস, *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ১৪৪।

[২৮০] লুৎফর রহমান, 'বাংলাদেশ মে ইকবালিয়াত কা আহইয়া', অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ২০০৬।

[২৮১] সৈয়দ আলী আহসান, *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা* (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৩৭৫), পৃ. ২১১।

[২৮২] আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক (অনু.), *রুমূয-ই-বেখুদী* (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স্‌, ১৯৫৫), পৃ. মুখবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

حرز جان کن گفتهٔ خیر البشر　　هست شیطان از جماعت دورتر
فرد و قوم آئینهٔ یک دیگراند　　سلک و گوهر، کهکشان، واختراند
فرد میگیرد ز ملّت احترام　　ملّت از افراد می یابد نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود　　قطرهٔ وسعت طلب قلزم شود
مایه دار سیرت دیرینه او　　رفته و آینده را آئینه او[২৮৫]

ভূমিকা
ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক

ব্যক্তির তরে সংঘের ডোর দান খুদার,
পূর্ণতা লভে সংঘের বরে সত্তা তার।
ঘনিষ্ঠ হও সংঘের সাথে অনুক্ষণ,
আযাদ জনের গৌরব করো বিবর্ধন।
রক্ষা-কবচ শ্রেষ্ঠমানব-বাক্যে করো,
শয়তান থাকে জমা'আত থেকে দূরান্তর।
ব্যক্তি সংঘ পরস্পরের মুকুর হেন,
মুক্তামাল্য-পুঞ্জের মাঝে তারকা যেন।
সম্মান লভে ব্যক্তি একক সংঘ থেকে,
সংঘ সে পায় সুশৃংখলা ব্যক্তি থেকে।
সংঘের মাঝে ব্যক্তি যখন লুপ্ত হয়,
বিন্দু তখন বিস্তার লভি' সিন্ধু হয়।
প্রাচীন যুগের কীর্তির করে সে রক্ষণ,
অতীত এবং ভবিষ্যতের সে দর্পণ।[২৮৬]

সৈয়দ আবদুল মান্নান

আস্‌রারে খুদী

মহাকবি আল্লামা ইকবাল-এর ফারসি কাব্য *আসরারে খুদী*-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। গ্রন্থটি তমদ্দুন পাবলিকেশন্স, লালবাগ রোড, ঢাকা থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত ইকবালের কাব্যের নমুনা নিম্নরূপ:

در بیان اینکه خودی از عشق و محبّت استحکام می پذیرد

نقطهٔ نوری که نام او خودی است　　زیر خاک ما شرار زندگی است
از محبّت اشتعال جوهرش　　ارتقای ممکنات مضمرش

---

[২৮৫] ড. মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল ফারসি*, পৃ. ৮৫-৮৬।
[২৮৬] আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক, *রুমূয-ই-বেখুদী*, পৃ. ৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশ-পথ!
প্রজ্বলিত কর তোমার বাতি
রুমীর মতো
আর দগ্ধ কর রুম তাব্‌রিজের অগ্নিতে।
প্রেমাস্পদ লুকায়িত তোমার অন্তরে,
প্রদর্শন কর্‌বো আমি তাঁকে তোমার কাছে
যদি থাকে তোমার দর্শনের চক্ষু।
প্রেমিকেরা তাঁর সুন্দরের চাইতে সুন্দরতর,
মধুরতর, সুশ্রীতর, প্রিয়তর।[২৮৮]

در بیان اینکه خودی از سوال ضعیف میگردد

ای فراهم کرده از شیران خراج　　گشته روبه مزاج از احتیاج
خستگی های تو از ناداری است　　اصل درد توهمین بیماری است
می رباید رفعت از فکر بلند　　می کشد شمع خیال ارجمند
از خم هستی مئی گلفام گیر　　نقد خود از کیسئه ایّام گیر
خود فرود آاز شتر مثل عمر　　الحذر از منّت غیر الحذر
تا بکی در یوزۂ منصب کنی　　صورت طفلان زنی مرکب کنی
فطرتی کو بر فلك بندد نظر　　پست میگردد زاحسان دگر
از سوال آشفته اجزای خودی　　بی تجلّی نخل سینای خودی
از سوال افلاس گردد خوار تر　　از گدائی گدیه گر نادار تر
مشت خاك خویش را از هم مپاش　　مثل مه رزق خود از پهلو تراش[২৮৯]

আত্মা দুর্বল হয়ে পড়ে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা

ওগো যারয কর গ্রহণ করতে সিংহের কাছ থেকে
তোমাদের প্রয়োজন
তোমাদেরকে পরিণত করেছে শৃগালে।
বেদনা-সংগীত তোমার দারিদ্রের ফল ঃ
এই ব্যাধি তোমার ব্যথার উৎসমুখ।
তাতে বিনষ্ট করে তোমাদের সম্মানের উচ্চ ধারণা,
আর নিভিয়ে দেয় তোমাদের
মহান কল্পনার আলোক।
পান কর গোলাবী সুরারস
অস্তিত্বের সোরাহী থেকে!

---

[২৮৮] সৈয়দ আবদুল মান্নান, *আস্‌রারে খুদী* (ঢাকা: তমুদ্দন পাবলিকেশন্স, ১৯৫০), পৃ. ৫৭-৫৮।
[২৮৯] ড. মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল ফারসি*, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ছিনিয়ে নাও কালের ভাণ্ডার থেকে অর্থ!
নেমে এসো উষ্ট্র-পৃষ্ঠ থেকে
ওমরের মতো!
সাবধান, ঋণী হয়ো না কারুর কাছে?
আর কতকাল তুমি আকাংখা করবে দাসত্ব
আর চাইবে শিশুর মতো আরোহণ
করতে নলের?
যে প্রকৃতি নিবদ্ধ রাখে তার দৃষ্টি আকাশের দিকে,
হয়ে পড়ে হীনতর
দান গ্রহণের দ্বারা।
দারিদ্র গ্রহণ করে উৎকট আকার
ভিক্ষাবৃত্তিতে;
ভিক্ষায় ভিক্ষুককে করে তোলে দরিদ্রতর।
ভিক্ষা অবনমিত করে আত্মাকে
আর বঞ্চিত করে আত্মার সিনাইকে
আলোক থেকে।
ছড়িয়ে দিও না তোমার ধূলিমুষ্টিকে,
সংগ্রহ করো অন্ন তোমার আত্মশক্তিবলে
চন্দ্রের মতো। [২৯০]

বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্যানুবাদের ক্রমবিকাশে বলা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশাল অংশ জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল এবং এ চর্চার ফলে সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। মধ্যযুগের অনুবাদ কবিগণের বিষয় নির্বাচনের উৎস বিশেষণে দেখা যায় মুসলিম কবিদের উৎস ছিল আরবী, ফারসি ও হিন্দী ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্য। আরবী থেকে এসেছে ধর্মীয় গ্রন্থ, ফারসি থেকে এসেছে ধর্মীয় ও প্রেমোপাখ্যান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের ধারাটি সমৃদ্ধ লাভ করায় এ অনুবাদকর্ম সাহিত্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। মধ্যযুগে মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হলে মুসলিম শাসকগণ এ দেশের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের সাথে সাথে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম আকর্ষণও দেখিয়েছিলেন। মুসলিম শাসকগণ মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের প্রতি সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন না করলে মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের এত উৎকর্ষপূর্ণ বিকাশ সাধিত হত না বলে আমাদের বিশ্বাস। পরিশেষে বলা যায় অনুবাদ মৌলিক রচনা নয়; অনুবাদ কর্মের দ্বারা এক ভাষার শিল্পসম্পদ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত হয়। মধ্যযুগে মূলের অনুসরণে অনুবাদ হয়েছে কম; বেশী হয়েছে ভাবানুবাদ। কিছু আক্ষরিক অনুবাদ, কিছু মূলানুসরণ আর কিছু কল্পিত সংযোজন নিয়ে রচিত এসব রচনা ছিল প্রায় মৌলিক গ্রন্থের সমতুল্য।

[২৯০] সৈয়দ আবদুল মান্নান, *আস্‌রারে খুদী* (ঢাকা: তমুদ্দন পাবলিকেশন্স, ১৯৫০), পৃ. ৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৪
স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ভাষায় ফারসি অনুবাদকর্ম (১৯৭১-১৯৭৯)

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালেও ফারসি বঙ্গানুবাদের ধারা অব্যাহত থাকে। ভারতবর্ষে ফারসি ভাষায় রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরীন*, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, *হুমায়ুননামা*, *তবকাত-ই-আকবরী*, *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী*, তারীখে ফিরিশ্‌তা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্থাৎ ১৯৭১-১৯৭৯ সময়কালে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট এবং উপর্যুক্ত মৌলিক গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু ও অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৪.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশদের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে যেসব ইস্যুতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, সেগুলোর মধ্যে ছিল ভূমি সংস্কার, রাষ্ট্রভাষা, অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

প্রথমে ভাষার প্রশ্নে বাঙ্গালিরা অধিকার-সচেতন হয়। ক্রমান্বয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যগুলো তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে। এক পর্যায়ে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়, যা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ছিল চরম বৈষম্যের শিকার। ১৯৪৭-এর পর ১৫জন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সদস্যকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (পি.এস.সি.) পদোন্নতি দেয়া হয়। উক্ত ১৫জনের মধ্যে বাঙ্গালি ছিলেন মাত্র ৪জন।[১]

প্রশাসনে অবাঙ্গালি মুসলমানদের একচেটিয়া আধিক্য রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ণে তাদেরকেই মুখ্য ভূমিকা পালনকারীতে পরিণত করে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তাদের স্বার্থ চিন্তা ছিল বিধায় পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার লাভ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে অবাঙ্গালিদের আধিপত্য ছিল ব্যাপক।

[১] ড. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২হাজার কর্মচারী-কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২হাজার ৯০০ এবং তারা অধিকাংশই ছিলেন নিম্নপদস্থ।[২] ১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদসমুহে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে *বাংলাদেশের ইতিহাস* গ্রন্থের রচয়িতা ড. মো. মাহবুবুর রহমানের বক্তব্য এখানে গ্রহণীয়:

> পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো বেড়ে যায়। সামরিক শাসনের ৪৪ মাসে ৭৯০ জন জুনিয়র গ্রেড কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল মাত্র ১২০ জন (১৫.২%)। ১৯৫৯ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৬০ খ্রি. মে মাস পর্যন্ত ৯ মাসে ৭৩৪ জন সেকশন অফিসার নিয়োগ করা হয়, যার মাত্র ৭৪ জন (১০%) পূর্ব পাকিস্তানের। ১৯৫৯-১৯৬৩ সময়কালে রাওয়ালপিন্ডিস্থ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ৩১৫ জন কেরানি নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ছিল মাত্র ৩৬ জন (১১%)। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ খ্রি. মধ্যে ১৪ জন সামরিক কর্মকর্তাকে বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। আইয়ুবের ১৯৬২ খ্রি. সংবিধানে যদিও বৈষম্য কমিয়ে এনে চধৎরঃু প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। যেমন ১৯৬৬ খ্রি. কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৩৩৮ এবং ৩,৭০৮ জন এবং একই বছরের নন-গেজেটেড কর্মচারীর সংখ্যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল যথাক্রমে ২৬,৩১০ এবং ৮২,৯৪৪ জন।[৩]

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সার্ভিসেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজ করে। দেশভাগের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালিদেরকে অসামরিক জাতি বলে বিবেচনা করত, ফলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালিদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য।

যদি শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনাকালে প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বেশী ছিল। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্কুলগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়লেও প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা কমেছে। শিক্ষা বাবদ অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৫৫ সময়কালে শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানকে যেখানে বরাদ্দ দেয়া হয় ১৫৩০ কোটি টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় মাত্র ২৪০ কোটি টাকা (১৩.৫%)।[৪] যে সকল

---

[২] *প্রাগুক্ত।*

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪।

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

বৈদেশিক বৃত্তি দেয়া হয় তার সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভোগ করে, পূর্ব পাকিস্তানের যোগ্য প্রার্থীরা অনেক সময় এসব বৃত্তির সন্ধানই পেত না।

অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সবচেয়ে শোষিত। ১৯৪৮-৪৯ আর্থিক বছরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের ৫৭.৫৯ ভাগ অর্জিত হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে। সে বছর পাকিস্তানের মোট রফতানি আয়ের ৬৮% আয় আসে পাট খাত থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত চা, চামড়া, রেশম প্রভৃতি থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের সময় পাকিস্তানের উভয় অংশ শিল্প কলকারখানার দিক থেকে প্রায় সমান অবস্থায় ছিল।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের পর বিত্তশালী শরণার্থীরা পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন। ভাষা ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে এবং ফেডারেল রাজধানী অবস্থিত হওয়ায় বোম্বে ও উত্তর প্রদেশের মুসলমান ব্যবসায়ী-শিল্পপতিবৃন্দ করাচী ও লাহোরে গমন করেন এবং সেখানে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। সেখান থেকে হিন্দু মহাজন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের পুঁজিপাট্টা নিয়ে ভারতে চলে যায়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজিপতি হিন্দুদের ভারতগমনে বাধা দেননি, আবার ভারত থেকে আগত মুসলমান পুঁজিপতিদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে গমন করতেও উদ্বুদ্ধ করেননি।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়ে দেখা যায় যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র একবার (১৯৪৮-১৯৫১ খ্রি.) পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে (১৯৪৮ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তান থেকে খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৭জন। তার মধ্যে ৪জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ৩জন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেবল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙ্গালির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন ছিলেন।[৫] এমনকি বাঙ্গালিরা নিজ প্রদেশেও স্বশাসনের সুযোগ পায়নি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজ হাতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং রাজনৈতিক দলের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর উত্তরসূরীরা পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে।

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে তেইশ বছরের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করার পর বাঙ্গালিরা ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতা লাভ করতে ব্যর্থ হলে স্বাধীনতার চিন্তা করতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙ্গালির ওপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীরাই বাঙ্গালিদেরকে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য করে ।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙ্গালি জাতিকে আক্রমণ করার ফলে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাসে নজিরবিহীন হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা কবলিত সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালি দুর্জয় আক্রোশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। [৬]

মাওলানা ভাসানী ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই নানা সুযোগে পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন। তৎকালীন সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে ভাসানীর এ বক্তব্য ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করতে না পারলেও ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক আইন জারি হলে এ অঞ্চলের তরুণদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে ক্রমশ জনমত সৃষ্টি হতে থাকে।[৭] বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ বর্বরোচিত গণহত্যার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান 'স্বাধীন ও সার্বভৌম' বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অংশ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার দাবি উঠতে থাকে এবং পরদিন, ২ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রসমাজের পক্ষথেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে 'বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত' স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়।[৮] সেদিনই 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। ঘোষণায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের' তিনটি লক্ষ্য নির্দেশিত হয়:

---

[৬] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩য় সংস্করণ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০), পৃ, ৪৮১।

[৭] সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০১), পৃ. ১২০।

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

১। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙ্গালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙ্গালির ভাষা-সাহিত্য-কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা;

২। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন কল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ্য কায়েমের ব্যবস্থা;

৩। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করা। [৯]

ইশতেহারে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের 'সর্বাধিনায়ক' বলে ঘোষণা করা হয়।[১০] স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি শীর্ষক ইশতেহারে নিম্নোক্ত শ্লোগান উচ্চারণের জন্য আহবান জানানো হয়:

> স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-দীর্ঘজীবী হোক; স্বাধীন কর স্বাধীন কর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর; স্বাধীন বাংলার মহান নেতা-বঙ্গবন্ধু শেখ মজিব; গ্রামে গ্রামে দূর্গ কর; বীর বাংগালী অস্ত্র ধর মুক্তি যদি পেতে চাও- বাংগালীরা-এক হও।[১১]

৩ মার্চ থেকে আওয়ামী লীগের নির্দেশে সারা প্রদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসমাবেশে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন:

> ১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;
> ২. অবিলম্বে সব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনতে হবে;
> ৩. প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে;
> ৪. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।[১২]

এ-সংগ্রামকে শেখ মুজিবুর রহমান 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তির' সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-শ্রমিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সরকারী চাকুরে, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক-ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখতে শুরু করে ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে-পূর্ববাংলার সর্বত্র

---

[৯] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পটভূমি ১৯৫৮-১৯৭১* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৬৬৭।

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৮।

[১১] *প্রাগুক্ত*, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৮।

[১২] ড. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৯৪৭-৭১, পৃ. ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[১৩] ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সৈন্যের আক্রমণ শুরু হলে ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাঙ্গালীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ঐ বছর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম ছিল বিভিন্ন ঘটনা, বিরূপ পরিস্থিতি ও গুরুতর বিষয়ের কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাগত অবনতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

২৬ মার্চ পাকিস্তানী সৈন্যরা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধু বন্দি হওয়ার পূর্বেই চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম. এ. হান্নানের নিকট স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি স্বাধীনতার দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

> "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your Fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."[১৪]

প্রায় কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

> I also declare, we have already framed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democraticGovernment is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bagnladesh.
>
> The government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal government of Bagnladesh and is entitled to recognition from all democratic nation of the world.[১৫]

বাংলাদেশের সকল এলাকায় স্বাধীনতার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। এ অভ্যুত্থানে অংশ নেয় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ।

---

[১৩] সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[১৪] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ১।

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সামরিক কৌশল হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে ১১টি সেক্টর বা রণাঙ্গনে ভাগ করা হয়। প্রতি সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার (অধিনায়ক) নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য প্রতিটি সেক্টরকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি সাব-সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োজিত হন।

পরিশেষে এ দেশের বীর জনতা বাহু শক্তিকে পরাজিত করার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের ফলে ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি হয়।

৪.২ ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদকর্ম

স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ ধারাবাহিকতার স্পর্শ সাহিত্যাঙ্গনেও পরিলক্ষিত হয়। আর এ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধারায় ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো অনূদিত হয়। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে অনূদিত গ্রন্থাবলী যেমন–*রিয়াজ-উস-সালাতিন*, *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরীন*, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, *হুমায়ুন নামা*, *তবকাত-ই-আকবরী*, *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী*, *তারীখে ফিরিশ্তা* ইত্যাদি। নিম্নে উপর্যুক্ত অনূদিত গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হলঃ

৪.২.১ *রিয়াজ-উস-সালাতিন*

রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থটির লেখক গোলাম হোসাইন সালিম। (মৃত ১৮১৭ খ্রি.) গোলাম হোসাইনের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। লেখক তাঁর গ্রন্থের সূচনায় যে, আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর নাম গোলাম হোসাইন এবং উপাধি সলিম জৈদপুরী। এ সূত্রধরে হেনরী বেভারিজ গোলাম হোসাইনকে আযোধ্যাবাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এ মত খণ্ডন করেছেন। রিয়াজের বর্ণনার সূত্রধরে মৈত্রেয় উল্লেখ করেছেন যে, জর্জ উডণীর অধীনে নিযুক্তি লাভের ২ বছরের মধ্যে গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল। লেখক অযোধ্যাবাসী হলে এ অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানদের আচার-আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। কাজেই তিনি বাঙ্গালি ছিলেন না এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত তিনি মালদাহর অধিবাসী ছিলেন বলে অন্যসূত্র থেকে জানা যায়। ইংরেজদের মালদাহ কুঠির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জর্জ উডনী (Gorge Udny)। আলোচ্য গ্রন্থকার গোলাম হোসাইন ছিলেন তাঁর ডাক মুন্শী এবং জর্জ উডনীর নির্দেশেই *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬] এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাকারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

[১৬] ড. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সহৃদয় মিস্টার জর্জ উডনি পুরাতত্ত্ব ও ভ্রমন বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থ সর্বদা পাঠ করিতেন এবং সর্বপ্রকার জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের জন্য উৎসাহী ছিলেন। হিজরী ১২০০ সালে ইংরেজী ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রদেশ শ্রেষ্ঠ বঙ্গদেশে যে সকল অধিপতি রাজপতাকা উড্ডনী করিয়া এক্ষণে কালসাগরে বিলীন হইয়াছেন, তাহাদের জীবনবৃত্ত ও কার্যমালা জানিবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। এজন্য তিনি আমাদিগকে বঙ্গদেশের স্বাধীন নরপতি ও প্রতিনিধি শাসনকর্তাদের বিবরণ প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সংকলন পূর্বক সর্বসাধারণের বোধগম্য ও বিদ্বজনের অনুমোদনযোগ্য সরল পারস্য ভাষায় বিবৃত করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমরা বিদ্যাহীন, আমাদের ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ তথাপি প্রভূর আদেশ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমরা তদীয় আদেশ অনুযায়ী দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। আমরা (গ্রন্থ সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়া) প্রত্যেক স্থান হইতে বাক্যের পর বাক্য সংগ্রহ করিয়াছি; এবং দুই বৎসরকাল ব্যাপৃত থাকিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন শেষ করিয়াছি; এবং গ্রন্থশেষ করিবার তারিখ অনুসারে (১২০২ হিজরী) রিয়াজ-উস-সালাতিন নাম রাখিলাম।[১৭]

বস্তুতঃ গোলাম হোসাইন তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ, প্রচলিত জনশ্রুতি ও নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি *রিয়াজ-উস-সালাতিন* (رياض السلاطين) গ্রন্থ রচনায় ফারসি ভাষায় লিখিত সমসাময়িক কালের যে সকল গ্রহণযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন তন্মধ্যে মিনহাজুস সিরাজ রচিত *তবকাত-ই-নাসিরী* (طبقات ناصرى) জিয়াউদ্দীন বারনী রচিত ও শামস ই সিরাজ আফিফ রচিত *তারীখে ফিরোজ শাহী* (تاريخ فيروزشاهى) ইয়াহিয়া আহমদের *তারীখে মোবারক শাহী* (تاريخ مبارك شاهى) আব্বাস শিরওয়ানীর *তারীখে শাহী* (تاريخ شاهى) আবুল ফযলের *আইন ই আকবরী* (آئين اكبرى) ও *আকবর নামা* (اكبر نامه) বদাউনী রচিত *মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ* (منتخب التواريخ) নিজামুদ্দীন বখশীর *তবকাতে আকবরী* (طبقات اكبرى) দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজসভায় রচিত *তারীখে ফিরিশতা* (تاريخ فرشته) গোলাম হোসাইন তাবাতাবাঈর *সিয়ারুল মুতাআখখারিন* (سيرالمتأخرين) মুন্সী সলিমূল্লাহার *তারীখ-এ-বাঙ্গালা* (تاريخ بنگاله) উল্লেখযোগ্য।[১৮]

রিয়াজ-উস-সালাতিন-এ ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনায় গোলাম হোসাইন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিশেষ করে গৌড় ও পাণ্ডুয়া হতে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেন এবং এমনকি শিলালিপির তথ্যাদিও সংগ্রহ করেন। তাঁর এ গ্রন্থে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থা, উৎপন্ন কৃষি ও শিল্প দ্রব্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়। একই সাথে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠির জীবনধারা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থ রচনায় গোলাম হোসেন সলিমের মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু না থাকলেও বাংলার ইতিহাসের তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্ত কম নয়। কেননা এটি ছিল তখন পর্যন্ত লিখিত বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ।

---

[১৭] গোলাম হুসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পা.) (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ২৬।
[১৮] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৯ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

হেনরী বেভারিজ ও ব্লকম্যান প্রমূখ পণ্ডিতগণও গ্রন্থটির যথাযোগ্য প্রশংসা করেছেন। বেভারিজ রিয়াজকে "A valuable contribution to the history of Bengal" এবং ব্লকম্যান "The fullest account in persian of the Mohammedan History of Bengal" বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক Charles Stewart এর *History of Bengal (১৮১৩)* গ্রন্থটি প্রধানত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

মূল ফারসি ভাষা থেকে গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেন আবদুস সালাম। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়। এ ইংরেজী অনুবাদ থেকে আকবর উদ্দীন গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদ করেন এবং তা *বাংলার ইতিহাস* নামে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

আকবর উদ্দীন স্বীয় অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থের মূল রচয়িতা গোলাম হোসাইন সলিমের তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা ও ইংরেজী অনুবাদক আবদুস সালাম এর অনুবাদ সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। যেমন:

> বর্তমান শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে (সম্ভবত: ১৯০৪ সালে) অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মরহুম মওলবী আবদুস সালাম সাহেব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে মূল ফার্সী থেকে পুস্তকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ ছাড়াও তিনি প্রচুর মূল্যবান টীকা সংযোজন করেন।, যার ফলে মূল পুস্তকের মূল্য বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মূল পুস্তক লিখবার সময় গ্রন্থকার গোলাম হোসায়ন যেমন অন্য বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুস্তকের এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, ইংরেজী অনুবাদক সালাম সাহেব তাঁর চাইতে আরো অনেক বেশী গবেষণা করেছেন মনে হয়। সরকারী চাকুরীতে থাকাকালে তিনি বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে ছিলেন এবং সর্বত্র অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বহু তথ্য আবিস্কার ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি সালাম সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ থেকে (টীকাসহ) বাংলায় অনুবাদ করেছি।[১৯]

তবে এর আগে শ্রীরামপ্রাণ গুপ্তের সম্পাদনায় ১৩১২ সালে টাঙ্গাইল থেকে মূল ফারসি অবলম্বনে গ্রন্থটির একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার দিব্য প্রকাশ শ্রীরামপ্রাণ গুপ্তের এ অনুবাদ গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণ প্রকাশ করে।

রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থাকার মি. জর্জ উডনী সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় যে প্রশংসা করেছেন, আকবর উদ্দীন চমৎকারভাবে তা অনুবাদ করেছেণ। যেমন:

---

[১৯] আকবর-উদ-দীন, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. পাঁচ।

Dhaka University Institutional Repository

مناقب. اعلی مناصب. خجسته سیرت. فرخنده
سریرت. کریم الطبع. حلیم المزاج. ستوده شیم. سراپا همم. حاتم کشور سجاوت.
نو شیروان ممالك عدالت. خداوند فیاض زمان. مشفق و مهربان. بسیار بخش و کم
ستان. قدر دان فیض رسان. از همه اوصاف مستغنی مسترجارج ادنی. ادام الله تعالی
اقباله. وزاد حشمته. ورفع درجته. وضاعف عمره و قدره. بسلك ملازمان منتظم
گردیده. همواره مستفیض فیض و احسانش و بهره یاب انعام و نوالش بوده وهست.
الحق ذات مجمع الحسنات روزگار و دهر. عدیم المثال است[২০]

মি: উডনি একজন উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক; তাঁর চরিত্র সুন্দর, হৃদয় দয়ালু, আচরণ প্রসংশাজনক, এবং তিনি অত্যন্ত দানশীল।

দানশীলতায় তিনি হাতিমের তুল্য; বিচারে নওশেরওয়ার তুল্য; তিনি একালের একজন মহানুভব ব্যক্তি; জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা লাভ উভয়তেই তিনি নির্বিকার।

আল্লাহ তার সেই ভাগ্য বজায় রাখুন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন; তার পদোন্নতি দান করুন; এবং তার জীবন ও সম্মান বিগুনিত করুন। - এবং সে (গোলাম হোসায়েন) তাঁর অধীন একজন কর্মচারী; বরাবর তাঁর নিকট অনুগ্রহ পেয়ে আসছে ও এখনও পাচ্ছে। সংক্ষেপে, একালে তাঁর মতো সদগুণভূষিত, বদান্য ও বোধ শক্তি সম্পন্নব্যক্তি একক ও অতুলনীয়।[২১]

প্রশংসামূলক কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে গোলাম হোসাইন সলীম জজ উডনীকে পাঠকের সামনে আরো চমৎকারভাবে তোলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এ বিষয়ে *রিয়াজ-উস-সালাতিন* ফারসি গ্রন্থে বর্ণিত কবিতাগুলোর যে সার্থক অনুবাদ আকবর উদ্দীন করেছেন তাতে এ বক্তব্যটিকে একেবারেই অনুবাদ বলে মনে হয়নি। যেমন:

بود هر فضیلت ذات او مجموعهٔ خوبی
-ران و صیفی که آید در گمان افزون ازان دارد
دل روشن صواب اندیشی چون -ران دانا دل
ولی افبال عمر و حشمت و بخت جوان دارد
سخن سنجد بدمن گوهر معنی فروریزد.
دو لب همچون درکف وقت تکلم در فشان دارم
سیهان خوان نعمایش عسکینان و محجان
زر و دینار برجو از برای م—ن دارد[২২].

[২০] গোলাম হোসাইন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন* (কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, বাঙ্গাল, তা.বি.), পৃ. ৪।
[২১] আকবর-উদ-দীন, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ৪-৫।
[২২] গোলাম হোসাইন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সকল সদগুনের আকর
তিনি সর্বপ্রকার প্রশংসার উর্দ্ধে
তিনি জ্ঞানী ও পুরাকালের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো
–সকল বিষয়ে সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন
কিন্তু তাঁর আছে পূর্ণবয়স্কের তূল্য সৌভাগ্য,
–বয়স ও মর্যাদা
কথা বলার সময় ওজন করে তিনি বলেন ও সেগুলি অর্থপূর্ণ
হাতের তালু দিয়ে যেমন, তেমনি তার দুই ঠোঁট দিয়েও
কথাবার্তায় মুক্তা ছড়ায়।
দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থের জন্য তাঁর দান পাত্র সদা মুক্ত,
তিনি সর্বদাই স্বর্ণ ও দীনার দুঃস্থদের জন্য রাখেন।[২৩]

রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে গোলাম হোসাইন সলীম বাংলাদেশের সীমানা নিয়ে যে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন আকবর উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত সে অংশের কিয়দাংশ নিম্নরূপ:

مقدمه – مشتمل بر چهار چمن

چمن اوّل—در بیان کیفیت حدود و اطراف ممالک بنگاله. مشهود خواطر سیاحان اقالیم سیر و تواریخ باد که صوبهٔ بنگاله در اقلیم دوم است از اسلام آباد عرف چاتگام تابه تیلیا گدهی شرقا غربا چهار صد کروه طول. و عرض شمالاً و جنوباً از کوهستان شمالی تا سرکان مدارن. که حد جنوبی این صوبه است. دو صد کروه مسافت دارد و چون در زمان سلطنت جلال الدین محمّد اکبر پادشاه غازنی صوبهٔ اودیسه بر دست کالا پهار مفتوح شد. وآن صوبه داخل ممالک محروسهٔ پادشاه دهلی گردید. و صوبهٔ اودیه را نیز با بنگاله منتظم کردند. طول چهل و سه کروه و عرض بست کروه افزوده شد[২৪]

বাংলাদেশের সীমানা ও পারিপার্শ্বিকতার বিবরণ

বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমনকারী ও ইতিহাস পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সুবে বাংলা দ্বিতীয় ইকলিমে অবস্থিত। ইসলামাবাদ- যে স্থান চট্টগ্রাম নামে পরিচিত-থেকে তেলিয়াঘরি অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০০ করোই (ক্রোশ) এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ অর্থাৎ উত্তরে পর্বত থেকে সুবার দক্ষিণ সীমান্তস্থ সরকার মান্দারণ পর্যন্ত হচ্ছে ২০০ ক্রোশ প্রস্থ। জালাল উদ-দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজীর আমলে কালা পাহাড় কর্তৃক সুবে উড়িষ্যা বিজয়ের পর উক্ত সুবা দিল্লীর বাদশাহের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ও এই অঞ্চলকে সুবে বাংলার অংশ করা হয়। শেষোক্ত সুবার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৪৩ ক্রোশ ও প্রস্থে বিশ ক্রোশ বর্ধিত হয়।[২৫]

---

[২৩] আকবর-উদ-দীন, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ৫।
[২৪] গোলাম হোসাইন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-৭।
[২৫] আকবর-উদ-দীন, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম হোসাইন সলীম রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* আকবর উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত হয়ে *বাংলার ইতিহাস* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য অনুবাদ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে অনুবাদটি মূলানুগ হয়েছে।

৪.২.২ *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরীন*

সাইয়্যেদ গোলাম হোসাইন তাবাতাবায়ী *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরীন* নামক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটি রচনা করেন। *সিয়ার-উল-মুতায়াখ্খিরিন* অষ্টাদশ শতকে সংকলিত একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। মুসলিম ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসাইন খান তাবাতাবায়ী ১৭৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থাকারের পিতার নাম সৈয়দ হেদায়েত আলী খান। তিনি ছিলেন শাহজাদা আলী গহর (পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম, ১৭৫৯-৯৩ খ্রি.) এর এক সময়ের প্রধান মন্ত্রী। সৈয়দ গোলাম হোসাইন খান পাটনার নায়েব নাজিম জয়ন-উদ্-দীন খানের সেনাপতি ও তাঁর আপন মামা সৈয়দ আবদুল আলী খানের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।

সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরিন একটি সুবিশাল ইতিহাস গ্রন্থ। *সিয়ারুল মুতায়াখখিরিন* তিন খণ্ডে লিখিত। প্রথম খণ্ড আরম্ভ হয়েছে ভারতের প্রাচীনকাল থেকে এবং সমাপ্ত হয়েছে আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বের শেষে। দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হয়েছে সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৭০০ খ্রি.) এর মৃত্যু থেকে। এ খণ্ডে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের বিষয় বর্ণনা, মুর্শিদাবাদের নিযামতের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এ প্রদেশের বিভিন্ন আইন কানুন বিধি ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সম্রাট মুহম্মদ শাহ এবং অযোধ্যা, হায়দারাবাদ, হায়দর আলী ও মারাঠাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২৬] এতে নবাব মীর কাশিমের মৃত্যু প্রসঙ্গেও উল্লেখ করা হয়েছে। হাকিম আবদুল মজিদ এ সুবিশাল গ্রন্থটির ফারসি পাঠ সম্পাদনা করেন এবং ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি তিন খণ্ডে তা প্রকাশ করে। তবে তার পূর্বেই বাংলার গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংসের আগ্রহে মঁশিয়ে রেমন্ড (M. Raymond) নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত 'হাজী মোস্ত াফা' ছদ্মনামে গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেন। অনুবাদক 'নোটা মনাস' (Nota Manus) ছদ্মনামে গ্রন্থটি হেস্টিংসের নামে উৎসর্গ করেন। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার R. CAMBRAYX CO. ইংরেজী অনুবাদটি প্রকাশ করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হাজী মোস্তফার ইংরেজী অনুবাদ ও হাকীম আবদুল মজিদ সম্পাদিত সিয়ারের ফারসি পাঠের মধ্যে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। হাজী মোস্তাফা অনূদিত সিয়ারের প্রথম

[২৬] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ১০ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

খণ্ড শুরু হয়েছে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে এবং শেষ হয়েছে ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু হাকীম আবদুল মজিদ সম্পাদিত ফারসি পাঠের প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই এবং শেষ হয়েছে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে। এ অংশের অনুবাদ হাজী মোস্তাফা করেননি।

সিয়ার-উল্-মুতায়াখখিরিন একটি পরিধিবহুল গ্রন্থ। গ্রন্থের মুখবন্ধে গ্রন্থাকার এ বিশাল গ্রন্থ রচনার উদ্দ্যেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর নিকট ইতিহাস অভিজ্ঞতার গ্রন্থ, জনসাধারণের জন্য জ্ঞান ও শিক্ষার বিষয়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, মানব জীবনে ইতিহাসের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করে তিনি *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরিন* রচনা করেছেন। তাঁর দাবী তিনি তাঁর ইতিহাসের যা কিছু বর্ণনা করেছেন সবই যথাযথভাবে ও সততার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। কোন প্রকার বিদ্বেষ, ভীতি, প্রীতি বা অনুগ্রহের বশবর্তী না হয়ে সব কিছু তিনি নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থাকারের বক্তব্যে একজন সত্যসন্ধানী, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রকৃত ইতিহাসবিদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের খণ্ডগুলো (যা হাজী মোস্তফা প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ডে অনুবাদ করেছেন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এসব খণ্ডে নবাবী বাংলাসহ এমন এক সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে যার কোন ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁর রচনা এক বিরাট শূণ্যস্থান পূরণ করেছে।

গোলাম হোসাইন খানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য জানা যায় না। তাঁর নিজের এবং পরিবার পরিজনদের সম্পর্কে তিনি সিয়ারে অনেক কথা বললেও নিজের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। তবে অবস্থা দৃষ্টে একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে, তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আরবী ভাষায় তাঁর পারঙ্গমতা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে না আসা গেলেও ফারসি ভাষায় তাঁর যে অসাধারণ দখল ছিল তা *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরিন*-এ এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু ভাষা জ্ঞান নয় সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস বিষয়েও তিনি অসামান্য বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এ বিষয়ে সিয়ার গ্রন্থ তাঁর উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরিণ সমসাময়িকালের জন্য একটি বিরাট তথ্য ভাণ্ডার। বস্তুতঃ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দৃশ্যটি সামগ্রিকভাবে এ গ্রন্থে ধরা পড়েছে। শুধু রাজনৈতিক নয় সমসাময়িক বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এ গ্রন্থের বিশেষ মূল্য রয়েছে। *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরিণ* গ্রন্থের সফল অনুবাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া যথার্থই বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

সেই যুগে ইতিহাস নিয়ে বাংলায় আরও অনেক ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু সেই সব গ্রন্থের বর্ণনা এত সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন যে, এ সব গ্রন্থ পাঠ করে অন্ধদের হাতি দেখার মতো সেই সময়ের ঘটনাবলীর সম্যক ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। সেই তুলনায় সিয়ারের বর্ণনা খুবই বিস্তারিত এবং এ ব্যাপারে কাপর্ণ্যের অপবাদ গ্রন্থাকারকে দেওয়া যাবেনা।[২৭]

সিয়ার-উল-মুতায়াখ্‌খিরিন রচয়িতার গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য অতীত ঘটনাবলীকে ধারাবাহিকভাবে একসূত্রে উপস্থাপিত করা। প্রাসঙ্গিক ভাবেই এ সব ঘটনাবলীর মাধ্যমে আবহমান বাংলার রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি এতে উঠে এসেছে।

বাংলার ইতিহাসের এ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি ইংরেজী অনুবাদের প্রথম খণ্ড আবদুল কাদের বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি মূল ফারসি পাঠের প্রথম খণ্ডের মাঝামাঝি থেকে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পর্যন্ত যেখানে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, সে অংশটুকু আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বাংলায় অনুবাদ করেছেন। দিব্য প্রকাশ, ঢাকা কর্তৃক ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে এ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আবদুল কাদের কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থ *সিয়ার-উল-মুতায়াখ্‌খিরিন* থেকে বাদশাহ মুহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর সংক্রান্ত আলোচনার অনুবাদ উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হল:

ذکر رحلت محمد محی الدین اورنگ زیب عالمگیر پادشاه و جلوس اولادش بر سریر سلطنت و مقتول شدن محمد اعظم شاه مغفور و محمد کام بخش در جنگ و قرار یافتن سلطنت بمحمد معظم خلف اکبر محمد اورنگ زیب

عالمگیر بادشاه را که مشغول تسخیر و تنسیق ممالك دکهن بود و اطمینان کلی از ان امور میسر نیامده عطف عیان بشاه جهان آباد که مرکز دولت سلاطین بابریه و سواد اعظم بلاد هندوستان است میسورنگشت بحسب فرمان قضا در سال پنجاه و دویم از جلوس وسن نود ویك سالگی در بلدهٔ احمد نگرسنه ۱۱۱۸ هجری نبوی عوارض آلام جسمانی برمزاجش هجوم آورده از زندگی ما یوس گردیده دران وقت محمد کام بخش پسر کهتر خود را که بسیار دوست میداشت بروز دوشنبه هفدهم ذی القدة الحرام چار ساعت روز بر آمده صوبه بیجاپور مرحمت فرموده

[২৭] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. আটত্রিশ।

Dhaka University Institutional Repository

حکم نمود که از دولت سرای شاهی با تجمل ملوکانه سوار گردد و نوبت نواخته راهی شود و کوچهای طولانی نموده در راه توقف نماید سببش آنکه مبادا از دست اعظم شاه عجاله باو آسیبی رسد و روز پنجشنبه بستم ماه مذکور چار ساعت از روز بر آمد محمد اعظم شاه پسر وسطی را که در حضور حاضر بود رخصت کرده حکم نمود که بصوبه مالو نهضت کند اماتانی در قطع منازل نموده هر روز پنج کروه مسافت طی نماید و دو روز در منزل مقام کرده روز سوم باز راهی شود هماناغرض ازین امر آن بود که اگر سانحه ناگزیر روی نماید بسبب نزدیکی شاهزاده مذکور که شجاع بافرهنگ وجویای نام و ننگ است در اردو آشوبی بر نخیز دو علت کوچاندنش آنکه مبادا در ضعف بیماری کاریکه خود با پدرش کرده بود پسرش با او کند القصه اعظم شاه حسب الامر بجا آورده فرسخی چند رفته بود که عالم گیر پادشاه روز جمعه ۲۸ ماه و سال مذکور پکیاس و سه گهری روز که تقریبا پنج ساعت نجومی باشد بر آمده داعی حق را لبیک اجابت گفته بعالم بقاشنافت[২৮]

বাদশাহ মুহম্মদ আওরঙ্গযীব আলমগীর তাহার জীবনের বড় একটা অংশ দাক্ষিণাত্য জয় ও উহা বশে আনিতে ব্যয় করার পর তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভে অসমর্থ হইয়া অবশেষে তাহার অভিযান পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উহা ছিল বাবর বংশের সাম্রাজ্যের রাজধানী ও হিন্দুস্তানের নগরাবলীর মুকুটমণি কিন্তু আহমদ নগরে তাঁহার অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ায় তিনি স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার সময় পাইলেন না। সেখানে ৯৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ও তাঁহার রাজত্বের ৫২ বৎসরে তিনি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন; তিনি এতই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন। দুইজন শাহজাদা তখন তাহার শিবিরে ছিলেন, একজন তাঁহার কনিষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র কামবখশ; অন্যজন আজম শাহ। আজম শাহ ছিলেন সাহসী, সুযোগ্য ও সামরিক যশগৌরবের জন্য লালায়িত। বাদশাহ তৎখনাৎ কিশোর শাহজাদাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে বিজাপুরের সুবাদারি দিয়া যাবতীয় রাজোচিত আড়ম্বর ও পরিষদ বর্গ সমভিব্যহারে সোজা কর্ম স্থলে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। তাঁহার প্রতি নির্দেশ রহিল, দীর্ঘ মনিজলে সফর করার এবং অবিরাম গতিতে আগাইয়া যাওয়ার জন্য। আদেশ ইহাও ছিল যে, তিনি যেন ১৭ ই জিলক্বদ মঙ্গলবার সুর্যোদয়ের চারিঘন্টা পূর্বে রওয়ানা হইয়া যান। এরূপ সঠিক উপদেশ দানের উদ্দেশ্য ছিল কিশোর শাহজাদাকে তাহার জোষ্ঠভ্রাতা আজম শাহের নাগালের ও অনুস্মরণের বাহিরে রাখা। এই পূর্ব সতর্কতা অবলম্বনের সাতদিন পরে তিবি তাঁহার অপর পুত্র পূর্বোক্ত আজম শাহকে সুর্যোদয়ের চারিঘন্টা পরে তাঁহার মালবের সুবাদারির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আদেশ দান করিলেন; তাঁহার প্রতি উপদেশ রহিল যে, তিনি যেন নাতিদীর্ঘ মঞ্জীলে দিনে প্রায় পাঁচ মাইল করিয়া অগ্রসর হন এবং প্রতি মঞ্জিলে দুই দিন থাকিয়া কেবল প্রতি তৃতীয় দিনেই সফর করেন। এবম্বিধ আদেশ দানে বাদশাহ তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, সিংহাসন খালি হইলে দেশে যদি কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবে তিনি যেন তাকে দমন করিতে পারেন এবং ইতিমধ্যে তাঁহার পিতার মৃত্যুতে তাঁহার মিরাস অধিকারের জন্য যেন তাঁহাকে হাতের কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু বাদশাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল

[২৮] সাইয়্যেদ গোলাম হুসাইন তাবাতাবায়ী, *সিয়ারুল মুতাআখখারিন* (কলকাতাঃ বেদারুল উমারা, তা.বি.), পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

> এমন একজন উদ্দ্যোগী রাজপুত্রকে নিজের নিকট হইতে কতটা দুরে রাখা-যাহাতে তাঁহার দৈহিক দুর্বলতার সুযোগে তাঁহাকে ধৃত ও বন্দি করিবার সুযোগ না পায়। অর্থ্যাৎ নিজ পিতা শাহজাহানের সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত ঠিক সেইরূপ আচরণে শাহজাদাকে নিবৃত রাখা। কিন্তু শাহজাদা কয়েক মঞ্জিল যাইতে না যাইতে বাদশাহ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার স্রষ্টার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন। "আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" (আমি প্রস্তুত, হে আল্লাহ প্রস্তুত) এই ছিল তাঁহার শেষ বাণী। সেদিন ছিল শুক্রবার। মাসের বিশ তারিখ। বেলা তখন এক প্রহর তিন ঘড়ি অর্থ্যাৎ সুর্যোদয়ের পাঁচ ঘটিকা পর।[২৯]

আবদুল কাদের কর্তৃক অনূদিত উপস্থাপিত অংশে দেখা যায় তিনি *সিয়ারুল মুতায়াখখিরিন* এর ফারসি গ্রন্থে উল্লিখিত শিরোনামগুলোর অনুবাদ করেননি। তা সত্ত্বেও আবদুল কাদের যেভাবে অনুবাদ করেছেন, তা মুলানুগ হয়েছে। উল্লেখ্য যে সম্প্রতি মূল ফারসি পাঠের প্রথম খণ্ডের মাঝামাঝি থেকে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পর্যন্ত যে অংশটুকু আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বাংলায় অনুবাদ করেছেন তা দিব্য প্রকাশ, ঢাকা কর্তৃক ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। আ. কা. মো. যাকারিয়াকৃত অনুবাদ যেখানে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সার্থক ও সফল অনুবাদ হিসেবে ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

৪.২.৩ *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*

ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*র মূল রচয়িতা আলাউদ্দীন ইস্পাহানী ওরফে মির্জা নাথান। মির্জা নাথান ছিলেন সমকালীন মোগল সেনাপতিদের অন্যতম। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলা এবং আসামে সমস্ত অভিযান ও যুদ্ধে এবং বাংলায় শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে সম্রাট জাহাঙ্গীর শিতাব খাঁন উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর পিতার নাম মালিক আলী যিনি ইতিমাম খাঁ নামে সুপরিচিত।[৩০] সম্রাট আকবরের সময়ে তিনি আড়াইশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পিতা রাজকীয় নৌবহরের অ্যাডমিরাল হিসেবে ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুবাহদার ইসলাম খাঁ চিশতির সাথে বাংলায় আগমন করেন। পিতার সাথে মির্জা নাথান সামরিক জীবন বাংলায় অতিবাহিত করেন। অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ অবলোকনকারী হিসেবে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের আলোকে তিনি তা লিপিবদ্ধ করেন। গায়বী নাথানের তাখাল্লুস বা ছদ্মনাম, আর এ ছদ্মনাম অনুসারেই তাঁর রচিত গ্রন্থের নামকরণ করেন *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*।

---

[২৯] ড. এম আবদুল কাদের (অনু.), *সিয়ারে মুতাখ্খিরীন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১।
[৩০] খালেকদাদ চৌধুরী (অনু.), *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, খণ্ড ১ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

মির্জা নাথান তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন:

> এই নগণ্য ব্যক্তির এই ধারণা জন্মে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুলতান ও শ্রেষ্ঠতম খাকান নুরউদ্দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজীর (মহান আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন) সৌভাগ্যপূর্ণ রাজত্বকালের একটি ক্ষুদ্রতম অংশও যদি লিপিবদ্ধ করে রাখা যায় তাহলে তা কালের পৃষ্ঠায় স্থায়ী হয়ে থাকবে এবং দূরদর্শী বিদ্যান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থের উল্লিখিত সত্য ও সঠিক ঘটনাবলী থেকে সমকালীন বহু তথ্য ও ইতিহাসের সন্ধান লাভ করবেন। তাই আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এই আশা নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হলো যে তা শাহী দরবারের পণ্ডিতদের এবং জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিদের সুক্ষ্ম দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা তা সংশোধন করে জাহাঙ্গীরের ইতিহাসে তা সংযোজিত করে নেবেন।[৩১]

বাহারিস্তান-ই-গায়বী গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত। এবং প্রতিটি খণ্ডের নাম 'দফতর'। প্রথম খণ্ডে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলার বিভিন্ন সুবেদারের শাসনকালের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এ অংশে সুবাহদার ইসলাম খানের সুবাদারির বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথম 'দফতর' এর নাম ইসলামনামা। এতে রয়েছে বারটি অধ্যায় প্রতিটি অধ্যায়কে গ্রন্থাকার দাস্তান বা কাহিনী বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ড বা দফতরের কোন নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু এ অংশে কাশিম খান চিশতির সুবাহদারির বর্ণনা রয়েছে। এতে রয়েছে আটটি অধ্যায় বা দাস্তান। তৃতীয় খণ্ডে ইবরাহীম খাঁর শাসন ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং এর নামকরণ করা হয়েছে ইবরাহীম নামা। এতে রয়েছে মোট ছয়টি দাস্তান বা অধ্যায়। চতুর্থ দফতর বা খণ্ডে শাহজাদা শাহজাহান কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার অধিকার করার বিস্ত ারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। গ্রন্থের উক্ত দফতর বা খণ্ডটি ওয়াকিয়াত-ই-জাহানশাহী নামে পরিচিত।[৩২] এতে তিনটি দাস্তান বা অধ্যায় রয়েছে।

দীর্ঘকাল এ গ্রন্থের কথা অজানা ছিল, স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক আবিস্কৃত *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এক মহা মূল্যবান আকর গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক এম. আই বোরাহ ইংরেজী ভাষায় *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* অনুবাদ করেন। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে আসাম সরকার কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ শব্দ ও ভৌগলিক স্থানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত করেন। বোরাহ কর্তৃক অনূদিত অনুবাদ সর্বমহলে খুবই মানসম্মত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

বাহারিস্তান-ই-গায়বী এর ইংরেজী অনুবাদক ড. এম. আই. বোরা গ্রন্থ সর্ম্পকে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

---

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

[৩২] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৭ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

"মোগল শাসন আমলে অসংখ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়। ইতিহাসের এইসব মৌলিক গ্রন্থের পাশাপাশি রচিত হয় মোগল বাদশাহ এবং তাঁদের আমীর-উমরাহ্ ও পার্শ্বচরদের ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতিপূর্ণ বহু গ্রন্থ। এই সমস্ত মূল্যবান ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচিত হওয়া সত্ত্বেও মোগল শাসন-আমলের সামরিক ও বে-সামরিক আমলাতন্ত্রের জটিল তথ্য, বিস্তারিত, প্রামাণ্য ও সমালোচনা বাস্তবধর্মী বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ হিসাবে বাহারিস্তান-ই-গাইবীর স্থান সর্বোচ্চ। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী ষোল বছরের বাংলা, বিহার, কোচবিহার এবং কামরূপ রাজ্যের বাস্তব ঘটনাবলীর একটি শ্রেষ্ঠতম ও বাস্তব দলিল এই বাহারিস্তন-ই-গাইবী গ্রন্থটি।"[৩৩]

বাহারিস্তান-ই-গায়বী এর ইংরেজী অনুবাদ হতে বঙ্গানুবাদ করেছেন খালেকদাদ চৌধুরী (১৯০৭-১৯৮৫ খ্রি.)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা হতে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। পর্যায়ক্রমে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড এবং ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থে সে আমলে বাংলার মুসলিম সমাজে পবিত্র রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা কিভাবে উদ্‌যাপিত হতো তার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঈদুল ফিতরের নতুন চাঁদ দর্শনে মুসলমানদের আনন্দ উৎসবের ইঙ্গিতও মীর্জা নাথানের এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। নাথানের এ গ্রন্থে সন্তানের জন্মের পর সেকালে বাংলায় কি ধরনের উৎসব উদযাপিত হতো তারও বর্ণনা পাওয়া যায়।

খালেকদাদ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত বাহারিস্তান-ই-গায়বী থেকে অনুবাদের কিয়দাংশ নিম্নে উপস্থাপিত হল:

বাদশা কর্তৃক ইতিমাম খাঁর নৌবাহিনী পরিদর্শন

বাংলার বিদ্রোহীদের মূল উৎপাটনের জন্য বাদশা কর্তৃক ইতিমাম খাঁর শাহী দরবার ত্যাগ করে বাংলা যাত্রার হুকুম হলে ইতিমাম খাঁ ১০১৬ হিজরী, ৯ই রবিউল (৪ঠা জুলাই, ১৬০৭ খ্রীঃ) এক শুভক্ষণে বাদশা কর্তৃক তাঁর নৌবাহিনী পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি তার নৌবাহিনীকে সম্রাটের ঝরোকার নীচে সমবেত করেন। সেখান থেকে তাঁর করী-বাহিনীর লড়াই-এর মহড়া পরিদর্শন করেন। অতঃপর ইতিমাম খাঁ বাংলা যাত্রা করেন। যাত্রার সময় তাঁর গোলান্দাজ বাহিনীর কামান গর্জনে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠে।

কল্যান সিং এর সঙ্গে ইতিমাম খাঁর সাক্ষাৎ

চলার পর ৯ম দিন ইতিমাম খাঁ এলাহাবাদ উপস্থিত হন। ইতিমাম খাঁর উপস্থিতির পূর্বেই রাজা মানসিংহের পুত্র কল্যাণ সিং এলাহাবাদ ত্যাগ করে তাঁর প্রধান স্ত্রী রানী গওর সহ সরাইবন্দেগী অভিমুখে রওনা হয়ে যান। বাংলা ও রোটাস থেকে আগত রাজা মানসিংহের গোলান্দাজ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার শাহী নির্দেশ থাকায় ইতিমাম খাঁ কল্যাণ সিংহের নিকট তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রেরণ করেন। তাঁরা তিনশ ত্রিশটি 'গজ-নাল' (ছোট কামান) 'হাত-নাল, (বন্দুক) এবং 'শের-দাহান (ব্যঘ্রমুখাকৃতি) কামান সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন। এলাহাবাদে অবস্থিত কিছু সংখ্যক নৌকাও তাঁরা নিয়ে নেন। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল থেকে নৌ-বহর নিয়ে রওনা হয়ে ঝুসিতে এসে তাঁবু গাড়েন।[৩৪]

---

[৩৩] খালেকদাদ চৌধুরী (অনু.) *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, খণ্ড ১ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ভূমিকা ৫।
[৩৪] খালেকদাদ চৌধুরী, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, খণ্ড ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৪ *হুমায়ুননামা*

গুলবদন বিনতে বাবর *হুমায়ুননামা* নামক গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় রচনা করেন। আর গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোস্তফা হারুন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে এপ্রিল ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ফারসি ভাষায় রচিত এ ঐতিহাসিক দলিল *হুমায়ূননামার* প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করেন মিসেস এনিটা বিউরেজ।[৩৫] উর্দু ভাষায় এ গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে তবে রশিদ আক্তার নদভী কর্তৃক অনুবাদ বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। গুলবদন বেগম রচিত এ গ্রন্থটি সম্রাট হুমায়ূন[৩৬] এর ইতিহাস সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উৎস গ্রন্থ। বাবর[৩৭] এর কন্যা গুলবদন ১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে এর দিকে জন্মগ্রহণ করেন। হুমায়ূন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন শাহজাদী গুলবদনের বয়স ছিল প্রায় আট বছর। জনৈক চাঘতাই মোগল খিজির খাওয়াজা খাঁনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। একজন সুশিক্ষিতা, প্রতিভাময়ী, জ্ঞানানুরাগী, ধর্মপরায়ণ ও সংস্কৃতিবান নারী হিসেবে গুলবদন ছিলেন খ্যাতিমান। সম্রাট হুমায়ূনের মৃত্যুর পর তিনি সম্রাট আকবর[৩৮] এর কাছ থেকে সুরক্ষা ও সম্মান লাভ করেন। ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সম্রাট আকবরের কাছে তিনি অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন, যে তাঁর মৃত্যুর পর

---

[৩৫] মোস্তফা হারুন (অনূ.), *হুমায়ূন নামা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. অনুবাদকের কথা।

[৩৬] **সম্রাট হুমায়ূন** (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রি.): জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবরের ইন্তেকালের পর নাসির উদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ূন ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের উনত্রিশে ডিসেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অনিবার্য কারণে ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ত্যাগে বাধ্য হন এবং ১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে মোগল আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। শান্ত স্বভাব ও দয়ালু সম্রাট হুমায়ূন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী দিল্লীতে স্বীয় লাইব্রেরীর সিঁড়ি হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। [দ্রঃ এ. কে. এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ ১৮৯-২১৮; ড. আবদুল করিম, *পাক-ভারতে মুসলিম শাসন* (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৯), পৃ. ২২৭-২৫০; Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India* (Allahabad: The Indian Press (Publications) Private Ltd., 1994), pp. 217-232; S. M. Jaffar, *The Mughal Empire* (Delhi: 1974), pp. 33-49|]

[৩৭] **সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)**: ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্তানের এক ক্ষুদ্র রাজ্য ফরগানার আমীর ওমর শেখ মির্জার পুত্র জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথ এবং ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মাত্র চার বছর রাজ্য শাসন করে ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমণ করেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে বাবর অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। [দ্রঃ এ. কে. এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ১৭৭-১৮৮; ড. আবদুল করিম, *পাক-ভারতে মুসলিম শাসন* (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৯), পৃ. ২০৯-২২৬; Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India* (Allahabad: The Indian Press (Publications) Private Ltd., 1994), pp. 200-216; S. M. Jaffar, *The Mughal Empire* (Delhi: 1974), pp. 9-32; Ashirbad Lal Srivastava, *The Mughal Empire (1526-1803 A.D.)* (Agra: Shiva Lal Agarwala @ Co., (Private) Ltd., Second Edition, 1957), pp. 10-42.

[৩৮] **সম্রাট আকবর** (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.): ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে জন্মগ্রহণকারী মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বহুল আলোচিত ও সমালোচিত নরপতি হচ্ছেন সম্রাট আকবর। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পিতা নাসির উদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ূনের ইন্তেকালের পর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করেন। তিনি ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সম্রাট আকবর সমাজনীতি, সমরনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। [দ্রঃ এ. কে. এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ ২১৮-২৭২; ড. আবদুল করিম, *পাক-ভারতে মুসলিম শাসন* (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৯), পৃ. ২৫১-৩২১; Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India* (Allahabad: The Indian Press (Publications) Private Ltd., 1994), pp. 235-314; S. M. Jaffar, *The Mughal Empire* (Delhi: 1974), pp. 71-91.]

Dhaka University Institutional Repository

আকবর তাঁর লাশ কিছু দূর পর্যন্ত বহন করেন এবং তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য অকাতরে দান করেন। সম্রাট আকবরের অনুরোধে গুলবদন *হুমায়ূননামা* গ্রন্থটি রচনা করেন।[৩৯]

হুমায়ূননামা গ্রন্থে সম্রাট বাবর সম্পর্কে তাঁর বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও সম্রাট হুমায়ূন সম্পর্কে যথেষ্ট বর্ণনা রয়েছে। *হুমায়ূননামা* গ্রন্থে গুলবদন রাজনৈতিক বর্ণনা ছাড়াও তিনি তৎকালীন সামাজিক রীতি-নীতি এবং মোগল দরবারের আদব-কায়দা সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা উপাস্থাপন করেছেন। গুলবদন কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত *হুমায়ূননামা* এর একমাত্র কপিটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে বলে জানা যায়।[৪০] মোস্তফা হারুনকৃত বঙ্গনুবাদের নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

> জমাদিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ রোজ জুমাবারে বাদশাহ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সারা বিশ্ব তার সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য মোবারকবাদ জানান।
>
> সিংহাসন আরোহণ করার অব্যবহিত পরেই বাদশাহ হুমায়ুন মা-বোন ও মহলের অন্যান্যদের কাছে আসেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাদেরকে সান্তনা দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং অতঃপর ঘোষণা করেন যে, যারা ইতিপূর্বে জায়গীর, পদাধিকার এবং যে কোন রাজকীয় সুযোগ ভোগ করতে ছিলেন, এখনও তারা সে সব যথানিয়মে ভোগ করে যাবেন।
>
> এই দিনে মির্জা হিন্দাল কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তন করে হুমায়ুন বাদশাহর খেদমতে হাজির হন। হুমায়ুন বাদশাহ ভাইয়ের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তির অনেক কিছুই মির্জা হিন্দালকে দিয়ে দেন।
>
> সিংহাসন লাভের পর হুমায়ুন বাদশাহ সর্বপ্রথম যে কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলো মরহুম আব্বা হুজুরের মাজারে উপস্থিত হন এবং মোহাম্মদ আলী আছিসকে মাজারের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে ষাটজন কোরানে হাফেজ ও সুললিত কণ্ঠের অধিকারী কারীদেরকে মাজারের খেদমতের নিমিত্ত নিয়োজিত করেন। তারা পাঁচ বেলা বাজামাত নামাজ পড়বে এবং কোরানখানি করবে, যার বদৌলতে বংশকুল চুড়ামনি হযরত শাহেনশাহ বাবুরের বিদেহী আত্মা সওয়াব হাসিল করবে। [৪১]

৪.২.৫ *তবকাত-ই-আকবরী*

তবকাত-ই-আকবরী গ্রন্থটির রচয়িতা খাজা নিজামুদ্দীন আহমদ। নিজামুদ্দীনের পিতার নাম উসমান হারভী। তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রথম বকশীর পদে[৪২] অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রন্থ রচনার সময় পর্যন্ত গ্রন্থটি ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সাধারণ ইতিহাস। মুখবন্ধের বর্ণনামতে গ্রন্থটি রচনার তারিখ ১৫৯২-১৫৯৩ খ্রি. কিন্তু গ্রন্থের বর্ণনা ১৫৯৩-১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। নিজামুদ্দীন ১৫৯৪

[৩৯] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ১০ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৪৯১।

[৪০] *প্রাগুক্ত*।

[৪১] মোস্তফা হারুন (অনু.), *হুমায়ুন নামা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ২৬।

[৪২] সেনা বিভাপের সর্বোচ্চ কর্তা; প্রধানত সৈন্যদের বেতনের হিসেব করে টাকা বন্টন করাই ছিল তার মূল দায়িত্ব। [দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, চতুর্থ সংস্করণ (কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০৪ বাংলা), পৃ. ৫২২।]

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিষ্টাব্দে লাহোরে মারা যান। সমসাময়িককালের পূর্ববর্তী ইতিহাসের জন্য তিনি পুরোনো কাহিনীকারদের রচনার সাহায্য নেন, আর আকবরের সমসাময়িক হওয়ায় তিনি ঐ সময়ের সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য *তবকাত-ই-আকবরী* খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সহজ ভাষায় লিখিত *তবকাত-ই-আকবরী* প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ যেখানে মোটামুটিভাবে বাংলার নৃপতিদের নাম ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে। *তবকাত-ই-আকবরী* গ্রন্থটি *তারিখ-ই-নিজামী* নামেও পরিচিত।[৪৩] খাজা নিজামুদ্দীন আহমদ এ গ্রন্থ সংকলনে অনেক ইতিহাস গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য গ্রহনযোগ্য:

> تفصیل اسامی کتب تواریخ که این تاریخ، بر مجملی از جمیع آنها اشتمال دارد اینست تاریخ یمینی، تاریخ زین الاخیار، و روضت الصفا، وتاج المآثر، و صبقات ناصری، و خزائن الفتوح، وتغلقنامه، و تاریخ فیروز شاهی از ضیاء برنی، و فتوحات فیروز شاهی، و تاریخ مبارک شاهی، و تاریخ فتوح السلاطین و تاریخ محمود شاهی مندوی و تاریخ محمود شاهی خورد مندوی و طبقات محمود شاهی گجراتی و مآثر محمود شاهی گجراتی، و تاریخ محمدی و تاریخ بهادر شاهی، و تاریخ بهمنی، و تاریخ ناصری، و تاریخ مظفر شاهی، و تاریخ میرزا حیدر، و تاریخ کشمیر، و تاریخ سند، و تاریخ بابری، و واقعات بابری، و تاریخ ابراهیم شاهی، و واقعات مشتاقی، و واقعات حضرت جنّت آشیانی همایون بادشاه[৪৪]

এ পুস্তক সংকলনে যে সব ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে সেগুলোর নাম হল তারিখ-ই-ইয়েমেনি, তারিখ-ই-জয়নুল আকবার, রৌযাত-উস-সাফা, তাজ-উল-মা'সির, তবকাত-ই-নাসিরি, খাযাইন-উল-ফতুহ, তুঘলকনামা, তারিখ-ই-ফিরোয শাহী ঃ লেখক যিয়া বারণী, ফতুহাত-ই-ফিরোযশাহী, তারিখ-ই-মুবারক শাহী, তারিখ-ই-ফতুহ-ই-সালাতিন, মা'সির-মুহম্মদ-শাহী-গুজরাটি, তারিখ-ই-মাহমুদ শাহী মান্দভী; তারিখ-ই-মাহমুদ শাহী, খুর্দ মান্দভী, তবকাত-ই-মাহমুদ শাহী গুজরাটি, তারিখ-ই-বাহাদুর শাহী, তারিখ-ই-বাহমনী, তারিখ-ই-নাসিরী, তারিখ-ই-মুজাফফর শাহী, তারিখ-ই-মির্যা হায়দার কাশ্মিরী, তারিখ-ই-কাশ্মির, তারিখ-ই-সিন্দ্, তারিখ-ই-বাবরী, ওয়াকায়াত-ই-বাবরী, তারিখ-ই-ইব্রাহিম শাহী, ওয়াকায়াত মুশতাকী, জান্নাতবাসী মহান সম্রাট হুমায়ুন বাদশাহের ওয়াকায়াত।

তবকাত-ই-আকবরী গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। খাজা নিজামুদ্দীন আহমদ রচিত *তবকাত-ই-আকবরী* গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন ফজলুর রহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটির

---

[৪৩] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৩৪।

[৪৪] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ রচিত বি. ডি. এম. এ, আই. সি. এস (সম্পা.), *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ১ (কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙ্গাল, ১৯২৭), পৃ. ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ফজলুর রহমান কর্তৃক তবকাত-ই-আকবরীর অনূদিত প্রথম খণ্ড থেকে অনুবাদের কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপর করা হল:

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس رفعت اساس بادشاه حقیقی را سزد که حل وعقد نظام عالم، وضبط و ربط بنی آدم، در وجود عالی ورود فرمان روایان معدلت پیشه، ومملکت پیرایان نصفت اندیشه ودیعت نهاد و استمرار و استحکام قوانین دین و دولت، در اثر جلال و جمال ، ولطف و قهر و رحمت و سیاست این طبقه عالی مکنون و مخزون ساخت. و درود عرش صعود، بر قافله سالاران صراط مستقیم، که آبله پایان ظلمات ضلالت را بنورستان هدایت رهنمونی کردند، و بافاضۀ انوار ربانی و اشاعۀ اسرار الهی، گم گشتگان بادیۀ حیرت را بسر منزل مقصود رسانیدند، به تخصیص اکمل افزاد کون واتم مظاهر تائید و عون، که گوهر عالیش نور ایزدی، و عنصر گرامیش جوهر قدسی ست، و آسمان و زمین ظل نور اوست، و کون و مکان فروغ ظهور او، و بر پیروان شاهراه رضایش، که قدم بر قدم او سلوک نموده به پیشگاهوصول پیوستند.

اما بعد عرض میدارد، ذره بمقدار نظام الدین احمد بن محمد مقیم الهوری، که از خانه زادان و اخلاص نزادان درگاه والای حضرت شاهنشاه اعظم، سلطان السلاطین عالم، ظل جلیل حق، خلیفت الله المطلق، مشیّد ارکان جهانستانی، موسس قوانین جهانباقی، خدیوجهان و جهانیان، خداوند زمان و زمانیان، جامع اسرار سبخانی، صاحب ملکات روحانی، ملک کشای عظیم صولت، مملکت آرای قوی دولت، غضنفر بیشه معارک و مغازی ابو الفتح جلال الدین محمّد اکبر بادشاک غازی، خلد الله ملکه و سلطانه، و ایّد موائد عدله و احسانه است[৪৫]

সর্বোচ্চ প্রশংসা সেই প্রকৃত নৃপতিরই প্রাপ্য যিনি পৃথিবীর শাসন ব্যবস্থায় ভাঙ্গাগড়া আর মানব জাতির ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ রাজাদের ও বিজ্ঞ শাসকদের মহান অস্তিত্বের উপর ভারার্পণ করেন; আর ধর্ম ও শাসনের আইন কানুন প্রয়োগ ও রক্ষণ করিবার ব্যাপারে এই সব মহান লোকদের চরিত্রে মহত্ব, ও ঔদার্য, দয়ার্দ্রতা এবং দৃঢ়তা ও করুনা ও রোষ প্রদান করেন। আর আল্লাহর সিংহাসনের ন্যায় উচ্চ প্রার্থনা সেই কাফেলাসমুহের নেতাদেরই প্রাপ্য যাহারা সত্য পথ অনুসরণ করেন এবং নির্বোধ পরিব্রাজকদের ধর্মহীনতার

[৪৫] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকার হতে পথ প্রদর্শন করিয়া সত্যের উজ্জ্বল প্রান্তরে আনয়ন করেন আর যাহারা হতবুদ্ধিতার মরুভুমিতে বিচরন করেণ তাহাদিগকে আল্লাহর আলোকের প্রাচুর্যের সহায়তায় এবং আল্লাহর মহান দীপ্তির মাহাত্মে পরিপূর্ণতার বেহেশতে লইয়া যান। আর বিশেষভাবে সৃষ্টির ঐ সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ আবং আলাহর সাহায্য ও অনুপ্রেরণার সর্বশেষ প্রতীক, যাহার সমুন্নত প্রকৃতি আল্লাহর দীপ্তির অংশ এবং যাহার মহান নির্যাস আল্লাহর পবিত্রতারই অংশ; পৃথিবী আর আকাশ যাহার আলোকের প্রতিচ্ছবি, আর সকল শূন্যতা ও সৃষ্টি যাহার চিন্তার নির্যাস ; আর যাহারা তাহার ইচ্ছার রাজপথে বিচরণ করেন এবং পদে পদে তাহার অনুসরন করিয়া মিলনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে পৌছেন।

কিন্তু ইহার পর এই তুচ্ছ পরমাণু নিযাম উদ্দিন আহমদ, মুহম্মদ হাকিম হারাভির পুত্র, যিনি মহান সম্রাটের মহান দরবারের একজন নগণ্য ভৃত্য ও বিশ্বাসি অনুচর, আর সেই মহা সম্রাট হইলেন পৃথিবীর সুলতানদের সুলতান, আল্লাহর পরোপকারী প্রতিচ্ছায়া, সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি, বিশ্ব বিজয়ের খুটি সমূহের সুদৃঢ়কারী, পৃথিবী শাসনের নিয়ম কানুনের প্রতিষ্ঠাতা, সমস্ত পৃথিবী এবং ইহার সকল অধিবাসীর শাসনকর্তা, সকল কালের এবং সকল জিনিসের প্রভু, আল্লাহর সকল রহস্যের প্রতীক, আধ্যাত্মিক শক্তিসমুহের রূপ পরিগ্রহকারী, সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী, এবং সর্বাপেক্ষা সফল শাসনকর্তা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রণক্ষেত্রের সিংহ, আবুল ফতেহ জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ; আল্লাহর তাহার প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্য যেন চিরস্থায়ী এবং তাহার ন্যায়পরায়নতা ও পরোপকারীতার ভাব যেন পূর্ণ করেন।

তাহার সুযোগ্য পিতার উপদেশ অনুযায়ী তাহার শৈশব কাল হইতেই তিনি ইতিহাস পুস্তক সমুহ পাঠে মনোযোগ দেন, যাহা অধ্যয়নশীলদের বুদ্ধিমত্তা উজ্জ্বল করে আর।[৪৬]

তাবকাত-ই-আকবরী গ্রন্থে নাসিরুদ্দীন সবুক্তগীন সম্পর্কে খাজা নিযামুদ্দীন যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এবং ফজলুর রহমান কর্তৃক অনূদিত সে অংশের বর্ণনা নিম্নরূপ:

ذکر امیر ناصر الدین سبکتگین

او غلام ترک نزادست مملوک الپنگین که او غلام امیر منصور بن نوح سامانیست. ودر خدمت منصور بن نوح بمرتبهٔ امیر الامرا رسیده بود. امیر ناصر الدین در ایام دولت امیر منصور، بهمراهی ابو اسحاق بن الپتگین ببخارا رسیده در خدمت او بمرتبهٔ وکالت رسید. چون ابو اسحاق به نیابت امیر منصور بحکومت غزنیی رسید مدار کارخانهٔ حکومت را بامیر ناصر الدین گذاشته، خدمتش استقلال تمام پیدا کرد. چون ابو اسحاق رخت اقامت بعالم دیگر کشید. و ازو وارسی نماید سپاهی و رعیت بر حکومت ناصر الدین رضا داده، اختیار متابعت او نمودند. و او از روی استظهار بکار امارت پر داخته، علم ملک سقانی بر افراخت. و در سنه سبع و ستین و ثلثمآئه، طغان نامی که حکومت ولایت بست باو متعلق بود، از دست پایتور نامی که

[৪৬] আহমদ ফজলুর রহমান (অনু.), *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ১ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

بست را منصرف شده طغافرا بر آورده بود، پیش امیر ناصر الدین آمده ازو مدد خواست. و امیر ناصر الدین لشکر کشیده بست را از تصرف پایتور بیرون آورده، حوالۀ طغان نمود. و طغان قبول پیشکش بسیار کرده عهد کرد، که از جادۀ متابعت بیرون نرود و چون بوعده وفا نکرده نقض عهد ازو صادر شد امیر ناصر الدین بست را تصرف او بر آورده گماشتۀ خود گذاشت[৪৭]

১। আমীর নাসিরুদ্দীন সবুক্তগীন।

তিনি ছিলেন আলাবতিগীনের তুর্কী জাতীয় একজন ক্রীতদাস, আবার আলাবতিগীন ছিলেন সামানী নূহের পুত্র আমীর মনসুরের ক্রীতদাস আর তাহার চাকুরিতে আমীর উল উমারা পদে উন্নীত হন।

আমীর মনসুরের প্রতিপত্তির সময়ে আমীর নাসিরুদ্দীন আলাবতিগনের পুত্র আবু ইশহাকের সংগে বুখারায় আগমন করেন; আর তাহার চাকুরিতে তাহার প্রতিনিধির পদে উন্নীত হন। আবু ইশহাক যখন আমীর মনসুরের প্রতিনিধি রূপে ঘযনীর গভর্ণর নিযুক্ত হন, তখন তিনি শাসন কার্য আমীর নাসিরুদ্দীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান এবং তাহার শাসনে পূর্ণ শৃঙ্খলা শান্তি বিরাজ করে। আবু ইশহাক যখন কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়াই পরলোক গমন করেন, তখন সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ আমীর নাসিরুদ্দীনের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া নেন। এবং তাহার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি মহা উৎসবের সঙ্গে শাসনকার্য আরম্ভ করেন এবং দেশ বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেন।

আ. হি ৩৬৭ সনে বাস্তের ভূতপূর্ব রাজা তূঘান, যিনি পাতিউয নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, আমীর নাসিরুদ্দীনের নিকট আগমন করেন এবং তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমীর নাসিরুদ্দীন তাহার সেনাবাহিনী সহ অগ্রসর হন এবং পাতিউযের নিকট হইতে বাস্ত ছিনাইয়া নেন এবং তাহা তুঘানের হস্তে অর্পণ করেন; তুঘান যথেষ্ট পরিমাণ কর দিতে স্বীকৃতি হন এবং এক চুক্তি সম্পাদন করেন যে তিনি কখনও আনুগত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না। পরবর্তীকালে তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং আমীর নাসিরুদ্দীন ঐ দেশ হইতে তাহাকে বিতাড়িত করেন এবং তথায় তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।[৪৮]

*তবকাত-ই-আকবরী*র লেখক বিভিন্ন আলোচনার ফাকে ফাকে যে কাব্যের অবতারণা করেছেন, সে কাব্যের অনুবাদেও ফজলুর রহমান সফলতার সাক্ষর রেখেছেন। যেমন:

اگر بایدت دولت وعز و ناز   باحسان، دل دوستان صید ساز
ازان یافت کاوس بر خصم دست   که چون رتمی داشت فرمان پرست
سپه را باحسان قوی کن بجنگ،   که از جنگ مرد افگن افتد پلنگ[৪৯]

---

[৪৭] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬।
[৪৮] আহমদ ফজলুর রহমান (অনূ.), *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।
[৪৯] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা

তোমার যদি ক্ষমতা, মহত্ব আর মর্যাদা থাকে
অনুগ্রহ আর মর্যাদা দিয়া তোমার বন্ধুদের হৃদয় জয় কর।
ইহার দ্বারাই কাউস তাহার শত্রুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন
তিনি একজন রুস্তম হইলেও তোমার আদেশ পালন করিবেন।
তোমার সৈন্যদের প্রচুর অনুগ্রহ দ্বারা যুদ্ধে শক্তিশালী কর
কারণ মানব হন্তার কাছে সিংহও পরাজয় বরণ করে। [৫০]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ফজলুর রহমান সাহেব যেমনি সার্থকভাবে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেছেন তেমনি তিনি দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদেও সফলতার সাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ফজলুর রহমানকৃত সার্থক অনুবাদের কিছু নমুনা দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নিম্নে উপস্থাপিত হল:

ذکر نهضت فرمودن حضرت جهانبانی فردوس مکانی ظهیر الدین بابر بادشاه غازی

بن عمر شیخ بن سلطان ابو سعید بن مرزا سلطان محمد بن مرزا میرانشاه بن امیر تیمور کورکان طیب الله ثراهم، و جعل الجنت مثواهم.

چون این مجموعه مخصوص وقائع هندوستان ست سوانحی که آنحضرت را ، در ولایت ماوراء لنهر، ونراسان و جاهای دیگر دست داده است، بیان آنرا حواله بتاریخ اکبر نامه، از تالیفات افاضل پناه، حقایق و معارف آگاه مقرب الحضرت الخاقانیه علامی شیخ ابو الفضل، و واقعات بابری، و دیگر تواریخ نموده، شروع بما نحن فیه کرده، می آید. وچون درین، سلسلهٔ ابدپیوند، حضرت بابر بفردوس مکانی اشتهار دارد، درین مجموعه نیز، بهمین کلمه تعبیر خواهد نمود[৫১]

যহির উদ্দীন বাবর

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, বেহেশতের অধিবাসী সম্রাট যহিরুদ্দীন বাবর বাদশা ঘাযীর পিতা উমর শেখ, পিতা সুলতান আবু সাইদ মির্যা, তাহার পিতা মির্যা সুলতান মুহম্মদ, তাহার পিতা মির্যা মিরন শাহ, তাহার পিতা আমীর তাইমুর গুরগান, আল্লাহ যেন তাহাদের কবর পবিত্র করেন, আর আল্লাহ যেন বেহেশতকে তাহাদের বাসস্থান করেন, ভ্রমণের বিবরণ।

যেহেতু এই বিবরণী বিশেষ করিয়া হিন্দুস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে লিখিত, মারওয়ারুন্নাহার, এবং খুরাসান এবং অন্যান্য স্থানে সম্রাটের যে বিপদসমুহ ঘটিয়াছিল সেই

---

[৫০] আহমদ ফজলুর রহমান (অনূ.), *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৪।
[৫১] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

সবের বিবরণ সম্বন্ধে পাঠককে আকবরনামা নামীয় ইতিহাসখানি দেখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে; এই পুস্তকটি রচনা করিয়াছেন সর্বগুনান্বিত সর্বসত্য ও আল্লাহর জ্ঞান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, সম্রাটের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ, সর্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত শেখ আবুল ফযল; আর তাছাড়া ওয়াকিয়াত বাবরী ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থও পাঠ করা যাইতে পারে; এবং আমাদের বিষয় শুরু করা যাইতে পারে। আর এই চিরস্থায়ী বংশের ইতিহাসে সম্রাট বাবর বাদশাহ যেহেতু সর্বদাই ফির্দোস মাকানী (বেহেশত বাসী) নামে পরিচিত, এই ইতিহাস গ্রন্থেও তাহাকে এই নামেই অভিহিত করা হইবে।[৫২]

তবকাত-ই-আকবরীর ফারসি গ্রন্থে খাজা নিযামুদ্দীন কোন ব্যক্তির আলোচনা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, অনুবাদক ফজলুর রহমান অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সেদিকটি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন:

بیت

شیر را حاجت لشکر نبود، خاصه گهی،
که بود آرزوی صید غزالش در سر،
مهربی خیل، و سیه عرصۀ عالم گیرد
چون کند رایت اقبال عیان، از خاور[৫৩].

কবিতা

সিংহের কোন সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়না, বিশেষ যখন
তিনি হরিণ শিকারের মনস্থ করিয়াছেন
সুর্য, সৈন্যদল বা স্বগোত্রীয় লোক ছাড়াই পৃথিবী জয় করে
যখন পূর্ব দিগন্ত হইতে ইহা তাহার পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরে।[৫৪]

ملا غربتی بخاری

از همه قسم اشعار دارد، و دیوانی ترتیب داده. در هند آمده، بملازمت حضرت خلیفه آلهی رسید. و از نوال انعام آن حضرت شاداب گشته باز به بخارا رفت. ازوست .

قضا جدا ز تو خونم چرا نمی ریزد،
مگر ز دست قضا این قدر نمی آید.

---

[৫২] আহমদ ফজলুর রহমান (অনূ.), *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।
[৫৩] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।
[৫৪] আহমদ ফজলুর রহমান (অনূ.), *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

براه عشق تو در هیچ منزلی نرسیدم،
که درد عشق ترا بیشتر رسیده ندیدم[৫৫].

মুল্লা ঘুরবতী বুখারী, তিনি বহু প্রকারের কবিতা লিখিয়াছেন এবং একটি দিওয়ান সাজাইয়াছেন। ভারতে আগমন করিয়া তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহির চাকুরি লাভ করেন আর তাহার উপহারে খুশী হইয়া বুখারায় প্রত্যাবর্তন করেন। নিম্নের উদ্বৃতি গুলি তাঁর রচনা হইতে নেওয়া।

কবিতা

আমি যখন তোমার কাছ হইতে দূরে থাকি তখন
ভাগ্য কেন আমার রক্তপাত ঘটায়না
সম্ভবতঃ ইহা ভাগ্যের হাতের আওতার মধ্যে নয়।
তোমার প্রেমের পথে আমি কোন লক্ষস্থলে পৌছিনাই
আমি দেখি নাই যে প্রেমের বেদনা আমার পূর্বেই পৌছে নাই।[৫৬]

ملا طالب اصفهان

قریب بیست سال است که در کشمیر سکونت دارد و در سلك بندهای درگاه منتظم است .

بیت

خوش آن بزمی که سرنه نهاده بر زانوی تو میدی
تو گوی باد در بکشود و یار عاز در درون امد৫৭.

بیت

زهرم بفراق خود چشانی که چه شد،
خون ریزی و آستین فشانی که چه شد .
ای غافل ازان که تیغ هجر تو چه کرد،
خاکم بفشار تابدانی که چه شد[৫৮].

---

[৫৫] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৮।
[৫৬] আহমদ ফজলুর রহমান (অনূ.), *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৭।
[৫৭] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৮।
[৫৮] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, পৃ. ৫১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুল্লা তালিব ইসফাহানী, প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি কাশ্মিরে অবস্থান করিতেছেন এবং দরবারের ভৃত্যদের দলভুক্ত হইয়াছেন।

কবিতা

সেই ভোজেই আনন্দময় যাহা ইহার মাথা হতাশায় হাটুতে স্থাপন করে নাই।
তুমি বলিতে পার যে মলয় প্রবাহ দ্বার খুলিয়া দিয়াছে
আর ভিতর হইতে বন্ধু আসিয়াছে।
চতুষ্পদী শ্লোক
তুমি আমাকে তোমার বিরহের বিষপানে বাধ্য করিয়াছ
আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কি ঘটিয়াছে;
তুমি রক্তপাত করিতেছ, তোমার আস্তিন ঝাড়িতেছে
আর জিজ্ঞাসা করিতেছে কি ঘটিয়াছে।
ওহে; তোমার বিরহের তরবারি যে কি করিয়াছে সে সম্বন্ধে অনবহিত তুমি
আমার ধুলি চাপিয়া ধরে, যাহাতে তুমি জানিতে পার যে কি ঘটিয়াছে।[৫৯]

উপর্যুক্ত দীর্ঘ উদাহরণে দেখা যায় ফারসি গ্রন্থে যেখানে পদ্যে ও গদ্যে বর্ণনা রয়েছে সে ক্ষেত্রে অনুবাদক অনুবাদ করার সময় সেভাবেই অনুবাদ করেছেন, যা নিঃসন্দেহে সার্থক ও সফল অনুবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৪.২.৬ *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী*

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.), সম্রাট শাহজাহানের[৬০] মৃত্যুর পর আলমগীর উপাধী ধারণ করে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৬১] তাঁকে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুদের বিদ্রোহ ও আক্রমনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের দখল নিয়ে দুর্বল উত্তরাধীকারীদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে দ্রুত মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।[৬২] সম্রাট আলমগীরের সময় শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত *ফাতওয়ায়ে আলমগীরি* তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৬৩] আরবী, ফারসি, ইসলামী শরিয়ত ও ফিকাহ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত সম্রাট আওরঙ্গজেব মুসলিম সমাজের কাছে আজও জিন্দাপীর ও আলমগীর নামে সুপরিচিত।

---

[৫৯] আহমদ ফজলুর রহমান (অনূ.), *তবকাত-ই-আকবরী*, খণ্ড ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৭-৫২৮।

[৬০] **সম্রাট শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রি.):** সম্রাট জাহাঙ্গীরের ইন্তেকালের পর শাহজাহান ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারী সিংহাসনে আরোহণ করে। শিক্ষানুরাগী শাহজাহান অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে সাম্রাজ্য শাসন করেন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তিনি ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। [দ্রঃ এ. কে. এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ ২৯১-৩২২; ড. আবদুল করিম, *পাক-ভারতে মুসলিম শাসন* (ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৯), পৃ. ৩৪৯-৩৯৭।]

[৬১] এ. কে. এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩।

[৬২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০।

[৬৩] ড. আবদুল করিম, *পাক-ভারতে মুসলিম শাসন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী গ্রন্থটি ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যামূলক টীকাসহ রচিত হয়েছে। এটি ফারসি মূল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক। ইংরেজী অনুবাদ করেছেন জামশিদ এইট. বিলিমোরিয়া বি. এ.। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে অক্টোবর, ১৯৭৪ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের পত্রাবলীর তিনটি সংগ্রহ রয়েছে। *রুকআতে আলমগিরি* অথবা *কলেমাতে তয়্যেবাত* নামক প্রথম সংগ্রহটি সম্রাটের অন্যতম প্রধান সচিব এনায়েতুল্লাহ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। *রকাইমে কারাইম* নামক দ্বিতীয় সংগ্রহটি আবদুল করিম আমির খান নামক অপর সচিবের পুত্র কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংগ্রহটির নাম *দস্তরুল আমল অঘাহী* যা সম্রাটের মৃত্যুর আটত্রিশ বছর পর রাজা আয়ামলের নির্দেশে তাঁরই একজন শিক্ষিত কর্মচারী কর্তৃক বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এগুলো ছাড়াও *আদাবে আলমগিরি* নামে আরেকটি সংগ্রহ রয়েছে যাতে পিতা-পুত্র ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লিখিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের কতগুলো পত্র স্থান পেয়েছে।[৬৪]

এ পত্রগুলোতে সাধারণত আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে এবং পত্রগুলোতে মাঝে মাঝে প্রসংঙ্গক্রমে সম্রাটে বা তাঁর পিতার শাসনামলের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া এগুলোতে আওরঙ্গজেব যে একজন ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, কোমলপ্রাণ, ধর্মভীরু ও ভক্তিমান মুসলমান ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পত্রগুলো অধ্যয়নে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্রদেরকে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছেন তা জানা যায়। সাম্রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে কিভাবে রাজ্যশাসন করতে হয় সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা এ পত্রগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে।

পত্রগুলোর মাঝে সুপরিচিত পারস্য কবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃত চমৎকার ও উপদেশমূলক বহু শ্লোকের সমাহার পরিলক্ষিত হয় যা তার মূল বক্তব্যের নির্যাস। এ বিষয়টি ফারসি ভাষায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের পাণ্ডিত্য ও শাসকের কাব্যপ্রীতির সাক্ষ্য বহন করে।

পিতা সম্রাট শাহজাহানের প্রতি আওরঙ্গজেবের অপরিমিত শ্রদ্ধা, প্রজাদের সুখ-শান্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা, ন্যায়ের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শাহজাদা ও সকল শ্রেণীর শাহী কর্মচারীকে তাঁর অমূল্য উপদেশ দান, পবিত্র কোরান হাদীস ও ফারসি ভাষার উপর তাঁর প্রভূত অধিকার এবং সর্বোপরি ইসলাম ধর্মের প্রতি যে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা রয়েছে তা জানার জন্য আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী

[৬৪] মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক (অনূ.), *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. সাত।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একজন শাসক ও মানুষ হিসেবে আওরঙ্গজেবের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যাবে এ পত্রগুলোতে। *রুকআতে আলমগিরি* এর অনুবাদ *আলমগীরের পত্রাবলী* নামক আলোচ্য গ্রন্থে একশত একাশিটি পত্র রয়েছে।

বাংলায় মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক ছাড়াও কাজী আবুল হোসেন *রুকআতে আলমগিরি* এর অনুবাদ করেছেন। এ অনুবাদটি *আলমগীরের পত্রাবলী* শিরোনামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী* ও *আলমগীরের পত্রাবলী* এর অনুবাদের মূল্যায়নে বলা যায় যে মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক অনূদিত *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী* গ্রন্থটি কাজী আবুল হোসেন এর অনুবাদ থেকে বেশ উন্নত ও বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ কেননা এতে ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যামূলক টীকা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে করে পাঠক অবলীলায় পত্রাবলীর অর্থ ও সারর্মম উদঘাটনে সক্ষম হয়েছে।

মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক অনূদিত *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী* র একটি নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

২ নং পত্র[১]

সুখী পুত্র মহম্মদ মুয়য্যম, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। একজন নিরপেক্ষ লোকের বিবরণ থেকে অবগত হয়েছি যে তুমি এই বৎসর পারসিকদের[২] প্রথানুযায়ী নওরোযের[৩] উৎসব পালন করেছ। আল্লার অনুগ্রহের দোহাই, তোমার ঈমানকে মজবুত রেখো। তুমি কার কাছ থেকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই নতুন প্রথা গ্রহণ করেছ? স্পষ্টতঃই তুমি সেই আরববাসী কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছ, যিনি সৈয়দ[৪] উপাধিধারী বলে নিজেকে দাবী করে থাকেন; অথচ তিনি হলেন (সৈয়দ বংশীয়) কয়েকজন ভাল লোকের অসন্তষ্টির কারণ। যা-ই ঘটুক না কেন, ইহা মজুসিসদের[৫] উৎসব। বিধর্মী হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ইহা অভিশপ্ত বিক্রমজিতের[৬] রাজ্যাভিষেকর দিন এবং হিন্দু অব্দের আরম্ভ। এখন থেকে তুমি আর এই উৎসব পালন করো না এবং এরূপ বোকামির পুনরাবৃত্তি আর করো না। (চরণ) "আমি প্রায়ই তোমাদেরকে উপদেশ দান করি; কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ আমার পুত্রদের কেউ সত্যানুসন্ধান করে না।" আমি যে সমস্ত পাপ কার্য করেছি তার প্রত্যেকটির ক্ষমার জন্য আমি আমার প্রভু আল্লার কাছে প্রার্থনা করি; এবং আমি (অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁর দিকেই দৃষ্টি ফেরাই।

---

[১] এই পত্রটি আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মোন্ধতার প্রমাণ দেয়।

[২] পারসিকরা ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, পরন্তু আওরঙ্গজেব ছিলেন কঠোর নিষ্ঠাবান সুন্নি।

[৩] (ফার্সী ভাষায়) এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'নতুন দিন'। ইহা পারস্য দেশের একটি উৎসব; পারস্যের অন্যতম প্রাচীন রাজা জামশেদ কর্তৃক এই উৎসব প্রবর্তিত হয় এবং তাঁর সিংহাসনারোহণের দিনে ইহা অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ এই দিনটিতে (২১ শে মার্চ) সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করে। আধুনিক পারসিক ও আফগানরা অতিশয় জাঁকজমক ও গভীর আগ্রহের সহিত অদ্যাবধি এই দিনটিতে নওরোযের উৎসব পালন করে থাকে এবং এই দিনটিকে রাজনৈতিক বৎসরের সুচনা বলে গণ্য করে থাকে। ভারতবর্ষে সম্রাট আকবর কর্তৃক এই উৎসবের প্রচলন হয়; কিন্তু পরে ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে 'ধার্মিক' সম্রাট আওরঙ্গজেব এই উৎসব বন্ধ করে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

দরাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আকবর কর্তৃক সৌর বৎসরের গণনা গৃহীত হয়; কিন্তু আওরঙ্গজেব তা রহিত করে দেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পুরনো চান্দ্র সালের প্রবর্তন করেন। ভারতবর্ষে এই উৎসব অদ্যাবধি বর্তমান পারসিক ও নিযাম বাহাদুরের প্রজাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। খাফি খান বলেছেনঃ "পারস্য দেশের অন্তর্গত কারমান প্রদেশের ও সুরাত বন্দরের মজুসিসরা নওরোয উৎসব পালন করে থাকে"। "সম্রাট আকবর অতীত যুগের চমৎকার রীতিনীতিগুলোর অনুসন্ধান করতেন এবং অতীতকালের লোকদের কথা যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই তিনি যা গ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতেন তা-ই গ্রহণ করতেন, যদিও সেজন্য তাঁকে যথেষ্ট খেসারত দিতে হত। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ওপর পিতৃসুলভ দৃষ্টি রাখতেন এবং উপহার বিতরণের উপলক্ষ অনুসন্ধান করতেন। এইরূপে সম্রাট যখন জামশেদের ও পারসিক পুরোহিতদের উৎসবাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হন, তখনই তিনি সেগুলি এদেশে প্রবর্তন করেন এবং সেগুলি উপহার অর্পণের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সূর্য যেদিন তার দীপ্তি নিয়ে মেষরাশিতে বিচরণ করে, সেইদিন এই নওরোযের পর্ব শুরু হয় এবং পার্সী মাস ফরোয়ারদিনের উনিশ তারিখ পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হয়। এই সময়কালের দু'টি দিনের উৎসবকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে, যখন অনেক অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র উপহার হিসেবে প্রদত্ত হয়। এ দু'টি দিন হল ফরোয়ারদিন মাসের প্রথম দিন এবং উৎসবের শেষের দিন অর্থাৎ উনিশ তারিখ, যাকে শরফের সময় বলা হয়।"

–আইন-ই-আকবরি।

[৪] হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর বংশধর।

[৫] প্রাচীন পারসিকেরা ও ভারতের বর্তমান পারসিকদের পূর্বপুরুষেরা আরবদের দ্বারা গধমরং নামে পরিচিত হত। ইহা আবেস্তীয় 'গধুফধহরধহং'-আরবী ভাষার বিকৃত রূপ বলে কথিত, যারা 'গধুফধ'-য় (জ্ঞানী আল্লাহ) বিশ্বাস করে। ইংরেজী 'সধমরপ', 'সধমরপরধহ' ইত্যাদি শব্দ এ শব্দ থেকেই ব্যুৎপন্ন।

[৬] মলোয়ার অন্ধ রাজবংশের একজন হিন্দু যুবরাজ অজেয় বিক্রম উজ্জয়িনী শাসন করতেন। তিনি ছিলেন মানব-হিতৈষী, জনপ্রিয় ও কৃষ্টিসম্পন্ন শাসক এবং সাহিত্যের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক। শকুন্তলার রচয়িতা কালিদাস তাঁরই রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। বিক্রম কহরোরের যুদ্ধে সাইথিয়ানদের পরাজিত করেন এবং একটি হিন্দু সালের (খ্রীস্টপূর্ব ৫৬ অব্দ) প্রবর্তন করেন, যা উত্তর ভারতে এখনও প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্যে যে অব্দ প্রচলিত, তাকে শালিবাহন শকাব্দ (৭৮ খ্রীস্টাব্দ) বলা হয়; দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজা শালিবাহন নামানুসারে এই অব্দের নামকরণ হয়। বিক্রম নামধারী অনেক রাজাই এদেশে রাজত্ব করেছেন।[৬৫]

নিম্নে *রুকআতে আলমগীরী* থেকে একটি ফারসি পত্রের নমুনা উপস্থাপিত হল:

بنام پادشاهزادهٔ محمد معظم بهادر

ذرهٔ بی مقدار ابو الفتح مراسم اخلاص بجا آورده معروض میدارد، نشان گرامی که بعد از مدتی بسر افرازی این عقیدت آئین صادر شده بود، در اعزاز منه پرتودرود انداخته سرمایه مباهات گردید، بموجب اشارت قدسی بشارت مسودهٔ عرضه داشت را بقدر در یافت ناقص خود ترتیب داده بسامی خدمت ارسال داشته امید که بنظر قبول در آید، عرضه داشتی که بخط نسخ بدرگاه معالی مرقوم شده در حینی که از

---

[৬৫] মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক (অনূ.), *আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-১০।

Dhaka University Institutional Repository

نظر انور قبله و کعبۂ دو جهانی مدظله العالی میگذشت بنده حاضر بود، تعریف حسن خدمت (خط) بسیار فرموده تحسین نمودند و عبادت عرائضی که بخدمت شاهزادۂ جوان بخت والاتبار بلند مقدار مشتمل برسوانح و حقائق مرقوم میگرد و بغایت استوار است ومکرر این غلام را مخاطب ساخته میفرمایند، که "تقریر و تحریر فارسی ایشان درست تر از دیگران است و انشاء الله تعالی ترقی بسیار خواهند نمود" این اخلاص کیش نیز سر رشتۂ عقیدت مندی را از دست نداده انچه سبب خوشنودی و رضامندی پیر و مرشد حقیقی میداند، همه وقت بعرض رساینده از خود بتقصیر راضی نمیشود، امیدوار است که گاه گاه بتقریب خدمات با صدار نشانهای گرامی سربلندی میبافته باشد.

صاحب زادۂ اقبال مند سلامت چون توجه قبله و کعبه دارین از روی بنده نوازی مصروفت آن است که کلبۂ فقیر که دراركٹ ظفر آباد عنایت شده مرتب گردد، و آقابیگٹ کوتاهی بسیار نموده، تا حال کاری نساخته و این معنی بعرض مبارك رسیده بکمترین حکم شد که بقدسی خدمت عرضداشت کند بنابران معروض میدارد، کهمومی الیه را تاکید فرمایند تا بزودی آن خانه را تعمیری که باید موقوف ندارد. ایام شریف عید سعید بر آن ذات ملکی آیات خجسته و مبارکباد در سایۂ بلند پایۂ خدیو زمین و زمان پیر و مرشد جهانیان بسعادت صوری و معنوی فائز شوند[৬৬]

৪.২.৭ *তারীখে ফিরিশ্‌তা*

মুহাম্মদ কাসিম হিন্দ শাহ ফিরিশ্‌তা কর্তৃক ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *তারীখে ফিরিশতা* গ্রন্থটি *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস* শিরোনামে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক অনূদিত হয়। বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে গ্রন্থাকার খাজা নিজামউদ্দীন রচিত *তাবকাতে আকবরী* ও মোল্লা আবদুল কাদির বদাউনীর *মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ* এর সহায়তা গ্রহণ করেন।[৬৭] *তারীখে ফিরিশ্‌তা* বাংলার সুলতানদের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে রচিত সুলতানি আমলের কোন সমসাময়িক ইতিহাস আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ফলে দিল্লীতে রচিত ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত উপাদানের সাহায্যে এ আমলের ইতিহাস এমনভাবেই পুনর্গটন করা

---

[৬৬] সাইয়্যেদ নাজীব আশরাফ নদভী (সম্পা.), *রুকআতে আলমগীরী* (কলকাতা: আজম ঘাট, ১৯২৯), পৃ. ২৯৩-২৯৪।

[৬৭] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে যে, যেখানে দিল্লীতে রচিত গ্রন্থাবলীতে কিছু পাওয়া যায়নি সেখানে বাংলার সুলতানদের ইতিহাস ছিল ফাঁকা। ফিরিশতা হচ্ছেন দ্বিতীয় ঐতিহাসিক যিনি সুলতানী আমলের বাংলার ইতিহাসের জন্য একটি আলাদা অধ্যায় রচনাকল্পে মনোনিবেশ করেছিলেন। *তারীখে ফিরিশতা* গ্রন্থে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলীর আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক অনূদিত *তারীখে ফিরিশ্‌তা* যা *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে, *তারীখে ফিরিশ্‌তার* মূল ফারসি সহ অনূদিত গ্রন্থ থেকে অনুবাদের কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

ذکر معز الدین بهرام شاه بن شمس الدین التمش

چون سلطان رضیه در قلعه بهتنده محبوس گشت روز شنبه پست و هشتم ماه رمضان سنهٔ سبع و ثلثین و ستمایه سلطان معز الدّین بهرام شاه باتّفاق امرا و ملوك بر تخت سلطنت دهلی جلوس فرمود و معاملهٔ سلطان رضیه را چنانکه گذشت مفروغ ساخت هر آینه ملك اختیار الدّین الپتگین باتّفاق وزیر مملك نظام الملك مهذب الدّین جمیع امور مملك را پیش گرفت وهمشیره سلطان معز الدّین را که سابقا منکوحهٔ قاضی اختیار الدّین بود بنکاح خویش در اورد و دایم یك پیل بزرگ بر در خانهٔ خود می بست و در ان زمان غیر از پادشاه دیگری پیل نمیداشت اینمعنی موجب بد گمانی سلطان معز الدّین بهرم شاه شد[৬৮]

সুলতানা রাজিয়া বেগমকে যখন বিতুণ্ডায় কয়েদ করা হয় তখন তাহার ভ্রাতা শামস্‌-উদ-দীন আলতামাসের অন্যতম পুত্র বৈরাম ৬৩৭ হিজরীর (১২৪০ খ্রীঃ ২১শে এপ্রিল) ২৭শে রমজান সোমবার তখতে আরোহণ করেন। ইখতিয়ার আলপ্তগীন খাজা মেহ্‌দী গজনবীর সাহায্যে সুলতানের ভগ্নি–ভূতপূর্ব কাজী ইখতার উদ-দীনের বিধবা পত্নীকে শাদী করিয়া ক্রমান্বয়ে সমস্ত রাজকার্য নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আনয়ন করেন। তিনি তাহার তোরণে হাতি রাখিতে লাগিলেন, যে মর্যাদা শুধু সুলতানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ইহাতে সুলতানের মনে ভীষণ ঈর্ষার সঞ্চার হইল।[৬৯]

ذکر رکن الدین فیروزشاه بن شمس الدین التمش

متون کتب تواریخ مخبر است که در سنه خمس و عشرین وستمایه سلطان شمس الدّین التماش چترودورباش به سلطان رکن الدین داده پرکنه بداون بدوعنایت فرمود

[৬৮] মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশ্‌তা বিরচিত, *তারীখে ফিরিশ্‌তা* (কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙ্গাল, তা.বি.), পৃ. ১২০।
[৬৯] মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

و بعد از انکه فتح گوالیار گرده بدار الملک دهلی بر کشت ایالت لاهور باو داده صاحب هشمت و شوکت گردانید و زمانی که پدرش از سفر سیوستان بر کشته در گذشت او در دهلی بود روز سه شنبه سنه ثلث و ثلاثین و سنمایه بر تخت دهلی جلوس فرمود و ارکان دولت لوازم نثار و ایثار بعمل آورده شعرا قصاید و غزل در مدح و تهنیت او گفتند و بصلات و انعام نوارش یافتند ازان جمله ملک تاز الدین ریزهد دبیر قصیده طویل گذرایند انعام پادشاهانه یافت و این بیت از ان است

نظم

مبارک باد ملک جاودانی
ملک را خاصه در عهد جوانی
امین الدوله رکن الدین که آمد
درش از یمن چون رکن یمانی[৭০]

সমসাময়িক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ৬২৫ হিজরীতে শামস-উদ-দীন আলতামাস তাহার পুত্র রুকুন-উদ-দীন ফিরোজকে বাদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারের পরে তাহাকে পাঞ্জাবে সুলতানের সহকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে ঘটনাক্রমে এই শাহজাদা দিল্লী ছিলেন। ফলে ৬৩৩ হিজরী (১২৩৬ খ্রী:) ২১শে শাবান নির্বিঘ্নে সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, অভিষেক অনুষ্ঠানে ওমরাহগণ নজরানা দিয়া আনুগত্যেও শপথ গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং কবিদের মধ্যে স্তুতিব্যঞ্জক কবিতা রচনা করিবার প্রতিদ্বন্দিতা শুরু হইয়া ছিল। কিন্তু অভিষেকের পরেই তিনি ইন্দ্রীয় সুখে নিমজ্জিত হইয়া রাজকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।[৭১]

উপর্যুক্ত বর্ণিত অংশে শামস-উদ-দীন আলতামাস এবং তাঁর পুত্র রুকুন-উদ-দীন ফিরোজ সম্পর্কে *তারীখে ফিরিশ্‌তার* মূল ফারসি গ্রন্থে যে কবিতা রয়েছে, অনুবাদক অনুবাদ করার ক্ষেত্রে কবিতার অনুবাদ করেননি। শহীদুল্লাহ *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস* নামে *তারীখে ফিরিশ্‌তা* এর যে অনুবাদ করেছেন তা মূলত ভাবানুবাদ।

পরিশেষে বলা যায় আলোচ্য অধ্যায়ে ফারসি ভাষায় রচিত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থ ও এর বঙ্গানুবাদ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচিত অনূদিত গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণে অনূদিত। যার ফলে গ্রন্থগুলোতে ফারসি টেক্সট এর উল্লেখ নেই। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে অনূদিত গ্রন্থগুলোর আলোচনা করার ক্ষেত্রে মূল ফারসি টেক্সট উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

[৭০] মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশ্‌তা বিরচিত, *তারীখে ফিরিশ্‌তা* (কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, বাঙ্গাল), পৃ. ১২১।
[৭১] মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৫
ইরানের ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদ (১৯৭৯-২০০০)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতো এখানেও রাজনীতির স্পর্শ বেশ স্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যে অতীতকাল থেকেই সামাজিক ও আন্দোলনের পটপরিবর্তনের প্রভাব পড়ে এসেছে। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ও রাজনীতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে তথা ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলাদেশে ফারসি বঙ্গানুবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আলোচ্য সময়কালে অনেক ফারসি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। এ অধ্যায়ে ইসলামী বিপ্লব ও ইমাম খোমেনী, বিপ্লবোত্তরকালে ফারসি বঙ্গানুবাদ চর্চায় বিপ্লবের প্রভাব, ফেরদৌসীর *শাহনামার* অনুবাদ, ওমর খৈয়্যামের *রুবাঈয়াতের* অনুবাদ, শেখ সা'দীর সাহিত্যকর্মের অনুবাদ, মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর *মাসনবীর* অনুবাদ, মহাকবি হাফিজের কাব্যের অনুবাদ, আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের সাহিত্যকর্মের অনুবাদ ছাড়াও অন্যান্য লেখকের ফারসি-বাংলা অনূদিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বর্ণনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৫.১ ইসলামী বিপ্লব ও ইমাম খোমেনী

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনী (রহ.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, বিপ্লবী নেতা ও ইসলামী চিন্তাবিদ।

ইমাম খোমেনীর প্রকৃত নাম রূহুল্লাহ।[১] তার পারিবারিক উপাধি মুসাভী। তিনি খোমেইন (خمین)[২] শহরে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে খোমেনী নামে অভিহিত করা হয়। তিনি একাধারে কবি, বিখ্যাত আলেম, তাত্ত্বিক, গবেষক, শেকড়সন্ধানী প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সমাজশিল্পী, আদর্শ শিক্ষক, বহুদুর্লভ গ্রন্থ প্রণেতা, রাজনীতিবিদ, মুজতাহিদ, প্রতিভাদিপ্ত আধুনিক সূফী কবি ও আধ্যাত্মিক ও বলিষ্ঠ নেতা; তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই ১৯৭৯

---

[১] Dr. Sayyid Ali Qaderi, Translated and Edited: M.J. Khalili and Dr. Salar Manafi Anari, *The Life of Imam Khomeini*, First Edition (Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, 2001), p. 106.

[২] খোমেইন (خمین) ইরানের একটি প্রাচীন শহর। শহরটি ইরানের একটি কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক শহরের অর্ন্তগত এবং ইরানের উত্তর দিকে অবস্থিত। পূর্বে খোমেইন শব্দটি 'খোমেহীন' (خمهین) লিখা হত। কিয়ানী বাদশাহ্ 'বাহমান' (بهمن) এর মেয়ে 'হোমা' (هما) এর নেসবত ছিল 'খোমেহীন' (خمهین)। শহরটি 'খোমেইহান' (خمیهن) আবার 'খোমামীন' (خمامین) নামেও উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান রূপ 'খোমেইন' (خمین) বা পুরাতন রূপ 'খোমেইহান' (خمیهن) দুই শব্দে পড়া যায়। যেমন: 'খু' (خو) অর্থ - ভাল, 'মেইহান' (میهن) অর্থ - জায়গা বা স্থান। যার অর্থ ভাল জায়গা বা পবিত্র ভূমি। [দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ হাসান রেজবী, *জিন্দেগী নামেয়ে সিয়াসীয়ে ইমাম খোমেনী*, সং. ৩ (তেহরান: মারকাযে ফারহাঙ্গীয়ে কেবলে, ১৩৭৩ ইরানী সাল), পৃ. ১১৫-১১৬; হামীদ আনসারী, *হাদীসে বিদারী নেগাহী বে জিন্দেগী নামেয়ে অরমানী*, সংস্করণ ২ (তেহরান: মোআসসেসেয়ে তানযীম ওয়া আসারে ইমাম খোমেনী ১৩৭৪ ইরানী সাল), পৃ. ১৪।]

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিষ্টাব্দে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফলতা লাভ করে। ইরানী জনগণের জাতীয় নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর নামের প্রারম্ভে 'ইমাম' শব্দটি সংযুক্ত রয়েছে। ইমামের পুরোনাম হযরত আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল মুসাভী আল খোমেনী।[৩] তবে তিনি ইমাম খোমেনী নামেই সারা বিশ্বে সর্বাধিক পরিচিত। ইমাম খোমেনী ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতেই ইরানী জাতির নিকট 'আয়াতুল্লাহ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৪]

ইমাম খোমেনীর জন্ম ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ২২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত খোমেইন শহরে। এটি ইরানের একটি প্রাদেশিক শহরের অন্তর্গত ইরানের উত্তর দিকে অবস্থিত।[৫] তাঁর পিতার নাম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মোস্তফা মুসাভী এবং মাতার নাম হাজেরা। ইমাম খোমেনীর পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। ইমাম শৈশবকালেই তাঁর পিতাকে হারান। পনের বছর বয়সে তাঁর মাতা মৃত্যুবরণ করেন।[৬] ইমাম খোমেনী তাঁর বড় ভাইয়ের নিকটই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ছোট বেলা থেকেই ছিলেন মেধাবী ও বুদ্ধিমান। অল্প বয়সেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় গৃহশিক্ষক মীর্জা মাহমুদের নিকট পড়া-লেখার বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমে।[৭] মাত্র সাত বছর বয়সে খোমেনী সম্পূর্ণ কুরআন পড়া সমাপ্ত করেন। শেখ জাফরের নিকট আরবী এবং মীর্জা মাহমুদের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর তিনি মীর্জা রেজা নাযাফীর নিকট যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩৯ ইরানী সালে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য (اراك) 'আরাক' গমন করেন। ১৩৪০ ইরানী সালে তিনি কোমে (قم) চলে যান। খোমেনী কোমের মাদ্রাসায় 'দারুস্ শেফা' (دار الشفا) ছাত্রাবাসে অবস্থান করে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, আরূজ, কাফী, পাশ্চাত্যদর্শন জ্যোতির্বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা (Gnostic Science) বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৮] তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ আয়াতুল্লাহ বুরুজারদীর গবেষণা ক্লাসে অংশগ্রহণ করে জ্ঞানার্জন করেন। এ ব্যাপারে খোমেনী নিজেই বলেন:

من از درس آقاي بروجردي خيلي استفاده [৯]كردم

'আমি আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী থেকে অনেক বেশী (জ্ঞানার্জনে) উপকৃত হয়েছি।'

---

[৩] মুহাম্মদ হাসান রেজবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮; *আলোর স্মারক* (ইতিহাসের চির ভাস্বর অবয়ব খোমেনী) (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯০), পৃ. ৯।

[৪] *Britannica Ready Reference Encyclopeadia*, Vol. 5 (New Delhi: Encyclopeadia Britannica (India) Pvt. Ltd. and Impulse Merketing, 2005), p. 240.

[৫] মুহাম্মদ হাসান রেজবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।

[৬] আলী রেজা দেহকান, *চেহেল নুকতে আয সীরে আমালীয়ে ইমাম খোমেনী (র.)* (তেহরান: নাশরে রূহ, প্রথম প্রকাশ ১৩৮১ ইরানী সাল), পৃ. ৭৬-৭৭; আমিন আল আসাদ, *ইমাম খোমেনী (র.) ও ইসলামী বিপ্লব* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৭), পৃ. ২৮।

[৭] *Imam Khomeini (a.s) A Portrait* (Tehran: Headquarters for the 100th Birth Anniversary of Imam Khomeini (a.s) 2000), p. 11.

[৮] মুহাম্মদ হাসান রেজবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

[৯] আমির রেযা সাতুদে, *পা বে পায়ে আফতাব*, প্রথম খণ্ড (গুফতেহা ওয়া নাগুফতেহা আয জিন্দেগীয়ে ইমাম খোমেনী) (তেহরান: নাশরে পানজারে, ১৩৭৩ ইরানী সাল), পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ইমাম খোমেনী সাহিত্যসাধনা করে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং মাত্র ২৭ বছর বয়সে একজন স্বীকৃত মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। আরবী ভাষা-সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী আইন, কুরআন, হাদীস, তাফসীর শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, উসূলফিকাহসহ বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরেও প্রবেশ করেন।[১০] শিক্ষাজীবন শেষ করে খোমেনী মাত্র ২৭ বছর বয়সে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে কোমের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্রে দর্শন শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।[১১] বিপুল সংখ্যক জ্ঞানী ও পণ্ডিত খোমেনীর ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন।[১২] নীতিশাস্ত্র এবং আত্মিক জ্ঞানের উপর তাঁর ক্লাসগুলো এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, কোমের শত শত ছাত্র, এমনকি ধর্মশাস্ত্রবিদগণও এতে অংশগ্রহণ করতেন। খোমেনীর ক্লাসে বিপুল ছাত্রের উপস্থিতি ও তাঁর বিশাল জনপ্রিয়তা রেজা শাহ ও অনুসারীদের ভাবিয়ে তুলেছিল বলেই তারা খোমেনীকে ক্লাস বন্ধের হুমকি প্রদান করেছিল কিন্তু খোমেনী দৃঢ়তার সাথে এর মোকবেলা করে বলেন:

> এসব ক্লাস নেয়া আমার দায়িত্ব। পুলিশ বাহিনী চাইলে নিজেরা এসে বল প্রয়োগ করে আমার ক্লাস বন্ধ করতে পারে। যে সরকার সত্যের গলা টিপে ধরতে চায়, যে সরকার কুরআন হাদীসের ক্লাস বন্ধ করতে চায়, নিজে ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে, আর জনগণের কল্যাণ চায়না, নিরীহ নারী-পুরুষের উপর অত্যাচার করে সে সরকার জালিম সরকার।[১৩]

জনতার প্রতিক্রিয়া ও ইমামের শক্তিশালী প্রতিরোধের ভয়ে শাহ খোমেনীর ক্লাস বন্ধ করতে চাইলেও তা করতে পারেনি। পরিশেষে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর চক্রান্তে তাঁর ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনের যবনিকাপাত ঘটে।

ইমাম খোমেনী তাঁর অধ্যয়নের পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকার মাধ্যমে ইরানীদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করতেন। মোহাম্মদ রেজা শাহের সময়ে যখন স্বৈরশাসনের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধকে সরিয়ে তদস্থলে ইউরোপীয় বা পশ্চিমা ভাবধারা চালু করার চেষ্টা চলতে থাকে তখনই ইরানের ইসলামী বিপ্লবে ইমাম খোমেনীর আগমন।

---

[১০] *Islamic Revolution of Iran* (Tehran: Islamic Propagation Organization, 1991), p. 30; *আলোর পথে* (ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অসিয়তনামা), একটি অনুবাদ গোষ্ঠী কর্তৃক অনু. ও (সম্পা.) (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯), পৃ. ৮।

[১১] মুহাম্মদ হাসান রেজবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২; *নিউজ লেটার*, ২৪তম বর্ষ, ১১-১২ সংখ্যা, অধ্যাপক সিরাজুল হক (সম্পা.) (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ২০০২), পৃ. ১৯।

[১২] আমির রেযা সাতুদে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

[১৩] আমিন আল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ রেজা শাহের শাসনকালকে চার স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম (১৯৪১–৪৬) খ্রিষ্টাব্দ, এ সময়ে মূলত তাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না; বিদেশীদের শক্তিবলে ক্ষমতা দখল ছিল মাত্র। দ্বিতীয় (১৯৪৬–৫৩) খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বছর। এরপর ড. মুহাম্মদ মোসাদ্দেক ক্ষমতায় আসেন এবং মুহাম্মদ রেজা শাহ দেশ থেকে পলায়ন করেন। তৃতীয় (১৯৫৩–৫৫) খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শেষ দু'বছর, এ সময়ে শাহ দেশে ফিরে আসেন, তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জেনারেল যাহেদী। চতুর্থ (১৯৫৫–৭৮) খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর পতন পর্যন্ত। প্রথম ১৪ বছর প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর পিতার অনুকরণ করেন। কিন্তু ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পর ২৩ বছর তিনি ইরান শাসন করেন একনায়কতন্ত্র শাসক হিসেবে।[১৪]

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ এজেন্ট 'রায্ম আরা' ইরানের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি তেল চুক্তিগুলো বাস্ত বায়ন করার জন্য জোর তৎপরতা চালান।[১৫] এ সময় দ্বীনী ও জাতীয়তাবাদী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে তেলশিল্প জাতীয়করণের আন্দোলন শুরু করে। ষোড়শ মজলিসে ড. মোসাদ্দেক মজলিসের সংখ্যালঘু সদস্যদের নিয়ে সমগ্র ইরানের তেলশিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রায্ম আরা এবং বৃটিশরা বিভিন্ন কুট কৌশলের আশ্রয় নিয়ে এ প্রস্তাব নাকচ করে। এমনি মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী রায্ম আরা 'ফেদাইয়ানে ইসলাম' এর সদস্য 'খালীল তাহ্মাসেবীর' হাতে নিহত হন।[১৬]

রায্ম আরার মৃত্যুর পর হোসেন আলা নামক আরেক বৃটিশ সেবাদাস প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি তেলশিল্প জাতীয়করণ বিলটি বাতিলের চেষ্টা করেন কিন্তু সফল না হওয়ায় পদত্যাগ করেন। ফলে মজলিস নিজ উদ্যোগে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ড. মোসাদ্দেককে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে।[১৭] ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ রেযা ড. মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করায় মোসাদ্দেক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।[১৮]

ড. মোসাদ্দেকের পর কাওয়ামুস্ সালতানেহ্ প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই আয়াতুল্লাহ কাশানী সাংবাদিক সম্মেলন করে কাওয়ামকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন এবং জনসাধারণকে সাথে নিয়ে রাস্তায় নেমে এসে কাওয়াম সরকারের পতনের দাবীতে বিভিন্ন শ্লোগান

---

[১৪] Gholam Hossein Aarabi, *Six Theories About The Islamic Revolution`s Victory* (Tehran: Al Hodh Publishers, 2000), p. 139.

[১৫] রেযা শো'বানী, *কিতাবে ইরান* (গুযীদেয়ে তারীখে ইরান) (তেহরানঃ মারকাযে মোতালায়াতে ফারহাঙ্গীয়ে বায়নাল মেলালী, ২০০২), পৃ. ৩৭৭।

[১৬] *Imam Khomeini (a.s) A Portrait* (Tehran: Headquarters for the 100th Birth Anniversary of Imam Khomeini (a.s), 2000), p. 23.

[১৭] *New Standard Encyclopedia*, Vol. 9 (Chicago: Ferguson Publishing Company, 2001), p. 178.

[১৮] *The Macmillan Family Encyclopedia*, Vol. II (London: Arete Publishing Company, 1980), p. 253.

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কাওয়ামের নির্দেশে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলি বর্ষণ শুরু হলে এতে অনেকেই শহীদ হয়। এ গণঅভ্যুত্থানের ফলে শাহ্ নতি স্বীকার করে কাওয়ামকে পদচ্যুত করেন। জনগণের আত্মত্যাগ ও আলেম-ওলামাদের সর্মথনে ড. মোসাদ্দেক পুনরায় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন।[১৯]

ড. মোসাদ্দেক ক্ষমতা গ্রহণ করে ইসলামী শক্তিকে এড়িয়ে চলা শুরু করেন এবং জাতীয়তাবাদী ও পাশ্চাত্যঘেষা লোকদের নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। পরবর্তীকালে তাই কাশানীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাঁর সমালোচনা শুরু করে।[২০] এ সুযোগে আমেরিকা সিআইএ-র মাধ্যমে মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটানোর জন্য চরিত্রহীন ও নীচু স্তরের ব্যক্তিদের ক্রয়ের জন্য প্রচুর মার্কিন ডলার খরচ করে। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট আমেরিকার নেতৃত্বে ইরানে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হওয়ায় শাহ্ দেশ থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু সিআইএ পুনরায় এক সপ্তাহের মধ্যে সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হয়।[২১] তারা ড. মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল যাহেদীকে প্রধানমন্ত্রী করলে শাহ দেশে ফিরে আসেন।[২২] এ ঘটনার পর ইরান আমেরিকার সর্বাধিক নিশ্চিত রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটি হিসেবে পরিগণিত হয়। ইরানের তেলসম্পদ আমেরিকা, বৃটেন এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের তেল কোম্পানীগুলো নিয়ে গঠিত কনসোর্টিয়ামের হস্তগত হয়।[২৩]

পাশ্চাত্যের কতিপয় উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় মুহাম্মদ রেযা শাহ ইরানের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[২৪] বাণিজ্যিকভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। প্রায় চল্লিশ হাজার আমেরিকান পুলিশ সদস্য হিসেবে ইরানে বসবাস করতো।[২৫] ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের পর হারানো ক্ষমতা ফিরে পেয়ে তিনি হয়ে উঠেন দারুণ স্বেচ্ছাচারী একনায়ক। তিনি সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কুক্ষিগত করেন।[২৬] তিনি তাঁর কর্তৃত্ব অব্যাহতভাবে ধরে রাখার জন্য অন্যায়ভাবে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে *সাভাক* নামক বিশেষ গুপ্ত পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। *সাভাক* বাহিনীর প্রধানসহ সকল সদস্যই ছিল আমেরিকান পুলিশ বাহিনীর সদস্য। যাদেরকে মোটা অংকের বেতন-ভাতা দেয়া হত।[২৭] এ বাহিনীর মূল

---

[১৯] রেযা শো'বানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০; *বার রাসেয়ে এনকেলাবে ইরান*, পৃ. ১৪৯।

[২০] মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৭৩), পৃ. ২৮৭।

[২১] *New Standard Encyclopedia, Ibid.,* Vol. 9, p. 178.

[২২] *Imam Khomeini (a.s) A Portrait, Ibid.,* p. 24.

[২৩] গোলাম রসুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬।

[২৪] *Imam Khomeini (a.s) A Portrait, Ibid.*, p. 17.

[২৫] Nikshoy C. Chatterji, *A History of Modern Middle East* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1987), p. 297.

[২৬] *New Standard Encyclopedia, Ibid.,* Vol. 9, p. 178.

[২৭] Peter Avery, *Modern Iran* (London: Ernest Benn Limited, 1967), p. 483.

Dhaka University Institutional Repository

কাজ ছিল শাহকে সার্বিক দিক দিয়ে সাহায্য করা। এ বাহিনীর বিভিন্ন অন্যায় কার্যাদির কারণে শুধু ইরানেই নয় সমগ্র বিশ্বেই সমালোচিত হয়েছিল[২৮]

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী (র.) মৃত্যুর পর ইরানের জনগণ ইমাম খোমেনীকে (র.) অনুস্মরণীয় নেতা হিসেবে গ্রহণ করলে, তিনি তাঁর সকল অনুসারীকে সাথে নিয়ে শাহের স্বৈরশাসন এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকমূলক সকল অন্যায় কাজের মোকাবেলায় ইসলামী আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[২৯] শাহ্ ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর 'প্রাদেশিক ও জেলা সমিতি বিল' নামে একটি বিল পাশ করেন। তাতে নারীদের ভোটাধিকারসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়।[৩০] এবং নির্বাচিত মজলিস সদস্যদেরকে আল কুরআনের পরিবর্তে অন্য যে কোন গ্রন্থ নিয়ে শপথ করার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় ইমাম খোমেনী (র.) সকল আলেম-ওলামাদেরকে সাথে নিয়ে এ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন।[৩১] ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারী শাহ্ ছয় দফা সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ এবং এ কর্মসূচীকে জনগণের অনুমোদনের জন্য গণভোটের তথা 'শ্বেতবিপ্লব' এর ঘোষণা দেন।[৩২] এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের অর্থনীতিতে মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে পরিবর্তন আনয়ন, ভূমি ও কৃষি সংস্কার, গ্রামীণ ও উপজাতীয় জনগণকে শহরমুখীকরণ এবং তারেদকে মার্কিন পণ্যের ভোক্তায় পরিণতকরণ।[৩৩] ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী গণভোটের আয়োজন করা হয়।[৩৪] ইমাম খোমেনী (র.) জনগণকে এ গণভোট বয়কটের ঘোষণা দেন। ফলে ইমাম খোমেনী (র.) কে গ্রেফতার করা হয়। এতে জনগণ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জুন তেহরানসহ সারা দেশ গণবিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এতে শাহের পোষাবাহিনী গুলি চালালে তেহরানেই ১৫ হাজার লোক নিহত হয়। পরে ইমাম খোমেনীকে মুক্তি দেয়া হয়।[৩৫]

শাহ্ ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ অক্টোবর ক্যাপিচুলেশন আইন পাশ করায় ইমাম খোমেনী (র.) এ আইনের কঠোর সমালোচনা করে আলেম-ওলামা ও জনসাধারণকে এ আইনের বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। জনগণ প্রিয় নেতার আহবানে সাড়া দিয়ে ময়দানে উপস্থিত হয়।[৩৬] এতে শাহ্

---

[২৮] রেযা শো'বানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬।

[২৯] *Islamic Revolution of Iran* (Tehran: Islamic Propagation Organization, 1991), p. 22.

[৩০] *New Standard Encyclopedia*, Vol. 9, p. 178.

[৩১] *Islamic Revolution of Iran*, pp. 33-35.

[৩২] *The Macmillan Family Encyclopedia*, Vol. II, p. 253.

[৩৩] Yahya Armajani, *Middle East Past and Present* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1970), p. 357.

[৩৪] এমাদুদ্দীন বাকী, *বাররাসেয়ে ইনকেলাবে ইরান* (তেহরান: নাশরে তাফাক্কুর, ১৯৯১), পৃ. ১৬৫।

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-৬৮।

[৩৬] *Islamic Revolution of Iran, Ibid.*, p. 152.

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর রাতের বেলা ইমাম খোমেনী (র.) কে গ্রেফতার করে তুরস্কে নির্বাসিত করেন।[৩৭] সকালে ইমাম খোমেনী (র.) এর গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়লে কুম, মাশহাদ, তেহরানসহ অন্যান্য শহরে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে এবং ইরানে অবস্থানরত তুরস্কের দূতাবাস ঘিরে ইমাম খোমেনী (র.) এর মুক্তি ও শাহের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতে থাকে। এতে সরকারের পক্ষ থেকেও মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা পর্যায়ক্রমে বাড়তেই থাকে এবং বিভিন্ন জায়গায় রক্তের বন্যা বয়ে যায়।[৩৮] ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর শাহের সিদ্ধান্তে ইমাম খোমেনী (র.) কে তুরস্ক থেকে ইরাকের পবিত্র শহর নাজাফে স্থানান্তর করা হয়।[৩৯] ইমাম খোমেনী (র.) তাঁর আচার-ব্যবহার এবং বক্তৃতা দ্বারা ৯৫% ইরানবাসীকে নিজের একনিষ্ঠ অনুসারীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪০]

তাই তারা তাঁর মুক্তির জন্য তাঁর নির্দেশমত নতুন করে আন্দোলন করে দেশকে অচল করার চেষ্টা করতে থাকে।[৪১] শাহ এক পর্যায়ে তার বংশগত শাসনকে বৈধতা প্রদানের কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশের অনুকরণে তার রাজতন্ত্রকে বৈধ রূপ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'রাস্তাখীয পার্টি' (حزب رستاخیز) নামক একটি অনুগত রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। জাপান, বৃটেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ একটি ব্যাখ্যা গড়ে তুলে শাহ তার রাজ কর্তৃত্বকে একটি জনপ্রিয় ভিত্তি (Popularbase) প্রদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইমাম খোমেনী (র.) রাস্তাখীয পার্টির গঠন, কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপ থেকে শাহের অভিসন্ধি পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করে তা জনগণকে প্রত্যাখান করার আহবান জানান।[৪২]

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহ ইরানী হিজরী শামসী সালকে 'পাহলভী সালে' রূপান্তর করে ইরানী জনগণের মনে আঘাত দেন। ফলে ধীরে ধীরে ইরানীরা শাহের বিরুদ্ধে যেতে থাকে। শাহ যখন দেশের পরিস্থিতি কোনমতেই আর আয়ত্তে রাখতে পারছিলেন না তখন তিনি ইমাম খোমেনীকে কঠিনভাবে আঘাত করার চেষ্টা করলেন এবং ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর তাঁর ৪৭ বছরের প্রাণপ্রিয় সন্তান মোস্তফা খোমেনীকে হত্যা করেন।[৪৩] ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী 'আহমদ রশীদী মোৎলাক' নামের এক লেখক

---

[৩৭] *The Macmillan Family Encyclopedia*, Vol. II, p. 253.
[৩৮] *Islamic Revolution of Iran*, *Ibid.*, p. 163.
[৩৯] হামীদ আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮।
[৪০] *Islamic Revolution of Iran*, *Ibid.*, p. 166.
[৪১] *Ibid.*
[৪২] রেযা শো'বানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৯।
[৪৩] নূর হোসেন মজিদী, *ইরানের সমকালীন ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৬), পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম খোমেনী (র.) কে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে ইমাম খোমেনীর সম্মান ও মর্যাদার উপর আঘাত হানে এবং তাঁর অবমাননা করা হয়। মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাত এবং আহমদ রশীদী মোৎলাকের প্রবন্ধ যেন সমগ্র ইরানে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং পর্যায়ক্রমে সে আগুন বেড়েই চলতে থাকল।[৪৪] তেহরান, ইয়াযদ, জাহরাম, কাযরুন, ইসফাহান, শীরাজ, মাশহাদ, রাফসানজান, হামেদান, নাজাফাবাদ এবং দেশের বিভিন্ন শহরে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। আর সরকার পক্ষ থেকে চলতে থাকে রক্তক্ষয়ী দমননীতি।[৪৫]

শাহ যখন কোন মতেই বিপ্লবীদের রুখতে পারছিলেন না তখন তাদেরকে জনসাধারণের কাছে খারাপ পরিচয়ে তুলে ধরার জন্য ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট রমযান মাসের রাতে 'আবাদানের রেক্স সিনেমা হলে' ছবি চলাবস্থায় শাহের পোষা লোকেরা আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রায় ৭০০ লোককে পুড়িয়ে মারে। এতে হিতে আরো বিপরীত হয়, জনগণ শাহের কুমতলব বুঝতে পারে এবং সারা দেশে বিক্ষোভ করে দেশ অচল করে দেয়।[৪৬] এ অবস্থায় ইমাম খোমেনীর পক্ষ থেকে দেশ, জনগণ এবং নিজেদের ঈমান-আকীদা রক্ষার জন্য জ্ঞান সমৃদ্ধ বিভিন্ন বাণী বিপ্লবীদের কাছে আসতে থাকে এবং জনগণ এ সব বাণীকে মহামূল্যবান হিসেবে গ্রহণ করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় শাহের সরকার এবং তাঁর প্রভু আমেরিকা এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং জনগণকে শান্ত ও সরকারমুখী করার জন্য বার বার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন করতে থাকে।[৪৭]

শাহের সরকার কোনভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় ইমাম খোমেনীর সাথে তাঁর অনুসারীদের যোগাযোগ ও দেখা-সাক্ষাৎ করতে না দেয়ার জন্য ইরাক সরকারের কাছে অনুরোধ করেন। এতে ইরাক সরকার ইমাম খোমেনীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে তিনি ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাধ্য হয়ে ফ্রান্সে চলে যান এবং সেখান থেকে নূতনভাবে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। সেখানে বিশ্বের চতুর্দিক থেকে তাঁর ভক্ত-অনুসারী, আলেম-ওলামা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং দেশী-বিদেশী সাংবাদিক তাঁর কাছে ছুটে আসেন।[৪৮] এমতাবস্থায় ইরানের জনসাধারণ নিজেদের মানবীয় এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়সঙ্গত অংশ আদায়ের জন্য, আইন প্রণয়নের ও প্রশাসনে

---

[৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩।

[৪৫] নূর হোসেন মজিদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৭), পৃ. ১৫২।

[৪৬] মুহাম্মদ মেহদী বাবাপুর গুল আফশানী, *তাহলীলীয়ে বার এনকেলাবে ইসলামীয়ে ইরান রীশেহা ওয়া পীয়ামদহা* (কুম: এন্তেশারাতে মারকাযে জাহানীয়ে উলূমে ইসলামী, ২০০৩), পৃ. ১৯৫।

[৪৭] *Islamic Revolution of Iran*, *Ibid.*, p. 354.

[৪৮] হামীদ আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে সর্বোপরি পাহলভী বংশের অবৈধ স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বকে বাদ দিয়ে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি আইন ও যুক্তিসিদ্ধ কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করতে বদ্ধপরিকর হন। ফলে ইসলামী বিপ্লব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।[৪৯] ইমাম খোমেনী (র.) এর দিক নির্দেশনায় চলতে থাকে ইরানে একের পর এক ধর্মঘট। দোকান মালিক, পেশাজীবী, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং সংস্কৃতিসেবী, শিল্প-কলকারখানার শ্রমিক এবং এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্যও ইমাম খোমেনী (র.) এর আহবানে সাড়া দিয়ে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। একাধারে দীর্ঘদিন চলতে থাকে ধর্মঘট। ধর্মঘটে সমগ্র দেশ অচল হয়ে পড়ে এবং দেশ শাহের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে পড়ে।[৫০]

দেশের অবস্থা বেগতিক দেখে শাহ দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর শরীফ ইমামীকে সরিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আযহারীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে জনগণকে শান্ত করার জন্য কিছু জনহিতকর কাজ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইমাম খোমেনী প্রধানমন্ত্রী আযহারীর ধোকায় না পড়ার জন্য পূর্বেই জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেন। আযহারী ব্যর্থ হলে শাহ তাঁকে সরিয়ে আমেরিকার নির্দেশে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারী আরেক মার্কিন সেবাদাস শাহপুর বখতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। ইমাম খোমেনীর নির্দেশে জনগণ আরো বেশী সতর্ক হলো।[৫১] শাহপুর বখতিয়ারের সরকারকে ইমাম খোমেনী অবৈধ ঘোষণা করেন এবং বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত আন্দোলন ও ধর্মঘট অব্যাহত রাখার আহবান জানান।[৫২]

ইমাম খোমেনীর নির্দেশে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারী বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা হয়। দেশের এমন বেগতিক অবস্থা দেখে শাহ প্রাণভয়ে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী দেশ থেকে পলায়ন করেন।[৫৩] শাহ দেশ থেকে পলায়ন করলে শাহপুর বখতিয়ারের কঠিন বাঁধা উপেক্ষা করে ইমাম খোমেনী (র.) ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারী ইরানে ফিরে আসেন এবং মেহেদী বাযারগানকে প্রধানমন্ত্রী করে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারী অস্থায়ী সরকার গঠন করে সকলকে বখতিয়ারের সরকারকে প্রত্যাখান এবং বাযাগানের সরকারের প্রতি সমর্থন করার আহবান জানান। সকল ইরানী ইমাম খোমেনীর নির্দেশ মেনে নেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী কিছু সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় সংঘটিত

---

[৪৯] নূর হোসেন মজিদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।
[৫০] নূর হোসেন মজিদী, *ইরানের সমকালীন ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫-২৬৬।
[৫১] *Islamic Revolution of Iran*, *Ibid.*, p. 415.
[৫২] এমাদুদ্দীন বাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৬।
[৫৩] *Islamic Revolution of Iran*, *Ibid.*, p. 448.

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[৫৪] এভাবে রেজা শাহের পতন এবং এ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৫০০ বছরের পাহলভী রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৫৫]

ইমাম খোমেনী ঘটনাবহুল দীর্ঘ জীবন শেষে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩ জুন রোজ শনিবার সাতাশি বছর বয়সে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।[৫৬] ইমামের মৃত্যুর তিন দিন পর ৬ জুন উত্তর তেহরানের 'মোসাল্লা-ই-বুজুর্গ' এ প্রখ্যাত আলেম আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ রেজাগুল পায়গানীর ইমামতিতে জানাজা সম্পন্ন হয়। বিশ্বের অনেক দেশ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গ ইমামের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।[৫৭]

ইমাম খোমেনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তাঁর মেয়ে জোহরা মুসাভী বলেন:

> ইমাম একবার একটি বিবৃতি লিখে দিয়েছিলেন–রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারের জন্য। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই তিনি সেটা আবার ফেরত নিয়ে আসেন। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন: এই বিবৃতিতে আমি লিখেছিলাম যে, আমি সংগ্রামীদের জন্য সর্বন্ত করণে দোয়া করি। আমার মনে হলো, আমি তো অন্যান্যের জন্যও দোয়া করি। আমার বিবৃতির এই কথাটির সংশোধন দরকার ছিল। তাই যেটা সত্যি সেটাই আমি লেখার চেষ্টা করেছি।[৫৮]

ইমাম খোমেনী দীর্ঘ ছাত্র জীবনে এবং ৩৫ বছরের শিক্ষকতার জীবনে তিনি জাতির মুক্তির জন্য বক্তৃতা, বিবৃতি ছাড়াও বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করেন। বিশেষ করে নির্বাসিত জীবনে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বহু গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৫৯] তার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে; কারো মতে পঁচাশিটি [৬০] কারো মতে চব্বিশটি [৬১] আটত্রিশটি [৬২] পঁয়তাল্লিশটি [৬৩] ইমাম খোমেনী (র.) কর্তৃক লিখিত গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ:

---

[৫৪] মুহাম্মদ মেহদী বাবাপুর গুল আফশানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯।

[৫৫] Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature*(Calcutta: Naaz Publishing Centre, 1991), p. 16.

[৫৬] অধ্যাপক সিরাজুল হক (সম্পা.), *নিউজ লেটার*, ১৭তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৫), পৃ. ৫৪।

[৫৭] *বাংলাদেশী পত্রপত্রিকার দৃষ্টিতে ইমাম খোমেনী* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ১৯৯০), পৃ. ৬৫।

[৫৮] আমির রেযা সাতুদে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

[৫৯] এ, এন, সালামত উল্লাহ, *হাজার বছরের বিস্ময়* (ঢাকা: তাযকীয়া প্রকাশনী), ১৪১০ হি. পৃ. ১১।

[৬০] (ইমাম খোমেনী (র.) (স্মরণে নিবেদিত সংকলন), *জামারানের পীর* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪), পৃ. ২৭৫।

[৬১] মোস্তফা ভিজদানী, *সারগুজাশত্হায়ে ভীযে আয জিন্দেগীয়ে হযরত ইমাম খোমেনী* (তেহরান: ইন্তেশারাতে পায়ামে আযাদী, পঞ্চম প্রকাশ ১৩৬৪ ইরানী সাল), পৃ. ১৮-২০।

[৬২] *উস্তাদ মুতাহ্হারী শাহীদ আগাহী, ইমাম খোমেনী (র.) চেরাগে হেদায়াত* (তেহরান: ইত্তেহাদীয়ে আন্জুমানহায়ে ফারহাঙ্গীয়ে তালাব, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৮১ ইরানী সাল), পৃ. ৩১-৪৩।

[৬৩] হামীদ আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪-২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

চেহেল হাদীস, সেররুস্ সালাত, আদাবুস্ সালাত, শারহে হাদীসে জুনুদে আকল ওয়া জাহল, কাশফুল আসরার, রেসালে ফিত্ তাকীয়ে, মেসবাহুল হেদায়াত ইলাল খেলাফাত ওয়াল বেলায়াত, শারহে দোয়ায়ে সাহর, রাহে এশ্‌ক, তাহরীরুল ওয়াসীলা, কিতাবুল বাঈ, ত্বহারাত, মাকাসেবে মুহাররামে, তাওযীহুল মাসায়েল, তা'লীকাতু আলাল উরওয়াতুল উস্কা, রেসালাতে ফিত্ তালাব ওয়াল ইরাদে, রেসালেয়েল ইসতেসহাব, বেদায়ে উদ্ দারার ফি কায়েদাতু নাফিদ্ দারার, রেসালাত ফিত্ তায়াদুল ওয়াত্তারাজীহ, আন্ওয়ারুল হেদায়াত ফিত্তালীকাত আলাল কেফায়াত, রেসালাতুল ইজতেহাদ ওয়াত্তাকলীদ, তাকরীরাতে উসূলিয়ে, রেসালাত ফি কায়েদাত মিন মুলক, হাশীয়ে বার মেসবাহুল উন্স, শারহে হাদীসে রাসূল জালুত, হাশীয়ে ইমাম বার শারহে হাদীসে রাসুল জালুত, হাশীয়ে বার শারহে ফাওয়ায়েদুর রাদুয়ে, রেসালেয়ে লেকাউলাহ, হাশীয়ে বার আসফার, রেসালে ফি তা'য়ানুল ফাজর ফিল লাইয়ালীল মুকাম্মাওে, তা' লীকাতু আলা ওয়াসীলাতুন্ নাজাহ, রেসালেয়ে নাজাতুল ইবাদ, হাশীয়ে বার রেসালে আরস, মানাসেকে হজ্জ, তাকরীরাতে দারুসে ইমাম খোমেনী, কেতাবে খালাল ফিস্ সালাত, হুকুমাতে ইসলামী ইয়া বেলাওয়াতে ফাকীহ, জেহাদে আকবার ইয়া মুবাররেজে ব নাফস, তাফসীরে সূরায়ে হামদ, এস্তেকাতায়াত, দিওয়ানে ইমাম খোমেনী (র.), বাদেয়ে এশ্‌ক, সহীফায়ে নূর, কাওসার এবং ওয়াসীয়াত নামেয়ে সিয়াসীয়ে এলাহী।

৫.২ ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে ফারসি বঙ্গানুবাদ চর্চায় বিপ্লবের প্রভাব

ইরানের ইসলামী বিপ্লব মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শাসিত ইরানে জুলুম-নির্যাতনের পরিবর্তে একটি নিরাপদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর এ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশে। বিপ্লবের ফলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, কুটনৈতিক অঙ্গনসহ শিল্প ও সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনও এর প্রভাবমুক্ত নয়। বিপ্লবোত্তরকালে ইরানের অনেক কবি সাহিত্যিকের মূল্যবান সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়, যা পাঠকমহলে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সমাদৃত হয়।

ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে ফারসি সাহিত্য হতে বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থসমুহে ইসলামের মৌলিক বিধি বিধান, উপন্যাস ও ছোট গল্প, ইসলামী অর্থনীতি ও এর যাকাত ব্যবস্থা, রাজনীতিতে ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা, ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকারসহ ইরানী শিশু সাহিত্য বিষয়ে রচিত বেশ কিছু বই অনূদিত হয়। নিম্নে ইসলামী বিপ্লবের প্রভাবে বাংলাদেশে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে তা উপস্থাপিত হল।

Dhaka University Institutional Repository

রিয়াজ-উস-সালতিন, সিয়ারুল মুতায়াখখিরীন, বাহারিস্তানে গায়বী, হুমায়ুননামা, তাবাকাতে আকবরী আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী, তারিখে ফিরেশ্‌তা, ফেরদৌসীর শাহনামার অনুবাদ, রুবাঈয়াতে ওমর খৈয়াম, শেখ সা'দীর গল্প, শায়খ সাদী (র.)-এর গুলিস্তাঁ, গুলিস্তানের বঙ্গানুবাদ, বুস্তানের বঙ্গানুবাদ, মসনবীয়ে রুমী, মসনবীর কাহিনী, মসনবীর গল্প, মাওলানা রুমীর মাছনবী শরীফ, হাফিজের গজলগুচ্ছ, হাফিজের কবিতা, ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বিলায়েত নামা, তারিখে ফিরোজশাহী, তবকাত ই নাসিরী, চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, ইমাম খোমেনীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, ইমাম খোমেনীর বাণী, শহীদ, জাতিসমুহের আগামী দিনের পথ ইসলামী বিপ্লব, জাগো-সাক্ষ্য দাও, জিহাদ ইসলামের পবিত্র যুদ্ধ ও তার কুরআনী বৈধতা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শুরা, ইসলাম পরিচিতি, আধুনিক আরবী ফার্সী তুর্কী কবিতা, ফতুহাতে ফিরোজ শাহী, তাহেরেহ্‌ সফরজাদেহ: স্বনির্বাচিত কবিতা, ইমাম খোমেনীর কবিতা, নারী নির্যাতন: যুগে যুগে, ইসলামী বিপব কি ও কেন, শিক্ষাঙ্গনে নৈতিকতা, সিয়াসতনমা, কারবালা ও হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাত, হজ্জ আমাদের কি শেখায়, ইন্তেখাব আয্‌ গুলিস্তান ও পান্দনামা, আল মুরতাজা ইমাম আলী ইবনে আবি তালেব (আ.), তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী, মোজাফ্‌ফরনামা, নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি, আইন-ই-আকবরী তাযকিরাতুল ওয়াকিয়াত সম্রাট হুমায়ুনের কাহিনী, মীযান, পাঞ্জগাঞ্জ, ফুসূলে আকবরী, নাহ্‌বেমীর, ইলমুস্‌সীগাহ, আল্লাহ রাসূল ও রিসালাত, মহাকালের ত্রাণকর্তা, বিহারুল আনওয়ার কাহিনী সম্ভার, আহকামে মুমিনাত, মালা বুদ্দা মিনহু ইত্যাদি।

৫.৩ ফেরদৌসীর শাহনামার অনুবাদ

মহাকাব্য *শাহনামা* রচয়িতা কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী ইরানের জাতীয় কবি এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি। তিনি ইরানের প্রাচীন ইতিহাস, অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের সার্থক রূপকার। ফারসি ভাষা ও ইরানের রাজা-বাদশাহদের ঐতিহ্যকে অমরত্বদানকারী মহাকবি ফেরদৌসীর জীবনী ইতিহাস সুলিখিত ভাবে সংরক্ষিত নেই যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। মহাকবি ফেরদৌসীর জীবন-চরিত সম্পর্কে আলী আকবর দেহখোদা বলেন:

> হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রচিত ইতিহাসগ্রন্থ ও জীবনচরিতগুলোতে ফেরদৌসীর জীবনী সম্পর্কে গবেষণার দৃষ্টিকোন থেকে সন্তুষ্ট করার মত যথেষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে পরবর্তী শতাব্দীর গবেষকদের লেখার প্রতিই বেশী মনযোগ দিতে হয়; যারা শাহনামার মূল পাঠে গবেষণার মাধ্যমে নিজস্ব মতামতের পক্ষে কার্যকর যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।[৬৪]

[৬৪] আলী আকবর দেহখোদা, *লুগাত নামায়ে দেহখোদা*, খণ্ড ৩৭ (তেহরান: দেহখোদা অভিধান ফাউন্ডেশন শামীরুন, ১৩৪১ ইরানী সাল), পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, ফেরদৌসীর জন্মস্থান ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মাশহাদের অনতিদূরে তুসে অবস্থিত।[৬৫] একারণেই তিনি ফেরদৌসী তুসী নামে পরিচিত। ফেরদৌসী যে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন তার নাম 'কাফ' অথবা 'বায'।[৬৬] কবি ফেরদৌসীর সঠিক জন্ম তারিখ জানা নেই। তবে গবেষকরা শাহনামার নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি সমুহের বর্ণনার আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কবির জন্মসাল ৩২৯ হিজরী বা ৩৩০ হিজরী।[৬৭] ফেরদৌসীর সঠিক মৃত্যু তারিখ ৪১১ হিজরী। দেহখোদা উল্লেখ করেছেন যে হামিদুল্লাহ মুস্তাওফীর মতে- ফেরদৌসীর মৃত্যু সাল ৪১৬ হিজরী এবং দৌলত শাহর মতে ৪১১ হিজরী। তবে তাঁর পুরো জীবনকাল ও মৃত্যু তারিখ হিসাব করলে ৪১১ হিজরীই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।[৬৮] ফেরদৌসী ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা প্রচুর প্রতিপত্তি ও বিত্তের মালিক ছিলেন।[৬৯] ফেরদৌসীর পরিবার ছিল ইরানী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল অনুরাগী। তারা পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ও বর্ণনাসমুহ অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞাত ছিল। এগুলো তারা মুখে মুখে চর্চা ও কণ্ঠস্থের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় লালন করত। কবি ফেরদৌসী পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে শাহনামা রচনা আরম্ভ করেন। ফেরদৌসীর স্বদেশী কবি দাকীকী, সামানী যুগের শ্রেষ্ঠ ও খ্যতিমান কবি রুদাকীর[৭০] পর শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে পারস্য কবিদের মধ্যে অন্যতম। যিনি ইতিপূর্বে শাহনামা রচনার সূচনা করে ছিলেন। সামানী যুগের শাসক আবু মনসুর বিন নুহ সামানী ও তার ছেলে নুহ বিন মানসুর সামানীর শাসনকালে (৯৬১-৯৯৭ খ্রি.) দাকীকী রাজকবি হওয়ার ফলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। দাকীকীই মূলতঃ ইরানী প্রাচীন রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস ও বীরত্বগাথা যা *শাহনামা* নামে পরিচিত তা লেখার সূচনা করেন। কবি দাকীকী এক হাজার বয়েত বা শ্লোক লেখার পর তাঁর এক ক্রীতদাসের হাতে যৌবনেই নিহত হন।[৭১] যার ফলে *শাহনামা* রচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। দাকীকীর নিহত হওয়ার পর ফেরদৌসী শাহনামা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন; যার বর্ণনা ফেরদৌসী রচিত শাহনামায় বিদ্যমান।

---

[৬৫] নিযামী আরুযী সামারকান্দী, *চাহার মাকালে* (তেহরানঃ এন্তেশারাতে আমীর কবীর, ১৩৬৬ ইরানী সাল), পৃ. ৭৫; ড. সাইয়্যেদ মোহাম্মদ দাবীর সিয়াকী, *যেন্দেগী নামায়ে ফেরদৌসী ওয়া সারগুযাশতে শাহনামা*, ১ম সংস্করণ (তেহরানঃ শেরকাতে চাপ ওয়া এন্তেশারাতে এলমী, ১৩৭০ ইরানী সাল), পৃ. ২৪; সাইদ নাফীসী, *তারিখে নাযম ওয়া নাসর দার ইরান ওয়া দার যাবানে ফারসি*, ১ম খণ্ড (তেহরানঃ এন্তেশারাতে ফুরুগী, ১৩৬৩ ইরানী সাল), পৃ. ৩৯।

[৬৬] ড. মুহাম্মদ মুইন, *ফারহাঙ্গে ফারসি মুইন*, খণ্ড ৬ (তেহরানঃ চাপখানেয়ে সেপেহর, ১৯৮৫), পৃ. ১৩৩৭; ড. সাইয়্যেদ মোহাম্মদ দাবীর সিয়াকী, *বারগারদানে রাওয়ায়েতে গোনেয়ে শাহনামেয়ে ফেরদৌসী বে নাসর*, ২য় সংস্করণ (তেহরানঃ নাশরে কাতরে, ১৩৮১ ইরানী সাল), পৃ. ১৩।

[৬৭] মাহমুদ মুহিব্বী, *দাস্তানে বাস্তান*, ৩য় সংস্করণ (মাশহাদঃ এন্তেশারাতে ইয়াস, খেয়াবানে সাদী, ১৩৭২ ইরানী সাল), পৃ. ৮; পারভেজ নাতেল খানলারী ও যাবিহুল্লাহ সাফা, *শাহকারহায়ে আদাবিয়াতে ফারসি* (তেহরান; মোআসসেসেয়ে চাপ ওয়া এন্তেশারাতে আমীর কবীর, ১৩৪৩ ইরানী সাল), পৃ. ৩; *লুগাত নামায়ে দেহখোদা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০; ড. মাহদী বায়নী (সম্পা.) *কারনামায়ে বুযুর্গানে ইরান* (তেহরানঃ এদারায়ে কুল্লি এন্তেশারাত ওয়া রাদিও, ১৩৪০ ইরানী সাল), পৃ. ২৩৩।

[৬৮] আলী আকবর দেহখোদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩।

[৬৯] মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (সম্পা.), *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৮০।

[৭০] **রুদাকীঃ** মূলনাম আবু আব্দুল্লাহ জাফর বিন মুহাম্মদ রুদাকী। তিনি ইরানের রোদাক অঞ্চলের সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকাল অজ্ঞাত। রুদাকীকে ইরানের সর্ব প্রথম বড় কবি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ৫২৯ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [দ্রষ্টব্যঃ ড. রেজা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরানঃ এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৯৮০), পৃ. ১০১-১০৪।]

[৭১] Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature* (Calcutta: Naaz Publishing Centre, 1991), p. 90.

Dhaka University Institutional Repository

جوانی بیامد گشاده زمان　　سخن گفتن خوب و روشن روان
بنظم آرم این نامه راگفت من　　ازو شاد من شد دل انجمن
یکا یک ازو بخت برگشته شد　　بدست یکی بنده برکشته شد
زگشتا سب وارجاسب بیتی هزار　　بگفت و سرآمد براو روزگار[72]

'একদা এক মুক্ত রসনা যুবকের আবির্ভাব হলো,
সে ছিল কবি, সুন্দর স্বভাব ও উজ্জলমনা।
আমাকে সে বলল, আমি এই গাথাকে কাব্যরূপ দান করেছি,
এ আসরের সকলেই আনন্দে উল্লাসিত হল।
সহসাই যেন অস্তমিত হল তার ভাগ্যের সূর্য,
এক উম্মাদের হাতে হল তাঁর জীবনের অবসান।
গাশ্তাসাব এবং আরজাসাব সম্পর্কে এক হাজার বয়েত,
তিনি বললেন এবং তাঁর দিনকাল পূর্ণ হলো অর্থাৎ তিনি চিরবিদায় নিলেন।'[৭৩]

দাকীকী সম্পর্কে ফেরদৌসী আরও বলেন:

برفت او و این نامه ناگفته ماند　　چنان بخت بیدار او خفته ماند
خدایا ببخشا گناه ورا　　بیفزای درحشر جاه ورا
دل روشن من چو برگشت ازوی　　سوی تخت شاه جهان کرد روی[74]

'দাকীকীও চলে গেলো আর রেখে গেলো এই অসমাপ্ত গাথা,
তাঁর জাগ্রত ভাগ্য হলো চিরনিদ্রায় অভিভূত।
হে খোদা, তুমি তাঁর স্খলন ও ক্রুটি মার্জনা করো,
এবং সমুন্নত করো তাঁর পদমর্যাদা হাশরের দিনে।
আমার অন্তর আলো লাভ করলো দাকীকীর থেকে,
এবং বাদশাহর সিংহাসনের দিকে করলো দৃষ্টিপাত।" [৭৫]

শাহনামা গ্রন্থটি কবি দাকীকী কাব্যাকারে রচনা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু কবি দাকীকী গ্রন্থটি রচনা সম্পূর্ণ করতে পারেননি, ফলে কবি ফেরদৌসী কবি দাকীকীর অসম্পূর্ণ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। কবি ফেরদৌসীর বর্ণনা অনুসারে এ গ্রন্থটিই শাহনামার মূল ভিত্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়।[৭৬]

یکی نامه بد از گه باستان　　فراوان بدو اندرون داستان
پرا کنده دردست هر موبدی　　ازو بهره برده هر بخردی

[৭২] মোহাম্মাদ আলী ফোরুগী (সম্পা.), *শাহনামেয়ে ফেরদৌসী*, ৭ম সং (তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৩৭২ ইরানী সাল), পৃ. ৪।

[৭৩] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.) *ফেরদৌসীর শাহনামা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

[৭৪] মোহাম্মাদ আলী ফোরুগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৫।

[৭৫] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬।

[৭৬] *শে'রুল আজম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

یکی پهلوان بود دهقان نژاد　　　دلیر بزرگ و خردمند و راد
پژوهنده روزگار نخست　　　گذشته سخنها همه باز جست
زهر کشوری موبدی سال خورد　　　بیاورد این نامه را گرد کرد[৭৭]

'অতীতকালে ছিল পূরাকীর্তি সম্বলিত এক গাথা,
তার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল অনেক উপাখ্যান।
প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে মুখে তা ছড়িয়েছিল,
সেগুলি থেকে তারা সংগ্রহ করত প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের সম্পদ।
কোন নিভৃত গ্রামাঞ্চলের এক বীর সন্তান,
বর্ষীয়ান সাহসী জ্ঞানী ও দানশীল।
আদিম যুগের সেই ইতিকথার খোঁজে তৎপর হলো,
কাহিনীগুলোর উদ্ধার মানসে সে ঘুরে বেড়ালো বহুদিন।
ফিরলো সে বহু নগরীর পথে পথে,
ফলে সংগৃহীত হলো এই গাথা।'[৭৮]

বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য *শাহনামার* মাধ্যমে তিনি ইরানীদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষার অনন্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে সুরক্ষিত ও কালজয়ী করে নিজেও কালজয়ী হয়েছেন। ইরানের প্রাচীন রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস ও শৌর্যবীর্যের উপর রচিত *শাহনামা* বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বীরত্ব গাঁথা। শাহনামা ইরানীদের ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস এবং ইরানী জাতির সামাজিক, চারিত্রিক এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার বাস্তব রূপ-রেখার প্রতিচ্ছবি।[৭৯] এ গ্রন্থে প্রাচীন পারস্য-সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত কাব্যাকারে উপস্থাপিত হয়েছে।[৮০] ফেরদৌসী শুধু ইরানের বীরত্বগাথার শ্রেষ্ঠ রচয়িতা নন বরং তিনি সমগ্র বিশ্বের বীরত্বগাঁথার রচয়িতাদের অন্যতম। তাঁর চিরস্মরণীয় অবদান শাহনামা জগতের শ্রেষ্ঠ বীরত্বগাথার নিদর্শন।[৮১] বিশ্ব সাহিত্য ও ফারসি ভাষার সৌধমালা নির্মানে ফেরদৌসির এ অবিস্মরণীয় অবদান সম্পর্কে ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা আলী আকবর দেহখোদা লিখেছেন:

حکیم الوالقاسم فردوسی طوسی بزرگترین حماسه سرای تاریخ ایران و یکی از برجسته ترین شاعران جهان شمرده میشود .[৮২]

[৭৭] মোহাম্মাদ আলী ফোরুগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।

[৭৮] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

[৭৯] ড. মোহাম্মাদ জা'ফর ইয়াহাক্কী, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, ১-২ (তেহরান: ইরানের শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৭ ইরানী সাল), পৃ. ৫৫; মোহাম্মাদ আমীন রিয়াহী, *সারে চেশমেহায়ে ফেরদৌসী শেনাসী*, ১ম সং. (তেহরান: মোআসসেসেয়ে মোতালাআত ওয়া তাহকীকাতে ফারহাঙ্গী, ১৩৭২ ইরানী সাল), পৃ. ৬০।

[৮০] ড. গোলাম সাকলায়েন (সম্পা.), *কবি মোজাম্মেল হক ও ফেরদৌসী-চরিত* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮), পৃ. ৪৮।

[৮১] মনুচেহের মারতাযাভী, *ফেরদৌসী ওয়া শাহনামেয়ে* (তেহরান: মোআসসেসেয়ে মোতালাআত ওয়া তাহকীকাতে ফারহাঙ্গী, ২য় সং. ১৩৭২ হি.শা./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৪-২৫; মনুচেহের দানেশ পেজু, *গোযিদেহায়ে নায়ম ওয়া নাস্‌রে ফারসি*, ১ম সং. (তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে আল্লামে তাবাতাবাঈ, ১৩৭৪ ইরানী সাল), পৃ. ৬৭।

[৮২] আলী আকবর দেহখোদা, *লুগাত নামায়ে দেহখোদা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

"হাকীম আবুল কাসেম ফেরদৌসী তুসী ইরানের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরত্বগাঁথার রচয়িতা এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি।

শাহনামা রচনার মধ্য দিয়ে ইরানী জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য নির্মানের কৃতিত্ব সম্পর্কে স্বয়ং কবি ফেরদৌসী বলেন:

بسی رنج بردم این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی[৮৩]

"বহু কষ্ট সহ্য করেছি এই ত্রিশ বছরে
ইরান জিন্দা করেছি ফারসির অমর কীর্তি গড়ে।"

কবি ফেরদৌসী নিজ মাতৃভাষা ফারসিকে রক্ষা করতে গিয়ে আরবী ভাষা খুব কম ব্যবহার করেন।[৮৪] যে ক্ষেত্রে আরবী শব্দ ব্যবহার ছাড়া কোন উপায় নেই একমাত্র সে ক্ষেত্রেই তিনি আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৮৫] পাশ্চাত্যে হোমার তাঁর বিখ্যাত *ইলিয়ড* ও *ওডিসি* মহাকাব্য রচনার মাধ্যমে যে রূপ খ্যাতি অর্জন করেন, প্রাচ্যে ফেরদৌসী *শাহনামা* রচনার মাধ্যমে সেরূপ খ্যাতি অর্জন করেন। আর এ জন্যই ইউরোপীয় মনীষীগণ তাঁকে 'Homer of the east' বা প্রাচ্যের হোমার নামে অভিহিত করেছেন।[৮৬]

শাহনামার পুরো, সংক্ষিপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষের অনুবাদ ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীতে শুধু ইউরোপ মহাদেশের প্রায় ১৩টিরও অধিক দেশে অনূদিত হয়েছে।[৮৭] পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যেমন জার্মানী, আর্মেনীয়, উজবেকী, ইংরেজী, ইটালী, বুলগেরী, বাংলা, পশ্‌তু, তুর্কী, তাজেকী, চীনা, ডেনমার্কী, রুশী, গ্রীক, সংস্কৃত, সিন্ধী, ইবরী, আরবী, উর্দু, ফরাসী, সুইডী, ফিনল্যান্ডী, কুর্দী, কাশ্মীরী, গুজরাটী, গোর্‌জী (জর্জিয়ার ভাষা) ল্যাটিন, লেহেস্তানী (পোল্যান্ডের ভাষা) হল্যান্ডী, নোরভেজ্বী (নরওয়ের ভাষা) ও হিন্দী ভাষায় শাহনামার অসংখ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[৮৮]

---

[৮৩] ড. সাইয়্যেদ মোহাম্মদ দাবীর সিয়াকী, *যেন্দেগী নামেয়ে ফেরদৌসী ওয়া সারগুযাশতে শাহনামা*, ১ম সংস্করণ (তেহরান: শেরকাতে চাপ ওয়া এন্তেশারাতে এলমী, ১৩৭০ ইরানী সাল), পৃ. ১০০।

[৮৪] পারভীন শাকীবা, *শে'রে ফারসি আয অগায তা এমরোয* (তেহরান: এন্তেশারাতে হীরমান্দ, ১৩৭৩ ইরানী সাল), পৃ. ৫৩; *শে'রুল আজম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩।

[৮৫] আজিমুল হক জোনাইদী ও মোহাম্মাদ তাহের ফারুকী, *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি* (পেশাওয়ার: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১৪৬-১৪৭।

[৮৬] প্রফেসর সাইয়্যেদ আমীর হাসান আবদী, *শাহনামে ওয়া হিন্দ, কানদে গোযিদেয়ে মাকালাতে ফারসি*, হাসান আনুশে (সম্পা.) (তেহরান: এন্তেশারাতে দাবিরখানেয়ে শুরায়ে গুস্তারাশে যাবান ওয়া আদাবিয়্যাতে ফারসি, ১৩৮২ ইরানী সাল), পৃ. ৫৬।

[৮৭] মাহদী করীব, *বাযখানিয়ে শাহনামে*, ১ম সং. (তুস: এন্তেশারাতে তুস, খেয়াবানে ইনকিলাব, ১৩৬৯ ইরানী সাল), পৃ. ৪৫।

[৮৮] আবুল কাসেম রাদফার, *তারজুমেহায়ে শাহনামে, ফারহাঙ্গ*, ১ম সং., ৭ম সংখ্যা, মাহমুদ বোরোজারদী ও মাহদী মাদাইনী (সম্পা.) (তেহরান: শেরকাতে এন্তেশারাতে এলমী ওয়া ফারহাঙ্গী, ১৩৬৯ ইরানী সাল), পৃ. ১৪৫-১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

শাহনামা পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ফেরদৌসীর অমর কাব্য শাহনামার সার্থক অনুবাদ করেছেন গবেষক মনিরুদ্দীন ইউসুফ। তাছাড়া *সোহরাব ও রোস্তম* শিরোনামে ফজলুর রহীম চৌধুরী *শাহনামার* কিছু অংশ কাব্যানুবাদ করেন যা কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। *সোহরাব ও রুস্তমের মহাযুদ্ধ* শিরোনামে আব্দুর রশিদ ছিদ্দিকী শাহনামার কাব্যানুবাদ করেন যা ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। *সচিত্র ছেলেদের শাহনামা* শিরোনামে অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য মৌলভী এব্রাহিম খাঁ রচিত গ্রন্থটি *শাহনামা* থেকে সঙ্কলিত অনুবাদগ্রন্থ। এটি কলকাতা থেকে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। মোজাম্মেল হক কর্তৃক অনূদিত শাহনামার প্রথম খণ্ড *শাহনামা* শিরোনামে গদ্যানুবাদ গ্রন্থটি কলকাতা হতে সুরুজ কুমার নাথ কর্তৃক ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং গণেশচন্দ্র নাথ কর্তৃক ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুহাম্মদ খাতের কর্তৃক বাংলা ভাষায় *শাহনামার* প্রথম অনুবাদকর্ম *শাহনামায়ে বুজুর্গ সহীহ* শিরোনামে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ফেরদৌসীর অমরকাব্য *শাহনামার* সার্থক অনুবাদক মনিরুদ্দীন ইউসুফের বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপিত হল।

শাহনামার সবকটি খণ্ডেরই অনুবাদ করেছেন মনির উদ্দীন ইউসুফ যা বাংলা একাডেমী থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৮৯] ষাটের দশকের শুরুতেই বাংলা একাডেমী থেকে বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তখন আবুল কাসেম ফেরদৌসী রচিত *শাহনামা* বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার জন্যে মনিরউদ্দীন ইউসুফকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করা হলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন।[৯০] এ বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসান বলেন:

> ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে যখন বাংলা একাডেমীর কার্যভার গ্রহণ করি, তখন সর্বপ্রথম যারা আমাকে স্বাগত জানান তাঁদের মধ্যে মনিরউদ্দীন ইউসুফ অন্যতম। সে সময় প্রায়ই মনিরউদ্দীন ইউসুফ আমার এখানে আসতেন এবং বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। আমি তার ফারসি জ্ঞান এবং উর্দু জ্ঞান একাডেমীর কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি ইকবালের কবিতার কিছু অনুবাদ আগেই করেছিলেন। এবারে বাংলা একাডেমীর কাছ থেকে ফেরদৌসীর 'শাহনামা'র অনুবাদের দায়িত্ব পেলেন।[৯১]

শাহনামার সার্থক অনুবাদক মনিরুদ্দীন ইউসুফের বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে আবু সাইদ চৌধুরী বলেন:

> ফেরদৌসীর শাহনামা অনুবাদের জন্য সুকঠিন কাব্য। এতে ফারসি ছাড়া আরবী বা অন্যকোন ভাষার শব্দ খুবই কম আছে। কিন্তু এমন একটি মহাকাব্যের অনুবাদেও মনিরউদ্দীন ইউসুফ

---

[৮৯] মনিরউদ্দীন ইউসুফ, *ফেরদৌসীর শাহনামা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ভূমিকা।

[৯০] মনিরউদ্দীন ইউসুফ, *আমার জীবন আমার অভিজ্ঞতা* (ঢাকা: কালান্তর প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১৩৬।

[৯১] *মনিরউদ্দীন ইউসুফ সংকলন*, বেলাল চৌধুরী (সম্পা.) (ঢাকা: মনিরউদ্দীন ইউসুফ সংকলন কমিটি, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯), পৃ. ৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে নিয়োজিত করেছেন পরম উৎসাহে। অর্জন করেছেন সাফল্য বিরামহীন পরিশ্রমে ও একাগ্রতায়। এমন একান্তভাবে নিজেকে দিতে পেরেছিলেন বলেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পেরেছেন। অনুবাদে হারিয়ে যায়নি মৌলিকতার স্বাদ। মনিরউদ্দীন ইউসুফ শাহনামায় দেখেছিলেন, 'যৌবনপ্রাপ্ত ইরানের প্রাণময় চলমান প্রতিচ্ছবি'। তাই অনায়াসে চলেছেন, 'কোন মহৎ কবি-প্রতিভার মধ্যে তার নিজের কাল অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যখন আলোড়নের সৃষ্টি করে, তখন তার প্রকাশ হয় যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। সে প্রকাশ তখন জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজে নিতে ব্যস্ত হয়। ফেরদৌসীর বেলায়ও তেমন হয়েছিল। তিনি তাঁর স্বদেশ ইরানের সুপ্ত প্রাণধর্মের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ফিরেছিলেন; ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কিংবদন্তী ও ইতিকথার উদ্ধারে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। পরাজিত, নির্যাতিত ইরান কবির কাছে জানিয়েছিল তার মহত্তম অতীতের ক্রম-উন্মোচনের আবেদন।[৯২]

মনিরুদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক অনূদিত শাহনামা সম্পর্কে আল মাহমুদ বলেন:

> 'ফেরদৌসীর শাহনামার দুটি খণ্ড যখন প্রকাশিত হল তখন থেকেই কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যিক মহল, কবি ও সাহিত্যের অধ্যাপকবৃন্দের কাছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ান। এই মহাগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ যে এক অতিশয় দুরূহ শ্রমসাধ্য কাজ তা মুহূর্তেই অনুসন্ধিৎসু মহলে বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। যারা একই সাথে আধুনিক কবিতার নতুন আঙ্গিক, ঘটনার ইঙ্গিত ও ক্লাসিক কাব্যের সুদৃঢ় বাঁধুনির জন্য এ সময় লালায়িত ছিলেন, মনিরউদ্দীন ইউসুফ এদের সামনে এতদিনের অনধিগম্য এক সোনার তোরণ যেন খুলে দিলেন।'[৯৩]

আল মাহমুদ আরও বলেন:

> 'কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ শাহনামার অনুবাদে এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে সকল ধরনের পাঠকেরই পরিতৃপ্তি যোগাতে সক্ষম হয়েছেন।'[৯৪]

মনির উদ্দীন ইউসুফের অনুবাদের নমুনা

কবি ফেরদৌসী সততা, ন্যায়পরায়ণতা, স্বদেশপ্রীতি, ঈমানদারী, মিথ্যা ও অসত্য বিষয় থেকে নিজেদেরকে বিরত থাকার যে কল্যাণকর উপদেশাবলীকে কাব্যাকারে এবং দার্শনিকভাবে শাহনামায় উপস্থাপন করেছেন তা মনির উদ্দীন ইউসুফ চমৎকার অনুবাদ করে বাংলাভাষীদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

بیا تا جهان را ببد نسپریم   بکوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار   همان به که نیکی بود یادگار
همان گنج ودینار و کاخ بلند   نخواهد بدن مر ترا سودمند
سخن ماند از تو همی یادگار   سخن را چنین خوار مایه مدار

---

[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।
[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

فریدون فرخ فرشته نبود　　　به مشک و به عنبر سرشته نبود
بداد و د هش یافت آن نیکوی　　　تو داد و دهش کن فریدون توی[৯৫]

‘এসো আমরা দুনিয়ায় মন্দের পরিণতি প্রত্যক্ষ করি,
এসো, সযত্নে আমরা শক্তি নিয়োজিত করি সৎকর্মের দিকে।
যদিও ভালো ও মন্দ কিছুই চিরকালের নয়,
তবুও ভালোই সঞ্চিত থাকে স্মৃতির মণিকোঠায়।
স্বর্ণমুদ্রা, সম্পদ ও উন্নত প্রাসাদ,
তোমার জন্য লাভবান বস্তু বলে প্রমাণিত হবে না।
কথা বেঁচে থাকবে তোমার স্মৃতিরূপে,
কথাকে তুমি অল্পমূল্য জ্ঞান করো না।
মহামতি ফরীদূন ফেরেশতা ছিলেন না,
তাঁর সুনাম কস্তুরী ও ‘অম্বর’ থেকে হয়নি।
ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা দিয়েই তিনি অর্জন করেছিলেন যশ,
তুমিও তা করো, কারণ অন্তরের অন্তঃস্থলে তুমিও ফরীদূন।’[৯৬]

শাহনামায় বর্ণিত সোহরাব-রোস্তমের কাহিনী থেকে মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক অনূদিত কয়েকটি শ্লোক উপস্থাপিত হলো:

چو شیران بکشتی در آویختند　　　ز تن ها خوی و خون همیر یختند
بزد دست سهراب چون پیل مست　　　چو شیر دمنده زجا در بجست
کمر بند رستم گرفت و کشید　　　ز بس زور گفتی زمین بردرید
برستم در آویخت چون پیل مست　　　بر آوردش از جای و بنهاد پست
یکی نعره بر زد پراز خشم و کین　　　بزد رستم شیررا بر زمین
نشست از بر سینهء پیلتن　　　پر از خاک چنگال و روی ودهن[৯৭]

‘তারপর তাঁরা দুই সিংহের মতো পরস্পরকে জাপটে ধরে,
বুকের রক্ত ঝরাতে লাগলেন।
অবশেষে সোহরাব মত্ত হস্তীর মতো,
আস্ফালনকারী সিংহের উপর হানলেন আঘাত।
রোস্তমের কটিবন্ধ ধরে এমনভাবে আকর্ষণ করলেন যে,
মনে হলো, সেই শক্তিতে ভূমি বিদীর্ণ হবে।
প্রমত্ত হস্তীর সেই অমোঘ আকর্ষণে,
স্থানচ্যুত হয়ে রোস্তম মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।
তারপর ক্রোধ ও জিঘাংসা-দৃপ্ত এক রণনাদের সঙ্গে সঙ্গে,

---

[৯৫] মোহাম্মাদ আলী ফোরূগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।
[৯৬] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪।
[৯৭] মোহাম্মাদ আলী ফোরূগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাব রোস্তমকে ভূমি পরে আছড়ে মারলেন।
সোহরাব চড়ে বসলেন রোস্তমের বুকের উপর,
রোস্তমের মুখ ও কেশরাজি ধূলায় ধূসরিত হলো।'[৯৮]

সোহরাব হত্যার হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক কাহিনী কবি ফেরদৌসী অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক অনূদিত রোস্তম-সোহরাবের হৃদয় বিদারক ও লোমহর্ষক কাহিনীর শেষাংশের কয়েকটি শ্লোক উপস্থাপিত হল:

بما در خبر شد که سهراب گرد   ز تیغ پدر خسته گشت و بمرد
برا آورد بانگ و غریو و خروش   زمان تا زمان زو همیرفت هوش
مر آن زلف چون تاب داده کمند   بانگشت پیچید و از بن بکند
بسر بر فکند آتش و بر فروخت   همی موی مشگین بآتش بسوخت
پدر جستی ای گرد لشکر پناه   بجای پدر گورت آمد براه
همیگفت و میخست و میکند موی   همیزد کف دست بر خوب روی
بیفتاد بر خاک چون مرده گشت   تو گفتی همی خونش افسرده گشت[৯৯]

'মায়ের কাছে সংবাদ গেলো,
সোহরাব পিতার হাতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।
তাঁর রোদন, চিৎকার ও বিলাপ,
তাঁকে অনেক সময় পর্যন্ত অজ্ঞান করে রাখলো -
যে কেশগুচ্ছ ছিল একদিন কুঞ্চিত ও ঊর্মিল,
তা এখন আঙ্গুলে বিজড়িত হয়ে মূলশুদ্ধ উৎপাটিত হতে লাগলো।
শিরে নিক্ষেপ করতে লাগলেন অগ্নি,
তাঁর সুন্দর কেশরাজি, আগুনে দগ্ধীভূত হলো।
সেনাদলের রক্ষক বীরপুত্র আমার, তুমি তোমার পিতাকে খুঁজতে গিয়েছিলে?
কিন্তু পিতার বদলে বুঝি তোমার সামনে এলো কবরের অতল গহবর?
এই বলে তাহমিনা তাঁর কেশ টেনে ছিড়তে লাগলেন,
ও হস্ত দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন স্বীয় সুন্দর মুখে।
তিনি সংজ্ঞাহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েন ভূমিতে,
মনে হয় বুঝি ম্লান হয়ে ঝরে পড়লো তাঁর জীবন প্রসূন।'[১০০]

যুদ্ধের ধরনগুলো কবি ফেরদৌসী যেমন সুন্দরভাবে শাহনামায় উপস্থাপন করেন তেমন মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক যুদ্ধের প্রতিটি ধরনের বর্ণনা অনূদিত হয়ে বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যেন যুদ্ধের প্রকৃত ধরন বাস্তবে চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন:

---

[৯৮] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৯।
[৯৯] মোহাম্মাদ আলী ফোরুগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬।
[১০০] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮০-৬৮২।

Dhaka University Institutional Repository

که آن ترک درجنگ نر اژدهااست　　دم آهنج ودر کینه ابر بلاست
درفشش سیاهست وخفتان سیاه　　از آهنش ساعد ازآهن کلاه
همه روی آهن گرفته به زر　　درفشی سیه بسته برخود بر
ازوخویشتن را نگهدار سخت　　که مردی دلیرست وبیدار بخت
جهان آفریننده یار منست　　دل وتیغ وبازو حصار منست
برانگیخت پس رخش روئینه سم　　برآمد خروشیدن گاودم
چو تنگ اندر آورد با اوزمین　　فروکرد گرزگرانرا به زین
ببند کمرش اندر آویخت چنگ　　جدا کردش از پشت زین خدنگ[১০১]

কারণ এই তুর্কী বীর যুদ্ধক্ষেত্রে আজদাহার মতোই ভয়ঙ্কর,
সঙ্কল্প ও প্রতিহিংসায় সে অমঙ্গলের ঘনঘটা।
তার ঝান্ডা কালো রঙ্গের, তার পোশাকও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,
তার বাহুদ্বয় লৌহ-বর্মে ও শিরোদেশে লৌহ-শিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত।
তার লৌহ-কঠিন মুখমণ্ডল স্বর্ণ নির্মিত আচ্ছাদানিতে ঢাকা,
তার কালো পতাকা তার শিরস্ত্রাণের উপরে ধরা রয়েছে।
তার রোষ থেকে বাঁচবার জন্য নিজের উপর নজর রাখতে হয় সর্বক্ষণ,
কারণ সে যেমন বীর তেমনি ভাগ্যবান।
বিশ্ব স্রষ্টা আমার সহায়,
সাহস, তরবারি ও বাহুবল আমার দুর্গ প্রাচীর।
এই বলে রোস্তম রাখ্শকে উত্তেজিত করলেন,
সঙ্গে সঙ্গে নাদিত হলো বিষাণ।
তারপর উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব যখন কম হয়ে এলো,
তখন রোস্তম অশ্বপৃষ্ঠ থেকে উদ্যত করলেন তাঁর গুরুভার প্রহরণ।
আফরাসিয়াব তা দেখেই তাঁর কটিদেশে রক্ষিত,
তরবারি আকর্ষণ করে নিলেন।'[১০২]

বীরত্বগাথার উজ্জল দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাকবি ফেরদৌসীর শাহনামার কয়েকটি শ্লোক যা মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক অনূদিত তা নমুনা স্বরূপ নিম্নে উপস্থাপিত হল:

به قلب اندرون پور داستان سام　　ابر کوه زین درون خم خام
بفرمود رستم که تا کرنای　　زدند وبجنبد لشکر زجای
برآمد درخشیدن تیغ و خشت　　تو گفتی هوا برزمین لاله کشت
بدان سو که او رخش را زاندی　　تو گفتی که آتش بر افشاندی

[১০১] পারভেয আতাবুকী (সম্পা.), *শাহনামেয়ে ফেরদৌসী*, ১ম খণ্ড. ১ম সং. (তেহরান: শেরকাতে এন্তেশারাতে এলমী ওয়া ফারহাঙ্গী, ১৩৭৫ ইরানী সাল), পৃ. ২৩৪-২৩৫।

[১০২] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১-৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

زخون دشت گفتی که رود زم است　　نه رزم گو پیلتن رستم است
بریده به هر سو سر ترگ دار　　پراگنده خفتان همه دشت وغار[১০৩]

'সৈন্যদলের পদধূলিতে অন্ধকার হয়ে গেছে আকাশ,
উজ্জ্বলিত সূর্য যেন বন্দী হয়ে পড়েছে।
এমন সময় রোস্তমের আদেশে যুদ্ধারম্ভকসূচক তূর্য নিনাদিত হলো,
সৈন্যবাহিনী বিচলিত হলো স্বস্থান থেকে।
শত্রুগণও স্বীয় অধিকৃত ভূমি পেছনে ফেলে
অগ্রসর হলো সামনের দিকে।
অবিরাম চলতে লাগলো তীর, তরবারি ও প্রহরণ,
বীরগণের রক্তে যুদ্ধভূমি আর্দ্র হয়ে উঠলো।
ঝকমকে তলোয়ার ও প্রস্তরের বর্ষণে,
মাটিতে গজিয়ে উঠতে লাগলো লালাফুলের উপবন।
দুরন্ত রাখ্শ যে দিকেই মুখ করলো
সে দিকেই ঝরে পড়তে লাগলো আগুন।
রক্ত জমাট বেঁধে বরফের নদীতে রূপান্তরিত হলো,
শত্রু সৈন্য সর্বত্র রোস্তমকেই দেখতে লাগলো।
ক্রীড়াভূমির গেঁদের মতো লুটিয়ে পড়ছে মানুষের শির,
আকাশ যেন ঢেলে দিচ্ছে মাথার উপর অমঙ্গলের ধারা।'[১০৪]

আরদেশীর বাদশাহ সৈন্যদের সুনাম ও গৌরব অর্জন এবং সাধারণ মানুষের সাথে আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে উপদেশ দিয়েছেন, মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক অনূদিত সে অংশের বর্ণনা নিম্নরূপ:

زدی بانگ کای نامداران جنگ　　هران کس که دارد دل و نام و ننگ
نباید که بر هیچ درویش رنج　　رسد گر بران کش بود نام وگنج
به هر منزلی در خورید و دهید　　بدان زیردستان سپاسی نهید
به چیز کسان کس میازید دست　　هران کس که او هست یزدانپرست[১০৫]

সেই ঘোষণাকারী বলবে, হে রণক্ষেত্রের যশস্বীবৃন্দ,
যারা সুনাম ও গৌরবের অধিকারী হতে চাও শোন,
দরিদ্র লোকের উপর যেন কোন দুঃখ আপতিত না হয়–
এবং কোন খ্যাতিমান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যেন কষ্ট না পান।
প্রতিটি বিশ্রামস্থলে যেখানে তোমরা খাওয়া-দাওয়া করবে অন্যকেও দিবে খাদ্য,
ফলে আমার প্রজারা প্রকাশ করবে পরিতুষ্টি।
কারো ধনের দিকে তোমরা হাত বাড়িয়ো না,
বিশেষ করে যারা বিশ্ব প্রভূর পূজারী।[১০৬]

---

১০৩ পারভেয আতাবুকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।
১০৪ মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।
১০৫ পারভেয আতাবুকী (সম্পা.), *শাহনামেয়ে ফেরদৌসী*, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০২।
১০৬ মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

সৈন্যদল যখন যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতো তখন সে দেশের সম্রাট দূত হিসেবে একজন লেখককে নির্বাচন করতেন। আর দূতের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদা, পুরস্কার এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হতো। কবি ফেরদৌসীর শাহনামার সে অংশের অনুবাদ মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক অনূদিত নমুনা নিম্নরূপ:

چو لشکرش رفتی به جایی به جنگ　　خرد یار کردی و رای درنگ
فرستاده ای بر گزیدی دبیر　　خردمند و بادانش و یادگیر
پیامی بدادی به آیین و چرب　　بدان که نباشد به بیداد حرب
فرستاده رفتی بردشمنش　　که بشناختی راز پیراهنش
شنیدی سخن گر خرد داشتی　　غم و رنج و بد را به بد داشتی
بدان یافتی خلعت شهریار　　همان عهد و منشور وهم یادگار[১০৭]

যখন সৈন্যদল যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতো,
তখন সম্রাট জ্ঞানের সহায়তায় সিদ্ধান্তকে দীর্ঘতর করতেন।
দূত হিসেবে তিনি নির্বাচিত করতেন কোন লেখককে,
যিনি হবেন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও স্মৃতিধর।
তাকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সুমধুর ভাষণে উপস্থাপিত করতে পারেন বাণী,
যাতে কোন অন্যায় কারণে যুদ্ধ বেধে না যায়।
সেই দূত শত্রুর কাছে এ কারণে যাবে যে,
শত্রুর গোপন অবস্থা সে সম্যকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়।
সে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শত্রুর সকল কথাই শুনবে,
এবং প্রয়োজনীয় কোন কথা বলতেই সে পিছপা হবে না।
এমন ব্যক্তিই লাভ করেন সম্রাটের হাতে সম্মান,
পদমর্যাদা, রাজ্য ও স্মৃতি তারই জন্যে রক্ষিত থাকে।[১০৮]

নওশেরওয়ান বাদশাহর যুগে এক সম্পদশালী মুচির ছেলে পড়া-লেখা করার ইচ্ছা পোষণ করে বাদশাহর নিকট আবেদন করার বিষয়ের বর্ণনাটি মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক চমৎকার ভাবে অনূদিত হয়েছে। যেমন:

هنر یابد اژ مرد موزه فروش　　سپارد بدو چشم بینا و گوش
به دست خردمند مرد نژاد　　نماند جز از حسرت و سردبار
شود پیش او خوار مردم شناس　　چو پاسخ دهد زود یابد سپاس
به مابر،پس از مرگ نفرین بود　　چو آیین این روزگار این بود[১০৯]

[১০৭] পারভেয আতাবুকী (সম্পা.), *শাহনামেয়ে ফেরদৌসী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০১-১৫০২।
[১০৮] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৬-৪৬৭।
[১০৯] পারভেয আতাবুকী (সম্পা.), *শাহনামেয়ে ফেরদৌসী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯২৮

Dhaka University Institutional Repository

'জ্ঞান ও কলাকৌশল পাদুকা নির্মাতার আয়ত্তে এসে গেলে,
তা তাকে দান করবে দৃষ্টিময় চক্ষু ও শ্রবণ।
অভিজাত পুরুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষমতা তখন
পরিতাপ ও দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হবে।
মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার সামনে হবে অপমানিত,
সত্য কথা গৃহীত হবে না তার কাছে।
মৃত্যুর পর আমাদের উপর বর্ষিত হবে অপবাদ,
তার ফরমান বিস্তৃত হবে কালের সর্বত্র।'[১১০]

রাষ্ট্র পরিচালনায় আরদেশীরের কৃতিত্বের বর্ণনা শাহনামায় উপস্থাপিত হয়েছে: মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক সে অংশের অনুবাদের নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

ازومرز بان آگهی داشتی　　چنین کارها خوار نگذاشتی
فرستاده را پیش خود خواندی　　بر تخت زرینش بنشاندی
بفرسش گرفتی همه راز اوی　　ز نیک و بد و نام و آواز او
به ایوانش بردی فرستاده وار　　بیاراستی هرچه بودی به کار
وزان پس به خوان ومیش خوا ندی　　ابر تخت زرینش بنشاندی
به نخچیر بردیش با خویشتن　　شده لشکر بیشمار انجمن
گسی کردنش را فرستاده وار　　بیا راستی خلعت شهریار[১১১]

'তখন সেনাপতি যেন তার আগমন সংবাদ পেয়ে,
তাকে ক্ষুদ্র বলে গণ্য না করেন।
যথা সময়ে সম্রাট দূতকে ডাকবেন তাঁর সামনে,
এবং তাকে এক স্বর্ণাসনে বসতে দিবেন।
তারপর সম্রাট তার কাছ থেকে জানবেন সব কথা,
তার ভাল-মন্দ বার্তা তিনি অবগত হবেন।
তারপর তাকে দূতের মর্যাদায় প্রাসাদে আনয়ন করা হবে,
এবং তার প্রয়োজনীয় সব কিছু তাকে দেওয়া হবে।
আহারের সময় নিকটবর্তী হলে সম্রাট
তাকে নিজের পাশে স্বর্ণাসনে বসাবেন।
দূতকে সম্রাট নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন মৃগয়ায়,
সেখানে অগণিত সৈন্য তাঁর অনুসরণ করবে।
অবশেষে যখন তার বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হবে;
তখন সম্রাট তাকে দান করবেন মর্যাদাপূর্ণ খেলাত।'[১১২]

উপর্যুক্ত উদাহরণের আলোকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক শাহনামার বঙ্গানুবাদ পূর্ণাঙ্গ সার্থক, সফল ও মূলানুগ বলে সর্বজনবিদিত হয়েছে।

---

[১১০] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬।
[১১১] পারভেয আতাবুকী (সম্পা.), *শাহনামেয়ে ফেরদৌসী*, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০৩-১৫০৪।
[১১২] মনির উদ্দীন ইউসুফ (অনু.), *ফেরদৌসীর শাহনামা*, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৯-৪৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ ওমর খৈয়্যামের রুবাঈয়াতের অনুবাদ

ফারসি সাহিত্যাঙ্গনে যে ক'জন কবি-সাহিত্যিক জ্ঞান সাধনা চিন্তা দর্শন পৃথিবীতে এক নতুন ও প্রাণবন্ত কৃষ্টি-কালচারের জন্ম দেন ওমর খৈয়াম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পুরো নাম আবুল ফাতাহ ওমর বিন ইবরাহীম আল খৈয়াম, খৈয়াম তার উপাধি এর অর্থ তাবু তৈরীর ব্যবসায়ী। তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় নি। তবে অনেকের মতে ১০৩৮-১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এবং এখানেই তিনি ১১২৩-১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি খোরাসান, তুস, বলখ, বোখারাসহ বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেন। এক বর্ণনানুযায়ী তিনি হজ্বব্রতও পালন করেন। একাধারে তিনি ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক, গণিতশাস্ত্রবিদ। তবে এ সকল গুণাবলীর মধ্য থেকে তিনি একজন রুবাঈ রচয়িতা তথা একজন কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত।

ওমর খৈয়ামের রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী *মাকালাতু ফি'ল জাবরী ওয়াল মুকাবিলা, মুসাদিরাতু কিতাব-ই-উকলিদাস, মুশকিলাতুল হিসাব, লাওয়াযিমু আমকিনা, মীযানুল হিকাম, রিসালায়ে ফি কুল্লিয়াতে অজুদ, নওরোজ নামে*।[১১৩] ওমর খৈয়াম তাঁর রুবাঈর জন্য অমর হয়ে আছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় খৈয়ামের রুবাঈ অনূদিত হয়েছে। যেমনঃ ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইটালীয়, স্পেনীয়, হাঙ্গেরিয়ান, সুইডিশ, আরবী, তুর্কী, বুলগেরিয়ান, আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান, উজবেক, রুশ, চেক, গ্রীক, হিব্রু, রুমানিয়ান, নরওয়েজিয়ান, পোলিশ, বাংলা, সিন্ধি, গুজরাটি, কাশ্মীরী, হিন্দী, উর্দু ও জাপানী অন্যতম।[১১৪]

বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ ওমর খৈয়ামের কবিতার বাংলা অনুবাদ *রুবাইয়াত* শিরোনামে অনুবাদ করেন যা ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়। শ্যামচরণ কবিরত্ন *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম* নামে খৈয়ামের কাব্যের অনুবাদ করেন যা চাঁদনীচরণ বসাক কর্তৃক কলকাতা হতে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকাসহ ওমর খৈয়ামের কবিতার অনুবাদ *ওমর খৈয়াম* শিরোনামে শ্যাম পদ চক্রবর্তী কর্তৃক অনূদিত হয়ে সমীর বসু কর্তৃক কলকাতা হতে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুজাতা দেবী *ওমর খৈয়াম* নামে ছবিসহ বইটির কাব্যানুবাদ করেছেন যা সুধীর কুমার হাজরা কর্তৃক কলকাতা হতে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হেমন্তকুমার রায় অনূদিত *ওমর খৈয়ামের রুবাইয়্যাত* নামক গ্রন্থটি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়।

---

[১১৩] মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (সম্পা.), *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯), পৃ. ১১২-১১৩; এম আকবর আলী, *বিজ্ঞানী কবি ওমর খৈয়াম* (ঢাকাঃ মালিক লাইব্রেরী, ১৯৯০), পৃ. ১৩৪-১৩৫। আশরাফ লতিফী ও সাইয়্যেদ খোরশীদ হোসাইনি বোখারী, *মোতালায়ে আদাবিয়্যাতে ইরান*, হিচ্ছায়ে নায্ম (লাহোরঃ তাজ বুক ডিপো, ১৯৬৬), পৃ. ৯৬।

[১১৪] মুহসিন রমযানী (সম্পা.), *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম দর ছেহ যাবান* (তহরানঃ এন্তশারাতে পাদীদে হুনারী, ১৩২২ ইরানী সাল), পৃ. ভূমিকা; নূরুন নাহার বেগম, *রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম* শিরোনামে ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াতের অনুবাদ করেন যা কাজী মুহাম্মদ বশীর কর্তৃক প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ভিক্টোরিয়া পার্ক, বর্ধমান হাউস ঢাকা হতে প্রথম ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ওমর খৈয়াম এর কাব্যসমূহ *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম* শিরোনামে আযীযুল হাকীম কর্তৃক গদ্যানূদিত হয়ে ইস্টার্ণ বুক সেন্টার, ঢাকা হতে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনুবাদক শ্রী কান্তি চন্দ্র ঘোষ। শ্রী অনাথ নাথ ঘোষ কর্তৃক ১৩৪ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলকাতা হতে *রুবাইয়াতে-ই-ওমর খৈয়াম* শিরোনামে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ওমর খৈয়ামের কবিতা *রুবাইয়্যাতে ওমর খৈয়াম* নামে নরেন্দ্র দেব বাংলায় অনুবাদ করেছেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা হতে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম* নামে ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াত বাংলায় অনুবাদ করেন। জোহরা খানম কর্তৃক ইস্টার্ণ বুক সেন্টার ৯ এন্টনী বাগান লেন কলকাতা হতে সৈয়দ মুজতবা আলীর ভূমিকাসহ ডিসেম্বর ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। সিকান্দার আবু জাফর ফিটজেরাল্ডকেই পুরোপুরি অবলম্বন করে *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়ম* এর ৭৫টি রুবাঈ বাংলা অনুবাদ করেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা হতে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াতের যে কয়টি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সে সর্ম্পকে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

রুবাঈয়াতে ওমর খৈয়াম

ছবিসহ ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াতের বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন ইউসুফ হায়দার।[১১৫] শফিকুল ইসলাম ইউনুস কর্তৃক ঢাকা প্রকাশনী হতে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। ইউসুফ হায়দার স্বীয় অনুবাদ সম্পর্কে বলেন:

> বাংলাদেশ-উত্তর যুগে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় নাই বলেই আমার ধারণা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই যুগের বার্তাবহ একটি অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বাংলাদেশর সুধীবৃন্দ যে এখনও খৈয়ামের অনুরাগী, খৈয়ামের দর্শন ও রুবাইয়াতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই আমার এই বিনম্র প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য।[১১৬]

[১১৫] ইউসুফ হায়দার ১ জানুয়ারী ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রশিক্ষণ শেষে সেনাবাহিনীতে কমিশন পান। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিরক্ষা বিষয়ক নিবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [দ্র. ইউসুফ হায়দার, *ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ* (ঢাকা: ঢাকা প্রকাশন, ১৯৮৫), পৃ. ভূমিকা।]

[১১৬] ইউসুফ হায়দার, *ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ* (ঢাকা: ঢাকা প্রকাশন, ১৯৮৫), পৃ. আমার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ হায়দার মূলত ফিটজেরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদের অনুকরণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> বাংলাদেশী কিশোর মাত্রই কবিতার মাধ্যমে যৌবনে উপনীত হয় বলে একটা সুবাদ আছে। সেই সুবাদে আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দীর্ঘ ছুটির দিনগুলোতে আমি এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের অনূদিত ওমার খৈয়ামের রুবাইয়াতগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম। সেটাই আমার প্রথম এবং শেষ কাব্য প্রচেষ্টা। সেই অনুবাদই এতদিন পর প্রকাশ হতে চলেছে। তবে এই অনুবাদে সেই প্রথম যৌবনের জড়সধহঃরপ ভাব প্রবণতা ও উচ্ছ্বাসের যে ছাপ পড়েছিল, এতদিন পরেও সেই ভাবের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। কেবল শব্দের পরিবর্তন আর ছন্দের উন্নতি সাধিত হয়েছে মাত্র।[১১৭]

ইউসুফ হায়দার অনূদিত একটি রুবাঈ নিম্নরূপ:

Awake! For the morning in
the bowl of night
has flung the stone
That put the start to flight;
And Lo! The hunter of the
east hrs caught
the sultsn's turnet in a
noose of light.

রাতের গুহা মুক্ত হয়ে
নবীন ঊষা ডাকছে আয়,
আকাশ পানে পাথর হানে
তারারা সব মিলিয়ে যায়।
শিকারী রবি আবির মুখে
জ্বালিয়ে দিলো ইশকে নূর,
সেই নূরেতে উঠলো জ্বলে
সুলতানেরই সৌধ চূড়।[১১৮]

রোবাইয়াৎ-এ- ওমর খৈয়াম

ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়্যাত-এর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম* এর অনুবাদ করেছেন নূরুন নাহার বেগম। এটি মূল ফারসি থেকে অনূদিত হয়েছে। ওমর খৈয়ামের ৯০টি রুবাঈয়ের অনুবাদ সম্বলিত গ্রন্থটি আগামী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে আগস্ট ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আর প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ।

---

[১১৭] *প্রাগুক্ত*।

[১১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

নূরুন নাহার বেগম তাঁর অনূদিত গ্রন্থে ওমর খৈয়ামের মূল ফারসি রুবাঈগুলো (বাংলা হরফে) তুলে ধরে সে গুলোর আক্ষরিক অনুবাদ গদ্যে ও পরে কবিতায় রুবাঈ-এর ছন্দে প্রকাশ করেছেন। এর পরে ফিটজেরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদ এবং কান্তি ঘোষ ও নরেন্দ্র দেব-এর অনুবাদগুলো উদ্ধৃত করে তুলনামূলক বিচারের জন্য এখানে শুধু ঐ সব রুবাঈ নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন যেগুলোর অনুবাদে ফিটজেরাল্ড, কান্তি ঘোষ এবং নরেন্দ্র দেব মূল ফারসি থেকে বিচ্যুতির পরিচয় দিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা তোলে ধরেছেন। নূরুন নাহার বেগম কর্তৃক তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপিত অনূদিত নমুনা নিম্নরূপঃ

গোইয়ান্দ বেহেশ্‌ত্‌ আদম বা হুর খোশ আস্ত্‌
মান মীগোইয়াম কেহ্‌ ঃ আবে আংগুর খোশ আস্ত্‌
ইন নগ্‌দ্‌ বেগীর ও দস্ত্‌ আয আন্‌ নসিহেহ্‌ বেদার
কাহ্‌ওয়াযে দহ্‌লে বেরাদর আয দুর খোশ আস্ত্‌।

গদ্য অনুবাদ

তারা বলেছে বেহেশতের আনন্দ হুর পরীতে। আমি বলি আঙ্গুর রসেই আমার আনন্দ। এটাই নগদ গ্রহণ কর এবং বাকীর আশা থেকে হাত সরিয়ে নাও, কেননা, ঢোলের আওয়াজ ভাই দূর থেকেই শুনতে মধুর মনে হয়।

ফিটজেরাল্ডের অনুবাদ

Some for the Glories of this world; and some
Sigh for the prophets Paradise to come;
Ah, for fhe Cash, and let the promise go,
Nor heed the music of a distant Drum!
(Rubai XI)

কান্তি ঘোষের অনুবাদ

রাজ্যসুখের আশায় বৃথা
কেউবা কাটায় বরষ মাস,
স্বর্গসুখের কল্পনাতে
পড়ছে কারুর দীর্ঘশ্বাস।...
নগদ যা' পাও হাত পেতে নাও,
বাকীর খাতায় শুন্য থাক--
দুরের বাদ্য লাভ কি শুনে?--
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ

কেউ ভাবে-এই ইহকালে-
রাজ্য-সুখই ভোগের চরম!

Dhaka University Institutional Repository

কারুর মতে– ভবিষ্যতে
স্বর্গ পাওয়াই লাভটা পরম!
তুচ্ছ ক'রে ওসব তত্ত্ব
নগ্‌দা হিসাব মিটিয়ে নাও,
নেপথ্যের ওই ঢাকের রোলে
কর্ণে তোমার আঙুল দাও।

উপর্যুক্ত তিনটি অনুবাদের প্রথম চরণের বক্তব্য মূল ফারসি রুবাঈ-এ কোথাও উল্লেখ নেই।[১১৯]

উপর্যুক্ত আলোচনার ফারসি মূল রুবাঈটি নিম্নরূপ:

گویند بهشت عدن با حور خوشست
من می گویم آب انگور خوشست
این نقد بگیر و دست از نسیه بدار
کآواز دهل شنیدن از دور خوشست.[১২০]

নূরুন নাহার বেগম ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াৎ এর স্বীয় বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে বলেন:

> ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-এর প্রচলিত বাংলা অনুবাদগুলোর মধ্যে কি ধরনের ভুল-ভ্রান্তি আছে আমি সে বিষয়ে এ গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনা করেছি। ভূমিকার দুটি অংশ–প্রথম অংশে ওমর খৈয়ামের কবিতা সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় অংশে তাঁর রুবাইয়াৎ-এর বাংলা অনুবাদের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে আমি যে ৯০টি রুবাই-এর অনুবাদ করেছি তাদের পাশাপাশি মূল ফার্সী রুবাইগুলোও বাংলা হরফে ছাপান হয়েছে, যেন পাঠকবৃন্দ ওমর খৈয়ামের মূল ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদনও করতে পারেন।
>
> এ পুস্তক রচনায় আমি প্রখ্যাত ইরানী লেখক ও গবেষক ড. সাদেক হেদায়েত কর্তৃক সংকলিত 'তারানেহাই খাইয়াম' কাব্যগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। উক্ত গ্রন্থে সংকলিত ওমর খৈয়ামের ১৪৩টি রুবাই-এর মধ্যে যেগুলোতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৯০টি রুবাই-এর অনুবাদ এখানে তুলে ধরেছি।[১২১]

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়্যাত

সৈয়দ আবু রায়হান[১২২] কর্তৃক অনূদিত *ওমর খৈয়ামের রুবাইয়্যাত* শিরোনামে খৈয়ামের রুবাঈ অনুবাদ করেন। সৈয়দ আবু রায়হান কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি রীনা খান কর্তৃক সোলডা, কালিহাতি টাঙ্গাইল হতে ৩০

[১১৯] নূরুন নাহার বেগম, *রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১৬-১৭।

[১২০] ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ* (তেহরান: এন্তেশারাতে আনজুমান আসারে মিল্লী, ১৩৪২ ইরানী সাল), পৃ. ৩৩৫।

[১২১] নূরুন নাহার বেগম, *রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৭।

[১২২] সৈয়দ আবু রায়হান ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার গোলড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এবং ঢাকার টি এণ্ড টি কলেজে ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে যোগদান করেন। [দ্র. সৈয়দ আবু রায়হান, *ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত* (টাঙ্গাইল: রীনা খান, ১৯৯৫), পৃ. ২।]

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আবু রায়হান তাঁর অনূদিত গ্রন্থে রুবাঈ অনুবাদ করার পূর্বে গ্রন্থের ভূমিকায় রুবাঈ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ওমর খৈয়ামের সময়কাল, সূফী ও দার্শনিকগণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, খৈয়াম ও রুবাঈ সম্পর্কে আলোচনা, ওমর খৈয়াম: একটি বহুমুখী প্রতিভা, ওমর খৈয়াম: একটি তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি শিরোনামে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সৈয়দ আবু রায়হান কর্তৃক অনূদিত রুবাঈয়াতের অনুবাদ এর নমুনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ফারসি মূল রুবাঈটিও তুলে ধরা হল, যদিও তিনি ফারসি রুবাঈ উল্লেখ করেননি। যেমন:

گویند بهشت عدن با حور خوشست
من می گویم آب انگور خوشست
این نقد بگیر و دست از نسیه بدار
کآواز دهل شنیدن از دور خوشست.[১২৩]

তারা বলে স্বর্গ আছে-তাতে রয়েছে হুরী এবং নদী
শরাব-প্রবাহিনী, দুধ, মিষ্টি এবং মধু ;
শরাবের পেয়ালাটি পূর্ণ কর-আমার হাতে দাও,
হাজারো অঙ্গিকারের চেয়ে নগদ টাকা পাওয়া ভাল।[১২৪]

گویند مرا که دوزخی باشد مست
قولیست خلاف و دل در آن نتوان بست
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود
فردا بینی بهشت هم چون کف دست.[১২৫]

তারা বলে হুরীগণ বেহেস্তের বাগানগুলোকে পরম আনন্দময় করে তোলে
আমি বলি যে দ্রাক্ষার রস পরম আনন্দময়
নগদ টাকা নাও, ধার প্রত্যাখ্যান কর
দূরের ঢাকের শব্দ মিষ্টিই হয়।[১২৬]

সৈয়দ আবু রায়হান দুইশত পয়ত্রিশটি রুবাঈ অনুবাদ করেন। তিনি তাঁর অনুবাদ ও এর অনুকরণ সম্পর্কে বলেন:

---

[১২৩] ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ* (তেহরান: এন্তেশারাতে আনজুমান আসারে মিল্লী, ১৩৪২ ইরানী সাল), পৃ. ৩৩৫।

[১২৪] সৈয়দ আবু রায়হান, *ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত* (টাঙ্গাইল: রীনা খান, ১৯৯৫), পৃ. ৭২।

[১২৫] ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ*, পৃ. ৩৩৫।

[১২৬] সৈয়দ আবু রায়হান, *ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত* (টাঙ্গাইল: রীনা খান, ১৯৯৫), পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

মূল ফারসী এবং খৈয়ামের ক্ষুরধার লেখনীর হুবহু ছন্দ রেখে অনুবাদ করা সুকঠিন বিধায় আমি ছন্দের প্রাধান্য উপেক্ষা করে রুবাইয়াতের মূল অবলম্বিত শৈলীর কাছকাছি নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি এ অনুবাদকে। অনুবাদে আমি অনুকরণ করেছি PETER AVERY AND JOHN HEATH STUBBS এর ইংরেজী অনুবাদ। উক্ত অনুবাদকদ্বয়ও মূল ফারসী ভাষা থেকে ইংরেজী অনুবাদে ছন্দের মিলকে ধরে না রেখে রুবাইয়াতের মূল সুর তুলে ধরেছেন। আমিও এদের ইংরেজী অনুবাদের অনুকরণে ছন্দ পরিহার করে রুবাইয়াতের মূল সুর উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।[১২৭]

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকাশিত ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াতের অনুবাদ গ্রন্থ সর্ম্পকে আলোচনা উপস্থাপন শেষে বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে যারা ওমর খৈয়ামের কাব্যের অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন সে সম্পর্কে তুলনামূলক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

বাঙ্গালীদের অনেকেই রুবাঈয়াতের অনুবাদ করেছেন তবে রুবাঈয়াতের অনুবাদক হিসেবে বাঙ্গালী অনুবাদকদের মধ্যে বিখ্যাত তিনজন হলেন কান্তি চন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব ও কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট উপরোক্ত তিনজনের নামই অধিক পরিচিত। এদের মধ্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতীত অন্যরা কেউই ফারসি ভাষা জানতেন না। ফলে খৈয়ামের কাব্য অনুবাদ করার জন্য তাঁরা মূলত ইংরেজী অনুবাদেরই আশ্রয় নিয়েছেন। কান্তি চন্দ্র ঘোষ ফিটজেরাল্ডের ১১০টি রুবাঈ-এর মধ্যে ৭৬টি রুবাঈ-এর হুবহু অনুবাদ করে গেছেন।

নরেন্দ্র দেব যদিও অন্যান্য ইংরেজী অনুবাদের আশ্রয়ও নিয়েছেন তথাপি ফিটজেরাল্ডের মোহ যে তিনি কাটাতে পারেননি, সে কথা তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় অকপটে স্বীকার করেছেন।

অনূদিত রুবাঈগুলোর অনুবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ দেশে অনূদিত ওমর খৈয়ামের রুবাঈর অধিকাংশই ফিটজেরাল্ড এর ইংরেজী অনুবাদের অনুসরণে রচিত। ফিটজেরাল্ডকে অনুসরণ করার ফলে মূল ফারসি রুবাঈ থেকে অনেকটা দূরে তাদের অবস্থান। সে ক্ষেত্রে ফারসি ভাষা জানার কারণে কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতিক্রম। অনুবাদকদের অনুবাদে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের রুবাঈ এর ক্রমিক নম্বর আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অনুবাদের ক্রমিক নম্বর এক নয়। এ বিষয়ে আবদুল কাদিরের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:

নজরুল তার অনুবাদ প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করেন। রুবাইগুলো সজ্জিত করেন নতুনভাবে যেমন মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত ২নং রুবাইটি গ্রন্থে হয়েছে ১২৮নং রুবাই। মাসিক মোহাম্মদীর ১৬নং ও ১৭নং রুবাই দুটি হয়েছে গ্রন্থের সর্বশেষ ১৯৬নং ও ১৯৭নং রুবাই।[১২৮]

---

[১২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

[১২৮] আবদুল কাদির, *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৯), পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

ফিটজেরাল্ডের অনুবাদেও তা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: প্রথম সংস্করণে ১নং রুবাঈটির অনুবাদ নিম্নরূপ:

Ask I for morning in the bowl of night
Has flung the stone that puts the star to flight
And Lo I the hunter of the east has caught
The sultan Turret in a noose of light.

পরবর্তী সময়ে চতুর্থ সংস্করণে উপর্যুক্ত অনুবাদে ফিটজেরাল্ড পরিবর্তন নিয়ে আসেন। যেমন:

Wake I for the sun, who scattered into flight
The stars before him from the field of night
Drives night along with them from heaven and strike
The Sultan Turret with a shaft of light.

ওমর খৈয়ামের একটি রুবাঈর বঙ্গানুবাদ যা বিভিন্ন অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়, নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা হল:

অক্ষয় কুমার বড়াল ১নং রুবাঈর অনুবাদ করেন নিম্নোক্তভাবে:

আর ঘুমায়ো না, পান্থ, মেলহ নয়ন।
প্রাচী-প্রান্তে ফুটে, ফুটে প্রভাত-কিরণ।
এলোকেশী নিশীথিনী পলায় তরাসে
অঞ্চলে কুড়ায়ে তার ছড়ান রতন।[১২৯]

কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ

রাত পোহালো-শুনছ সখি, দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক।
পূব-গগনের দেব্ শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির।[১৩০]

নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ

জাগো জাগো, রাত ফুরালো,
তরুণ প্রাতের আঁখির আলো
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে।
চাও গো সখি, চাঁদ-বধূয়া লজ্জানত মুখে
ত্রস্তপদে পলায় যেন ত্রাসে!
পূব-আকাশের শিকারী ওই
জ্যোতির জালে জড়িয়ে লো সই
রং-মহলের মিনার-দ্বারে
জয়োল্লাসে হাসে![১৩১]

---

[১২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪।
[১৩০] কান্তি চন্দ্র ঘোষ, *রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১।
[১৩১] নরেন্দ্র দেব, *রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭), পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের অনুবাদ

পূর্বাশায় ঐ মিহির হানে তিমির বিদার কিরণ তীর।
কায় খসরুর লাল পিয়ালায় ঝরছে যেন মদ জ্যোতির।
ভোরের শুভ্র বেদীমূলে ডাক দিয়ে কয় মুয়াজ্জিন-
জাগো জাগো, প্রসাদ পেতে উষার ঘটের লাল পানির।[১৩২]

অনূদিত আলোচ্য রুবাঈর মূল ফারসি নিম্নরূপ

خورشید کمند صبح بر بام افکند
کیخسرو روز مهره در جام افکند
می خور که موذن صبوحی خیزان
آوازه اشربو در ایام افکند[১৩৩].

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অনুবাদের চেয়ে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালের অনুবাদ নিঃসন্দেহে মূলের কাছাকাছি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম শতভাগ সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন বলে সর্বজন স্বীকৃত। উল্লেখ্য যে, নজরুল এর অনুবাদ নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৫ শেখ সা'দীর সাহিত্যকর্মের অনুবাদ

শেখ সা'দী ফারসি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইরানের কাব্যকুঞ্জের বুলবুল হিসাবে দেশ বিদেশের সর্বত্র তিনি নন্দিত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাধক, দার্শনিক, পর্যটক ও মানব দরদী জনসেবক। শুধু পারস্য প্রতিভারূপে নয়; বরং বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি যে অমুল্য সম্পদ দান করে গেছেন তাতে বিশ্বমানবের হৃদয়াকাশে তিনি এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে চিরভাস্বর হয়ে বিরাজ করবেন। এ মহান কবির নাম ও জন্মতারিখ নিয়ে গবেষকদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মূলনাম মুসলেহ উপাধী মুশাররফ উদ্দিন এবং কাব্যনাম সা'দী।[১৩৪] তাঁর পুরো নাম আবু মুহাম্মদ মুশাররফ উদ্দিন (শারফুদ্দিন) মুসলেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুশাররফ সা'দী শিরাজী।[১৩৫] তবে সকলের কাছে তিনি সা'দী

[১৩২] আবদুল কাদির, *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২।
[১৩৩] ইয়াগানী, *হাকিম ওমর খৈয়াম ও রোবাইয়াতে উ*, পৃ. ৩৫০।
[১৩৪] ড. মুহাম্মদ জাফর ইয়াহকী, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান* (তেহরানঃ চাপখানেয়ে শেরফাত, অফসেট, ১৩৭৭ ইরানী সাল), পৃ. ১৭০।
[১৩৫] ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়্যাতে দার ইরান*, ১১তম সং. (তেহরানঃ এন্তেশারাতে ফেরদৌস, চাপখানেয়ে রামীন, ১৩৭৩ ইরানী সাল), পৃ. ৫৮৪-৫৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১ ও ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে।[১৩৬] তাঁর পিতার কর্মস্থল ছিল ফার্স প্রদেশের আবু বকর ইবন সা'দ ইবন জঙ্গীর রাজ দরবারে।[১৩৭] সা'দ ইবন জঙ্গী (৫৯৯-৬৩২হি.) কবির প্রতি অনুগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ সা'দী কাব্যনাম গ্রহণ করেন। শিরাজে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর সা'দ জঙ্গীর অনুপ্রেরণায় তৎকালিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। সাদীর জীবন মূলত: তিন ভাগে বিভক্ত অধ্যয়নকাল, দীর্ঘ ভ্রমণকাল, শিরাজ প্রত্যাবর্তন ও কাব্যচর্চার কাল। তিনি মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, বালখ, আরব, সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল, ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও গুজরাট ভ্রমণ করেন।[১৩৮] ৬৯১ হিজরী মুতাবেক ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে শিরাজ নগরে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থদ্বয় বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। তাছাড়া সাদীর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী নিম্নরূপ:

মাজালিসে খামসা, নসীহাতুল মূলক, রিসালায়ে আশেকিয়ান, রিসালাহ দর তকদীরে দিবাচে, কাসায়েদুল ফারসি, কাসায়েদুল আরবী, বাজলিয়্যাত, রুবাইয়াত, কারীমা। *বুস্তান* ও *গুলিস্তান* গ্রন্থ দুটি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করছে।

শেখ সা'দী দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বিশ্ব সফরে নীতি-নৈতিকতার যে মুক্তা আহরণ করেছেন *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থ তারই সারনির্যাস। জীবনের উত্থান-পতনে মানুষ কি কি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে মানুষ নামের সার্থকতা ও স্বকীয় ঐতিহ্য ঠিক রাখতে পারে এবং একজন মানুষের নৈতিক উন্মেষ ও চারিত্রিক মাধুর্যতা তাকে কোন পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে তারই একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সা'দীর *গুলিস্তা* ও *বুস্তান* গ্রন্থে। গ্রন্থ দুটি এতই তাৎপর্যবহ যে কুরআন-সুন্নাহ ও মানুষের সহজাত আচরণের এক মহা সমুদ্রের মাঝে একটি মাইল ফলক। সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা, স্রষ্টার প্রতি প্রেম ও সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়ার এক অনবদ্য সৃষ্টি সা'দীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থ। ফারসি ভাষায় রচিত সা'দীর এ অমূল্য সম্পদ জনসমাজে তথা সমাজের মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার নৈতিক দায়িত্ব থেকে কিছু ব্যক্তি ভাষান্তরকর্ম সম্পাদন করেছেন। নিম্নে বাংলা ভাষায় শেখ সাদীর অনূদিত গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করা হলো:

---

[১৩৬] Edward G. Brown, *A Literary History of Persia*, Vol. I (London: Cambridge University Press, 1902), pp. 526-528.

[১৩৭] হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: শ্রী জগদীশ প্রেস, ১৩১৬ বাংলা), পৃ. ৯১।

[১৩৮] পারভেজ আতাবেকী, *বারগুজিদে ওয়া শারহে আছারে সা'দী* (তেহরান: নাশরে ফাজুহেশে ফারজান, চাপে নুশতার, ১ম প্রকাশ ১৩৭৪ ইরানী সাল), পৃ. ৬; আব্দুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ জুন ১৯৮৭), পৃ. ৫০।

শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ কাব্যের প্রথম বাংলা অনুবাদ ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে আগষ্টিন ডি সিলভা কর্তৃক অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[১৩৯] সা'দীর কাব্যগ্রন্থ *পান্দ নামা* মো. আকমল কর্তৃক অনূদিত হয় এবং *পান্দ নামে* কলকাতা হতে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আরবী ও ফারসি ভাষার সুপণ্ডিত শ্রী গিরীশচন্দ্র সেন কর্তৃক সা'দীর কাব্যের অনুবাদ *হিতোপাখ্যানমালা* নামে হার মোহন বসাক কর্তৃক গিরীশ প্রকাশনা, ঢাকা হতে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। শেখ সা'দীর অমর কাব্য গুলিস্তানে সা'দীর অবলম্বনে মাওলানা মো. ইয়াকুব আলী রচিত বঙ্গানূদিত গ্রন্থ *উদ্যান* ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেখ মুহাম্মদ আব্দুল গাফ্ফার কর্তৃক সা'দীর গুলিস্তানের প্রথম অধ্যায়ের অনূদিত গ্রন্থ *পুষ্পোদ্যান*-নামে কলকাতা হতে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মৌলভী শেখ মুহাম্মদ আব্দুল কাদের অনূদিত শেখ সা'দীর গুলিস্তানের বঙ্গানুবাদ *গুলিস্তানের বঙ্গানুবাদ* নামে মুহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন আহমদ কর্তৃক কলকাতা হতে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সা'দীর কবিতার অনূদিত গ্রন্থ *উপদেশ লহরী* রাধাগুয়ান্দ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত হয়ে কলকাতা হতে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সা'দীর কবিতার বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ শামসুদ্দিন আহমদ দেওয়ান অনূদিত দেওয়ান মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ কর্তৃক নীতি কানন নামে কলকাতা হতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। *মহাকবি শেখ সা'দীর গুলিস্তানের বঙ্গানুবাদ* শিরোনামে শেখ হাবিবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত বইটি এম. রহমান কর্তৃক কলকাতা হতে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। শেখ সা'দীর আরেক অমর কাব্যগ্রন্থ *কারিমায়ে সাদীর* বঙ্গানুবাদ করেছেন কাজী আকরম হোসাইন। প্রকাশক কাজী ইকামুদ্দীন কর্তৃক ইতিকথা বুক ডিপো, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা হতে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সা'দীর কাব্যগ্রন্থ বুস্তানের বঙ্গানুবাদ করেছেন শেখ হাবিবুর রহমান। দে সিরিত ইসাররান লাইব্রেরী কর্তৃক কলকাতা হতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তিনি *সদ্ভাব কুসুম* বা *সা'দীর কালাম*, *গুলিস্তার গল্প*, ও *মহাকবি শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ* শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন।[১৪০] ছোটদের জন্য গুলিস্তানের গল্পসমূহের বঙ্গানুবাদ করেছেন বন্দে আলী মিয়া। *গুলিস্তানের গল্প* নামে বইটি পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ঢাকা থেকে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সা'দীর অমর কাব্য *গুলিস্তান* এর কাব্যানুবাদ গ্রন্থ *কুসুম উদ্যান* এর অনুবাদক তমিজুর রহমান। *কুসুম উদ্যান* ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সা'দীর অমর কাব্য *পান্দ নামা* এর অনুবাদ করেছেন মো. মেহেরুল্লাহ মুন্সী। প্রকাশক মনসুর আহমেদ কর্তৃক কোরিয়া রোড, কলকাতা থেকে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

---

[১৩৯] রাজিয়া সুলতানা, *সাহিত্য বীক্ষণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৯৩।

[১৪০] আলী আহমদ (সংক.) *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৭৮৬-৭৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তরকালে সা'দীর যে সকল গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপিত হল:

শেখ সা'দীর গল্প

আবদুস সাত্তার শেখ সা'দীর গুলিস্তান গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত তেরটি গল্পের অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য তেরটি গল্পের শিরোনাম হল- কে ভালো, হিংসুকের পরিণাম, অত্যাচারী বাদশাহ, কে বড়, স্বভাব যায় না মরলে, লোভের খেসারত, খোদার ইচ্ছা, অভিজ্ঞতার দাম, বিচ্ছু, শিক্ষক, নিজে ভালো, সবুরে মেওয়া ফলে, ক্ষুধার জন্য খাবার ইত্যাদি।

আলোচ্য গল্পগুলো নীতিকথা ও উপদেশ সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে এ গ্রন্থের প্রকাশকের বক্তব্য নিম্নরূপ:

> লেখক জনাব আবদুস সাত্তার মূল ফারসির গুলিস্তা গ্রন্থ থেকে বাছাই করে তেরটি গল্প নিয়ে *শেখ সা'দীর* গল্প বই খানা লিখেছেন। এ সবে যেমন রয়েছে গল্পের স্বাদ, তেমনি নীতিকথা ও উপদেশ। এর শিক্ষণীয় প্রতিটি গল্প, মিষ্টি ভাষা আমাদের ভালো লেগেছে।[১৪১]

শায়খ সাদী (র.)-এর গুলিস্তাঁ

মূল গ্রন্থের রচয়িতা শেখ সাদী (র.)। এ কাব্যগ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ মোবারক আলী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে জুন ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আটটি অধ্যায়ে বইটির আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। মোহাম্মদ মোবারক আলী কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

> یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را بخواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده مگر چشمان او که همچنان در چشم خانه همی گردید و نظر می کرد. سایر حکما از تأویل این فروماندند مگر درویشی که بجای آورد و گفت : هنوز نگراست که ملکش با دگرانست

> بس نامور بزیر زمین دفن کرده اند
> کز هستیش بروی زمین بر نشان نماند

[১৪১] মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, *জীবনী গ্রন্থমালা আবদুস সাত্তার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

وانپیر لاشه راکه سپردند زیر گل

خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند

زنده است نام فرّخ نوشین روان بخیر

گرچه بسی گذشت که نوشین روان نماند

خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر

زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند[১৪২]

অসার সংসার

খুরাসানের এক বাদশা সুলতান সবুক্তগীনের পুত্র প্রসিদ্ধ নরপতি সুলতান মাহমুদ গজনবীকে স্বপ্নে দেখে ছিলেন। দেখেন যে তার শরীরের সকল অংগ-প্রত্যংগ পঁচে-গলে একেবারে মাটি হয়ে গেছে। কিন্তু চোখ দুটি অবিকল ঠিক আছে এবং চক্ষু কোটরের ভেতর থেকে এদিক ওদিক কি যেন দেখছে। রাজ দরবারে জ্ঞানী গুণী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কেউই এ স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। একজন দরিদ্র দরবেশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ স্বপ্নের অর্থ বুঝলেন এবং বললেন তাঁর এত সাধের রাজত্ব কারা ভোগ করছে, তিনি চেয়ে চেয়ে তাই দেখছেন।

কত নামযাদা প্রতাপশালীরা
এ মাটির নীচে নিয়েছে ঠাঁই।
বিলীন হয়েছে অস্তিত্ব তাদের
এ ধরার বুকে চিহ্ন নাই ॥
সেই বৃদ্ধের শীর্ণ শরীর
রাখা হয়েছিল মাটির নীচে।
এমন করিয়া খেয়েছে মাটিতে
অস্থিও অবশিষ্ট নাই ॥
ন্যায় বিচারেতে নওশেরোয়ার
পূত নাম আজও রয়েছে বেঁচে।
বহু বহু যুগ হয়েছে অতীত
নওশেরোয়ান ধরাতে নাই ॥
যতবেশী পার ভাল কাজ কর
আয়ু মনে কর লুটের মাল।
সেদিনের আগে যেদিন সকলে
বলিবে ওমুক বাচিঁয়া নাই ॥[১৪৩]

মোবারক আলী অনুবাদ করার সময় গদ্যের অনুবাদ গদ্যে আর পদ্যের অনুবাদ পদ্যে সম্পন্ন করেছেন। যার ফলে অনুবাদের মান যথেষ্ঠ পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

---

[১৪২] ড. খলীল খতিব রাহবার (সম্পা.), *গুলিস্তানে সা'দী* (তেহরানঃ কিতাব খানায়ে মিল্লীয়ে ইরান, ১৩৮৪ ইরানী সাল), পৃ. ৫০-৫১।

[১৪৩] মোহাম্মদ মোবারক আলী, (অনু.) *শায়খ সাদী (র.)-এর গুলিস্তাঁ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

গুলিস্তাঁ

শেখ সা'দী (র.) রচিত *গুলিস্তাঁ* কাব্যগ্রন্থের প্রথম ও অষ্টম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ সম্বলিত এ *গুলিস্তাঁ* নামক গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবু মুসা। বইটি ১ মে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মাওলানা আবু মুসার অনুবাদের নমুনা নিম্নরূপ:

مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند : نیک بخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت: نیک بخت آنکه خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت

مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچنکرد
که عمر در سر تحصیل مال کردو نخورد[১৪৪]

ধন সম্পদ জীবনের শান্তির জন্য, জীবন ধনোপার্জনের জন্য নয়। (অর্থাৎ মানব জাতি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্পদ সঞ্চয় করা নয়। সম্পদ মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ মাত্র।) জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল- ভাগ্যবান কে এবং হতভাগা কে? তিনি উত্তরে বললেন- ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে নিজে খায় এবং বপন করে। (এমন কাজ করে যায় যাতে মৃত্যুর পরও তার ফল লাভ হয়।) আর হতভাগা ঐ ব্যক্তি যে মরে যায় ও (পরের জন্য) ছেড়ে যায়।

পংক্তি: ঐ ব্যক্তির (জানাযার) নামাজ পড়বে না যে (পূণ্যের) কিছুই করেনি,
বরং মাল সঞ্চয় করার খেয়ালেই তার জীবন ব্যয় করেছে। নিজে কিছুই ভোগ করেনি।[১৪৫]

মাওলানা আবু মুসার অনুবাদকে মুলানুগ বলা যায়। তিনি তাঁর অনুবাদে কবিতার অনুবাদ গদ্যে করেছেন। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তার সংক্ষিপ্ত টীকা প্রদান নিঃসন্দেহে অনুবাদের মানকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

গুলিস্তানের বঙ্গানুবাদ

শেখ সা'দীর অমর কাব্য *গুলিস্তান* এর অনুবাদ *গুলিস্তানের বঙ্গানুবাদ* শিরোনামে সৈয়দ আব্দুল মান্নান কর্তৃক অনূদিত হয়েছে। প্রকাশক আলহাজ মুহাম্মদ আ. রহীম কর্তৃক কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল থেকে মার্চ ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

সহজ গুলিস্তা

শেখ সা'দীর *গুলিস্তান* গ্রন্থের প্রথম ও অষ্টম অধ্যায় মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ কর্তৃক অনূদিত হয়। আল-কাউসার প্রকাশনী ঢাকা থেকে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অনুবাদক সহজ-সরল বাংলা

---

[১৪৪] মোহাম্মাদ আলী ফোরুগী (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে সা'দী* (তেহরান: এন্তেশারাতে পেইমান, ১৩৪২ ইরানী সাল), পৃ. ১৫৮।
[১৪৫] মাওলানা আবু মুসা, (অনু.), *গুলিস্তাঁ* (ঢাকা: ইছামতি অফসেট প্রেস, ১৯৯৮), পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় অধ্যায় দুটি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদক ব্যাখ্যামূলক ভাবানুবাদ করেছেন এবং অনুবাদ শেষে তাহকীকাত শিরোনামে শব্দার্থ ও শব্দ বিশ্লেষণ দিয়েছেন। নিম্নে অনুবাদের একটি নমুনা উপস্থাপন করা হল:

پند ۲ ملك از خردمندان جمال گیرد و دین از پزهیزگاران کمال یابد بادشاهان به نصیحت خردمندان از آن محتاج تراند که خردمندان بقربات پادشاهان

قطعه

پندی اگر بشنوی ای پادشاه
در همه دفتر از این پند نیست
جز به خردمند مفرما عمل
گرچه عمل کار خردمند نیست

حکمت: سه چیز به پایدار نماند مال به تجارت و علم به بحث و ملك به سیاست[১৪৬]

জ্ঞানীদের দ্বারা দেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় আর দ্বীন পরহেয়গারদের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। জ্ঞানীরা বাদশাহের নৈকট্যের যতটুকু মুখাপেক্ষী, বাদশাহ জ্ঞানীদের নছিহতের প্রতি তদপেক্ষা বেশী মুখাপেক্ষী।

হে বাদশাহ! আপনি যদি একটি মাত্র নছিহত শুনেন। তবে কোন কিতাবে এর চেয়ে উত্তম নছিহত আর নেই। জ্ঞানী ব্যতীত কাউকে কোন উচ্চ পদ প্রদান করবেন না যদিও পদ গ্রহণ (চাকুরী) জ্ঞানীদের কাজ নয়।

তিনটি জিনিস তিনটি কাজ ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। (১) ধনসম্পদ ব্যবসা ব্যতীত (২) বিদ্যা চর্চা ব্যতীত (৩) এবং রাজত্ব শাসন ব্যতীত।[১৪৭]

বুস্তানের বঙ্গানুবাদ

শেখ সা'দীর অমর কাব্য *বুস্তানের* বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *বুস্তানের বঙ্গানুবাদ* সৈয়দ আব্দুল মান্নান কর্তৃক অনূদিত হয়েছে। প্রকাশক আলহাজ মুহাম্মদ আ. রহীম কর্তৃক কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়।

به نام خداوند جان آفرین — حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشندهٔ دستگیر — کریم خطا بخش پوزش پذیر[১৪৮]

---

[১৪৬] ড. খলীল খতিব রাহবার (সম্পা.), *গুলিস্তানে সা'দী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২০-৫২১।
[১৪৭] মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *সহজ গুলিস্তা* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৯৬।
[১৪৮] মোহাম্মাদ আলী ফোরুগী (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে সা'দী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

বনামে জাহা' দা রেজা আ-ফেরি,
হাকিমে ছুখান বর জবা' আ-ফেরী।
খোদা ওয়ান্দে বকশান্দাহ ও দস্তেগীর,
করিমে খাতা বখশ ও পূজাশ পিজীর।

আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি এই পৃথিবীর রক্ষক এবং জীবের সৃষ্টিকর্তা। তিনি এমন নিপুণ কারীগর, যে মানুষের জিহবার উপর কথা বলার শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সৃষ্টির মালিক ও সাহায্যকারী।"[১৪৯]

অনুবাদক কাব্যের অনুবাদের পাশাপাশি ব্যাখ্যাও করেছেন। যেমন তিনি উপর্যুক্ত কাব্যের ব্যাখ্যায় বলেন:

তিনি মাখলুকের নালিশ শ্রবণকারী ও মানুষের গোনাহ ক্ষমাকারী এবং দাতা; এমন বন্ধু তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারো নিকট দয়া পাওয়া যাইবেনা। বড় বড় অহঙ্কারী আমীর বাদশাহদের শির তাহার কাছে নত করিয়া থাকে। অহঙ্কারী অত্যাচারীকে যখন তখন শাস্তি দেন না এবং অপরাধ স্বীকারকারীকে দয়া হইতে বঞ্চিত করেন না। যদি কাহারো অন্যায় কাজের দরুন রাগান্বিত হন, পুনঃ যখন সে কৃত অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়, তখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়।[১৫০]

আবদুল মান্নান কর্তৃক ব্যাখ্যামূলক অনূদিত গ্রন্থটি সহজ-সরল ভাষায় অনুবাদ হওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সহজ বোসতাঁ

শেখ সা'দীর অমরকাব্য *বোস্তান* গ্রন্থটি আইয়ূব বিন মঈন কর্তৃক অনূদিত হয়। গ্রন্থটি আল-কাউসার প্রকাশনী ঢাকা থেকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে *সহজ বোসতাঁ* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের সূচনায় সংক্ষেপে শেখ সা'দীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদক প্রথমে ফারসি এবারত তুলে ধরেছেন অতঃপর তরজমা ও তাশরীহ শিরোনামে ভাবানুবাদ করেছেন। অনুবাদ শেষে প্রতিটি শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন, এতে খুব সহজেই পাঠক মূল ফারসি বুঝে অনুবাদ পড়ার সুযোগ লাভ করেন। আইয়ূব বিন মঈন এর অনুবাদকে মান সম্পন্ন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নিম্নে আলোচ্য অনুবাদের নমুনা উপস্থাপন করা হল: :

در نعت سرور کاأنت علیه افضل الصلوات

کریم السجایا جمیل الشیم
نبی البرایا شفیع الامم

---

[১৪৯] এ বি এম আব্দুল মান্নান, *বোস্তাঁর বঙ্গানুবাদ* (বরিশাল: কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, ১৯৯০), পৃ. ১।
[১৫০] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

امام رسل پشوای سبیل
امین خدا مهبط جبرایل
شفیع الور ی خواجۀ بعث و نثر
امام الهدی صدر دیوان حشر
کلیم که چرخ فلک طور اوست
همه نورها پر تو نور اوست
یتیمی که ناکرده قرآن درست
کتب خانه چند ملت بشست[১৫১]

বাংলা
বিশ্বনবী (সা.) এর প্রশংসা বাণী

তরজমা ও তাশরীহঃ (হজরত মুহাম্মদ (স.) সর্বোত্তম) ভদ্র স্বভাব ও সৎচরিত্রের অধিকারী। সমস্ত সৃষ্টি জীবের নবী, উম্মতের সুপারিশকারী। তামাম নবী ও রাসুল (স.) এর ইমাম । (সঠিক) পথ প্রদর্শক। আল্লাহ পাকের আমানতদার, জিব্রাঈল (আ.) এর অবতরণ স্থল। হাশরের কাচারী প্রধান। (তিনি) এমন কথোপকথনকারী যে আরশ তার তুর পাহাড়। (মুসা (আ.) যেমন তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। আর তিনি বলেছেন সরাসরি আরশে মহল্লায়। তাই তুর পাহাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে) সমস্ত নূর তার নূরের অংশ বিশেষ। (তিনি) এমন ইয়াতিম যে (পাঠশালায় প্রচলিত নিয়মে শিক্ষালাভ) কুরআন শরীফ শিক্ষা করেননি। (কিন্তু তা সত্ত্বেও) প্রত্যেক (পূর্ববর্তী) ধর্মের সমস্ত কুতুবখানা ধুয়ে দিয়েছেন। (তাঁর কুরআন শিক্ষা সকল ধর্মীয় গ্রন্থ রহিত করে দিয়েছে।)[১৫২]

কারীমা

শেখ সা'দী রচিত *কারীমা* গ্রন্থটি বাংলাদেশে খুবই একটি জনপ্রিয় ও অধিক পঠিত গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির তিনটি অনুবাদ বেরিয়েছে। মুহাম্মদ নূরুদ্দীন ফতেহপুরী *বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ কারীমা* শিরোনামে গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। আশরাফিয়া লাইব্রেরী চকবাজার ঢাকা থেকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

কারীমা গ্রন্থের অপর অনুবাদক হলেন হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান। *সহজ কারীমা* শিরোনামে আল-কাউসার প্রকাশনী ঢাকা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

---

[১৫১] সাইয়্যেদ যিয়া উদ্দীন দাহশিরী, *না'তে হযরত রাসূলে আকরাম দর শে'রে ফারসি* (তেহরানঃ ১৩৪৮ ইরানী সাল), পৃ. ৩১০।

[১৫২] আইয়ূব বিন মঈন, *সহজ বোসতাঁ* (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া মাওলানা আবদুল মান্নান কর্তৃক *কারীমা* গ্রন্থটি অনূদিত হয়। অনূদিত গ্রন্থটি ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা থেকে *ছন্দে বাংলা কারীমা* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে তিনটি অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হল:

মুহাম্মদ নূরদ্দীন ফতেহপুরী কর্তৃক অনূদিত *বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সহ কারীমা* গ্রন্থে অনুবাদক ফারসি উচ্চারণ সহ সংক্ষেপে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া অনুবাদ করেছেন। এ গ্রন্থের অনুবাদের নমুনা নিম্নরূপ:

خطاب بنفس

নিজের সমালোচনা (আত্ম সমালোচনা)

چهل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نگشت

চেহেল ছালে ওমরে আজীজত গুযাশ্ত মেযাজেতু আযহালে তেফ্লী নাগাশত।

তোমার প্রিয় জীবনের চল্লিশটি বছর চলে গেল, কিন্তু এখনও তোমার বাল্য স্বভাব পাল্টায় নাই।

همه با هوا و هوس ساختی دمی بامصالح نپرداختی

হামা বাহাওয়াও হাওছ্ ছাখ্তি, দমে বা মাছালেহ্ নাপর্দাখ্তি।

সব সময় তুমি মন মত এবং লোভের বশবর্তী হয়েছো, তুমি একটি নিঃশ্বাস-ও ভাল কাজে ফেল নাই।

مکن تکیه بر عمر نا پایدار مباش از ایمن از بازی روزگار

মকুন তাক্য়া বর ওম্‌রে নাপা-য়েদার, ম'বাশ এমেনায বাযিয়ে রোজেগার।

ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর ভরসা করোনা, কালের পরিবর্তন এবং বিপদাপদ থেকে নিশ্চিন্ত থেকোনা।[১৫৩]

হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান অনূদিত *সহজ কারীমা* নামক গ্রন্থের অনুবাদে ফারসি উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি উর্দু অনুবাদও তুলে ধরেছেন। অনুবাদ শেষে অনুবাদক ধারাবাহিকভাবে শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। এ অনুবাদটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বলা যায়। নিম্নে অনুবাদের ধরন তুলে ধরা হল:

در صفت سخاوت

দান করার গুনাগুণ সম্পর্কে

---

[১৫৩] মুহাম্মদ নূরুদ্দীন ফতেহপুরী, *বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সহ কারীমা* (ঢাকা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ২০০০), পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

سخاوت کند نیک بخت اختیار   که مرد از سخاوت شود بختیار

ছাখাওয়াত কুনাদ নে'ক বখত এখতেয়ার + কেহ মরদ আজসাখাওয়াত শাওয়াদ বখতিয়ার।

সৌভাগ্যশীল মানুষই দানশীলতা গ্রহণ করে থাকেন; কেননা মানুষ দানশীলতার দ্বারা ভাগ্যবান হয়।

بلطف و سخاوت جهانگیر باش   دراقلیم لطف و سخامیر باش

বলুতফ ওসাখাওয়াত জাহাঁগী'র বা'স+ দর একলীম লুতফ ওসাখা' মীর বা'স

দয়া ও ক্ষমার মাধমে পৃথিবীর বাদশায় পরিণত হও এবং অনুগ্রহ ও দানশীলতার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ হও।

سخاوت بود کار صاحبدلان   سخاوت بئد پیشہ مقبلان

সাখাওয়াত বুয়াদ কা'রে ছাহেব দিলাঁ + সাখাওয়াত বুয়াদ পে'শায়ে মুকবিলাঁ।

দান করা হৃদয়বান মানুষের কাজ; দানশীলতা নেককার ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পেশা।

سخاوت مس عیب را کیمیاست   سخاوت همه دردهارا دواست

সাখাওয়াত মেছে আইব রা কীমিয়াসত + সাখাওয়াত হামা' দরদাহা রা দাওউস্‌ত্‌

দানশীলতা দূষিত তামার জন্য পরশপাথর; সমস্ত রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা।

مشو تا توان از سخاوت بری   که گوئ بهی از سخاوت بری

মশৌ তা' তওয়াঁ আয সাখাওয়াত বরী + কেহ গোওয়ে বহী আয সাখাওয়াত বরী।

যথা সম্ভব দান করা থেকে বিরত থেকো না । কেননা দানশীলতার দ্বারাই কল্যাণকর কাজে জয়লাভ ও বাজীমাত করতে পারবে।[১৫৪]

মাওলানা আবদুল মান্নান কর্তৃক বাংলা ছন্দে অনূদিত হয় *কারীমা* গ্রন্থটি। অনুবাদক ছন্দে অনুবাদ করার পর সংক্ষেপে গদ্যেও অনুবাদ করেছেন। তবে তিনি ফারসি উচ্চারণ উল্লেখ করেননি। *ছন্দে বাংলা কারীমা* থেকে অনুবাদের কিয়দাংশ নিম্নরূপ:

در صفت راستی

সততার গুণ

[১৫৪] হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান, *সহজ কারীমা* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

دلا راستی گر کنی اختیار   شود دولتت همدم و بختیار

১. মন যদি সৎ স্বভাব করিবে ধারণ- সর্বদা সম্পদ তোমার করবে চুম্বন।

হে মন! তুমি যদি সৎ স্বভাব ধারণ কর, তবে সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।

نه پیچد سر از راستی هوشمند   که از راستی نام گردد بلند

সৎ কাজে বুদ্ধিমান দূরে নাহি রয়-সততায় নাম যশ অতি বেড়ে যায়।

বুদ্ধিমান সৎকাজে পশ্চাদপর হয় না, সততার জন্য মানুষের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

دم از راستی گرزنی صبح دار   زتاریکی جهل گیری کنار

১. ভোরের মত হাসিমুখ সততায় যার- মূর্খতার অন্ধকারে পাইবে কিনার।

তুমি যদি ভোরের মতো সবাইকে হাসি খুশি ও আনন্দ দান কর, তবে মূর্খতার অন্ধকার হতে কিয়ামতের দিন আলোময় পথের সন্ধান পাবে।

مزندم بجز راستی زینهار   که دارد فضیلت یمین بر بسیار

সততা বিহনে কভু দম নাহি লবে- ডান হাতের ফজিলত বাম নাহি পাবে।

তুমি কখনও সুচিন্তা ও সততা বর্জন করো না, কারণ ডান হাতের সমমর্যাদা বাম হাত কোন দিন পায় না।

به از راستی در جهان کار نیست   که در گلبن راستی خار نیست

সত্য ছাড়া এ জগতে ভাল কাজ নাই- সততার ফুল সাজি কাঁটামুক্ত তাই।

সততার চেয়ে ভাল কাজ এ জগতে আর নাই, এজন্যই সততার ফুল সাজিতে কোন কাঁটা থাকে না।[১৫৫]

৫.৬ মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মাসনবীর অনুবাদ

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সূফী সাধকের অন্যতম মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর আসল নাম মোহাম্মদ। উপাধী জালাল উদ্দীন, পিতার নাম মোহাম্মদ সুলতান বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ। মাওলানার পিতামহের নাম হোসাইন বালখী, দার্শনিক এ মরমী কবি পারস্যের খোরাসান প্রদেশের বালখ শহরে ৬ রবিউল আউয়াল ৬০৪ হিজরী

[১৫৫] মাওলানা আবদুল মান্নান, *ছন্দে বাংলা কারীমা* (ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

মুতাবেক ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫ জমাদিউস সানী ৬৭২ হিজরী মোতাবেক ১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।[১৫৬]

তিনি ৫বছর বয়সে পিতামাতার সাথে হজ্ব পালন করেন। বার বছর বয়সে রুমীর পিতা তাকে নিয়ে ফরীদ উদ্দীন আত্তারের সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে তার পিতার মৃত্যুবরণের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য দামেস্ক গমন করেন। ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা শামস তাবরিযীর সাথে সাক্ষাত লাভ করেন।[১৫৭] ইবনে বতুতার ভাষ্যমতে কর্মজীবনের শুরুতেই রুমী ইসলামের বিধিবিধান বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। মাওলানা রুমীর জীবনে শামস তাবরিযী নব দিগন্তের সূচনা করেন। নিম্নোক্ত পংক্তিটিই তার সাক্ষ্য বহন করে।

مولوی هرگز نه شد مولائی روم
تا غلام شمس تبریزی نه شد[১৫৮]

শামস তাবরিযীর গোলাম না হওয়া পর্যন্ত মৌলভী কখনও রুমের প্রতিভূ হতে পারেনি।

বিশ্ববিখ্যাত *মসনবী* গ্রন্থের লেখক মাওলানা রুমীর সাহিত্য সাধনা নানান উৎকর্ষতায় ভরপুর। কল্পনার মৌলিকতা, বৈচিত্র সম্ভব, পরিমিতিবোধ, পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছতা সাবলীল আকর্ষণ অনুভূতি ও চিন্তার গভীরতা ছিল তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য। ড. যাবীউল্লাহ সাফার মতে তাঁর *মসনবী* গ্রন্থে ২৬০০০ পংক্তি রয়েছে। ড. তাওফীক হা. সুবহানীর মতে ২৬০৩২টি পংক্তি রয়েছে।[১৫৯] নিঃসন্দেহে মাওলানার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও পরিচিতির মূলে রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ *মসনবী* কাব্যগ্রন্থ। এতে সূফী মতবাদ এর সাধনপ্রণালী ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে *রুবাইয়্যাত*, *ফীহে মা ফীহ*, *মাকাতীব*, *মাওয়াযে মাজালিসে খামসা*।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মাসনবীর অনুবাদ গ্রন্থ *মাওলানা রুমীর মসনবী শরীফ* নামক গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন আজহার আলী বকতিয়ারী ও মৌলভী জামী। প্রকাশক মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলকাতা থেকে ১লা আগস্ট ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়।

[১৫৬] ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, ২য় খণ্ড (তেহরানঃ রামীন প্রকাশনী, দশম মুদ্রণ ১৯৯৫), পৃ. ৯৭।
[১৫৭] আব্দুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ২য় সংস্করণ (ঢাকাঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩), পৃ. ৪২।
[১৫৮] মাওলানা আবদুল মজিদ ঢাকুবী (অনু.), *মসনবীয়ে রুমী*, প্রথম খণ্ড (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৪), পৃ. ১০।
[১৫৯] ড. তাওফিক হা. সুবহানী, *তারীখে আদাবিয়্যাত* (তেহরানঃ পায়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, , প্রথম মুদ্রণ ১৯৯০), পৃ. ২৫১-২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

ফয়জুদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর *মাসনবীর* অনূদিত গ্রন্থ *রুমির মসনবী* নামে মো. নুরুল ইসলাম ওসমানিয়া বুক ডিপো থেকে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। রুমির *মসনবীর* ঘটনাবলীকে খলিলুর রহমান গ্রন্থাকারে বাংলায় অনুবাদ করে *মসনবীর গল্প* নামকরণ করেন এবং সায়িকা খানম কর্তৃক অভয় দাস লেন, ঢাকা থেকে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রুমীর *মসনবী*তে উল্লেখিত গল্পগুলো নিয়ে অনূদিত গ্রন্থ *মসনবীর গল্প*-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন আব্দুস সাত্তার। বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মসনবী শরীফের ১ম খণ্ডের বাংলা কাব্যানুবাদ করেছেন আলহাজ মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ। চট্টগ্রাম লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম থেকে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মাসনবীর অনুবাদ গ্রন্থ *মসনবীয়ে রুমী* নামক গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন কাজী আকরম হোসাইন। কাজী ইকামুদ্দিন নিউ মহামায়া প্রেস, কলেজ স্ট্রীট কলকাতা থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করেন। মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মাসনবীর অনুবাদ গ্রন্থ *রুমির মসনবী* নামক গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন ফয়জুদ্দীন ইউসুফ। প্রকাশক মো. নুরুল ইসলাম ওসমানিয়া বুক ডিপো থেকে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে বইটি প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা পূর্বকালে মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক *মসনবী*য়ে রুমী অনূদিত হয়। তৎকালীন ওসমানিয়া বুক ডিপোর মালিক নূরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে 'মাসিক পূবালী'তে ধারাবাহিকভাবে *রুমীর মসনবী* প্রকাশিত হয়।[১৬০] ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তা গ্রন্থাকারে *রুমীর মসনবী* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

মসনবীয়ে রুমী

*মসনবী*য়ে রুমীর মূল ফারসি গ্রন্থের নাম হচ্ছে *মসনবীয়ে মাওলান রুমী*। তাছাওউফ বিষয়ক অতি মূল্যবান এ কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা সূফীকুল শ্রেষ্ঠ, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক কবি আল্লামা জালালুদ্দীন রূমী ।

রুমীর মাসনবীর অনুবাদ গ্রন্থ *মসনবীয়ে রুমী* নামক গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা আব্দুল মজীদ। এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা বইটি প্রকাশ করেছে। বইটির ১ম দফতর চারটি অংশে প্রকাশিত হয়েছে। ১ম ও ২য় অংশ আগস্ট ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩য় অংশ ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং ৪র্থ অংশ ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক *মসনবী* গ্রন্থটি অনুবাদ করতে গিয়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন:

---

[১৬০] আবদুল হাই শিকদার, *মনিরউদ্দীন ইউসুফ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

শরীঅত-মা'রেফতের গূঢ়তত্ত্ব ও গুপ্ত রহস্যের বিস্তারিত বর্ণনায় ছুফীকুল শিরোমণি দার্শনিক কবি মাওলানা রূমী (রঃ) প্রণীত "মসনবী মা'নবী" বিশ্ববিখ্যাত। এই মহাগ্রন্থে বর্ণিত আছেঃ (১) কুরআন ও হাদীসের আভ্যন্তরীণ দিকের বিশদ ব্যাখ্যা, (২) তরীকত, মারেফত ও হাকীকতের গূঢ় রহস্যের বিস্তারিত বর্ণনা, (৩) আল্লাহ্ পাকের এশক-মহব্বত ও আল্লাহ্ পাকের সহিত নিগূঢ় সম্পর্ক দৃঢ় করার সহজ পন্থা, (৪) নফস ও শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা হইতে আত্মরক্ষার উপায়, (৫) আত্মশুদ্ধি ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন করার সহজ পন্থা, (৬) কামেল পীরের সংসর্গে ও সাহচর্যে থাকিয়া আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের প্রতি উৎসাহ এবং ভণ্ডপীরের সাহচর্য এবং অপরিপক্ক মুরশেদের সংস্রব হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ, (৭) চরিত্র সংশোধনের ও আল্লাহ্তে আত্মনিয়োগের সরল ও সহজ পথ, (৮) কিংবদন্তী কাহিনীকে অভিনব ভঙ্গিতে অপরূপ ভাষা-মাধুর্যে মূল্যবান নছীহত-রূপ দান ও (৯) চরিত্র সংশোধক ও আত্মশুদ্ধিকারক অগণিত নছীহত অনুপম অতুলনীয় পদ্ধতিতে সারা বিশ্বের মানব জাতিকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বর হতে উত্তোলনপূর্বক উৎকৃষ্ট ও উন্নত চরিত্রের চরম শিখরে পৌঁছাইয়া ও পরকালের স্থায়ী সুখ-শান্তি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসেল করার উপায় বিজ্ঞান ও দর্শনের যথাযথ যুক্তির মাধ্যমে বর্ণনা।[১৬১]

আবদুল মজীদ অনুবাদ করার ক্ষেত্রে প্রথমে সংক্ষেপে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন অতঃপর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যামূলক আলোচনা তোলে ধরেছেন। তাঁর অনুবাদের কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হলঃ

بشنو از نی چون حکایت میکند
وز جدائیها شکایت میکند[১৬২]

কান পাতিয়া শোন, বাঁশী কি অবস্থা বর্ণনা করিতেছে,
বিরহ-বিচ্ছেদের (কি) অভিযোগ করিতেছে।

এখানে বাঁশী বলিতে মানুষের রূহ উদ্দেশ্য। রূহ উহার মূল সৃষ্টি অনুসারে একটি পবিত্র নূরানী মখলুক। ইহার আসল নিবাস আলমে মালাকুত অর্থাৎ, রূহের জগত। সেখানে সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'য়ালার মহব্বতে ও যেকের-ফেকেরে নিমগ্ন থাকার সৌভাগ্য লাভ করিত। দেহের জগতে আসিয়া, দেহের সহিত যুক্ত হইয়া যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও কুস্বভাব সে লাভ করিয়াছে, রূহের জগতে উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিল। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, দেহের জগতে আসিয়া তাহার মধ্যে নানাবিধ দোষ-ত্রুটি যথা- কাম, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ, রিয়াকারী, গর্ব, কৃপনতা, আমানতে খেয়ানত প্রভৃতি নফ্সানী দোষ-ত্রুটি যুক্ত হইয়াছে। কেননা, ইহা নিম্নজগতের অনিবার্য কুফল এবং ইহাতে সে তাহার রূহের জগতে থাকাকালীন সৌভাগ্যের অর্থাৎ, মহব্বত ও মারেফতের মধ্যে যথেষ্ট হ্রাস উপলব্ধি করিতেছে। ইহা তাহার জন্য বিশেষ ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের অবস্থা। অবশ্য সর্বসাধারণের রূহ ইহা অনুভব করিতে পারে না। তাহার ত দিবারাত্র নিজেদের পার্থিব কাজ-কারবারে মগ্ন থাকায় আশা-ভরসার মত্ততায় উদাসীন রহিয়াছে। কিন্তু যাহাদের অন্তরদৃষ্টি প্রখর এবং যাহাদের নফ্স উপদেশ গ্রহণকারী কিংবা যাহারা চরিত্র সংশোধন ও পবিত্রকরণ বিষয়ক কিতাব পাঠ করিয়া উপদেশ হাসিল করিয়াছে, কিংবা কামেল পীরের শিক্ষা ও তরবিয়ত তাহাদের অন্তর হইতে গাফলতের পরদা অপসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের রূহ উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহারা কেমন উচ্চ স্থান হইতে নামিয়া কিরূপ নিকৃষ্ট ও নীচ স্থানে আসিয়াছে, আর কেমন সৌভাগ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ দুর্ভাগ্যে পতিত হইয়াছে।[১৬৩]

---

[১৬১] মাওলানা আবদুল মজিদ ঢাকুবী (অনু.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. মসনবীর বিষয়বস্তু।
[১৬২] কাজী সাজ্জাদ হোসাইন (অনু.), *মাসনবীয়ে মওলভীয়ে মা'নাবী* (লাহোরঃ ইসলামী কুতুব খানা, তা.বি.), পৃ. ৩৫।
[১৬৩] মাওলানা আবদুল মজিদ ঢাকুবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে মাসনবীর সবচেয়ে পঠিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ হচ্ছে আবদুল মজীদ কর্তৃক অনূদিত *মসনবীয়ে রুমী* নামে প্রকাশিত গ্রন্থটি। তিনি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে প্রথমে *মসনবী*র ফারসি ইবারত তোলে ধরে বাংলা ভাষায় এর উচ্চারণ দিয়েছেন, অতঃপর তিনি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে পাঠক সহজেই এর অর্থ, ভাব ও বিষয় অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে।

মসনবীর কাহিনী

মরমী কবি জালালুদ্দীন রুমীর *মসনবী*তে উল্লেখিত কাহিনী নিয়ে রচিত *মসনবীর কাহিনী* নামক গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন নজরুল হক। ফরিদ উদ্দীন মাসউদ কর্তৃক ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। *মসনবী*র নির্বাচিত বিভিন্ন গল্পের আলোকে নজরুল হক তাঁর গ্রন্থটি সাজিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত গল্পগুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ:

হযরত ওমর ফারুক (রা.) ও রোমক রাষ্ট্রদূত, এক যে ছিল বাদশাহ, ইয়াহুদী রাজার অগ্নিকুণ্ড, ভয়ংকর ওযীর, বেদুঈন দম্পতির কিস্‌সা, এক বৃদ্ধ বীণাবাদকের জীবনালেখ্য, সওদাগর ও তোতাপাখির কাহিনী, সিংহ আর হরিণ দলের কিসসা, তোতা পাখি আর আতর ব্যবসায়ীর কিসসা, একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধের কাহিনী, সূফী ও বাচাল আশ্রম পরিচারক, এক সূফী গাধা চুরির কিসসা, প্যাচার রাজ্যে বন্দি বাজপাখি, বাদশাহ ও দুই ক্রীতদাসের কিস্‌সা, অন্ধের হাতি দেখা, তিনটি উপদেশ বাক্য ও বণিক ও খ্রিষ্টান দরবেশ।[১৬৪]

নজরল হক *মসনবী*র কাহিনী বর্ণনার পূর্বে "দুটি কথা" শিরোনামে *মসনবী* সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে একটি চমৎকার আলোচনা তোলে ধরেছেন। তিনি কবি পরিচিতি শিরোনামে রুমী ও তাঁর আধ্যাত্ববাদ নিয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

মসনবীর গল্প

রুমীর *মসনবী*তে উল্লেখিত গল্পগুলো নিয়ে অনূদিত গ্রন্থ *মসনবীর গল্প*-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন আব্দুস সাত্তার। বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য অনূদিত গ্রন্থে শিশু-কিশোরদের মনে ইসলামী ভাবধারা জাগানোর জন্য *মসনবী* থেকে নির্বাচিত দশটি গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। গল্পগুলোর শিরোনাম হল, জ্ঞানবৃক্ষ, বাজপাখি, প্রভূভক্ত লোকমান, চোরের পুরস্কার, ধনী-গরীবের কথা, শিয়াল শিয়ালই ময়ূর নয়, অন্ধ ভিক্ষুক, বাঁকা মন বাঁকা মানুষ, উপহার, বধির ইত্যাদি। *মসনবীর গল্প* নামক গ্রন্থ সম্পর্কে আবদুস সাত্তার বলেন:

---

[১৬৪] নজরুল হক, *মসনবীর কাহিনী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০), পৃ. সূচীপত্র এগার।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ও সুফী সাধক মওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মসনবী শরীফের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সেই মসনবী শরীফ থেকে বাছাই করে দশটি গল্প শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে এই মসনবীর গল্পতে পেশ করা হলো। শিশু-কিশোরদের মনে ইসলামী ভাবধারা জাগানোর জন্য গল্পগুলোর ভুমিকা বিশেষ কার্যকরী। আশা করি, শিশু-কিশোররা এতে মনের খোরাক পাবে।[১৬৫]

মাওলানা রুমীর মাছনবী শরীফ

শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক রুমীর মাসনবীর ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ করেন এবং তা *মাওলানা রুমীর মাছনবী শরীফ* শিরোনামে রশিদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি তবে তৃতীয় খণ্ডের শেষে অনুবাদকের একটি স্বাক্ষর থেকে বুঝা যায় গ্রন্থটি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিন খণ্ডে প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থটির সূচনায় তিনি *মসনবী শরীফের পরিচিতি* শিরোনামে *মেফতাহুল উলম শরহে মাসনবী* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মাসনবীর পরিচয় তোলে ধরেছেন।[১৬৬] মাওলানা আজিজুল হক উর্দু ভাষায় রচিত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর *কেলীদে মাসনবী*র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ স্বীয় অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন।[১৬৭] তিনি অনুবাদ সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য অনূদিত মাসনবী গ্রন্থে অনুবাদের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করেছেন। মাওলানা আজিজুল হক কর্তৃক অনূদিত মাছনবী শরীফ থেকে বাদশাহ ও দাসীর অনূদিত গল্পের কিয়দাংশ নিম্নে উপস্থাপিত হল:

বাদশাহ ও দাসীর গল্প

বুদ শাহে দার যমানে পেশাযী–মুলক দুনিয়া বুদাশ ও হাম মুলক দী

بود شاهی در زمانی پیش از این   ملک دنیا بودش وهم ملک دین

পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিলেন; দুনিয়ার রাজত্বও তাহার ছিল এবং দ্বীন–ধর্মের রাজত্বও তাহার ছিল–অর্থাৎ নেককার বাদশাহ ছিলেন। যেরূপ মানবদেহ-রাজ্যে বাদশাহ হইল রূহ-মানবাত্মা যাহা সৃষ্টিগতভাবে নেক পথের প্রতি আকৃষ্ট করে, যদি না তাহাকে নফছের আসক্ত গোলাম বানানো হয়।

اتفاقا شاه روزی شد سوار   با خواص خویش از بهر شکار

এত্তেফাক্বান শাহ রূযে শুদ ছওয়ার–বা খাওয়াছে খেশ আয বহরে শেকার

একদা তিনি নিজ পরিষদবর্গ সহ শিকার করিতে যাত্রা করিলেন।

یک کنیزک دید او بر شاه راه   شد غلام آن کنیزک جان شاه

এক কানীযক দীদ উ বর শাহেরাহ–শুদ গোলামে আঁ কানীযক জানে শাহ্

---

[১৬৫] আবদুস সাত্তার, *মসনবীর গল্প* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০), পৃ. ভূমিকা।
[১৬৬] শাইখুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক, *মাওলানা রুমীর মাছনবী শরীফ*, পৃ. ১-২।
[১৬৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ রাস্তার উপর এক সুন্দরী ক্রীতদাসী দেখিতে পাইলেন; তাহার প্রাণ ঐ সুন্দরীর প্রেমে তাহার গোলাম হইয়া গেল।

چون خرید او را و بر خور دار شد   آن کنیزک از قضا بیمار شد.

চুঁ খরীদ উ রাও বরখোরদার শুদ–আঁ কানীযক আয কাজা বীমার শুদ

বাদশাহ ঐ দাসীকে ক্রয় করিয়া নিজ মহলে নিয়া আসিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু আল্লাহর হুকুম–দাসী রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল।[১৬৮]

শাইখুল হাদীস মসনবীর অনুবাদ পরবর্তী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুরআন ও হাদীসের উপস্থাপন করেছেন যার ফলে তাঁর অনুবাদের মান অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এমনই একটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

শয়তান হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর রহমত প্রয়োজন, যাহা আল্লাহ প্রেমে লাভ হয়:

من چگونه هوش دارم پیش و پس   چون نباشد نور یارم هم نفس

মান্ চেগুনাহ হুশ দারাম্ পেশ ও পছ–চুঁ না বাশাদ নূর ইয়্যারম্ হাম নফছ

আমার প্রেমাস্পদ আল্লাহ তায়ালার দেওয়া নূর যদি আমার সঙ্গে না থাকে তবে আগ-পাছের (বিপদ-আপদের) খবর আমার থাকিবে কিরূপে? শয়তান ত প্রথম দিন হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

لا تِيَنَّهُم مِن بَينِ اَيدِيهِم وَمِن خَلفِهِم وَ عَن اَيمانِهِم وَ عَن شِمَالِهِم

আমি মানুষকে বিপদগামী করার জন্য তাহাদের সম্মুখ, পিছনে, ডান এবং বামদিক–তথা চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করিয়া আসিব। শয়তানের পণ ও প্রতিজ্ঞা এই, তদুপরি মানুষের অভ্যন্ত রেই শয়তানের দোসর রহিয়াছে "নফছ–প্রবৃত্তি"। নফছ ও শয়তানের ধোকা হইতে বাঁচার জন্য আল্লাহর রহমত ও নূরের প্রয়োজন; উহা এশ্‌ক বা আল্লাহ-প্রেমে লাভ হয় অধিক।

نور او دریمن یسر و تحت و فو ق   بر سر وبر کردنم مانند طوق.

নূরে উ দারয়্যমনু য়্যছরু তাহ্‌ত ও ফাওক–বর ছের ও বর গর্দানাম মানেন্দ তৌক

আল্লাহর নূর আমার ডানে, বামে, নীচে, উপরে এবং মাথায় ও মালার ন্যায় আমার গলায় (থাকা বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা আমি নফছ ও শয়তানের দাগা হইতে রক্ষা পাইব না। ইহার জন্য আল্লাহ প্রেমিক হইয়া আল্লাহর নিকট এই নূর ভিক্ষা চাইতে হইবে-দোয়া করিতে হইবে) বিভিন্ন হাদীছে সেই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহার সমষ্টি এই–

[১৬৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

اللهم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً و فی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن شمالی نوراً وخلفی نوراً ومن امامی نوراً واجعل لی نوراً وفی عصبی نوراً و فی لحمی نوراً وفی دمی نوراً وفی شعری نوراً وفی بشری نوراً وفی لسانی نوراً واجعل فی نفاسی نوراً واعظم لی نوراً واجعلنی نوراً واجعل فی فوقی نوراً ومن تحتی نوراً اللهم تعطنی نوراً

হে আল্লাহ ! আমার দিলে নূর দান কর, আমার চোখে নূর দান কর, আমার কর্ণে নূর দান কর, আমার ডানে নূর দান কর, আমার বামে নূর দান কর, আমার পেছনে নূর দান কর, আমার সম্মুখে নূর দান কর, আমাকে (রক্ষা করার জন্য) নূর দান কর, আমার শিরায় শিরায়- স্নায়ুতে নূর দান কর, আমার মাংসে, আমার রক্তে নূর দান কর, আমার লোমে লোমে নূর দান কর, আমার চামড়ায় নূর দান কর, আমার জিহবায় নূর দান কর, আমার ভিতরে নূর দান কর, আমাকে বড় নূর দান কর, আপাদমস্তক আমাকে নূর বানাইয়া দাও, আমার উপরে নূর দান কর, আমার নীচে নূর দান কর, আয় আল্লাহ আমাকে নূরই নূর দান কর।[১৬৯]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শাইখুল হাদীসকৃত মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর *মসনবী*র অনুবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে আলোচ্য অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে।

৫.৭ মহাকবি হাফিজের কাব্যের অনুবাদ

গযল গীতিকাব্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হাফিজ শিরাজী, তাঁর পুরোনাম খাজা শামসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজ শিরাজী। আসল নাম মুহম্মদ। শামসুদ্দীন তার উপাধি এবং হাফিজ তাঁর উপনাম। ইরানের শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে শিরাজী বলা হয়।[১৭০] তবে বিখ্যাত গযল কাব্যের রচয়িতা হিসাবে তাঁর স্বদেশবাসী আরো দু'টি সম্মান সূচক উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেছেন। *লিসানুল গায়েব* (অদৃশ্যেও মুখপাত্র) এবং *তরজমানুল আসরার* (রহস্যের মর্মসন্ধানী)।[১৭১] তিনি ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৭২] বাল্যকালে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্ত করে 'গৌরবের হাফিজ' উপাধি অর্জন করেন। ইরানের আধুনিক লেখক *ফারুযে আনফার* লিখেন যে হাফিজ চল্লিশ বছর যাবত জ্ঞানার্জন করেন।[১৭৩]

---

[১৬৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬।

[১৭০] মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদবনামেয়ে ইরান* (লাহোর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, তা.বি.), পৃ. ৫৫৫।

[১৭১] ড. তৌফিক হা. সোবহানী, *তারীখে আদাবিয়্যাত*, খণ্ড ২, ৭ম সং. (তেহরান: দানেশগাহে পায়ামে নূর, ১৩৭৫ ইরানী সাল), পৃ. ৩৫৬।

[১৭২] ড. রেজা যাদেহ শাফাক, *তারীখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: চাপ খানে আরমান, ১৩৬৯ ইরানী সাল), পৃ ৩০৭; ড. জাফার ইয়াহকী, *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, ১ম ও ২য় খণ্ড (তেহরান: ওয়াযারাতে অমুযাশে ইরান কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৭ ইরানী সাল), পৃ. ১৯৮; A. J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London: Geprge Allen and Unwin Ltd., 1958), p. 330.

[১৭৩] বদীউজ্জামান ফোরূযানফার, *তারীখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: ওয়াযারাতে আমুযাশে ইরান কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৮৩ ইরানী সাল), পৃ. ৪৮১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের সময়কালে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) হাফিজ শিরাজীকে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে তিনি আসতে পারেন নি। কিন্তু একটি গযল উপহার স্বরূপ সুলতান কে পাঠিয়ে ছিলেন। হাফিজের কাব্য প্রতিভার একমাত্র নিদর্শন *দীওয়ান* (কাব্য সমগ্র) যা *গযল, কাসীদা, রুবাঈ* ও *মসনবীর* সমাহার। মহাকবি হাফিজ এর দীওয়ানে ৬৯৩ টি কবিতা রয়েছে। তন্মধ্যে গযল ৫৭৩, ক্বেতআ ৪২, রুবাঈ ৬৯, মাসনবী ৬, ক্বাসীদা ২ এবং মুখাম্মাস ১ টি।[১৭৪]

হাফিজ *গযল* বা গীতিকাব্যকে তাঁর প্রতিভা প্রকাশের মূখ্য মাধ্যম হিসাবে চয়ন করেছিলেন, কারণ তাঁর এ আস্থাবোধ ছিল যে, কাব্যের এ ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। আর তাই গযল তাঁর হাতে উৎকর্ষতা লাভ করেছে। সুক্ষ্ম ও গভীর ভাব ধারাকে সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ, রাসূল, পীর, মুর্শিদ, আধ্যাত্মিক প্রেম, কুরআনের প্রতিফলন তাঁর কাব্যের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

হাফিজের ৬৫টি রুবাঈ নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *রুবাঈয়্যাতে হাফিজ*-এর অনুবাদ করেছেন অজয় কুমার ভট্টাচার্য। তিনি নিজেই প্রকাশক হিসেবে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে বইটি প্রকাশ করেন।

মহাকবি হাফিজ শিরাজীর রুবাঈ নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *রুবাইয়াত ই হাফিজ* শিরোনামে অনুবাদ করেছেন কান্তি চন্দ্র ঘোষ যা শরৎচন্দ্র মুখার্জী কর্তৃক কলকাতা হতে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আটত্রিশ পৃষ্ঠার বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। হাফিজ শিরাজীর দীওয়ান নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ '*দেওয়ানে হাফেজ*'-এর অনুবাদ করেছেন নরেন্দ্র দে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা থেকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মহাকবি হাফিজ শিরাজীর রুবাঈ নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *রুবাইয়্যাতে হাফিজ*-এর অনুবাদ করেছেন আজিজুল হাকিম। ইস্টার্ণ বুক সেন্টার, ঢাকা থেকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

ফজলে রহমান কর্তৃক হাফিজ শিরাজীর দেওয়ানের অনূদিত গ্রন্থ *প্রলাপ* মুন্সী মুহাম্মদ এলাহী বখ্শ সরকার কর্তৃক কালিপুর, রাজশাহী থেকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। মহাকবি হাফিজ শিরাজীর *দিওয়ান* নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *দিওয়ান ই হাফিজ*-এর অনুবাদ করেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এর প্রথম সংস্করণ এবং মুহাম্মদ জাকিউল্লাহ কর্তৃক রেঁনেসা প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

---

[১৭৪] শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজী, *দীওয়ানে গাযালিয়্যাতে হাফিজ শিরাজী*, ড. খলীল খতীব রাহবার (সম্পা.) (তেহরানঃ এন্তেশারাতে সফী আলী শাহ, ১৩৭৯ ইরানী সাল), পৃ. মুক্বাদ্দমাহ।

Dhaka University Institutional Repository

মহাকবি হাফিজ শিরাজীর দীওয়ান নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *দীওয়ান ই হাফিজ*-এর অনুবাদ করেছেন কাজী আকরম হোসেন। আযাদ জাহান কর্তৃক আযাদ প্রকাশনী ঢাকা থেকে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন কর্তৃক হাফিজের ৭৯টি গযল অনূদিত হয়ে *ইরানের কবি* শিরোনামে বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

মহাকবি হাফিজ শিরাজীর ৭৩টি রুবাঈ নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *রুবাইয়্যাতে হাফিজ* নামে অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রকাশক গোলাম দাস মজুমদার ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে কলকাতা হতে বইটি প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে অনূদিত হাফিজের সাহিত্যকর্ম নিয়ে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

হাফিজের গজলগুচ্ছ

ইরানের মহাকবি হাফিজের রচিত গজলের অনূদিত গ্রন্থ *হাফিজের গজলগুচ্ছ* এর অনুবাদ করেছেন আবদুল হাফিজ। এটি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে অনুবাদক ষোল পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। *হাফিজের গজলগুচ্ছে* হাফিজের একশতটি অনূদিত গযল স্থান পেয়েছে। আবদুল হাফিজ কর্তৃক অনূদিত গজলের নমুনা নিম্নরূপ:

الا یا آیّها الساقی ادر کاسا و ناولها   که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها
ببوی نافهٔ کآخر صبا زان طرّه بگشاید   زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم   جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها
بمی سجّاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید   که سالك بیخبر نبود زراه و رسم منزلها
شب تاریك وبیم موج و گردابی چنین هایل   کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
همه کارم زخود کامی ببدنامی کشید ا آخر   نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها
حضوری گر همی خواهی از و غایب مشو حافظ   متی ما تلق من تهوی دع الدّنیا وآهملها[১৭৫]

হায় বধুয়া! দাও পেয়ালা ঢালো শারাব মধুক্ষরা
সহজ ছিল পথটি প্রেমের দেখছি এখন কাটা-ভরা।
ভেবেছিলাম ভোর বাতাসে কস্তরী-বাস আসবে ভেসে
বধুর চিকণ চিকুর হতে; কলজা হলো ঘায়েল শেষে।
শারাব-রঙে রাঙা রে তুই মসল্লা তোর, হুকুম পেলে
সাচ্চা পীরের; পথিক জানে সরাইখানা কোথায় মেলে।

---

[১৭৫] ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রেযা জালালী নায়িনী (সম্পা.), *দীওয়ানে হাফিজ শিরাজী* (তেহরান: আন্‌জুমানে খোশ নাভেস্তানে ইরান, ১৩৭৫ ইরানী সাল), পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

হায়রে কপাল! কুঞ্জে প্রিয়ার কেবল দুঃখ-শঙ্কা রাজে,
তলপী বাধো গাফেল পথিক! দিবা-রাত্রি ডঙ্কা বাজে।
রাত্রি আধার ঝড়ো হাওয়া, সাগর বুকে উর্মি নাচে,
আমার দুঃখ বুঝবে কিগো পারো যেজন সুখে আছে!
স্বার্থ দিয়ে রাখুন ডেকে আমার যত কাজের বোজা'
রহস্য তার সবাই জানে; গোপন রাখা নয়কো সোজা।
যদি রে তুই চাস প্রিয়ারে ওরে হাফিজ, বুকের কাছে
ছেড়ে আয় তুই দুনিয়াদারী, ফেলে আয় তোর যে-ধন আছে।[১৭৬]

হাফিজের কবিতা

ইরানের মহাকবি হাফিজের রচিত ফারসি কাব্যের অনূদিত গ্রন্থ *হাফিজের কবিতার* বাংলা অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অনূদিত গ্রন্থটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির সর্বশেষ চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থে হাফিজের কবিতা অনুবাদের পূর্বে 'অনুবাদ প্রসঙ্গে' শিরোনামে হাফিজ ও তাঁর কবিতার উপর তথ্যবহুল চমৎকার একটি আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। পাঠককে মূলের তথা ফারসির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি অনুবাদ শেষে গ্রন্থের ১০৯-১৮৬ পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে ফারসি গজলের বাংলা উচ্চারণও তোলে ধরেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত গজলের নমুনা নিম্নরূপ:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا — بخال هندویش بخشم سمر قند و بخارا را
ده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی — کنار آب رکناباد و گلگشت مصلّا را
فغان کاین لولیان شوخشیرین کار شهر آشو — چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است — بآب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم — که عشق از پردهٔ عصمت برون آرد زلیخا
اگر دشنام فرمای وگر نفرین دعا گویم — جواب تلخ میزیبد لب لعل شکر خارا
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند — جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو — که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّارا
غزل گفتی و در سفتی بیاد خوش بخوان حافظ — که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریّارا[১৭৭].

[১৭৬] আবদুল হাফিজ, *হাফিজের গজলগুচ্ছ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১৭।
[১৭৭] ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ রেযা জালালী নায়িনী (সম্পা.), *দীওয়ানে হাফিজ শিরাজী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্গে যা নেই

গালে-কালো-তিল সেই সুন্দরী
বোখারা তো ছার, সমরখন্দও
খুশী হয়ে তাকে দিব উপহার।

স্বর্গে যা নেই, আমি যেন পাই
হে সাকী, বানাও এমন বিধান,
রুকনা বাদের নদীর কিনার,
মুসল্লার সে ফুলের বাগান।

খণ্ডিত এই প্রেম দিয়ে আমি
পারি না বাধতে সে অপরুপাকে;
রং তিল চুল-কিছুই কিছুনা
যদি লাবণ্য চোখেমুখে থাকে।

দিনে দিনে ইউসুফের যে রূপ
বাড়ছে চন্দ্রকলার সমান
সতীস্বাধীর পর্দা সরিয়ে
জুলেখাকে দেবে সকলে সে টান।

গানে আর মদে জমাও আড্ডা
ভবরহস্য হাতড়ে কী লাভ?
বুদ্ধির পথে চল্লে কখনও
পাবেনা কেও এ ধাঁধার জবাব।

কান দাও, প্রিয়া, আমার কথায়:
ঘা দিয়ে যতই শিখাক জীবন,
নওজোয়ানেরা জানে, তার চেয়ে
ঢের বেশী দামী প্রাজ্ঞবচন।

আকথা-কুকথা বলেছ অনেক
তবু কোন ক্ষোভ রাখিনি কো প্রাণে;
তুমি ঠিকই বলো:বিম্বাধরের
কটু কথাটাও মিঠে লাগে কানে।

বানিয়েছ তুমি এমন গজল
কথা দিয়ে গাঁথা মুক্তোর হার,
হাফিজ, তোমার ছত্রে ছত্রে
যেন ঝিকি মিকি তারার বাহার ॥[১৭৮]

---

[১৭৮] সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *হাফিজের কবিতা*, ১ম সং. (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী *ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী* নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে বিভিন্ন শিরোনামে লেখক মহাকবি হাফিজ শিরাজীকে মূল্যায়নের চেষ্ঠা করেছেন। গ্রন্থে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য শিরোনাম হল নিম্নরূপ:

বিরহের রজনী, শিরাজের পথে আকাশের বুকে, শিরাজের মাটিতে, শেখ সা'দীর মাজারে, হাফেজ ও বাবাকুহী, বুলবুলিদের গুলবাগিচায়, প্রেমের সম্মেলন, কম্পিউটারে ভাগ্যলিপি, বাংলার প্রতি হাফেজের উপঢৌকন, বাংলা সাহিত্যে হাফেজ, তৈইমুর লং ও খাজা হাফেজ ইত্যাদি। গ্রন্থের শেষে তিনি কয়েকটি গযল ফারসি উচ্চারণসহ চমৎকার বঙ্গানুবাদ করেছেন। মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীকৃত অনুবাদের নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را — به خال هندوی‌ش بخشم سمرقند و بخارا ر
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت — کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را
فغان کای‌ن لولیان شوخ شیری‌ن کار شهرآشوب — چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است — به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روزافزون که ی‌وسف داشت دانستم — که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم — جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند — جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو — که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ — که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را[১৭৯]

১। শিরাজের সেই প্রেমিক যদি আমার হৃদয় জয় করে নেয়, তাহলে তার কালো তিলের বিনিময়ে বুখারা ও সামারকন্দ বিলিয়ে দেব।

২। হে সাকী! অবশিষ্ট সুরাটুকু আমাকে পান করতে দাও। কেননা, রোকনাবাদের স্রোতস্বতীর তীর ও পুষ্পাস্তীর্ণ মুছল্লা (ইদগাহ)–র মত স্বচ্ছ সবুজ মনোলোভা পরিবেশ বেহেশতেও পাবেনা। প্রেমের সুরা প্রান করার এটিইতো উপযুক্ত স্থান।

৩। আমাকে সাহায্য করো হে জনতা। শহর পাগলকারী উদ্ধত, সুন্দর প্রেমিক দলের উৎপাতে আমি তো অস্থির। এরা আমার হৃদয়ের ধৈর্য্য এমনভাবে কেড়ে নিল, যেন ক্ষুর্ধাত ভিক্ষুকের দল যেয়াফতের সাজানো খাবার হরিলুট করল।

৪। প্রেমাস্পদেও অপূর্ব রূপ আমাদেও ভালবাসার মুখাপেক্ষী নয়। সুন্দও মুখের জন্য কি কসমেটিক, তিল ও সিন্দুরের দরকার হয়?

---

[১৭৯] ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রেযা জালালী নায়িনী (সম্পা.), *দীওয়ানে হাফিজ শিরাজী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫। ইউসুফের রূপের যে ঐশ্বর্য্য, তাতে আমি পূর্ব থেকে জানতাম যে, প্রেম যুলাইখাকে সতীত্বের পর্দা থেকে টেনে আনবে।

৬। আমাকে গালি দাও বা তিরস্কার করো, আমি তাতে অসন্তুষ্ট নই। বিনিময়ে তোমাকে দোয়া করে যাব। কেননা শিরিণ ঠোঁটে তিক্ত জবাব বড়ই শোভাপায়।

৭। হে প্রিয়তম, উপদেশ শোন! কেননা, ভাগ্যবান তরুণরা বৃদ্ধ জ্ঞানীর উপদেশবাণীকে প্রাণের চাইতে বেশী ভালবাসে।

৮। গায়ক ও সুরার কথাই এখন আলোচনা কর। পৃথিবীর তত্ত্ব রহস্য নিয়ে মাথা গামিও না। কারণ, এ পর্যন্ত দর্শন হেকমত দিয়ে কেউ এই রহস্যের জট খুলতে পারে নি। প্রেমই এই রহস্য ভাণ্ডারের চাবি।

৯। হাফেজ! তুমি গজল রচনা করেছ, মুক্তামালা গেঁথেছ অনেক। এবার আনন্দে গাইতে থাক। দ্যাখো! তোমার গজল শুনে আকাশ স্প্তর্ষিমণ্ডলের হার বর্ষণ করছে।[১৮০]

আলোচ্য অনুবাদের মূল্যায়নে বলা যায় যে, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কৃত হাফিজের গজলের অনুবাদটি মূলানুগ হয়েছে।

রুবাইয়্যাতে হাফেজ

মহাকবি হাফিজ শিরাজীর রুবাঈ নিয়ে রচিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ *রুবাইয়্যাতে হাফেজ*-এর অনুবাদ করেছেন আব্দুল হাফিজ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতা পূর্ব-পরবর্তীকালে অনূদিত হাফিজের সাহিত্যকর্মের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম ও কাজী আকরম হোসেন সর্বাধিক পরিচিত। তাঁদের অনুবাদ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.৮ আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের সাহিত্যকর্মের অনুবাদ

সাহিত্য জগত থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে সফল বিচরণকারী আল্লামা ইকবালের নাম সুপরিচিত। বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইকবাল ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য যেভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে তা সত্যিকার অর্থেই একজন পাঠককে ইসলামী চেতনা, আদর্শ ও সংগ্রামে উজ্জীবিত করে তোলে। তাঁর চিন্তা ও দর্শন বাস্তবধর্মী ছিল বলেই তিনি তাঁর কবিতায় জীবন বিবর্জিত সৌন্দর্যে মানুষকে উৎসাহিত করেন

[১৮০] মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, *ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী* (ঢাকাঃ ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

নি। আল্লামা ইকবাল জগত ও জীবনের রহস্য সন্ধান করতেন মানুষের কল্যাণে একটি শুদ্ধ জীবন নীতি উদ্ভাবন করতে সচেষ্ট ছিলেন। আর সে কারণেই তাঁর অমূল্য চিন্তাধারা গোটা মুসলিম জাহানের চিন্তার রাজ্যে এনে দিয়েছে এক বিপ্লবাত্মক ও কল্যাণময় পরিবর্তন।

আল্লামা ইকবালের জন্ম তারিখ নিয়ে কিছুটা মতপার্তক্য রয়েছে তবে সর্বসম্মত মতানুযায়ী তিনি ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ৯ নভেম্বর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮১] তাঁর পিতার নাম শেখ নূর মুহাম্মদ ও মাতার নাম ইমাম বিবি। ইকবালের পিতা-মাতা উভয়ই ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক।[১৮২] ইকবালের শৈশব-শিক্ষা সনাতন পদ্ধতিতে পারিবারিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় মক্তবেই শুরু হয়। ইকবাল ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে স্কচ মিশন স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৮৮৮, ১৮৯১ ও ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রবেশিকা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে স্কচ মিশন কলেজ থেকে এফ এ পাশ করেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লাহোর কলেজ থেকে বি এ পাশ এবং ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আল্লামা ইকবাল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ পাশ করেন।[১৮৩] ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ গমন করেন। ইউরোপ তথা বৃটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ড. জন ম্যাকটেগার্ট, ই. জি. ব্রাউন, ড. নিকলসন, উইলিয়াম জেমস-এর সান্নিধ্য লাভ করে নানাবিধ জ্ঞানার্জন করেন। কর্মজীবনে ইকবাল অধ্যাপনা ও আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।[১৮৪] আল্লামা ইকবালকে বিশ্বের মহান কবি ও দার্শনিকদের অন্যতম হিসাবে বিবেচনা করার মূল কারণ তাঁর কাব্যচর্চা ও দর্শন। মহাকবি আল্লামা ইকবাল ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল লাহোর জাভীদ মঞ্জিলে পরলোক গমন করেন।[১৮৫]

আল্লামা ইকবালের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে *ইলমুল ইকতেসাদ*, *আসরারে খুদী*, *রোমুযে বিখুদী*, *পায়ামে মাশরেক*, *বাঙ্গে দারা*, *যাবুরে আজাম*, *জাভীদ নামে*, *বালে জিবরীল*, *যারবে কালীম*, *মুসাফির*, *পাস চে বাইয়াদ কারদ এই আকওয়ামে শারক?* *আরমুগানে হিজায* ইত্যাদি।[১৮৬] আল্লামা ইকবালের মাতৃভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফারসি ভাষায় কাব্য চর্চা করতে সাচ্ছন্দবোধ করতেন এবং তিনি ফারসি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

---

[১৮১] অধ্যাপক সিরাজুল হক, *আল্লামা ইকবালের জীবন ও কর্ম*, সংখ্যা নভেম্বর (ঢাকা: মাসিক নিউজ লেটার, ১৯৯৭), পৃ. ১।
[১৮২] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইকবাল* (ঢাকা: রেনেসাস প্রিন্টার্স, ১৯৫৮), পৃ. ৫।
[১৮৩] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইকবাল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
[১৮৪] অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসূল, *ইকবাল প্রতিভা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ঙ।
[১৮৫] মাওলানা আবদুস সালাম নদভী, *ইকবালে কামেল* (লাহোর: আযমগড় প্রেস, ১৯৯১), পৃ. ৪২।
[১৮৬] আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল, *রুমূয-ই-বেখুদী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৫৫), পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল নিজেই বলেছেন:

আমি শুধু ভারতের জন্য নয়, বরং সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য কবিতা রচনা করছি। ফারসি ছাড়া এমন অন্য কোন ভাষা নেই, যাতে অন্যান্য দেশের মুসলমানদের কাছে আমার ভাবধারা পৌঁছানো যায়।[১৮৭]

ফারসি ভাষার মাধ্যমে দার্শনিক ভাবধারা সহজভাবে প্রকাশ করা যায় বিধায় ইকবাল তাঁর লেখার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ফারসি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এ বিষয়ে সাইয়্যেদ মুযাফফর হোসাইন বারনির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

اقبال زبان فارسی را برای بیان افکار وآرای سیاسی خود برگیزد، زیرا مثنوی در شعر فارسی از ماهوی دارای خصوصیتی است که به شیوه روشنی می تواند عقاید فلسفی و سیاسی را تبیین کند[১৮৮]:

ইকবাল তাঁর দর্শন ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরার জন্য ফারসি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। কেননা মাসনবী নামে এমন এক বৈশিষ্ট্যের কবিতা ফারসি কাব্যে বিদ্যমান রয়েছে যার মাধ্যমে আকাইদ-ধর্ম-বিশ্বাস-দর্শন ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে পরিস্কারভাবে প্রকাশ করা যায়।

এ বিষয়ে ইকবাল তাঁর আসরারে খুদী কাব্যগ্রন্থে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন:

گرچه هندی در عذوبت شکر است
طرز گفتار در ی شیرین تر است
پارسی از رفعت اندیشه ام
در خورد با فطرت اندیشه ام[১৮৯]

যদিও হিন্দী ভাষা চিনির মতই সুমিষ্ট
কিন্তু ফারসি (দারী)[১৯০] ভাষার বাচনভঙ্গী তার চেয়েও অধিক মিষ্টি।

---

[১৮৭] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ইকবাল ও নজরুল কাব্যে ভাবধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ১৬।

[১৮৮] সাইয়্যেদ মুযাফফর হোসাইন বারানী, *নাকশে ইকবাল দার আদাবে ফারসি-হিন্দী* (ইরান: ইসলামিক গাইডেন্স মিনিস্টারী, ১৩৬৪ ইরানী সাল), পৃ. ৩৫।

[১৮৯] ড. মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে আশআরে ফারসিয়ে ইকবাল* (তেহরান: কিতাব খানেয়ে সানায়ী, ১৯৬৪), পৃ. ৬৮।

[১৯০] **ফারসি দারী:** দার শব্দ থেকে দারী শব্দের উৎপত্তি। দার শব্দটি দরবারের সাথে সম্পৃক্তার কারণে বাদশাহদের দরবারে প্রচলিত ভাষাকে দারী ভাষা বলা হয়ে থাকে। সাসানী বাদশাহদের রাজধানী ছিল মাদায়েন, সামানী যুগে মাদায়েনে প্রচলিত ভাষা কে দারী ভাষা বলা হত। আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে পূর্ব ইরানে অর্থাৎ খোরাসান এবং মাউয়ারাউন্নাহার (উজবেকিস্তান) এলাকার শাসকগণ যে ভাষা ব্যবহার করতেন এবং সে যুগে পাহলভীয়ে আশকানী ও আরবী শব্দের সংমিশ্রণে যে নতুন ভাষা অস্তিত্ব লাভ করে সে ভাষাকে দারী ভাষা বলা হয়। রোদাকী কর্তৃক কাব্যাকারে অনু. *কালিলাহ ওয়া দামনেহ* গ্রন্থের অনুবাদের ভাষাও ফারসিয়ে দারী ভাষা নামে পরিচিত। তৎকালীন কবি সাহিত্যিকগণ এ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। এ ভাষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইরানের খ্যাতনামা কবি রোদাকী, দাকীকী ও ফেরদৌসী প্রমুখ কবিগণ নিজ নিজ কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। বর্তমানে আফগানিস্তানে প্রচলিত ভাষাকে ফারসিয়ে দারী বলা হয়। [দ্র. *আদাব নামেয়ে ইরান*, পৃ. ৭৭-৮০।]

Dhaka University Institutional Repository

আমার উচুঁ চিন্তা-চেতনার বাহন হলো এ ফারসি
কারণ এ ভাষা আমার স্বভাবজাত চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলা ভাষায় ইকবালের কবিতা অনুবাদের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের কবিতার অনুবাদই এ দেশে ব্যাপকহারে হয়েছে। কেননা তাঁর কবিতার শিল্পগুণে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। মুসলমানগণ যখন জাতীয় জীবনে ইসলামকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা পোষণ করেছে তখনই তারা ইকবালের কবিতায় তাদের মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে। *শেকওয়া* ও *জওয়াবে শেকওয়া* সে কারণেই অনূদিত হয়েছে। দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ *আসরারে খুদী* ও *রুমূযে বে খুদীর* বিষয়বস্তু অনেককে আকৃষ্ট করেছিল।

পাকিস্তান পূর্বকালে এর সূচনা হয় এবং পাকিস্তান আমলেও তা অব্যাহত ছিল। সূচনাকালে অনুবাদ সীমিত আকারে প্রধান কয়েকটি কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে অনুবাদের মাঝে ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় ফররুখ আহমদ ও আবুল হোসেন কর্তৃক *আসরারে খুদী* থেকে অনূদিত *ইকবালের কবিতা* শিরোনামে অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সহকারে আবুল ফারাহ মুহাম্মদ আবদুল হক কর্তৃক *রুমূযে বে খুদীর* প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ইকবালের দার্শনিক তত্ত্ব-সম্বলিত ফারসি কাব্য *আসরারে খুদীর* বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেছেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। তমদ্দুন পাবলিকেশন্স, লালবাগ রোড, ঢাকা থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গোলাম মোস্তফা কর্তৃক অনূদিত ইকবালের কবিতা *কালামে ইকবাল* শিরোনামে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে *রুমূয-ই-বেখুদী, আসরার-ই-খুদী, জাবিদনামা* ও *পায়াম-ই-মাশরিক* ছাড়াও উর্দু কাব্যগ্রন্থ *বাঙ্গ-ই-দারা* ও *জরব-ই-কলীম* এর কবিতা স্থান পেয়েছে। [১৯১]

উল্লেখ্য যে, মহাকবি আল্লামা ইকবালের চারটি কাব্যগ্রন্থের একত্রিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ হচ্ছে *ইকবালের কাব্য-সঞ্চয়ন*। এর অনুবাদক মনির উদ্দীন ইউসুফ। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে কার্তিক ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনূদিত চারটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *বাঙ্গ-ই-দরা, বাল-ই-জিব্রীল, জর্‌ব্-ই-কলীম* ও *আরমুগান-ই-হিজাজ*।

---

[১৯১] সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩) পৃ. ৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে সমকালীন কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা ইকবাল চর্চা তথা ইকবালের কবিতা অনুবাদে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলা ইকবালের কাব্য অনুবাদ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে তা থমকে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে ইকবালের কবিতা অনুবাদের ধারা সীমিত আকারে অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত *ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থটিই উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে প্রায় পৌনে দুশো কবিতার অনুবাদ নিয়ে ৪৪জন বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলিম অনুবাদকের অনুবাদ সংকলন করেছেন।[১৯২] তিনি এ গ্রন্থে ইকবালের উর্দু ও ফারসি কবিতা যা বিভিন্ন লেখক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, মূলতঃ সেগুলো সংকলন করেছেন। ইকবালের উর্দু কাব্যগ্রন্থ *বাঙ্গ-ই-দরা, বাল-ই-জিব্রীল, জরব্-ই-কলীম* ও *আরমুগান-ই-হিজাজ, শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া* গ্রন্থের অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত উর্দু কবিতার অনুবাদকদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোলাম মোস্তফা, আবুল হোসেন, বেনযীর আহমদ, মনির উদ্দীন ইউসুফ, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ মাহফুয উল্লাহ, রূহুল আমীন খান, মীজানুর রহমান, ফজলুর রহমান, মতিউর রহমান মল্লিক, সত্য গঙ্গোপাধ্যায়, আশরাফ আলী খান, আবদুল কাদির, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, সৈয়দ আবদুল মান্নান, মুফাখখারুল ইসলাম, আ.ফ.ম.আবদুল হক ফরিদী, আল মুজাহিদী, নূরুদ্দীন আহমদ, নেয়ামুল বাসির ও আবদুল মান্নান তালিব।

ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা নামক গ্রন্থে ফারসি *রুমূয-ই-বেখুদী, আসরার-ই-খুদী, জাবিদনামা, পায়াম-ই-মাশরিক* ও *আরমুগানে হেজায* থেকে অনূদিত কবিতা উপস্থাপিত হয়েছে। ফারসি কাব্যের অনুবাদকদের মধ্যে ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আবদুল মান্নান, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুফাখখারুল ইসলাম, আ.ফ.ম.আবদুল হক ফরিদী, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আলী আশরাফ, অমীয় চক্রবর্তী, আহসান হাবীব, গোলাম সামদানী কোরাইশী, শঙ্খঘোষ, সত্য গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক সিরাজুল হক ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী অন্যতম। ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থে উল্লিখিত কবিতাগুলোর অধিকাংশই স্বাধীনতাপূর্ব কালের অনুবাদ যা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখানে কিছু কবিতা রয়েছে যা স্বাধীনতার পর অনূদিত হয়েছে এবং তা আর অন্য কোথাও থেকে প্রকাশিতও হয় নি। গবেষণা শিরোনামের আলোকে আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত স্বাধীনতা উত্তরকালের অনূদিত কয়েকটি ফারসি কবিতা সর্ম্পকে আলোচনা নিম্নে তোলে ধরা হল:

---

[১৯২] আবদুল ওয়াহিদ (সম্পা.), *ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬), পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক সিরাজুল হক *পায়ামে মাশরিক* থেকে *ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা পায়ামে মাশরিক থেকে* শিরোনামে যে অনুবাদ করেছেন তা নিম্নরূপ:

ای امیر کامگار ای شهریار — نو جوان و مثل پیران پخته کار
چشم تو از پردگهیا محرم است — دل میان سینه ات جام جم است
غرم تو پاینده چون کهسار تو — خرم تو آسان کند دشوار تو
همّت تو چون خیال من بلند — ملّت صد پارۂ اشیرازه بند
هدیه از شاهنشهان داری بسی — لعل و یاقوت گران داری بسی
ای امیر ابن امیر ابن امیر — هدیه ئی از بینوائی هم پزیر[১৯৩]

ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা
পায়ামে মাশরিক থেকে

হে বিজয়ী! হে সফল আমীর
হে বাদশা নামদার
যদিও যুবা তুমি; কিন্তু অভিজ্ঞ
প্রবীণের মতোই (এই ধরণীর পরে)।
জানি, তব সুতীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয়
পর্দার অন্তরালে থেকেও
সব কিছুই দেখতে পায়।
আর তব বক্ষে লুক্কায়িত অন্তরতব
জামশিদের পানপাত্রের মতোই স্বচ্ছ
(যেন এক বিশ্বদর্পণ)।
তোমার ইচ্ছাগুলো শিলাময়
পার্বত্য ভূমির মতোই সুদৃঢ়
আর চির অক্ষয় অব্যয়,
তোমার প্রজ্ঞাময় সতর্কতা
সহজ করে দিচ্ছে অবিরত
তোমার সংকটময় পথ-বিশ্বময়।
আমার ভাবনাগুলোর মতোই-
উন্নত তব হিম্মত-সাহস
শতধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে তব
যা করেছে ঐক্যবদ্ধ
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর।
হ্যাঁ, পৃথিবীর অনেক রাজা-বাদশা থেকে
পেয়েছো অনেক অনেক
পারিতৌষিক তুমি, আর
পেয়েছো অনেক মূল্যবান মুক্তাদানা,
পেয়েছো অনেক পদ্মরাগ মণি।

---

[১৯৩] ড. মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল ফারসি* (লাহোর: গোলাম আলী পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ১৮৫-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

হে আমীর! হে আমীর পুত্র!
হে শাহজাদা (আফগান বীর)
আমার মতো দীন-দরিদ্রের
এ উপঢৌকন গ্রহণ করো তুমি।[১৯৪]

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কর্তৃক অনূদিত হয় আল্লামা ইকবালের পায়ামে মাশরিকের কবিতা 'আল মুলকু লিল্লাহ'। তিনি সহজ-সরল ভাষায় কবিতা চমৎকারভাবে অনুবাদ করেছেন।

الملک لله

طارق چو بر کنارۂ اندلس سفینه سوخت
گفتند کار تو به نگاه خسر و خطاست
دوریم از سواد وطن باز چونرسیم
ترک سبب ز روی شریعت کجا رواست
خندید و دست خویش بشمشیر برد و گفت
هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست [১৯৫]

আল্লাহর রাজত্ব

আন্দালুসের উপকূলে তারেক
যখন জাহাজ জ্বালিয়ে দিল
লোকেরা বলল, বুদ্ধির বিচারে
তোমার কাজটি বড় ভুল হল।
স্বদেশ হতে পড়ে আছি দূরে
কিভাবে ফিরব আবার
উপায় সহায় পরিত্যাগ করা
জীবনের কোন বিধান বলো
মৃদু হেসে তরবারীর তাপ স্পর্শ করলেন
আর ঘোষণা দিলেন
আটক নয় আমাদের পৃথিবী কোন দেশে
খোদার দুনিয়া জুড়েই তো আমাদের ঘর।[১৯৬]

শংকঘোষ কর্তৃক আল্লামা ইকবালের *যবুরে আজম* কাব্যগ্রন্থের কবিতা ফালকে ক্বামার অনূদিত হয়। শংকঘোষ চন্দ্রমণ্ডল শিরোনামে গদ্যাকারে তা অনুবাদ করেন। নিম্নে অনূদিত কবিতাটির মূল ফারসিসহ বঙ্গানুবাদ উপস্থাপিত হল:

[১৯৪] ড. আবদুল ওয়াহিদ (সম্পা.), *ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ২৮০-২৮১।
[১৯৫] ড. মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল ফারসি*, পৃ. ২৯৯।
[১৯৬] ড. আবদুল ওয়াহিদ (সম্পা.), *ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

فلک قمر

این زمین و آسمان ملک خداست این مه و پروین همه میراث ماست
اندرین ره هر چه آید در نظر، بانگاه محرمی او را نگر
چون غریبان در دیار خود مرو ای زخودگم اندکی بیباک شو
این و آن حکم تر ابر دل زند گر تو گوئی این مکن آن کن، کند
نیست عالم جزبتان چشم و گوش اینکه هر فردای او میرد چودوش
در بیابان طلب دیوانه شو یعنی ابراهیم این بتخانه شو
چون زمین و آسمان را طی کنی این جهان و آن جهان را طی کنی
از خدا هفت آسمان دیگر طلب صد زمان و صد مکان دیگر طلب
بی خود افتادن لب جوی بهشت بی نیاز از حرب و ضرب خوب و زشت
گر نجات ما فراغ از جستجوست گور خوشتر از بهشت رنگ و بوست
ای مسافر جان بمیرد از مقام
زنده تر گردد ز پرو از مدام[১৯৭]

চন্দ্রমন্ডল

ঈশ্বরের রাজ্য এই মর্ত্য আর এই স্বর্গলোক,
পিতৃসূত্র আমাদের এই চাঁদ, গ্রহতারাদল;
এই পথে হেঁটে যেতে যতকিছু সামনে চোখে পড়ে
সে সব দেখার জন্য তোমার নিবিড় দৃষ্টি হোক।
তোমারই আপনঘরে কেন যাবে অতিথির মতো-
যে তুমি আপনহারা কিছু-বা নির্ভয় হয়ে ওঠো!
তোমারই নির্দেশ বুকে তুলে নেয় এও, কিংবা সেও
'এভাবে না, ওইভাবে করো' বললে তাই করে তারা।
জগৎ তো শধুমাত্র দৃষ্টি কিংবা শ্রুতির প্রতিমা
বিগত কালের মতো ঝরে যাবে প্রতিটি আগামী।
সন্ধানের মরুবুকে ঝাঁপ দাও উন্মাদের মতো
এমন প্রতিমাঘরে হয়ে যাও অ্যাব্রাহাম তুমি।
যখন তোমার চলা সাঙ্গ হবে দ্যুলোকে ভূলোকে
এ-জগতে ও-জগতে পরিক্রমা হয়ে যাবে শেষ,
তখন আরেক সপ্তস্বর্গ চাও ঈশ্বরের কাছে
চাও আরো শত শত অন্য কাল, শত অন্য দেশ।
স্বর্গনদীতীরে যদি মগ্ন হয়ে থাকো আত্মহারা

[১৯৭] ড. মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল ফারসি*, পৃ. ৬১৯।

Dhaka University Institutional Repository

সদসৎ লড়াইয়ের থেকে যদি চলে যাও দূরে-
যদি ভাবো মুক্তি পাবে সব খোঁজ শেষ হয়ে গেলে
তবে তো কবরই ভালো, কী হবে রঙের স্বর্গপুরে!
মনে রেখ হে পথিক, আত্মা ঝরে যায় স্থানুতায়,
ততই সে জেগে ওঠে যত তার নিরন্ত উড়াল।[১৯৮]

স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তীকালে অনূদিত ইকবালের ফারসি কাব্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও আলোচিত *রুমূয-ই-বেখুদী* ও *আস্‌রারে খুদী* সার্থক ও সফল অনুবাদ, যার বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় উপস্থাপিত আল্লামা ইকবালের বঙ্গানূদিত কবিতাগুলোর মূল্যায়নে বলা যায় যে আল্লামা ইকবালের কবিতার অনুবাদকদের মধ্যে কেউ অনুবাদ করেছেন যথাসম্ভব মূলের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে, কেউ করেছেন মূলকে অবলম্বন করে স্বাধীন অনুবাদ, কেউ করেছেন দু'ধারাকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা।

আল্লামা ইকবালের বঙ্গানূদিত কবিতাগুলোর মধ্যে স্বাধীনতা পূর্বকালের অনুবাদগুলো ইকবালের মূল ফারসি অবলম্বনে অধিকতর মূলানুগ হয়েছে বলে মনে হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যৎসামান্য অনুবাদ হলেও অনূদিত কবিতাগুলোকে সফল অনুবাদ বলা যায়।

অন্যান্য লেখকের অনূদিত গ্রন্থ

বিলায়েত নামা

বিলায়েতনামা গ্রন্থটির মূল রচয়িতা হচ্ছেন মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দিন। তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তিনি সে সময়ের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মক্তব ও মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং আরবী, ফারসি ও তুর্কী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। অনেকে মনে করেন ইংরেজী ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। ভাষিক জ্ঞান ছাড়াও তিনি সে সময়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজনীতি, ধর্মীয় ও প্রকৃতিবিজ্ঞানেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় ও উচ্চস্তরের কর্মজীবন এবং রচনাবলীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৯৯]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দীন কর্তৃক ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় রচিত *শিগরোফনামা এ বিলায়েত* এর *বিলায়েতনামা* শিরোনামে বাংলা অনুবাদ করেন। অনূদিত *বিলায়েতনামা*

[১৯৮] ড. আবদুল ওয়াহিদ (সম্পা.) *ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।
[১৯৯] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪), পৃ. ১০৮-১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি 'মুক্তধারা' প্রকাশনী, ঢাকা থেকে জুন ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য অনুবাদে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থে বিশদ ভূমিকা ও কোন টীকা পরিলক্ষিত হয়না। প্রদত্ত ভূমিকা সংক্ষিপ্ত এবং খুবই সাধারণ। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন:

> একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক একটি আকর গ্রন্থকে কিভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তা বুঝা যায় না। ফলে বইটির ঐতিহাসিক মূল্য হারিয়ে যায়।[২০০]

বিলায়েতনামার ফারসি পাণ্ডুলিপিটির কপি লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরী এবং বিহারের অন্তর্গত বাঁকীপুরের খুদাবখশ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[২০১] এ পাণ্ডুলিপির একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ করেন জেম্‌স এডওয়ার্ড আলেকজান্ডার *Shigurfnama-i-Vilayet or Excellent Intelligence Concerning England, Being the Travels of Mirza I'tesamuddin* শিরোনামে এটি লন্ডনে প্রকাশিত হয়। আলেকজান্ডার ও হবিবুল্লাহর অনুবাদের উপর ভিত্তি করে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী অনুবাদ করেছেন কায়সার হক *The Wonders of Vilayet* শিরোনামে।[২০২]

তারিখে ফিরোজশাহী

জিয়াউদ্দীন বারনী ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ *তারিখে ফিরোজশাহী* রচনা করেন। তাছাড়া শামস-ই-শিরাজ আফীফও *তারিখে ফিরোজশাহী* নামে গ্রন্থ রচনা করেন।[২০৩] *তারিখে ফিরোজশাহী* একটি মূল্যবান গ্রন্থ এতে শাসন সংক্রান্ত সংস্কারাদি নিখুঁতভাবে আলোচিত হয়েছে।[২০৪] জিয়াউদ্দীন বারনী রচিত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন গোলাম সামদানী কুরাইশী যা বাংলা একাডেমী, ঢাকা হতে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জিয়াউদ্দীন বারনী বিরচিত ইতিহাস গ্রন্থ *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* সুলতান ফিরুজ শাহ্ তুগলক এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। সুলতানি আমলের ইতিহাস সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা *তারিখে ফিরোজশাহী*র নিরেট মূল্য রয়েছে যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের এক চমৎকার সমাহার। ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে

---

[২০০] নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাঙালীর ইতিহাস চর্চার ধারা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ২৯৩।

[২০১] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৮ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৭৮।

[২০২] *প্রাগুক্ত*।

[২০৩] **শামস-ই-সিরাজ আফীফ তারিখ-ই-ফিরুজশাহী:** সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলক এর রাজত্বকালের (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ইতিহাস গ্রন্থ *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* রচনা করেন শামস সিরাজ আফিফ। শামস-ই-সিরাজ আফীফ ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শামস-ই-সিরাজ আফীফ এর পরিবারের সদস্যগণ সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় থেকেই সুলতানদের অধীনে চাকরি করতেন বলে জানা যায়। আফীফের পিতা শামস আফীফ ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে বিভিন্ন পদে, বিশেষত বাংলা অভিযানগুলোতে সুলতানের অধিনে চাকরি করেছিলেন বলে জানা যায়। ফিরুজ শাহের সম্পূর্ণ রাজত্বকাল অবলোকনকারী আফীফের ইতিহাস রচনার তারিখ জানা যায় না। তবে এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রন্থটি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লেখা হয়েছিল। [দ্র. *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৬০-২৬১।]

[২০৪] এ. কে. এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম ব্যবস্থার ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ. ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে রাজা বাদশা ও আমীর উমরাহদের বর্ণনা বিদ্যমান। একই সাথে *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* সরকারের প্রবিধানসমূহ, আইন, প্রশাসনিক বিষয়াবলি, কর্মবিধি এবং পরামর্শের এক আকর গ্রন্থ। তিনি গ্রন্থ রচনায় যথেষ্ঠ পরিশ্রম করেছেন। এ বিষয়ে গ্রন্থের শেষে তা উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন:

من در تالیف مذکور زحمت بسیار دیده ام از خدای عز و جل امید میدارم که زحمت ذ یدۂ مرا ضایع نخواهد گردانید و در قرآن مجید فرموده است ان الله لا یضیع اجر المحسنین و الحمد لله رب العالمین والصلاة علی رسوله محمّد و اله اجمعین.[২০৫]

আমি এই ইতিহাস লিখিতে খুবই পরিশ্রম করিয়াছি। খোদাতালার নিকট এই প্রার্থনাই করি, তিনি যেন আমার এই পরিশ্রমের ফলকে বৃথা নষ্ট হইতে না দেন। তিনি কোরআন শরীফে বলিয়াছেন,

'অবশ্যই আল্লাহ্তালা সদাচারীদের পরিশ্রমের ফল নষ্ট করেন না।'
আলহামদু লিলাহি রাব্বিল আলামীন
ওস্সালাতু আলা রসুলিহি মুহম্মদিও
ও আলা আলিহি আজমাঈন।[২০৬]

গিয়াসউদ্দীন বলবন এর সিংহাসন আরোহণের ঘটনা থেকে ফিরুজ শাহ তুগলক পর্যন্ত দিল্লির সকল সুলতানের ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ফিরুজ শাহ তুগলকের রাজত্বের ষষ্ঠ বছরে জিয়াউদ্দীন বারনী ইতিহাস রচনা শেষ করে ক্ষমতাসীন সুলতানের নামানুসারে এর নামকরণ করেন *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*। জিয়াউদ্দীন বারনী এর প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সাথে সম্পর্ক ও ইতিহাস রচনার তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ে আবদুল করিম বলেন:

জিয়াউদ্দীন বরনী সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন এবং প্রশাসনের উঁচু পর্যায়ের লোকজন ও বিদ্বজ্জনের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ও যোগাযোগ ছিল। তাঁর মাতামহ সিপাহসালার হুসামুদ্দীন মন্ত্রীর পদমর্যাদায় বলবনের অধীনে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর পিতা মুয়ায়িদুল মুলক জালালুদ্দীন ফিরুজ খলজীর পুত্র আরকালী খানের নায়েব পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর চাচা আলাউল মুলক জালালুদ্দীন খলজীর বিরুদ্ধে আলাউদ্দীন খলজীর ষড়যন্ত্রে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। সিংহাসন দখল করার পর আলাউদ্দীন আলাউল মুলকের পদমর্যাদা বহু গুণে বৃদ্ধি করেন। এজন্য বরনীর বাল্যকালে সংঘটিত বিষয়াবলির উপর তথ্য সংগ্রহে তাঁকে বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি।[২০৭]

---

[২০৫] মৌলভী সাইয়্যেদ আহমদ খাঁন (সম্পা.), *তারীখে ফিরোজশাহী* (কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙলা, ১৮৭২), পৃ. ৬০২।

[২০৬] গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনু.), *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৪১৫।

[২০৭] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

বরণী তাঁর *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* গ্রন্থে বলবন কর্তৃক মুইজুদ্দীন তুগরলের বিদ্রোহ দমন এবং লখনৌতিতে প্রশাসনিক বিলিব্যবস্থার পর তাঁর দিল্লি প্রত্যাবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেন।

حمد و ثناء مرخدائی را که از اخبار و آثار انبیا و سلاطین بوحی سماوی بندگان را بیاگاها نید و معاملات مقبولان و مردودان و فضائل مقربان و رزئل دور افتدگان امم سالفه امت محمدی علیه السلام را روشن و منورگردانید و بدین اعلام برین امت منت نهاد و بزبان پاک قرآن فرمود و نکتب ما قدموا و اثارهم و در آیت دیگر فرمود نحن نقص علیک احسن القصص[২০৮]

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার জন্য, যিনি ওহীর সাহায্যে নবী-রসুল ও রাজা-বাদশাহদের কাহিনী তাঁহার বান্দাদিগকে জানাইয়াছেন। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যাঁহারা সৎ ছিলেন, তাঁহাদের স্বভাবচরিত্র এবং অসৎ ব্যক্তিদের দোষত্রুটি উম্মতে মুহম্মদীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এইভাবে তিনি এই জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং কোরানের ভাষায় বলিয়াছেন, 'আমরা লিখি তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে ও তাহাদের কীর্তিগুলি।' অন্যত্র বলিয়াছেন, আমরা বর্ণনা করি তোমার নিকট সুন্দরতম কাহিনী।'[২০৯]

الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلوة علی رسوله محمد و اله اجمعین و سلم تسلیما کثیرا کثیرا چنین گوید دعا گوی مسلمانان ضیاء برنی که انچه اینضعیف از اخبار و آثار سلطان غیاث الدین بلبن در تاریخ آورده است از پدر و جد خود استماع دارد و از ایشانکه در عصر او اصحاب اشتغال خطیر بوده اند کیفیت ملک داری او شنیده است که چون در شهور سنه ۶۶۲ اثنی و سنین و ستماة سلطان غیاث الدین بلبن که بندهٔ از بندگان شمسی بود و درمیان بندگان ترک چهل گانی ازاد شده بر تختگاه دهلی جلوس فرمود بیشتری رسم جهانداران قدیم را اتباع نمود و به دارات سلطین عجم در و درگاه خود را بیاراست و اعوان و انصار دولت خود معتبران و نام آوران ملک را گردانید و اشغال خطیر و اقطاعات بزرگ به پسران وسروران داد.[২১০]

আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওল আকিবাতুলিল মুত্তাকীন; ওস্সালাতু আলা রসুলিহি মুহম্মদিও ওআলিহি আজমাঈন ও সাল্লামা তসলীমান কাসীরা।

---

[২০৮] মৌলভী সাইয়্যেদ আহমদ খাঁন (সম্পা.), *তারীখে ফিরোজশাহী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।
[২০৯] গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনু.), *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১।
[২১০] মৌলভী সাইয়্যেদ আহমদ খাঁন (সম্পা.) *তারীখে ফিরোজশাহী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সকল মুসলমানের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়া এই অক্ষম আমি জিয়া বারানী সুলতান গিয়াস উদ্দিনের জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে যে বিবরণ বর্তমান ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহা আমার পিতামহদের নিকট শুনিয়াছি। তদুপরি সুলতানের সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হইতেও তাঁহার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন সুলতান শামসউদ্দিনের মুক্তিপ্রাপ্ত চল্লিশ জন তুর্কী গোলামের অন্যতম ছিলেন। তিনি ৬৬২ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পূর্বসূরী বাদশাহদের রাজ্য শাসনপ্রণালী এবং তাঁহাদের দরবারী জাঁকজমকের অনুসারী হন। রাজ্যের খ্যাতনামা ও গুণী ব্যক্তিদিগকে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহায়ক করিয়া তোলেন। গুরুত্বপূর্ণ সকল দায়িত্ব নিজ পুত্র এবং অন্যান্য মালীক-সরদারদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন।[২১১]

তবকাত ই নাসিরী

তবকাত-ই-নাসিরী রচয়িতা মিনহাজ শিরাজ এর নাম আবু ওমর মিনহাজ উদ্দীন ওসমান বিন সিরাজ উদ্দীন জাউজে জানী। এ বিষয়ে ড. আবদুল্লাহ চাগতাই (সম্পা.) লাহোর থেকে প্রকাশিত *তবকাত-ই-নাসিরী* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন:

قاضی القضاة صدر جهان ابو عمر منهاج الدين عثمان بن صراج الدين محمّد بن منهاج عثمان الجوزجانی[২১২]

মিনহাজ শিরাজ মামলুক সুলতান নাসির উদ্দীন এর অধীনে এক উচ্চ রাজকর্মচারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর *তবকাত-ই-নাসিরী* গ্রন্থে নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালের অতি মূল্যবান ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে।[২১৩] মিনহাজ শিরাজ দিল্লীতে স্বীয় মেধা বিকাশের সুযোগ লাভ করে। তিনি একাধারে অধ্যক্ষ, ইমাম, খতিব, কাজী ও সদর-ই-জাহান পদে নিয়োগ লাভ করেন।[২১৪] সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদের এর রাজত্বকালে দিল্লীতে অবস্থানকালে *তবকাত-ই-নাসিরী* গ্রন্থ রচনা করে ক্ষমতাসীন সুলতানের নামে উৎসর্গ করেন। আলোচ্য গ্রন্থের মূল্যায়ণে আবদুল করিম বলেন:

বখতিয়ার খলজীর বিজয় থেকে শুরু করে ১২৫৯ খ্রি.পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হলো তবকাত-ই-নাসিরী। অন্যান্য সমসাময়িক উৎস হিসেবে কিছু লিপি ও মুদ্রা পাওয়া যায়। শুধু সমসাময়িক গ্রন্থ বলে নয়, অন্য আরও দুটি কারণে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, মিনহাজ স্বয়ং বাংলায় আসেন, দুবছরের মতো এখানে অবস্থান করে তাঁর ইতিহাসের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং এখানকার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহেও অংশ নেন। দ্বিতীয়ত, বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তিনি তাঁর গ্রন্থের সম্পূর্ণ এক অধ্যায় জুড়ে (তবকাত) বর্ণনা করেন। গ্রন্থের এই বিশেষ অংশে লখনৌতির খলজী মালিকদের বর্ণনা ছাড়াও তিনি

---

[২১১] গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনু.), *তারিখ-ই-ফিরাজশাহী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০।

[২১২] ড. আবদুল্লাহ চাগতাই (সম্পা.), *তবকাত-ই-নাসিরী* (লাহোর: কিতাব খানায়ে নুরেস, ১৯৫২), পৃ. হা।

[২১৩] এ. কে. এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ২।

[২১৪] *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ ও তাঁর বংশধরদের অধীনে বাংলার ইতিহাস আলোচনা করেন। তিনি অন্য অধ্যায়ে শামসি মালিকদের বা সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের সভাসদদেরও বিবরণ দেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার বাংলার গভর্ণর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মোট কথা একমাত্র মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরীতে তুর্কী বিজয় থেকে শুরু করে ১২৫৯ খ্রি. পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস পাওয়া যায়।[২১৫]

আর আবুল কালাম মুহাম্মদ যাকারিয়া গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। ইতিহাস নির্ভর গ্রন্থটি জুন ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। আবুল কালাম মুহাম্মদ যাকারিয়ার অনুবাদের নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

الاول منهم السلطان قطب الدين المعزی

سلطان کریم قطب الدینحاتم ثانی طاب مرقده پادشاه مردانه و بخشنده بود. حق تعالی او را شجاعت و کرمی بخشیده بود که در شرق و غرب عالم در عصر او پادشاهی را نبود. و چون حق تعالی خواهد که تا بنده را در دل خلق عظمتی و فری ظاهر گرداند بصمت شجاعت و کرم موصوف کند تا دوست و دشمن را بنوازش و سخا و گذارش وغا مخصوص گرداند. چنانچه این پادشاه کریم غازی بود. تا از بخشش و کوشش او دبار هندوستن از دوست و دشمن پروتهی گشت. بخشش او همه لک و کشتن او (همه) لک لک بود چنانچه ملك الکلام بهاء الدین اوشی در مدح این پادشاه (ک یم می) فرماید:

ای بخشش تو لک بجهان آورده
کان را کف تو کار بجان آو رده
از شرم کف تو خون گرفته دل کان
پس لعل بهانه در میان آو رده[২১৬]

সুলতান কুতব্-উদ্-দীন-আল-মু'ইজ্জী

দ্বিতীয় হাতেম, দয়াবান সুলতান কুতব-উদ-দীন (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) একজন অসম সাহসী ও দানশীল নৃপতি ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে (এমন) সাহসিকতা ও দানশীলতা দান করেছিলেন যা তাঁর সময়ে পৃথিবীর প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দেশের কোন নৃপতিরই ছিল না। যখন মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে তাঁর সৃষ্ট কোন ভৃত্যের মহত্ব ও গৌরব মানুষের

---

[২১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫।

[২১৬] ড. আবদুল্লাহ চাগতাই (সম্পা.), *তবকাত-ই-নাসিরী* (লাহোরঃ কিতাব খানায়ে নূরেস, ১৯৫২), পৃ. ৫২।

অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হোক তখন তিনি তাঁকে বীরত্ব ও করুণার গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেন এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলে তাঁর বদান্যতা ও দয়ার অংশীদার হন; যেমন ছিলেন এই দয়াশীল (ও) বিজয়কারী সুলতান। তাঁর বদান্যতা ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে সমগ্র হিন্দুস্তার বন্ধুপূর্ণ হয়েছিল। এ সম্রাটের দান যেমন ছিল লক্ষ (লক্ষ) তাঁর হত্যাও ছিল (তেমন) লক্ষ লক্ষ। তাই কবিশ্রেষ্ঠ বাহা-উদ্-দীন উশী এ (দয়ালু) সুলতান সম্পর্কে বলেছেন:

> "তুমি লক্ষ দান এনেছিলে পৃথিবীর মাঝে,
> তোমার হস্তের দান খনিকেও হার মানিয়েছে।
> তোমার হস্তের দানের লজ্জায় খনির বুকে রক্ত ছুটে,
> অতএব রুবী এখানে (শুধু) উপলক্ষ মাত্র।"[২১৭]

চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন

মূলগ্রন্থের নাম *নেহ্জাদায়ে ইসলামী দার সাদ সালাহ্-এ আখীর*। এর রচয়িতা আয়াতুল্লাহ মুর্তোজা মোতাহারী। গ্রন্থটি হিজবুল্লাহীদের উদ্যোগে ভাষান্তরিত হয়েছে। এটি হিজবুল্লাহ প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ১৪০৪ হি. মোতাবেক ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির সূচিপত্র নিম্নরূপ:

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: সংস্কার

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন

তৃতীয় অধ্যায়: ইরানে ইসলামী আন্দোলন

প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

নেতৃত্ব

সমস্যা: ১। বিজাতীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ

২। চরম পুনর্জাগরণবাদ

৩। অসমাপ্ত রেখে যাওয়া

৪। সুবিধাবাদীর অন্তর্ঘাত

৫। ভবিষ্যতের অস্পষ্ট পরিকল্পনা

৬। আদর্শ উদ্দেশ্যের বিচ্যুতি

চতুর্থ অধ্যায়: সংস্কারকের সফলতার শর্তাবলী, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

---

[২১৭] মিনহাজ-ই-সিরাজ, আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া (অনু.), *তবকাত-ই-নাসিরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম খোমেনীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

এটি ইমাম খোমেনীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য পুস্তিকা। এটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামী নির্দেশনা মন্ত্রণালয়। বাংলায় অনুবাদ করেছেন আহমদ ইয়াহিয়া খালেদ। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির সূচীপত্র নিম্নরূপ:

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, শৈশব, শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক সংগ্রাম, প্রাদেশিক ও নগর কাউন্সিল বিল প্রসঙ্গে, ৬ বাহ্‌মানের গণভোট প্রসঙ্গে, ১৩৪২ ইরানী সালের (১৯৬৩ খ্রি.) শুরুতে, ১৫ই খোরদাদ ১৩৪২ ইরানী সাল, ১৫ খোরদাদের পরে, ক্যাপিটিউলেশন আইন, তুরস্কে নির্বাসন, ইরাকে, সাইয়েদ মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাত, পরবাসী এবার ফিরবে দেশে ও ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

ইমাম খোমেনীর বাণী

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইমাম খোমেনী এ বাণী দিয়েছিলেন। এটি পরে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। আহমদ ইয়াহিয়া খালেদ এটি বাংলায় অনুবাদ করেন।

শহীদ

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মোতাহারী *শহীদ* শিরোনামের এ পুস্তিকাটি রচনা করেন। গ্রন্থটি অনুবাদ করেন আহমদ ইয়াহিয়া খালেদ। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির সূচী নিম্নরূপ:

চিরঞ্জীব শহীদ মোতাহারী, শহীদ মোতাহারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, ভূমিকা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যে শহীদ, শহীদের বিশেষ অধিকার, কেন পবিত্র, জিহাদ বা শহীদের দায়িত্ব, শাহাদাতের আকাঙ্খা, শহীদের প্রেষণা, শহীদের খুন, শহীদের অমরত্ব, শহীদের সুপারিশ, শহীদের জন্যে বিলাপ, শোক প্রকাশ, শাইয়েদুশ শোহাদার সাক্ষ্য, ইমাম খুশী হলেন ও সবাই একই সুরে।

নাহ্‌জুল বালাগা'র শিক্ষা

বইটি সৈয়দ আলী খামেনী রচনা করেছেন। আর এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন হোসেইন ভাহিদ দস্ত জারদি। প্রিন্সিপাল রইস উদ্দিন আহমদ এর বাংলা অনুবাদ করেছেন। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির সূচিপত্রে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

প্রথমেই ইংরেজী অনুবাদকের কথা ও প্রকাশকের কথা আলোচিত হয়েছে। এরপর সূচনা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর বইয়ের মূল আলোচনা আটটি পাঠে আলোচিত হয়েছে। প্রথম পাঠ নবুওত ও প্রশ্নোত্তর। দ্বিতীয় পাঠ নবুওতের পটভূমি, অজ্ঞতার যুগ ও প্রশ্নোত্তর। তৃতীয় পাঠের বিষয় হচ্ছে নবীগণ সমাজের কোন শ্রেণীর, সার সংক্ষেপ ও প্রশ্নোত্তর। চতুর্থ পাঠের বিষয় নবীদের কিভাবে নির্বাচন করা হয়। পঞ্চম পাঠে নবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ষষ্ঠ পাঠে হচ্ছে নবুওতের ধারাবাহিকতা ও প্রশ্নোত্তর। সপ্তম পাঠে আছে নবুওতের পরিসমাপ্তি ও প্রশ্নোত্তর। অষ্টম পাঠে নবীদের আগমনকালের পূর্বে, পরে ও ঐ সময়ে বিশ্বাসীদের অবস্থা। সর্বশেষ পাদটিকা দিয়ে বইটির আলোচনা শেষ করা হয়েছে।

জাতিসমূহের আগামী দিনের পথ ইসলামী বিপ্লব

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের উপর রচিত বইটি রচয়িতা মসিহ মুহাজেরী। আর এর বাংলা অনুবাদ করেছেন অধ্যক্ষ রইস উদ-দীন আহমদ। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির প্রথমে সূচনা ও প্রস্তাবনা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর বিপ্লবের উদ্দেশ্য, বিপ্লবের বিজয় ও বিজয়ের পরে এ তিনটি পৃথক অংশে ইরানের ইসলামী বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জাগো-সাক্ষ্য দাও

বইটি ইমাম হোসাইন (আ.) এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ড. আলী শরীয়তীর প্রদত্ত বক্তৃতা যা পরবর্তী পর্যায়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আর বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ আবদুছ ছাত্তার চোকদার। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনটি অধ্যায়ে বইটি আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়: শাহাদত, দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রার্থনা, এবং তৃতীয় অধ্যায়: শাহাদতের উত্তরকালে।

খতমে নবুয়্যত

গ্রন্থটির মূল রচয়িতা শহীদ মুরতাজা মুতাহ্হারী। বাংলায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক সিরাজুল হক। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদ ইসলামের পবিত্র যুদ্ধ ও তার কুরআনী বৈধতা

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারী বইটি মূল রচয়িতা। এর বাংলা অনুবাদকের কোন উল্লেখ নেই। বইটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে জুন ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে চারটি বক্তৃতা শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন:

প্রথম বক্তৃতা: জিহাদ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী ,

দ্বিতীয় বক্তৃতা: প্রতিরক্ষা অথবা আগ্রাসন,

তৃতীয় বক্তৃতা:

প্রতিরক্ষা: জিহাদের সারকথা,

তাওহীদ: ব্যক্তিগত অধিকার না সাধারণ অধিকার ?

চতুর্থ বক্তৃতা: রহিতকরণ প্রশ্ন ।

সর্বশেষ একটি পরিশিষ্ট দিয়ে বইটির আলোচনা শেষ করা হয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শুরা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শুরা শিরোনামের গ্রন্থটি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। বইটিতে ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, সংবিধান, জনগণের সার্বভৌমত্ব, ইসলামী মজলিসে শুরা, মজলিসের ক্ষমতা, অভিভাবক পরিষদ, মজলিসের কার্যক্ষমতা ও কার্যবিবরণী আলোচিত হয়েছে।

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম পরিচিতি ইসলামী বিধি-বিধানের আলোচনা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচয়িতা আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবায়ী। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ আবু তাহের। গ্রন্থটির প্রকাশক বাংলা বিভাগ, সাজেমানে তাবলীগাতে ইসলামী, তেহরান, ইরান। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পৃথক তিনটি অধ্যায়ে এতে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: আকায়েদ বা বিশ্বাস

দ্বিতীয় অধ্যায়: আখলাক বা চরিত্র

তৃতীয় অধ্যায়: আহকাম বা নির্দেশাবলী

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক আরবী ফার্সী তুর্কী কবিতা

আবদুস সাত্তার কর্তৃক আরবী ফারসি ও তুর্কী ভাষায় রচিত কবিতা থেকে অনূদিত কবিতা সংকলন ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি এ গ্রন্থে আরবী ভাষায় রচিত ১৫টি কবিতা, ফারসি ভাষার ১৫টি কবিতা ও তুর্কী ভাষার ১৪টি কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছেন।[২১৮]

আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল ফারসি কবির কবিতা স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন রোদাকী, বাবা তাহির, জামী, ওমর খৈয়াম, নাসির খসরু, খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, নিযামী, জেবুন্নেসা মখফী ও ইরাজ মীর্জা। আবদুস সাত্তার স্বীয় অনূদিত গ্রন্থের ফারসি কবিতা সম্পর্কে বলেন:

> আধুনিক আরবী ফার্সী তুর্কী কবিতা সংকলনে যেসব কবিতা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে.......ফার্সী কবিতার ক্ষেত্রে কিছু প্রাচীন কবিতা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। সময়সীমা বিবেচনা করে আমরা হয়তো এসব কবিতা প্রাচীন বলে চিহ্নিত করি। কিন্তু ফার্সী কাব্য সমালোচকরা এ সব কবিতাকে চিহ্নিত করেছেন ক্লাসিকাল মর্ডান বা ধ্রুপদ আধুনিক বলে। কারণ কবিতাগুলোর আবেদন এতই চিরন্তন এবং সর্বজনগ্রাহ্য যে, এসব কবিতা সর্বকালের এবং আধুনিক। ফার্সী কবিতাসমুহ মূল থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।[২১৯]

হিজরত ও জিহাদ

হিজরত ও জিহাদ শিরোনামের গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় রচনা করেন শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারী। আর এর বাংলা অনুবাদ করেন অধ্যাপক সিরাজুল হক। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটির প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা বিভাগ, সাজেমানে তাবলীগাতে ইসলামী, তেহরান, ইরান–এর তত্ত্বাবধানে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ফতুহাতে ফিরোজ শাহী

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক *ফতুহাতে ফিরোজ শাহী* নামক ইতিহাস বিষয়ক বইটি রচনা করেন। আর বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আব্দুল করিম। এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা থেকে জুন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। আব্দুল করিম অনূদিত অনুবাদের নমুনা নিম্নরূপ:

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد بیحد و شکر بیعدّ مر خالق غفور مشکور را که من بیچاره مسکین، فیروز بن رجب، علام محمّد شاه بن تعلق شاه را باخیای سنن سنیّه و قلع بدعات و دفع

---

[২১৮] মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, *জীবনী গ্রন্থমাল আবদুস সাত্তার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৭৮।
[২১৯] আবদুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী ফার্সী তুর্কী কবিতা* (ঢাকা: নয়া দুনিয়া পাবলিকেশান্স, ১৯৮৭), পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

منکرات و منع محرمات و تحریص بر ادای فرائض و واجبات توفیق رفیق بخشید. و صلوات بیشمار بر سیّد کائنات که برای دفع رسوم و عادات مبعوث شد، بعث لرفع الرسوم و العادات ، صلی الله علیه وسلم ، و بر آل و اصحاب او که به سعئی جمیل ایشان مراسم جاهلیت مرتفع شد ، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین[২২০]

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে (আরম্ভ করছি)। অসীম প্রশংসা এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি কর্তার (আল্লাহতালার) প্রতি, যিনি ক্ষমাশীল এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার উপযুক্ত। আমি রজবের পুত্র ফীরুজ এবং তুঘলক শাহর পুত্র মুহম্মদ শাহর ভৃত্য একজন অধম দরিদ্র (লোক)। তিনি (আল্লাহতালা) আমাকে সমুজ্জ্বল সুন্নত সমূহ পুনর্জীবিত করা, বিদআতের মূলোৎপাটন করা, নিষিদ্ধ ও অশালীন কাজে বাধা দেওয়া, ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ সম্পাদনে উৎসাহ দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। সৃষ্টির সেরার (হযরত মুহাম্মদ দঃ এর) উপর অসংখ্য দরূদ বর্ষিত হোক যিনি কুসংস্কার এবং প্রচলিত আচার আচরণকে (কুসংস্কারকে) দূরীভূত করারজন্য প্রেরিত হয়েছেন; এবং তাঁর সাহাবী ও বংশধরদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক; যাদের উত্তম প্রচেষ্টায় অন্ধকার যুগের কুসংস্কারসমুহ দুরীভূত হয়েছে। আল্লাহতালার সন্তুষ্টি তাঁদের উপর বর্ষিত হোক।[২২১]

তাহেরেহ্ সফরজাদেহ: স্বনির্বাচিত কবিতা

ইরানের শীর্ষস্থানীয় সমকালীন আধুনিক কবিদের অন্যতম হচ্ছেন তাহেরেহ্ সফরজাদেহ। *তাহেরেহ্ সফরজাদেহ: স্বনির্বাচিত কবিতা* শিরোনামের গ্রন্থটিতে এ কবির নির্বাচিত কিছু কবিতার বাংলা অনুবাদ সংকলন। এটি অনুবাদ করেছেন আনিসুর রহমান স্বপন। বইটি বুকভিউ, নিউমার্কেট, ঢাকা থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য অনূদিত গ্রন্থের অনুবাদের নমুনা নিম্নরূপ:

انتظار

همیشه منتظرت هستم
بی آنکه در رکود نشستن باشم
همیشه منتظرت هستم
چونانکه من
همیشه در راهم
همیشه در حرکت هستم
همیشه در مقابله

---

[২২০] শায়খ আবদুর রশীদ, *ফুতূহাত-ই-ফীরূজ শাহী* (আলীগড়: মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ইতিহাস বিভাগ, ১৯৫৪), পৃ. ১।
[২২১] আব্দুল করিম (অনু.), *ফুতূহাত-ই-ফীরূজ শাহী* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

تو مثل ماه

ستاره

خورشید

همیشه هستی

و می درخشی از بدر

و می رسی از کعبه

و کوفه همین تهران ست

که بار اول می آیی

و ذوالفقار را باز می کنی

و ظلم را می بندی

همیشه منتظرت هستم

ای عدل وعده داده شده

این کوچه

این خیابان

این تاریخ

خطی از انتظار تو را دارند

و خسته اند

تو ناظری

تو می دانی

ظهور کن

ظهور کن که منتظرت هستم

ظهور کن که منتظرت هستم[২২২]

---

[২২২] আনিসুর রহমান স্বপন (অনু.), *তাহেরেহ্ সফরজাদেহ: স্বনির্বাচিত কবিতা* (ঢাকা: বুকভিউ, নিউমার্কেট, ১৯৯১), পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্ষা

আমি সব সময়েই তোমার জন্যে অপেক্ষমান।
স্থবির বসে থাকার ফাঁদে পা না দিয়ে–
সর্বক্ষণ অপেক্ষমাণ আমি তোমারি জন্যে।
যেন আমি
সব সময়ে পথেই রয়েছি,
গতিময় রয়েছি সর্বক্ষণ–
সর্বদাই তোমারি মোকাবিলায়।
তুমি মাসের মতো
নক্ষত্রের মতো
সূর্যের মতো–
প্রতি মুহূর্তেই আছো তুমি।
বদর প্রান্তর হতে তোমার উদয়
এবং আবির্ভাব কাবা হতে।
এবং কুফাই তোমার সেই তেহরান–
যেখানে প্রথম আসবে তুমি
এবং খাপ হতে টেনে নেব দুধারী জুলফিকার–
এবং বন্দী করবে সব জুলুম নির্যাতন।
আমি সর্বক্ষণ প্রতিক্ষমাণ তোমার জন্যেই
তুমি, হে প্রতিশ্রুত ন্যায়বিচার।
এ অলি–গলি
এই সড়ক–জনপথ
এই ইতিহাস–
সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে তোমার জন্যে ব্যাকুল প্রতিক্ষার চিহ্ন।
এবং সবাই ক্লান্ত–শ্রান্ত,
তুমিই সাক্ষী সবকিছুরই
সবকিছুই জানো তুমি।
আবির্ভূত হও–
দেখা দাও আবারো–অপেক্ষমান আমি
প্রতীক্ষমাণ আমি–দৃষ্টিগোচর হও তুমি।[২২৩]

ইমাম খোমেনীর কবিতা

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেনী রচিত কবিতার এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান। গ্রন্থটি সহিফা প্রকাশনী, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা থেকে জানুয়ারী ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনূদিত কবিতার একটি নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

چشم بیمار تو ای می زده بیمارم کرد
حلقهٔ گیسویت ای یار گرفتارم کرد

---

[২২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

سر و بستان نکویی گل گلزار جمال غمزه ناکرده زخوبان همه بیزارم کرد
همهٔ می زدگان هوش خود از کف دادند ساغر از دست روان بخش تو هشیارم کرد
چکنم شیفته ام سوخته ام غمزاده ام عشوه ات و الهٔ آن لعل گهربارم کرد
عشق دلدار چنان کرد که منصورمنش از دیارم بدر آورد و سر دارم کرد
عشقت از مدرسه و حلقهٔ صوفی راندم بندهٔ حلقه بگوش در خمشارم کرد
باده از ساغر لبریز تو جاویدم ساعت
بوسه از خاک درت محرم اسرارم کرد[২২৪]

হে মদমত্ত নেশাসক্ত
তোমার চাউনী
আমায় করেছে রোগাক্রান্ত
হে প্রিয়া! তোমার ঢেউ খেলানো জুলফীর প্যাঁচ
আমাকে বেঁধেছে কষে।
চমৎকার সবুজ বনের হে কোমর সরু চিরহরিৎ
মনমোহিনী গুলবাগের অতি সুন্দর গোলাপ!
সুন্দরী প্রিয়াদের কাছ থেকে পাইনি চোখের ঠার
তাই বেজায় আমার রাগ
শরাব পিয়ে পিয়ে সবাই হারিয়েছে সব হুঁশ
তোমার হাতের সঞ্জীবনী আমায় করেছে সজাগ।
কী করতে পারি আমি
বদ্ধ পাগল আমি
হলাম ভস্ম আর শোকাহত।
তোমার গোপন প্রেম
খোদার কসম করেছে আমায় রক্তিম মোতি
প্রিয়ার প্রেমের এতই টান
করেছে আমায় মনসুর হল্লাজ
করেছে আমায় দেশ ছাড়া
লাগিয়েছে গলায় ফাঁস।
তোমার প্রেম তাড়ালো আমায়
মাদ্রাসা আর খানকা থেকে
নাকে রশি বেঁধে বানিয়েছে ক্রীতদাস
শুড়িখানার।
তোমার নেশার আকণ্ঠ শরাব
দিয়েছে আমায় জীবন অমর
তোমার দ্বারের ধূলি চুমো খাওয়ায়
সকল গোপন ভেদের
হয়ে গেলাম
একান্ত বিশ্বাসী প্রবর।[২২৫]

---

[২২৪] ইমাম খোমেনী, *দীওয়ানে ইমাম খোমেনী* (তেহরানঃ মোআসসেসেয়ে তানযীম ওয়া নাসরে অসারে ইমাম খোমেনী, ১৩৭৩ ইরানী সাল), পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাঙ্গনে নৈতিকতা

গ্রন্থটির মূল রচয়িতা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা হযরত ইমাম খোমেনী (র.)। বাংলায় বইটির অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন ডন পাবলিসার্স, ইন্দিরা রোড, ঢাকা থেকে। এবং বইটি প্রথম ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

ইরানের সমকালীন ইতিহাস

ইরানের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক রচিত তারীখে মুয়াসেরে ইরান (تاریخ معاصر ایران) নামক গ্রন্থটি নূর হোসেন মজিদী কর্তক অনূদিত হয়। গ্রন্থটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা থেকে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের সমকালীন ইতিহাস নামে প্রকাশিত হয়। ইরানের সমকালীন রাজনীতি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটির অনুবাদে নূর হোসেন মজিদীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

নারী নির্যাতন: যুগে যুগে

ইসলাম-পূর্ব পৌত্তলিকতা ও বর্বরতার যুগে নারী নির্যাতনের অবস্থা এবং আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার নামে তাদের যে অধঃপতন ও তাদের উপর যে নির্যাতন তারই একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে *নারী নির্যাতন: যুগে যুগে* শিরোনামের বইটিতে। এর মূল রচয়িতা আবদুল কারিম বিআজার শিরাজী। গ্রন্থটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী নির্যাতনের অবস্থা দুভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া সমকালীন প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

আল্লাহকে কেন মানতে হবে

ইসলামী মৌলনীতির প্রথম পুস্তক *আল্লাহকে কেন মানতে হবে* শিরোনামের গ্রন্থটির রচয়িতা আল্লামা সাঈয়েদ মুজতাবা মুসাভী লারী। আর বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মুন্সী মোহাম্মদ রফিকুল হাসান। বইটির প্রকাশক ডন পাবলিশার্স, ইন্দিরা রোড, ঢাকা। আর এটি নভেম্বর ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। একুশটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠে গ্রন্থটির আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পাঠ নিম্নরূপ:

যুগে যুগে ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তন, বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর পরিচিতি, কুরআন আল্লাহকে কিভাবে উপস্থাপন করেছে, আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও আল্লাহ তায়ালার ন্যায় বিচার সংক্রান্ত আলোচনা ইত্যাদি।

---

[২২৫] মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, *ইমাম খোমেনীর কবিতা* (ঢাকা: সহিফা প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

অমিয় বাণী

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী (র.) বিভিন্ন বিষয়ের উপর উপদেশ ও দিকনির্দেশনা মূলক যেসব বাণী দিয়েছিলেন তারই সম্পাদিত গ্রন্থ হচ্ছে 'অমিয় বাণী'। গ্রন্থটির অনুবাদক ও প্রকাশক হচ্ছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটির সূচীপত্রে দেখা যায় যে, গ্রন্থটি চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমভাগে চারটি অধ্যায়, দ্বিতীয়ভাগে ছয়টি, তৃতীয়ভাগে চারটি ও চতুর্থভাগে অধ্যায় বিহীন একটি আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

সীরাহ-ই-নববী

ইরানের প্রখ্যাত দার্শনিক, ইসলামী বিপ্লবের নেতা শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মোরতাজা মোতাহ্হারী রচিত *সীরাহ-ই-নববী* শিরোনামের গ্রন্থটির অনুবাদ ও প্রকাশক ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ। বইটি সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আর ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে ধর্মীয় নানা বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

সিয়াসতনামা

নিযামুল মুলক তুসী কর্তৃক রচিত হয় *সিয়াসতনামা* গ্রন্থটি। সালজুক সুলতান আলাপ আরসালান ও মালিকশাহের শাসনামলে নিযামুল মুলক তুসীর তুখোর মেধা ও বিচক্ষণতা রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর ভূমিকা রেখেছিল। নিযামুল মুলকের পুরো নাম আবু আলী হাসান বিন আলী বিন ইসহাক তুসী তবে তিনি নিযামুল মুলক তুসী নামে সমধিক পরিচিত।

অধিকাংশ সূত্রের আলোকে নিযামুল মুলক তুসী ৪০৮/৪১০ হি. মোতাবেক ১০১৮/ ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে তুসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না, তবে *ওসায়া* গ্রন্থে তাঁর শৈশবের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সূত্রের আলোকে বলা যায় যে, তিনি নিজ এলাকা তুসে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে উচ্চ শিক্ষার জন্যে নিশাপুর ও মার্ভে গমন করেন এবং সেখানে শাফেয়ী মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের উপর বুৎপত্তি অর্জন করেন। আরবী ও ফারসি ভাষায় পারদর্শী নিযামুল মুলক তুসী সালজুক সুলতান আলাপ আরসালান ও মালিকশাহের শাসনামলে দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত প্রতিপত্তির সাথে মন্ত্রিত্ব করেন। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপে সুচিন্তিত নেতৃত্ব ও সফল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বেশ কটি উপাধিতে ভুষিত হন। নিযামুল মুলক তুসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের নিযামিয়া

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা তার জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার উজ্জল দৃষ্টান্ত। তিনি ৪৮৫ হি. মোতাকে ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[২২৬]

নিযামুল মুলক তুসী মালিক শাহের নির্দেশে ১০৭৬ খ্রিষ্টাব্দে *সিয়াসত নামা* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি মূলতঃ দেশের রাজনৈতিক বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে:

বাদশাহর আচরণ, বাদশাহ কর্তৃক আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের মূল্যায়ন ও মর্যাদা দান ও ন্যায় বিচার, মন্ত্রীবর্গ ও কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীদের মধ্যকার সম্পর্ক, শাহী ফরমান ও নির্দেশ সমুহের মর্যাদা, বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবিদগণের সাথে পরামর্শ, কূটনৈতিক মিশন, সামরিক বাহিনীর বেতন বন্টনের নিয়ম-কানুন, গভর্ণরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের গোপন অনুসন্ধান, খেতাব ও উপাধি প্রধান, আয়-ব্যয় ইত্যাদি।

খাজা নিজামুল মূলক তুসী রচিত *সিয়াসত নামা* গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন যাহিদ হোসেন। আর বইটি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, যাহিদ হোসেন গ্রন্থটি মূল ফারসি থেকে অনুবাদ করেন নি, তিনি ফারসি থেকে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ অনুকরণে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন; যা তার নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়।

> "এ কথা না বললেই নয়, যে কোন অনুবাদ কর্মই যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি তা যাতে সহজবোধ্য হয়, জড়তা ও যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট না হয় এবং ঝর ঝরে ভাষায় অনূদিত হয় সে দিকে নজর দিতে হয়। পাঠক যাতে বুঝতে না পারেন যে, তিনি অনুবাদ গ্রন্থ পড়ছেন। অনুবাদকালীন সময় আমার মনে হয়েছিল–ইংরেজী অনুবাদক মূল ফারসি 'সিয়াসতনামা'র প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন যথাযথ এবং অনুবাদক যান্ত্রিক করে তুলেন নি কখনো। আমিও ইংরেজী থেকে যখন এই বই অনুবাদ করছিলাম তখন বিশ্বস্ততা বজায় রেখেই বাংলা ভাষায় সহজবোধ্যভাবে অনুবাদের চেষ্টা করেছি।[২২৭]

যাহিদ হোসেন কর্তৃক অনূদিত কিছু অংশের নমুনা উপস্থাপন করা হলো-

و آن چنان بود که از خلفای بنی عباس، هیچ کس را آن سیاست و هیبت و آلت و
عدت نبود که معتصم را بود، و چندان بندهٔ ترک که او داشت کس نداشت. گویند

[২২৬] ড. যাহরা খানলারী কেয়া, *রাহনুমায়ে আদাবিয়্যাতে ফারসি* (তেহরান: কিতাব খানেয়ে ইবনে সিনা, ১৩৪১ ইরানী সাল), পৃ. ৩৯৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১৪ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ১২০।

[২২৭] যাহিদ হোসেন (অনু.), *সিয়াসত নামা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. মুখবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

که هفتاد هزار غلام ترک داشت؛ و بسیار کس را از غلامان بر کشیده بود و به امیری رسانیده؛ و پیوسته گفتی که خدمت را چون ترک نیست.

مگر، امیری وکیل خویش را بخواند و گفت که((در بغداد کسی را شناسی، از مردمان شهر و بازار، که به دیناری پنصد با من معامله کند، که مهم می باید ، و به وقت ارتفاع باز دهم؟)) وکیل اندیشید ، از آشنای ااو را به یاد آمد که در بازار خرید و فروخت باریک کردی؛ و ششصد دینار ذر خلیفتی داشت که به روزگار ، به دست آورده بود. امیر را گفت: مرا مردی آشنا هست که دکان به فلان بازار دارد، و من گاه گاه به دکان او می روم و با بو داد و ستاد می کنم. ششصد دینار خلیفتی دارد.

مگر، کسی بدو فرستی ، و اورا بخوانی ، و به جای نیکوش بنشانی، و هر ساعت تلطف کنی، و در وقت خوان با وی تکلف نمایی ، و پس از نان خوردن سخن سود و زیان درمیان آری، باشد که از تو شرم دارد و از حشمت تو رد نتواند کر.[২২৮]

আব্বাসীয় বংশীয় খলীফাদের মধ্যে আল-মু'তাসিমের যতবেশী কর্তৃত্ব, মর্যাদা ও ধনসম্পদ ছিল তা আর কোন খলীফার ছিল না। এমনকি, তার যত ক্রীতদাস ছিল তাও আর কারো ছিল না। কথিত আছে যে তার ৭০০০০ তুর্কী ভৃত্য ছিল এবং তাদের মধ্য থেকে অনেককেই তিনি আমীর পদে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, তুর্কীদের মত কর্মচারী আর কেউ নাই।

একদিন একজন আমীর তার গোমস্তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি বলতে পার যে বাগদাদে এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী আছে যে আমার সঙ্গে পাঁচশত দিনার নিয়ে ব্যবসা করতে আসতে পারে? ঐ টাকাটা আমার অত্যন্ত জরুরী এবং ফসলের সময় তা ফেরৎ দিয়ে দেব। গোমস্তার তার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল, সে বাজারে ব্যবসা করে এবং আস্তে আস্তে সে ছয়শত দিনার সঞ্চয় করেছে। তাই সে আমীরকে বলল, আমার এক পরিচিত লোক আছে যার অমুক বাজারে দোকান আছে। আমি মাঝে মাঝে তার দোকানে যাই এবং তার সঙ্গে ব্যবসা করি। তার ছয়শত দিনার আছে। আপনি যদি কাউকে দিয়ে তাকে দাওয়াত করে এনে সসম্মানে এখানে রাখেন, সদা-সর্বদা তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তাকে মহাসমাদরে আপ্যায়ন করেন এবং টাকার প্রসঙ্গটা তুলেন তাহলে সে আপনার সমাদরে কুণ্ঠিত হয়ে যাবে এবং অস্বীকার করতে পারবে না। আমীর তা-ই করলেন।[২২৯]

কারবালা ও হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাত

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)-এর জীবন চরিত সম্পর্কে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *লোহুফ*-এর বাংলা অনুবাদ। সাইয়েদ ইবনে তাউস নামক একজন প্রসিদ্ধ মনীষী গ্রন্থটি আরবীতে রচনা করেন। পরে গ্রন্থটি ফারসি

---

[২২৮] ড. জা'ফর শিআ'র, *বারগুযিদেয়ে সিয়াসত নামা* (তেহরান: চাপখানেয়ে সেপেহের, ১৩৭২ ইরানী সাল), পৃ. ১৮।
[২২৯] যাহিদ হোসেন (অনু.), *সিয়াসত নামা*, পৃ. ৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় রূপান্তরিত হয়। একটি অনুবাদক গোষ্ঠী কর্তৃক গ্রন্থটি ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। আল হোসাইনী প্রকাশনী, পাক পাঞ্জাতন পরিষদ, উত্তরা, ঢাকা থেকে বইটি জুন ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটির তিনটি অধ্যায় রয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: জন্ম থেকে ১০ মহররম পর্যন্ত ইমাম হোসাইন (আ.) এর জীবন চরিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়: আশুরার দিন কারবালার ঘটনা ও শহীদগণের নিহত হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ।

তৃতীয় অধ্যায়: হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পর হতে আহলে বাইতের মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত সময়কালের খুঁটিনাটি ঘটনাবলীর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ফার্সী কাব্য সাহিত্যে মহানবী (স.)

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে রাসূল (স.) সম্পর্কে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। বিখ্যাত ফারসি কবি হাফিজ, জামী, রূমী, সা'দী, আওহাদী ও খাজু কিরমানী রাসূল (স.) সম্পর্কে কাব্যরচনা করেছেন। মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান সে সকল কবিতার কিছু নির্বাচিত অংশ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। *ফারসি সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ (স.)* শিরোনামে অনূদিত কবিতাগুলো ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৩০] মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত কাব্যাংশ নিম্নরূপ:

کریم السجایا جمیل الشیم
نبی البرایا شفیع الامم
امام رسل پشوای سبیل
امین خدا مهبط جبرایل
شفیع الور ی خواجهٔ بعث و نثر
امام الهدی صدر دیوان حشر
کلیم که چرخ فلک طور اوست
همه نورها پر تو نور اوست[২৩১]

চরিত্র দয়ায় ভরা সুন্দর আচরণ
সৃষ্টি কূলের নবী শফিউল উমাম

---

[২৩০] মো. আবুল কালাম সরকার, 'তরজমায়ে মুতূনে ফারসি বেযবানে বাংলা বা'দায পেইরোযীয়ে ইনকেলাবে ইসলামী দর ইরান', *মাজাল্লায়ে ফারসি ও উর্দূ দানেশগাহে দাকা*, সংখ্যা: ২, বর্ষ: ২য়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

[২৩১] সাইয়্যেদ যিয়া উদ্দীন দাহশিরী, *না'তে হযরত রাসূলে আকরাম দর শে'রে ফারসি* (তেহরান: ১৩৪৮ ইরানী সাল), পৃ. ৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলগনের নেতা, পথের দিশারী
খোদার বিশ্বস্ত জিবরাইলের মনযিল।
সৃষ্টলোকের সুপারিশকারী, পুণরুত্থান দিবসের সরদার
হেদায়েতের ইমাম, বিচার দিনের নেতা।
নভোমন্ডল যার তুর পাহাড় আল্লাহর সাথে করতে আলাপ,
সকল আলো তাঁরই নূরের বিকিরিত আলোর ছটা।[২৩২]

কালীলা ওয়া দিমনা

কালীলা ওয়া দিমনা পশুপাখীর ভাষায় রাজপুত্রদের জন্য গল্পাকারে লিখিত উপদেশ মূলক ভারতীয় উপকথার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এর মূখ্য চরিত্রে রয়েছে কারাতাকা ও দামানাকা নামক দুটি শিয়াল। সংস্কৃত মূল শব্দের বিকৃতির ফলে আরবীতে উক্ত দু'টি নাম *কালীলে* ও *দেমনে* রূপ পরিগ্রহ করে এবং এ নামগুলোই পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে। *কালীলা ওয়া দিমনা* রচনার মূল কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দুস্তানের প্রাচীন এক রাজার ছেলে লেখা-পড়া থেকে বড়ই অমনযোগী ও পলায়নপর ছিল। তাকে শিখানোর সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা করেও শিখানো যাচ্ছিল না। পরিশেষে তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিক রাজকুমারকে শিক্ষা দেয়ার দাবী করে রাজনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনের বিষয় সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করেন; যার মাধ্যমে রাজকুমারকে পড়া-শুনা শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা সফল ও সার্থক হয়।

কালীলা ওয়া দিমনা গ্রন্থে রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য বন্ধুত্ব, কথা-কাজে সত্যনিষ্ঠতা, আতিথেয়তার নিয়মকানুন ইত্যাদি অবশ্য পালনীয় বিষয়াবলীর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। গ্রন্থে আলোচিত রাজন্যবর্গের শিক্ষণীয় ব্যাপারগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞান, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিসত্তা, ক্রোধের সময় ধীরতা, ওয়াদা অঙ্গীকার সংরক্ষণ, দয়া ও সদাচারের যথাযথ মূল্যায়ন, চরিত্রের উৎকৃষ্টতা, সঙ্গী নির্বাচন কৌশলের দক্ষতা, শ্রমিক নিয়োগে জবরদস্তিতা না করা, পরামর্শ প্রার্থনা, ভেদ সংরক্ষণ, ন্যায় বিচার ও যুদ্ধের উপর শান্তির প্রাধান্য ইত্যাদি। আর বন্ধুত্ব ও কথা-কাজে সত্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় ব্যপারগুলোর মধ্যে রয়েছে জীবনে বন্ধুত্ব কথা ও কাজে সত্য নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা, বন্ধুত্ব সৃষ্টির শর্তাবলী ও তা সুদৃঢ় করণের পন্থাসমূহ।

তাছাড়াও উক্ত গ্রন্থে প্রকৃত বন্ধু ও কৃত্রিম বন্ধুর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করত বন্ধুত্বের মৌলিক কানুন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বন্ধুর বন্ধু, বন্ধু হবে এবং বন্ধুর শত্রু, শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হবে। সর্বোপরি গ্রন্থটিতে প্রগতি, মানবতা, উত্তম জীবন যাপন সত্যবাদীতা, অঙ্গীকার পালন, আমানতদারী, একনিষ্ঠতা,

---

[২৩২] এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান, *ঈদে মিলাদুন্নবী উৎযাপন কি ও কেন* (আল-ফাতিহা গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৫), পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

খোদাভীতি পার্থিব জগতের প্রতি অনাসক্তি, পরজগতে আসক্তি, আতিথেয়তার গুণাবলী অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে উপযুক্ত গুণাবলীর বিপরীত দিকগুলো পরিহার ও ঈর্ষা থেকে বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি সহিফা প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্‌ফা রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ *কালীলা ওয়া দিমনা*-এর প্রথম বঙ্গানুবাদ করেছেন গোলাম সামদানী কোরায়শী। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

হজ্জ আমাদের কি শেখায়

প্রখ্যাত দার্শনিক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আলী শরীয়তী রচিত *হজ্জ আমাদের কি শেখায়* নামক গ্রন্থটি ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন মুন্সী মোহাম্মদ রফিকুল হাসান। গ্রন্থটি ডন পাবলিশার্স আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা থেকে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে হজ্জ সম্পর্কে তাত্ত্বিক বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

ইন্তেখাব আয্‌ গুলিস্তান ওয়া পান্দনামা

গুলিস্তান ও *পান্দনামা* ফারসি ভাষার দুটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ। দুটি গ্রন্থের অনুবাদ একই গ্রন্থে সন্নিবেশ করে *ইন্তেখাব আয্‌ গুলিস্তান ও পান্দনামা* নামে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ দুটির মূল রচয়িতা যথাক্রমে শেখ সা'দী (র.) ও শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.)। এটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন মওলানা মুহাম্মদ সাইয়েদ নূর। গ্রন্থটির প্রকাশক মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্‌। নাবিলা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম থেকে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায়ে ১-৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত *গুলিস্তানে সা'দী* ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫০-১০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত *পান্দেনামায়ে আত্তারের* বর্ণনা বিধৃত হয়েছে।

আল মুরতাজা ইমাম আলী ইবনে আবি তালেব (আ.)

হযরত আলী (আ.) এর জীবনী গ্রন্থ "আল মুরতাজা" এর রচয়িতা সাইয়্যেদ আলী জাফরী। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন কাজী মাসুম। বেগম বাজার, ঢাকায় অবস্থিত 'নূর-এ-সাকলাইন' নামক জনকল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে মে, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে হযরত আলী (র.) এর জীবনী, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, গুণ ও কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী

তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী গ্রন্থের রচয়িতা ইউসুফ আলী খান (১৭২০-৮০/৮১ খ্রি.)। তিনি ছিলেন নবাব সরফরাজ খানের জামাতা এবং নবাব আলিবর্দী খানের সভাসদ ও নবাবের কর্মজীবনের প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ইউসুফ আলী খানের পিতার নাম গোলাম আলী খান। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, গোলাম আলী খান ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নবাবের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন সেনাপতি। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* এর তথ্য মতে, গোলাম আলী খান কিছুকাল আজিমাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন।

ইউসুফ আলী খান ছিলেন সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ইতিহাস রচয়িতা। ১৭৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি আলিবর্দী খানের জীবনী ও রাজত্বকালের ইতিহাস।

তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী মূলত আলিবর্দী খানের রাজত্বের ইতিহাস। আলিবর্দী খানের জীবনের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্ণনায় গ্রন্থাকার নবাব সুজাউদ্দিন খান ও নবাব সরফরাজ খানের রাজত্বকালের কিছু বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কেও তাঁর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। এ গ্রন্থে মূলত আলিবর্দী খানের জীবন-ইতিহাসই স্থান পেয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন নবাবের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তাঁর গ্রন্থে তিনি এমন সব সমসাময়িক ঘটনা বর্ণনা দিতে পেরেছেন যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বস্তুত বাংলার ইতিহাসের প্রামাণ্য বিবরণের জন্য আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষভাবে মূল্যবান। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে সৈয়দ গোলাম হোসাইন খান তবাতবায়ি এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কে.কে. দত্তের মন্তব্য স্মরণীয়:

> This work stands unique as a store house of valuable historical details, gathered by the auther from personal observation and experience.[২৩৩]

কে. কে. দত্ত আরো উল্লেখ করেছেন:

> The work gives a very valuable and detailed description of the history of Bengal subah during the mid-eighteenth century, espacialy of the administration of Alivardi. The auther an eye-witness of the political events of Bengal since the time of Sarfaraj, gives us many new facts and dates, which are not found in any other contemporary work.[২৩৪]

বাংলার ইতিহাসের এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি ইংরেজতে অনুবাদ করেন স্যার যদুনাথ সরকার। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি অনুবাদটি প্রকাশ করে। ডক্টর আব্দুস সোবহান গ্রন্থটির ফারসি পাঠ সম্পাদনা করেন এবং ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন এবং তা ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা

---

[২৩৩] Abdus Subhan, *Ta'rikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi* (Calcutta: The Asiatic Society, 1969), p. 3.

[২৩৪] *Ibid.*

একাডেমী, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। আহওয়ালে আলবির্দী খান (احوال علی بردی خوان), তারীখে আলবির্দী খান মহাবত জঙ (تاریخ علی بردی خوان مهابت جنگی), তারীখে ইলাহবর্দী খান মহাবত জঙ (احوال مهابت جنگی), আহওয়ালে মহাবত জঙ (تاریخ اله بردی خوان مهابت جنگ), তারীখে বাংলায়ে মহাবত জঙ্গী (تاریخ بنگله مهابت جنگی) নামে আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।[২৩৫]

داستان وفات یافتن جعفر خان و بجای او نشستن سرفراز خان نبیره اش

دران زمان که جعفر خان برحمت الهی پیوست نبیره اش سرفراز خان پسر شجاع الدین محمد خان بحسب ارث بر مسند امارت نشست. چون این خبر به شجاع الدین محمد خان در کتک رسید اگرچه بنابر حب جاه خار خار حکومت بنگاله در خاطر داشت اما بسبب اینکه اگر بقصد انتزاع آن از پسر متوجه شود و احیاناً اخذ آن مملکت بمصالحه صورت نگیرد و محاربه با پسر مستکره باشد ، خواست که از ارادهٔ خویش متقاعد گردد. آخرالامر بمشورت آن مدبر اقبالمند عزم رفتن بنگاله مصمم فرموده ، چون بحوالی مرشد آباد رسید سرفراز خان در اول امر باغوای بعضی از اشقیا قاصد آن شد که با پدر بمکاوحه آید اما از آنجا که سعادتمندی در طینت او مخمر بود ترک آن اراده فاسد نبوده و باستقبال والد ماجد شتافته ، در کل امور اطاعت والد را بر خود لازم و واجب فرمود. شجاع الدین محمد خان بر مسند ایالت بنگاله اتکا فرمود. رسیدن باین مرتبه را در ظاهر اسباب بحسن تدبیر آن مشیر بی نظیر تصور کرده ، من بعد مصالح کلی و جزوی مملکت را بی استمزاج و استشاره آن عالی مرتبت تمشیت نمی نمود . و فوجداری اکبر نگر بنام آن والا گهر مقرر داشته بمنصب عالی و خطاب علی وردی خان مخاطب و مباهی ساخت ، و حاجی احمد بعلاقه سایر مرشدآباد و میرزا محمد رضا به بخشیگری سایر و میرزا محمد سعید به بخشیگری شاگرد پیشه همدران اوقات مرتقی شدند. و شاه خانم همشیره غیر مادری حاجی احمد هم درین ایام در سلک ازدواج میر محمد جعفر خان بن سید احمد نجفی آمد . و تفصیل حالات خان مشار الیه که بصوبه داری بنگاله رسیده بود عنقریب رقمزده کلک بیان خواهد شد[২৩৬]

---

২৩৫ আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া (অনু.), *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. উপক্রমণিকা আটত্রিশ।

২৩৬ আবদুস সোবহান (সম্পা.), *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী* (কলকাতা: আনজুমানে এশিয়ায়ী, ১৯৭৯), পৃ. ৪-৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব জাফর খানের মৃত্যু ও তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত

আল্লাহর রহমতে জাফর খানের মৃত্যু হলে তাঁর দৌহিত্র ও শুজা-উ-দীন মোহাম্মদ খানের পুত্র সরফরাজ খান তাঁর (জাফর) উত্তরাধিকারী হিসোবে সিংহাসনে বসেন। শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান কটকে এই সংবাদ পান। বাঙলা [সুবা] শাসনের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও এই রাজ্য লাভ করার বাসনা তাঁর ছিল। কিন্তু নিজ সন্তানের কাছ থেকে এই শাসনভার নিতে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় তা সম্ভব না হলে সংগ্রামের প্রয়োজন হলে তা হবে অবমাননাকর। এসব চিন্তা করে তিনি এ কাজ থেকে বিরত থাকতে চান।

কিন্তু অবশেষে এই সৌভাগ্যশালী প্রশাসকের (আলিবর্দী খান) পরামর্শে তিনি বাঙলায় আগমনের সিদ্ধান্তে মনস্থির করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী এক স্থানে উপনীত হলে কয়েকজন দুর্বৃত্তের প্ররোচনায় সরফরাজ খান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান। কিন্তু মহত্ত্ব তাঁর চরিত্রে নিহিত থাকার কারণে এই সংকল্প পরিত্যক্ত হয় এবং তিনি তাঁর মাননীয় পিতার অভ্যর্থনার জন্য দ্রুত এগিয়ে যান। [এরপরে] তাঁর পিতার সব আদেশ মেনে চলাকে তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। শুজা-উদ্-দীন মোহাম্মদ খান [এভাবে] বাংলার শাসনকর্তার আসনে অধিষ্ঠিত হন। এই অতুলনীয় উপদেষ্টার (আলিবর্দী খান) অনুপম ব্যবস্থার কারণে তিনি বাহ্যত এই পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এই কথা স্মরণে রেখে তিনি (শুজা-উদ্-দীন) রাজ্যের পূর্ণ বা আংশিক কোন কাজই এই মহান ব্যক্তির (আলিবর্দী খান) উপদেশ ও পরামর্শ ছাড়া করতেন না। এই মহান ব্যক্তিকে আকবর নগরের ফৌজদার পদে নিযুক্তি দান করে তাঁকে উচ্চ পদে ও আলিবর্দী খান উপাধিতে ভূষিত করেন। হাজী আহমদ মুর্শিদাবাদের আবগারি শুল্ক বিভাগের [কর্মকর্তার] দায়িত্ব ও মীর্জা মোহাম্মদ রেজা (নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান) আবগারি শুল্ক বিভাগের সচিবের পদ লাভ করেন। মীর্জা মোহাম্মদ সাঈদকে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের বখশির পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে হাজী আহমদের বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ খানমের সঙ্গে সৈয়দ আহমদ নজফীর পুত্র মীর মোহাম্মদ জাফর খানের বিবাহ হয়। এই [মীর মোহাম্মদ জাফর] খান পরবর্তীকালে বাঙলার নবাব হয়েছিলেন এবং সেই বিস্তারিত ইতিহাস শীঘ্রই বর্ণনা করা হবে।[২৩৭]

মোজাফ্‌ফরনামা

মোজাফ্‌ফরনামার রচয়িতা করম আলী (জন্ম ১৭৩৬ খ্রি.)। মাতৃকুলের দিক থেকে তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের আত্মীয়। আলিবর্দী খান যখন বিহারের নায়েব নাজিম তখন তাঁর আমন্ত্রণে গ্রন্থাকারের পিতা (নাম জানা যায় নি) দিল্লী থেকে পাটনায় আসেন এবং হাজী আহমদের সুপারিশক্রমে বর্ধমান চাকলার ওয়াকিয়া নবিশ পদে চাকুরী লাভ করেন। আলিবর্দী খানের ঘনিষ্ট আত্মীয় হিসেবে গ্রন্থকার করম আলী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং মাত্র ১২ বছর বয়সে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার নিযুক্ত হন।[২৩৮] নবাব আলিবদী খানের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর করম আলী বাংলার নায়েব নাজিম (১৭৬৫-৭২ খ্রি.) সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা খান মোজাফ্‌ফর জঙের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৭৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করে মোজাফ্‌ফর জঙের নামানুসারে গ্রন্থটির নামকরণ করেন *মোজাফ্‌ফরনামা*।

---

[২৩৭] কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া (অনু.), *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৯।

[২৩৮] কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া (অনু.), *মোজাফফরনামা ও নওবাহরি-ই-মুর্শিদকুলীখানি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. চার।

Dhaka University Institutional Repository

করম আলী রচিত *মোজাফ্‌ফরনামা* গ্রন্থের বেশিরভাগ বর্ণনাই তিনি সম্ভবত ইউসুফ আলী খানের *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন যদিও এ ব্যাপারে তিনি ইউসুফ আলী খানের ঋণ স্বীকার করেননি। ইতিহাস সংকলনে করম আলী পারদর্শিতার পরিচয় দিতে না পারলেও ঘটনা বর্ণনায় করম আলীর বস্তুনিষ্ঠতা প্রশংসনীয়।

করম আলী ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে বাংলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সময় বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলী খান। কিন্তু দু'একবার নামোল্লেখ ছাড়া মুর্শিদকুলী খান সম্পর্কে করম আলী কোন বর্ণনাই দেননি। নবাব সুজাউদ্দিন খান ও নবাব সরফরাজ খান সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এ গ্রন্থের প্রায় সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালের বর্ণনা। *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* গ্রন্থের মত আলোচ্য গ্রন্থেও আলিবর্দী খান ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের আদি এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। আলিবর্দী ও তাঁর পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ তাদের ত্রুটি বর্ণনায় গ্রন্থকারের কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও সত্যকে প্রকাশ করার ঐকান্তিক আগ্রহের কারণেই আলিবর্দী খানের চরিত্রের কদর্য দিক উন্মোচনে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি।

সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালের বর্ণনার ব্যাপারে ঐতিহাসিক হিসেবে করম আলী প্রশংসার দাবীদার। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে মীর জাফর, রায়দুর্লভ প্রমূখের ষড়যন্ত্রের কথা তিনি পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। চক্রীদলে জগৎশেঠের সম্পৃক্ততার কথাও তাঁর বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। পলাশির ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের ভূমিকাও তিনি চিহ্নিত করেছেন। দেশীয় চক্রীদের ষড়যন্ত্র ও ইংরেজদের সাথে তাদের যোগসাজশের ফলেই যে ইংরেজরা নবাবকে পরাজিত করে বাংলা দখল করতে পেরেছিল সেকথাও স্পষ্টভাবে এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নবাবী বাংলার ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে *মোজাফ্‌ফরনামা* বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এ গ্রন্থে সামাজিক ইতিহাসেরও কিছু উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে যা এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধি করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ও স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত *নওয়াবস বেঙ্গল* গ্রন্থ অবলম্বনে *মোজাফ্‌ফরনামা* গ্রন্থটি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আ.কা. মো যাকারিয়া কতৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হয়ে *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি* গ্রন্থের অনুবাদ সহ একত্রে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। আ. কা. মো. যাকারিয়া আলোচ্য গ্রন্থটি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ সার্থক ও সফল অনুবাদ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি

নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি গ্রন্থের রচয়িতা ইরান থেকে আগত পণ্ডিত আজাদ আল হোসাইনী। আজাদ আল হোসাইনী খুব সম্ভবত ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের নামে গ্রন্থের নামকরণ করেন। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের প্রকৃত নাম মীর্জা লুৎফুল্লাহ এবং তাঁর উপাধি 'রুস্তমজঙ'। তিনি ছিলেন নবাব সুজাউদ্দিন খানের জামাতা। ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম ছিলেন। যদুনাথ সরকারের বক্তব্য মতে, ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ এপ্রিল এ নায়েব-নাজিম ঢাকায় আসেন এবং পরের বছর ইরান থেকে আগত আজাদ-আল হোসাইনী নামক একজন পণ্ডিত তাঁর রচিত *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি* নামক গ্রন্থটি নায়েব নাজিমকে উপহার দেন।[২৩৯]

নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৫। যদুনাথ সরকার বোম্বে সরকারের মোহাফেজখানা থেকে বাংলার ইতিহাস সংক্রান্ত অসাধারণ মূল্যবান এ ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপিটি আবিস্কার করেন এবং তাঁর *Bengal Nawabs* গ্রন্থে মাত্র ৮ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি গ্রন্থটি যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি এর উপজীব্যও অত্যন্ত সীমিত। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার মতে, একে স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ বললেই বোধ হয় এর উপর সুবিচার করা হবে। কেননা কিছু কিছু স্থানীয় ঘটনার ইতিহাসই এ গ্রন্থে বেশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত গ্রন্থটিতে কিছু মূল্যবান উপদেশ, কিছু কাহিনী, গ্রন্থাকারের পৃষ্ঠপোষকের প্রভূত প্রশংসা ইত্যাদি রয়েছে। *ইবহমধষ ঘধধিনং* গ্রন্থে *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি* এর ইংরেজী অনুবাদে সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩ খ্রি.), সুবাদার আজম শাহ ও জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান সর্ম্পকে কিছু সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। নবাব সুজাউদ্দিন খানের শাসনামলে নবাবী বাহিনী কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়ের কাহিনীর বিশদ বিবরণী আজাদ আল হোসাইনীর গ্রন্থ ছাড়া সমসাময়িক আর কোন গ্রন্থে নেই। সলিমুল্লাহর *তারিখ-ই- বাঙ্গালাহ* গ্রন্থে এবং গোলাম হোসাইন সলিমের *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। তবে *মোজাফফরনামা, তারিখ বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* ও *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখমাত্র নেই। *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি* গ্রন্থে বর্ণিত অন্যান্য সব

[২৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা বাদ দিলেও নবাবী আমলে ত্রিপুরা বিজয় সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনার জন্যই ক্ষুদ্র এ পুস্তিকাটির তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ও স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত *নওয়াবস বেঙ্গল* গ্রন্থ অবলম্বনে *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি* গ্রন্থটি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আ.কা. মো যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হয়ে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। আ. কা. মো. যাকারিয়া আলোচ্য গ্রন্থটি টীকা সহ এত চমৎকারভাবে অনুবাদ করেছেন যে, গ্রন্থ পাঠে একে কোন অনুবাদ গ্রন্থ বলে মনে হয়না ।

কেবরিতে আহমার

শাহ্ সুফী হযরত শাহ নুরী (র.) রচিত *কেবরিতে আহমার* নামক গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করেন এ. কে. এম মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ শাহ জালাল। গ্রন্থটি সাইয়্যেদ আবদুল মালেক কর্তৃক ফহমী প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকা থেকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু দু'টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদ বিদ্যমান। *কেবরিতে আহমার* গ্রন্থে হযরত বাঘু দেওয়ান (র.) এর জীবন ও তাঁর তরীকত সম্পর্কে বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির অনুবাদের নমুনা নিম্নরূপ:

رباعی خونا به دل خور که شرابی به از این نیست
دندان بجگرزن که کبابی به این نیست
از کنز و هدا یا نتوان یافت خدا را
در صفحه دل بین که کتابی به از این نیست

অনুবাদ:

চতুষ্পদী অন্তরের খুন দিয়ে পড়ো
এর চেয়ে উত্তম শরাব আর নেই
কলিজায় কামড় দাও এর চেয়ে ভালো কাবাব আর নেই
কান্‌জ আর হেদায়া পড়ে খোদাকে পাওয়া যাবে না
অন্তরের পাতায় এর চেয়ে ভাল কিতাব আর মিলবে না।[২৪০]

বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭৯ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়কালে বাংলা ভাষায় উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অনূদিত হয়–

---

[২৪০] এ. কে. এম মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ শাহজালাল (অনু.), *কেবরিতে আহ্‌মার* (ঢাকা: ফাহমী প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১১৯-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

ঝরনার প্রহরী গ্রন্থের মূল রচয়িতা জয়নাল আবেদীন আল হোসাইনী। অধ্যাপক সিরাজুল হক কর্তৃক এ গ্রন্থটি অনূদিত হয়। যাকারিয়া তামির রচিত *ফিলিস্তিন* কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার অনুবাদ করেছেন। *চাতরে নূর* রচিত *হাফত দোখতার* গ্রন্থটি *সাত কন্যা* নামে মো. আলমগীর হোসেন অনুবাদ করেন। আফ্রিকান উপকথা অবলম্বনে ফারসি ভাষায় রচিত *গুরবেহ ও মোরগ* নামক গ্রন্থটি *বিড়াল ও মোরগ* নামে আনিসুর রহমান স্বপন কর্তৃক অনূদিত হয়। আফ্রিকান উপকথা অবলম্বনে ফারসি ভাষায় রচিত *গুনজাশক ও ফীলে গোলে পেইকার* গ্রন্থটি *চড়ুই পাখি ও মস্ত হাতী* শিরোনামে কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার কর্তৃক অনূদিত হয়। ইরানী চৌদ্দজন ফারসি গল্পকারের গল্প অবলম্বনে *সোনালী পাখীর ডানা* শিরোনামে মুহাম্মদ শাহজালাল কর্তৃক অনূদিত হয়। তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী কর্তৃক *ছোটদের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা* শিরোনামে ফরসি থেকে অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ফারসি সাহিত্য অবলম্বনে *পশু-পাখীর গল্প* শিরোনামে মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান কর্তৃক অনূদিত হয়। আলোচ্য সময়কালে মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান কর্তৃক ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অবলম্বনে বেশ কিছু গ্রন্থ অনূদিত হয়। যেমন: *সাধু-শয়তান, আজব শিশু, শিয়াল ও কাক, সওদাগরের তোতা পাখি, সুলতান মাহমুদের দাড়ি, গুলিস্তান ও বোস্তানের কাহিনী, ইঁদুর ছানাদের স্কুল যাত্রা, রুবাইয়াতে হাফেজ্জী হুজুর* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নূর হোসেন মজিদী কর্তৃক ইমামের *অসিয়ত নামা* গ্রন্থটি ইমাম খোমেনীর রচনাবলী সংকলন ও প্রকাশনা ইনষ্টিটিউট তেহরান থেকে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নূর হোসেন মজিদীর ফারসি থেকে অনূদিত গ্রন্থ *তৌহিদের দিকে আহবান, বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (স.), জ্ঞানী বাহলুল ও খলীফা হারুন* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৬
একুশ শতকে ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদের ধারা (২০০১-২০০৫)

ইসলামী বিপ্লবোত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে ফারসি বঙ্গানুবাদের যে স্রোতধারা সৃষ্টি হয়; এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের পর তা আরো ব্যাপকতা লাভ করে। আলোচ্য সময়কালে অনেক ফারসি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। এ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক, ভাষা ও সাহিত্য এবং ধর্মীয় বিষয়ে ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬.১ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী

আলোচ্য সময়কালে ইতিহাসের মৌলিক ফারসি গ্রন্থের নূতন অনুবাদ তেমন পরিলক্ষিত হয় না। ইতিহাস রচয়িতা আবুল ফজল এর *আকবরনামা* এবং জওহর আফতাবচী রচিত *তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত* গ্রন্থটি *সম্রাট হুমায়ুনের কাহিনী* শিরোনামে অনূদিত হয়।

আইন-ই-আকবরী

আবুল ফজল আল্লামী *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় রচনা করেন। মোগল সম্রাটদের মধ্যে আকবর ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর পুরোনাম জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবর (১৫৪২-১৬০৫)। ইতিহাস রচয়িতা ও *আকবরনামা* এর লেখক আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২) ছিলেন আকবরের সমবয়স্ক ও তাঁর মন্ত্রী। *আইন-ই-আকবরী* মূলত আবুল ফজল আল্লামীর *আকবরনামা* গ্রন্থের একটি খণ্ড। *আকবরনামা* এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে তাইমুর বংশের বিবরণ, বাবরের শূর বংশের রাজাদের রাজত্ব সংক্রান্ত বিষয় ও অন্যান্যদের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডে মোগল সম্রাট আকবরের প্রায় ছিচল্লিশ বছরের রাজত্ব সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড তথা *আইন-ই-আকবরী*তে রয়েছে আকবরের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নানা রাজনীতি ও তথ্য। মহামতি আকবরকে জানার জন্য এসব উপকরণ অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। আবুল ফজল সম্রাট আকবরের একজন ঘনিষ্ঠজন হিসেবে সম্রাটের দরবারে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকে সম্রাটকে যেমনটি দেখেছেন ঠিক তেমনটি সংযত ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। যার ফলে তাঁর *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থটি মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থমালার সবচেয়ে প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন এইচ ব্লকম্যান। আর ব্লকম্যানের ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলা অনুবাদ করেছেন আহমদ ফজলুর রহমান। বইটি বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে এপ্রিল ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আহমেদ ফজলুর রহমান কর্তৃক অনূদিত *আইন-ই-আকবরী* থেকে কিছু অংশ উপস্থাপিত হল:

ای همه در پرده نهان را ز تو
بیخبر انجام ز آغاز تو
در تو هم آغاز و هم انجام گم
هر دو بشهر قدمت نام گم
پای سخن لنگ و زبان سنگ لاخ
بال قدم تنگ و بیابان فراخ
حیرت اندیشه سپاس تو بس
بیخودیم روی شناس تو بس

سزاوار شناسائی آنکه از نیایش گفتار بستایش کردار گراید و بنگارش لختی شگز وکاری جهان آفرین جاودنی سعادت اندوزد و روز نهٔ دل بشگاف قلم برابر دارد. بوکه فروغ دولت شاهنشاهی برو تابد و بدین روشن هوشی نم قطرهٔ از دریا و خاك ذرّهٔ از بیابان بر گرفته جاودان فرخی گرد آورد و ویرا نکدهٔ گفت و کرد را آباد سازد[১]

আল্লাহু আকবর
হে প্রভু তোমার রহস্য চির আচ্ছন্ন
তোমার পূর্ণতার নেই কোন প্রারম্ভ
শুরু ও শেষ দুইই তোমার মধ্যে লীন
তোমার এই অনন্ত বিশ্বে তার নেই কোন চিহ্ন
আমার কথা ভীরু, আমার জিহবা হয়েছে পাথর
আমার পদযুগল অনড়, কিন্তু অনাদি এই বিশ্ব।
আমার ভাব গেছে হারিয়ে; কিন্তু এই তোমার শ্রেষ্ঠ প্রশান্তি।
শুধু ভুমানন্দে আমি তোমাকে দেখি মুখোমুখি।

সত্যিকারের জ্ঞানী লোকের পক্ষে শুধু বাক্যেই নয়, কার্যেও আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং তার দয়ার দ্বার খুলে দিয়ে সৃষ্টিকর্তাও আশ্চর্য গুণাবলী বর্ণনা লেখার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হওয়া উচিত। হয়তো সম্রাটের গৌরবচ্ছটা তার প্রতি বিকীর্ণ হবে এবং তারই

[১] আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, তা.বি.), পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

আলোতে যে সমুদ্র করতে সক্ষম হবে। এভাবে সে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হবে এবং কথা ও কাজের এ নিয়ম জগৎকে রসসিক্ত করে তুলতে পারবে।[২]

آئین منزل آبادی

فطرت بلند و همت عالی آنست که ذرات آفرینش را بی گزیدگی فلان و بهمان جلوه گاه نیرنگی ایزدی قدرت داند و باندازهٔ آن چالش درو نی وبیرونی نماید و از روی شناسائی با خویش و بیگانه هنگامهٔ قدردانی گرم وارد. و اگر بدین پایه نرسد ناگزیر از آویزش بپرهیزد و هنجار آشتی پیش گیرد. اگر تزرد گزین ست بگرامی خوها خویشتن را آراسته گرداند و اگر از وابتگان عاشقانه دل در انتظام آن بندد و آزاد خاطر زید[৩].

সম্রাটের গৃহস্থালী
আইন-১
গার্হস্থ্য

যিনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তুকে আল্লাহর অনুগ্রহের আলোকণা দেখতে পায় তিনি অতি সমঝদার ও মহৎ চিন্তাধারার লোক। তিনি তাঁর অন্তরের ও বাইরের চরিত্র সেভাবে গঠন করেন এবং যেমন নিজেকে তেমনি অন্যকেও সমীহ করেন। এসব গুণের যিনি অধিকারী নন তার পক্ষে এ পৃথিবীর সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করে, নীরব দর্শক হয়ে থাকাই উচিত। প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি আসন গ্রহণ করেন তা হলে তিনি সৎ গুণাবলীর বিকাশ সাধন করবেন; আর যদি তার পদ অন্যের অধীনে হয় তাহলে তিনি সর্বান্তকরণে নিজের কাজ সম্পন্ন করবেন এবং নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করবেন।

আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ব্যাপারে যারা মহৎ তারা কার্যের খুঁটিনাটি থেকে দূরে থাকে না। অপর পক্ষে তাঁরা নিজের কার্য সম্পাদনকে আল্লাহর এবাদত বলে মনে করেন।[৪]

آئین خزانه دار

بزبان وقت فوطه دار گویند. خزینه خانه را نزد حاکم اساس نهد و چنان سرزمینی گزیند که گزندی بدو نرسد. هر قسم مهر و روپیه و زرسیاه و جز آن که بزرگر آورد بگیرد. و زر مخصوص طلب ندارد. و از سکّهٔ مقدّس انچه بوزن برابر باشد صرف آن نخواهد و تفاوت وزن مسکوک بستاند. و باستانی مسکوک را بنا

[২] আহমদ ফজলুর রহমান (অনু.), *আইন-ই-আকবরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ৪৮।
[৩] আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।
[৪] আহমদ ফজলুর রহমান (অনু.), *আইন-ই-আকবরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

مسکوک بر گیرد. زر بوقوف شقدار و کارکن در گزین جا دارد و آخر روز بر شمارد و سر خط بمهر عمل گزار رساند و روز نامچه را بانسخهٔ کارکن برابر کند و بخط خود نشانمند سازد. در خزانه را چنانچه عامل مهر نماید یک قفل از خود نیز بر نهد. و بآگهی عامل و کارکن در خزانه بکشاید. زر از کشاورز بشناسائی عامل وکارکن بستاند و قبض دهد و خط بیواری بر بیاضچهٔ حساب که بعرف هندوستان بهی گویند (بفتح با و کسرها و سکون یای تحتانی) نویساند تاغبار خلاف بر خیزد. هیچ گونه بی دست آویز دیوان فند خرج نکند. دو کانچهٔ سود بر نسازد. و اگر خرج ناگزیر روی دهد که درنگ بر نتابد بنوشتهٔ کر کن و شقدار عمل نماید و حقیقت بموقف عرض رساند[৫]

আইন-৭
খাজনাদার বা কোষাধ্যক্ষ

বর্তমান কালের ভাষায় এ ফোতাদার ৮বলা হয়। কোষাগার প্রদেশিক শাসনকর্তার আবাস স্থলের নিকটে স্থাপন করা উচিত এবং এমন স্থানে তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে এর কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে। কৃষকদের নিকট হতে তিনি সকল রকমের মোহর, টাকা, তাম্রমুদ্রা, তারা আনয়ন করে তাই তিনি গ্রহণ করবেন। কোন বিশেষ ধরনের মুদ্রা দাবি করতে পারবেন না। সম্রাটের প্রচলিত মহান মুদ্রায়, মূল্যবান তিনি কম ধরতে পারবেন। পূর্বের নৃপতিদের মুদ্রা তিনি ধাতুরূপে গ্রহণ করবেন। তিনি সব অর্থ একটা সুরক্ষিত কক্ষে রাখবেন এবং তা সিকদার ও রেজিষ্ট্রারকে জানাবেন এবং প্রত্যেকদিন বিকালে তা গণনা করবেন এবং এর স্মারকলিপি প্রস্তুত করে তা আমলগুজার দিয়ে সহি করাবেন এবং দৈনিক জমাখরচের খাতার সঙ্গে। রেজিষ্ট্রারের হিসেব মিলে দেখবেন এবং তার সহি দ্বারা সত্যতা প্রতিপাদন করবেন। কোষাগারের দরজায় আমলগুজারের সীলমোহরের পর তিনি তার নিজের তালা লাগাবেন এবং শুধুমাত্র আমলগুজার ও রেজিষ্ট্রারের জ্ঞাতসারে এটা খুলবেন। কৃষকদের নিকট হতে তিনি আমলগুজার ও রেজিষ্ট্রারের অজ্ঞাতে কোন অর্থ গ্রহণ করবেন না। হিন্দুস্থানে বহিনামে পরিচিত হিসেবের খাতায় তিনি পাটওয়ারীর সহি নিবেন যাতে গড়মিল না থাকতে পারে। দেওয়ানের আদেশপত্র (ভাউচার) ছাড়া কোন অর্থ প্রদান করবেন না এবং সুদ সম্বন্ধীয় কোন রূপ আদান-প্রদানে জড়িত হবেন না। যদি কোন খরচ এমন আবশ্যকীয় হয় যে কোন রূপ বিলম্ব করা যায়না তখন তিনি রেজিষ্ট্রার ও শিকদারের আদেশে সেই খরচ করতে পারেন এবং পরে তা সরকারের নিকট নিবেদন করবেন।[৬]

উল্লেখ্য যে ফজলুর রহমান, এইচ ব্লকম্যান কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থটির অনুবাদ অবলম্বনে প্রথম খণ্ডের নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ করেছেন। এ অনুবাদে আরবী-ফারসি নামের প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে এত বেশী বিশৃঙ্খলা রয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে মূল নাম উদ্ধার করা যায়না।

[৫] আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।
[৬] আহমদ ফজলুর রহমান (অনু.), *আইন-ই-আকবরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

তাযকিরাতুল ওয়াকিয়াত সম্রাট হুমায়ুনের কাহিনী

সম্রাট হুমায়ুনের জীবনী, সিংহাসনারোহণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী সম্বলিত *সম্রাট হুমায়ুনের কাহিনী* শিরোনামে রচিত গ্রন্থটির মূল নাম *'তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত'*। গ্রন্থটির মূল রচয়িতা জওহর আফতাবচী। আফতাবচী ছিলেন মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের জলপাত্রবাহক ভৃত্য, সামান্য ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত জওহর বেশ শিক্ষিত ছিলেন, *তাজকিরাতুল-ওয়াকিয়াত* এর রচনাভঙ্গিই তার প্রমাণ। *তাজকিরাতুল-ওয়াকিয়াত* গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে জওহর ফারসি সাহিত্যের অমর কবি হাফিজ, সা'দী, জামী প্রভৃতির কবিতা থেকে সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন এবং মাঝে মাঝে কোরআন হাদীসের বাণীও উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থের স্থানে স্থানে জওহর এর আবেগপ্রবণ উচ্ছাসময় ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

> "খবর পাওয়া গেল যে, সম্রাট হুমায়ুন মৃত্যুর শরবৎ পান করে এ পার্থিব জগৎ থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। ...এ মানবিক অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নয়। জীবনের পোষাক যিনি পরিধান করেছেন, তাঁকে অবশ্যই মরণের পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে।..যে গাছ শ্যামলিমায় বেড়ে ওঠে, শেষে একদিন তাকে মাটিতেই মিশে যেতে হয়; আর যে পাতা রসাশ্রিত হয়ে সতেজ শোভা বিস্তার করে, সময় হলেই তাকেও ঝরে পড়তে হয়।"[৭]

জওহর আফতাবচী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন এবং কোন ক্ষেত্রেই তিনি সত্য গোপন করেননি, এ ব্যাপারে তার একটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকেই তা অনুধাবন করা যায়। যেমন:

> "ওজু করার জন্যে যখন তিনি (সম্রাট) অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন, আমার গালে এক চপেটাঘাত করেই ভর্ৎসনা করতে করতে বলে উঠলেন-'তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব আমি প্রদান করেছিলাম, সে কাজ তুমি ফিরিয়ে দিলে কেন?' সম্রাটের এ প্রশ্নের কোন সদুত্তরই আমার কাছে ছিল না। নিজের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করে নিয়েই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।'[৮]

আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন চৌধুরী শামসুর রহমান। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে *তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত* নামেই বইটি বের হয় কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে। ৩৩ বছরেরও বেশী সময় পর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে বইটি আবার বের হল দিব্যপ্রকাশ থেকে। চৌধুরী শামসুর রহমান স্বীয় অনুবাদ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

> বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সম্মুখে এ গৌরবেতিহাস প্রকৃত প্রেক্ষিতে তুলে ধরতে হলে মুসলিম শাসন আমলের সাহিত্য কীর্তি, বিশেষত ইতিহাস নিয়ে আমাদিগকে ব্যাপক অনুশীলনেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। *তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত*-এর এ অনুবাদ এবম্বিধ

---

[৭] চৌধুরী শামসুর রহমান, *সম্রাট হুমায়ূনের কাহিনী (তাযকিরাতুল ওয়াকিয়াত)* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ১৫৩।
[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

> অনুশীলনেরই একটি প্রচেষ্টা। বইখানাকে শুধুমাত্র অনুবাদ করেই আমি ক্ষান্ত হইনি; বহু সংখ্যক পাদটীকা সংযোজন করে একে একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপদানের জন্যেও বিশেষভাবে চেষ্টা করেছি। আমার এ প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হয়েছে, দেশের সুধী-সমাজই তা বিচার করবেন।[৯]

চৌধুরী শামসুর রহমান কর্তৃক অনূদিত *তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত* এর অনুবাদ *সম্রাট হুমায়ুনের কাহিনী* শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে অনুবাদের কিয়দাংশ উপস্থাপিত হল:

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মহামান্য সম্রাটের গুজরাট আক্রমণ ও বিজয়

> মহামান্য বাদশাহ গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং তাঁর বিজয়ী সেনাদল যখন বালুর দূর্গে গিয়ে উপনীত হলো, তখন গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের কাছ থেকে এক পত্র পাওয়া গেল। সুলতান বাহাদুর উক্ত পত্র মারফত সম্রাটকে বিদিত করেন যে, তিনি চিতোর দূর্গ অবরোধ করে রেখেছেন এবং বিধর্মীদের পরাজিত করে ইসলামকে গরিয়ান করাই তাঁর ইচ্ছা। সুতরাং সম্রাট যেন এ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন। সুলতানের এ অনুরোধ মতো সম্রাট অনেক দিন পর্যন্ত বালুর দুর্গের সান্নিধ্যে অপেক্ষা করলেন। সুলতান বাহাদুর ইতিমধ্যে চিতোর দুর্গ জয় করে গুজরাটে ফিরে আসেন।
>
> সম্রাটও এর পর পুনরায় গুজরাট অভিমুখে রওনা হলেন এবং স্বীয় পরাক্রান্ত বাহিনীসহ বুরহানপুর জেলার মুরী গ্রামের নিকটে গিয়ে পৌছালে সুলতান বাহাদুর এগিয়ে এসে বাধা দিলেন। সম্রাট তখন স্বীয় অমাত্যবর্গকে নিকটে আহবান করে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন। প্রত্যেক অমাত্যই নিজের নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী মতামত প্রকাশ করলেন। অবশেষে সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, বাহাদুর শা'র সেনাদলকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে তাদের রসদ বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। কারণ এভাবেই দুশমনদের পর্যদুস্ত করা সম্ভবপর ছিল।[১০]

৬.২ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী

কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা (বেসরকারী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা) কে *দরসে নিযামী*[১১] শিক্ষা ব্যবস্থাও বলা হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্য তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ফারসি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গটিও অত্র গবেষণা কর্মের একটি বিশেষ দিক বটে। প্রসঙ্গত, দরসে নিযামী নামটি ব্যবহারের সূচনা হয় ১০৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পরে। ঐ সময় খোরাসান নামক (বর্তমান ইরান, আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের বিশাল অঞ্চল জুড়ে ভৌগলিক সীমারেখা পূর্ণ) যে দেশটি ছিল তার গভর্ণর ছিলেন শাহ নিযামুল মুলক। জ্ঞানসেবা ছিল তাঁর নেশা। তিনি তৎকালীন জ্ঞানের আধার বাগদাদে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যার নামকরণ করা

---

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।
[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।
[১১] রফীক আহমদ রফীক, *এরশাদুত্তালেবীন ফী আহওয়ালিল মুসান্নিফীন* (করাচী: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৮২-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

হয় মাদরাসায়ে নিযামিয়্যাহ নামে। পরবর্তীকালে এ মাদরাসা প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থাই তারিকে তালীমে দরসে নিযামী বা দরসে নিযামী শিক্ষা ব্যবস্থা নামে পরিচিতি লাভ করে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত বাংলাদেশের বেসরকারী মাদরাসা সমুহের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ফারসি গ্রন্থাবলী ছাড়াও অন্যান্য অনূদিত গ্রন্থের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

মীযান

মীযান গ্রন্থটি দরসে নিযামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় লিখিত। মীযান শব্দটি আরবী, যার অর্থ পরিমাপের যন্ত্র বা ওজন করার যন্ত্র। মূলত গ্রন্থটিতে আরবী শব্দ প্রকরনের বিভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি ও তার পরিমাপ ও পরিধি বর্ণিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় *মীযান*।

এ গ্রন্থের লেখক নিয়ে রয়েছে অনেক মতভেদ। যেমন কারো মতে, এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন শেখ মুসলেহুদ্দীন সাদী। আবার কেউ বলেন গ্রন্থটির রচয়িতা শেখ ওয়াজউদ্দীন বিন উসমান বিন হুসাইন। আবার কারো মতে, এ গ্রন্থের রচয়িতা মুল্লা হামযা বদায়ুনী। কারো মতে, এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন শেখ সফিউদ্দীন বিন নাসীরুদ্দীন বিন নিযামুদ্দীন বিন খাজা আদম গজনবী রদুলবী জৌনপুরী (র.)। মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবীর মতে, এর গ্রন্থকার হল মুহাম্মদ বিন মুস্তফা বিন হাজী হাসান। এ সংক্রান্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতটি হল– গ্রন্থটির লেখকের নাম শায়খ সিরাজুদ্দীন উসমান আওয়াধী।[১২] তিনি সুলতানুল মাশাইখ হযরত নিযামুদ্দীন মুহাম্মদ বদায়ূনী দিহলভী-এর প্রতিনিধি বা খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ১৩৫৬/ ৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৩] ফারসি ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক সমাদৃত *মীযানুস সরফ* ও *পাঞ্জেগাঞ্জ*। ফারসি গ্রন্থ দু'টির বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল:

মীযানুস সরফ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন মুফতী অলিউল্লাহ কাসেমী। *দরসে মীযান* শিরোনামে ইসলামিয়া কুতুব খানা থেকে ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অনুবাদটি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হওয়ার ফলে এ পর্যন্ত গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক এখানে ব্যাখ্যাপূর্ণ ভাবানুবাদ করেছেন। নিম্নে তার অনুবাদের নমুনা তুলে ধরা হল:

---

[১২] মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *যফরুল মুহাসিসলীন* (করাচী: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা), পৃ. ৩০৯-৩১০।
[১৩] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

اما مستقبل فعلی را گویند که بزمانه آئنده تعلّق دارد و آخر او مرفوع باشد . مگر بعارض چون يفعِلُ يفعَلُ يفعُلُ يُفعلل چون يضرب، يسمع، يكرم يبعثر[১৪]

অনুবাদঃ যাহোক مستقبلএমন فعل কে বলে, যা ভবিষ্যৎ কালের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তার শেষাক্ষর مرفوع (পেশ বা নূনে এরাবী বিশিষ্ট) হবে। তবে কারণবশতঃ (অর্থাৎ কোন কারণে) পেশ বা নূনে এরাবী নাও থাকতে পারে। (যেমন- مضارع এর শুরুতে যদি لن বা لم আসে তখন فعل مضارع তে আর পেশ বা নূনে এরাবী হবে না বরং فعل مضارع তখন جزم বা نصب বিশিষ্ট হবে।)

যেমনঃ يفعل যার ওযনে يضرب এসেছে, يفعَل যার ওযনে يسمع এসেছে, يفعُل যার ওযনে يكرُم এসেছে, يفعلل যার ওযনে يبعثر এসেছে।[১৫]

মীযানুস সরফ ফারসি ভাষায় রচিত আরবী ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে এর গুরুত্ব অপরিসীম। হয়তো সেই গুরুত্বের কারণেই আলোচ্য গ্রন্থটির অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ উর্দু ভাষায় বিভিন্ন শিরোনামে ১২টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[১৬]

পাঞ্জেগাঞ্জ

পাঞ্জেগাঞ্জ ফারসি ভাষায় রচিত আরবী শব্দ রূপান্তর বিষয়ের বর্ণনা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। অবশ্য মীযান গ্রন্থের তুলনায় এতে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটিকে সরফ তথা রূপান্তর শাস্ত্রের দ্বিতীয় স্তরের গ্রন্থরূপে মনে করা হয়। মীযান গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ সিরাজুদ্দীন উসমান চিশ্তী নিযামীই *পাঞ্জেগাঞ্জ* শিরোনামে গ্রন্থটি রচনা করেন। এর প্রমাণ হলো-এ গ্রন্থের এক স্থানে প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন فاعل و مفعول را در میزان بیان کردیم অর্থাৎ ফায়েল (কর্তা) এবং মাফউল (কর্মের) আলোচনা আমি মীযান গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।[১৭] মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী *পাঞ্জেগাঞ্জ* গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন। গ্রন্থটি ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে আল আকসা লাইব্রেরী বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলায় অনূদিত *পাঞ্জেগাঞ্জ*-এর আরেকটি বঙ্গানুবাদ করেন মাওলানা হাবীবুর রহমান। এ গ্রন্থটি আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ যোবায়ের কর্তৃক অপর আরেকটি বঙ্গানুবাদ *পাঞ্জেগাঞ্জ* বা *আযীযুত্ব ত্বালিবীন* নামে প্রকাশিত হয়। তিনটি অনুবাদ থেকেই নিম্নে নমুনা তুলে ধরা হলঃ

---

[১৪] আবদুল আযীয (সম্পা.), *মীযানুস সরফ* (ঢাকাঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ৪।
[১৫] মুফতী অলিউল্লাহ কাসেমী (অনু.), *দারসে মীযান* (ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০৪), পৃ. ৪৯।
[১৬] মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১।
[১৭] রফীক আহমদ রফীক, *এরশাদুত্তালেবীন ফী আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরীর অনুবাদঃ

خَفَ (امر معروف - واحد مذكر حاضر ভয় কর) মূলত اخوف ছিল, (اسمع এর ওযনে) واو মুতাহার্রক ও পূর্বে حرف صحيح সাকিন হওয়ায় واو এর হরকত কে পূর্বে দেয়া হয়েছে। এরপর واو ও فاء তে দু' সাকিন একত্রিত হওয়ায় واو বিলুপ্ত হয়েছে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, خف মূলত تخاف ছিল। আলামতে মুযারে' বিলুপ্ত করে শেষে সাকিন করায় خف হয়েছে। এর পর اجتماع ساكنين এর কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে خف হয়েছে।[১৮]

মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান-এর অনুবাদ

خَفَ - امر معروف - واحد مذكر حاضر (ভয় কর) মূলত اخوف ছিল, (اسمع এর ওযনে) واو মুতাহার্রক ও পূর্বে حرف صحيح সাকিন হওয়ার واو এর হরকতকে পূর্বে দেয়া হয়েছে। এরপর واو ও فاء তে দু' সাকিন একত্রিত হওয়ায় واو বিলুপ্ত হয়েছে। এখন শুরুতে বর্তমান সাকিন না থাকায় همزه وصل বিলুপ্ত হয়ে خف হয়েছে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, خف মূলত اخواف ছিল। আলামতে মুযারে' বিলুপ্ত করে শেষে সাকিন করায় خف হয়েছে। এর পর اجتماع ساكنين এর কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে خف হয়েছে।[১৯]

মাওলানা মুহাম্মদ যোবায়ের কৃত বঙ্গানুবাদের নমুনা নিম্নরূপ

خَفَ : মূলত اخوَف ছিল। যবর বিশিষ্ট واو -এর পূর্বাক্ষর حرف صحيح (ব্যঞ্জনবর্ণ) টি সাকিন, তাই واو -এর হরকতটি স্থানান্তর করে পূর্বাক্ষরে দেয়ায় اخَوف হল। واو মূলত যবরযুক্ত ছিল, এখন তার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হওয়ায় উক্ত واو -কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে اخَاف করা হল। এখন اَلف এবং فَاء এ দু'টি সাকিন একত্রিত হওয়ায় اَلف -কে বিলুপ্ত করে اَخَف গঠন করা হয়েছে। অতঃপর শুরুতে সাকিন পড়ার জন্য যে هَمزه وصل নেয়া হয়েছিল তা বিলুপ্ত করা হল, خَفَ হল।[২০]

প্রথম অনুবাদদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি মৌলিক, দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুকরণ বা অনেকটা নকল বলে প্রতিয়মান হয়, এবং তা খুবই অসতর্কতার সাথে করা হয়েছে। অবশ্য বিষয় ভিত্তিক আরবী পরিভাষাগত শব্দ-সমষ্টির ব্যবহারে প্রথম অনুবাদটি সর্বসাধারণের নিকট অবোধগম্য হলেও এ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুবাদটিকে খুবই সহজ-সরল ও সাবলীল বলা চলে। উল্লেখ্য যে মাওলানা মুহাম্মদ যোবায়ের কৃত বঙ্গানুবাদটি সহজ-সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ অনুবাদটি প্রথম অনুবাদটির মতই মৌলিক।

অনুবাদের ক্ষেত্রের আরবী শব্দ রূপান্তর এর পারিভাষিক শব্দগুলোর অনুবাদ বাংলা ব্যাকরণের রূপান্তর রীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিভাষাগুলো বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করলে একই সাথে দুটি ভাষা সম্পর্কে

---

[১৮] মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী (অনু.), *পাঞ্জগাঞ্জ* (ঢাকাঃ আল-আকসা লাইব্রেরী, ২০০৪), পৃ. ৩২।

[১৯] হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান (অনু.), *সহজ পাঞ্জগাঞ্জ ও যুবদাহ* (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৩৩।

[২০] মাওলানা মুহাম্মদ যোবায়ের, *পাঞ্জেগাঞ্জ* বা *আযীযুত্ব ত্বালিবীন* (ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান অর্জন হতে পারে। আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে আরবীর অনুরূপ রীতির ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই, সে ক্ষেত্রে নূতন পরিভাষা সৃষ্টির লক্ষ্যে আরবী পরিভাষাগত শব্দগুলোর যথোপযুক্ত এবং সংক্ষিপ্তরূপে অনুবাদ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে অনুবাদটি আরো অধিক গ্রহণযোগ্য হতো এবং এতে বিষয়টি বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট বেশী সমাদৃত হতো।

ফুসূলে আকবরী

গ্রন্থকারের নাম আলী আকবর। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।[২১] তাঁর পিতার নাম ছিল আলী। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। তিনি ছিলেন হুসাইনি বংশোদ্ভূত ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল আরবী, ফারসি এবং ধর্মীয় বিষয়ে। ধর্মীয় পাণ্ডিত্যের জন্যই বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর তাঁকে লাহোর শহরের কাজী (বিচারপতি) নিয়োগ করেছিলেন।[২২] তাঁর দক্ষতা ও নিষ্ঠার কারণে অসাধু আমীর ওমরাগণ ছিল তাঁর প্রতি ক্ষীপ্ত। এ জন্যই পরবর্তীতে আমীর কিওয়ামুদ্দীন ইস্পাহানীকে যখন লাহোরের কাজী নিযুক্ত করা হয়, তখন সে ষড়যন্ত্র করে গ্রন্থকার আলী আকবরকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে হত্যা করে।[২৩]

আরবী ব্যাকরণের সুবিন্যস্ত বর্ণনায় *ফুসূলে আকবরী* অতুলনীয় গ্রন্থ। ফারসি ভাষায় সংক্ষিপ্ত ইবারতে রচিত হওয়ায় এ পর্যন্ত ফারসি ও উর্দুতে এ গ্রন্থের অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি *ফুয়ুযে আহমদী* শিরোনামে এবং হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি প্রশ্নোত্তরে সহজ ফুসূলে আকবরী নামে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য দু'টি অনুবাদের পর্যালোচনায় বলা যায় যে, দু'টি গ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে প্রথমটি সহজবোধ্য। দ্বিতীয়টির অনুবাদ হতে ভাবার্থ উদ্ধার প্রায় অসম্ভব। কারণ তাতে আরবী স্বর চিহ্নগুলো দেয়া হয় নি। অবশ্য অনুবাদের পর তিনি যে "সহজ তাহকীক ও তাশবীহ" শিরোনামে শব্দ বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা অংশ সংযোজন করেছেন, তা অবশ্য অনুবাদটি বুঝতে সহায়ক। কিন্তু ততক্ষণে পাঠকের মনকে অনেকটা নৈরাশ্য গ্রাস করে ফেলে। তাই সার্বিক ভাবে প্রথম অনুবাদটিকেই সফল অনুবাদ বলা যায়।

নাহ্‌বেমীর

গ্রন্থটির রচয়িতা আলী বিন মুহাম্মদ আলী (৭৪০-৮১৬ হি.)। তবে তিনি মীর সায়্যিদ শরীফ এবং মীর সায়্যিদ সনদ উপাধীতেই অধিক পরিচিত ছিলেন।[২৪]

---

[২১] রফীক আহমদ রফীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।
[২২] মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫-৩১৬।
[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৬।
[২৪] রফীক আহমদ রফীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরবী-ফারসি ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে *শরহে মিফতাহুল উলুম, শরহে কাফিয়া, হাশিয়া বর শরহে বেকায়া, হাশিয়া বর শরহে হিকমাতুল আইন, হাশিয়ায়ে সুগরা, কুবরা, সারফে মীর* ইত্যাদি।[২৫] মীর সায়্যিদ শরীফই সর্বপ্রথম ফারসি ভাষায় কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করেছেন বলে জানা যায়।[২৬] *নাহ্‌বেমীর* গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় রচিত আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনন্য গ্রন্থ। এর ভাষা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থ এবং মর্ম অনেক ব্যাপক। *নাহ্‌বেমীর* বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার সিলেবাসের অর্ন্তভুক্ত আরবী শিক্ষার প্রথম মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মাদরাসাগুলোতে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের বিবেচনায় বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তার অনুবাদ ছিল খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী যার অনূদিত *সহজ (ফার্সী-বাংলা) নাহ্‌বেমীর* শিরোনামে গ্রন্থটি আল-আক্‌সা লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। অপরজন হলেন হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান-যিনি *প্রশ্নোত্তরে সহজ নাহ্‌বেমীর* শিরোনামে গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি আল কাউসার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উভয় অনুবাদের নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

بدانکه اِنَّ و اَنَّ حروف تحقیق است و کان حرف تشبیه ولکِنَّ حرف استدراک و
لَیتَ حرف تمنی ولَعَلَّ حرف ترجی[২৭]

অনুবাদ: اِنَّ ও اَنَّ তাহকীক তথা দৃঢ়তা বুঝায়। كَاَنَّ তুলনা বা উপমা বুঝায়। لكِنَّ - استدراک তথা পূর্বের কথার সম্ভাব্য ধারণা খণ্ডন করার জন্যে, لَیتَ আকাঙ্ক্ষার জন্যে ও لَعَلَّ সম্ভাবনা প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হয়।[২৮]

উল্লেখিত উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে মাওলানা হাবীবুর রহমানের আলোচনা বা অনুবাদ এরূপ:

اِنَّ এবং اَنَّ কে حروف تحقیقی এবং كَاَنَّ কে حرف تشبیه - لَیتَ কে حرف تمنی -
لكِنَّ কে حرف استدراک এবং لَعَلَّ কে حرف ترجی বলা হয়।[২৯]

উপর্যুক্ত দুটি অনুবাদের মধ্যে প্রথমটিই প্রকৃত অনুবাদ। আর দ্বিতীয়টিতে বিষয়বস্তুকে প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুবাদ দুটি পাঠ করলেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম অনুবাদটি

---

[২৫] মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

[২৬] রফীক আহমদ রফীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২।

[২৭] মীর সায়্যিদ শরীফ, *নাহবেমীর* (ঢাকা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ১৭।

[২৮] মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী (অনু.), *সহজ ফার্সী-বাংলা নাহবেমীর* (ঢাকা: আল-আকসা লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ৪১।

[২৯] হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান (অনু.), *প্রশ্নোত্তরে সহজ নাহ্‌বেমীর* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। কিন্তু সে তুলনায় দ্বিতীয়টি তেমন বোধগম্য নয়। তথাপি এর অনুশীলনী প্রভৃতি অংশ পাঠ করে মর্ম ও ভাব উদ্ধার করা সম্ভব। সে আঙ্গিকে দ্বিতীয় অনুবাদটিও কম গুরুত্বের দাবীদার নয়। সারকথা দুটি অনুবাদই বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।

ইলমুস্‌সীগাহ

গ্রন্থটি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র বিষয়ক। এতে আরবী শব্দ প্রকরণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রচনা। এর রচয়িতা হলেন উনিশ শতকের উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন মাওঃ মুফতী এনায়াত আহমদ বিন মুনশী মুহাম্মদ বখ্‌শ। এছাড়াও অনেক গ্রন্থের তিনি ছিলেন প্রণেতা। তিনি ১২২৮ হিজরীতে ভারতের বারাবাঙ্কী জেলার দেবাহ নামক এক ছোট্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৩০] তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা আঠারোরও অধিক। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হল ফারসি ভাষায় রচিত আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের শব্দ-রূপান্তর বিষয়ক অত্র *ইলমুস্‌সীগাহ* গ্রন্থটি। গ্রন্থটির মূল নাম *ক্বাওয়ানীনে জাযীলাহ্‌ হাফিযিয়্যাহ*।[৩১] আর *ইলমুস্‌সীগাহ* হল এর রচনা তারিখ ও সনগত নাম। তিনি কারা মুক্তির দুবছর পর ১২৭৯ হিজরীতে হজ্জের সফরে জিদ্দার সন্নিকটে পাহাড়ে ধাক্কালেগে জাহাজ ডুবিতে শাহাদাত বরণ করেন।[৩২] এ-যাবৎ গ্রন্থটির তিনটি অনুবাদ সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। একটি *ইলমুস সীগাহ* (ফারসি-বাংলা) শিরোনামে মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আমিন অনূদিত।[৩৩] একটি মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী অনূদিত *সহজ (বাংলা) ই'ল্‌মুছ ছীগা*।[৩৪] আর একটি *সহজ ইল্‌মুছ্‌ ছীগাহ বাংলা* শিরোনামে হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান কৃত।[৩৫] এর মধ্যে প্রথম অনুবাদটিতে মূলতঃ মূল গ্রন্থের সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিতে আন্তরিক প্রয়াস প্রস্ফুটিত। আর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুবাদদ্বয়কে ব্যাখ্যা মূলক অনুবাদ বা স্বাধীন অনুবাদ বলা চলে।

প্রথম অনুবাদটির নমুনা

بحث اسم آله منصر، منصران، منصرين، مناصر، منصرة، منصرتان، منصرتين، مناصر، منصار، منصران، منصارين، مناصير. وگاهی بر وزن فاعل آيد چون خاتم آله ختم يعنی مهر کردن و عالم آله دانستن[৩৬].

---

[৩০] রফীক আহমদ রফীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।
[৩১] মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫।
[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫।
[৩৩] মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *ইলমুস সীগাহ* (ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.)।
[৩৪] মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী (অনু.), *সহজ বাংলা ই'লমুছ ছীগা* (ঢাকাঃ আল-আকসা লাইব্রেরী, ২০০১)।
[৩৫] হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান (অনু.), *সহজ ই'লমুছ ছীগাহ বাংলা* (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫)।
[৩৬] মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *ইলমুস সীগাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আমিন কৃত অনুবাদ : بحث اسم آله (যন্ত্রজ্ঞাপক বিশেষ্যের রূপান্তর, گردان মূল ইবারত দেখে নাও)। আবার কখনো(اسم آله) فاعل ওজনে হয়। যেমন- خاتم মোহর মারার যন্ত্র এবং عالم জ্ঞানের যন্ত্র।[৩৭]

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী কৃত অনুবাদটির নমুনা:

اسم آله-এর সংজ্ঞা: যে اسم مشتق টি فعل প্রকাশিত হওয়ার যন্ত্র বা উপকরণ বুঝায় তাকে اسم آله বলে। اسم آله র ওযন তিনটি مفعل، مفعلة و مفعال

بحث اسم آله

منصر منصران منصرين مناصر منصرة منرتان منصرتين مناصر و منصار منصاران منصارين مناصير.

اسم آله কখনো فاعل এর ওযনে আসে। যথা- خاتم সীল মোহরের যন্ত্র ও عالم জানিবার যন্ত্র।[৩৮]

হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান কৃত অনুবাদের নমুনা:

اسم آله

সংজ্ঞা: فعل – اسم مشتق সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যম বা উপকরণ বুঝায় তাকে اسم اله বলে। اسم اله-এর ওজন প্রধানত: তিনটি مفعل، مفعلة و مفعال

بحث اسم آله

منصر منصران منصرين مناصر منصرة منرتان منصرتين مناصر و منصار منصاران منصارين مناصير[৩৯]

ফারসী কী পহেলী কিতাব

বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসের অর্ন্তভুক্ত *ফারসী কী পহেলী কিতাব* ফারসি শিখার প্রাথমিক একটি গ্রন্থ। মাওলানা আবদুস সাত্তার অনূদিত ও মুফতী মাওলানা আহমাদুল্লাহ সম্পাদিত গ্রন্থটি আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি ফারসি শিখার জন্য একটি প্রাথমিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে রয়েছে ফারসি শব্দার্থ, একবচন ও বহুবচন, সংখ্যা, বাক্যরচনা, ক্রিয়ামূল, ফারসি ব্যাকরণ সম্পর্কে

---

[৩৭] *প্রাগুক্ত*।

[৩৮] মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী (অনু.), *সহজ বাংলা ই'লমুছ ছীগা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

[৩৯] হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান (অনু.), *সহজ ই'লমুছ ছীগাহ বাংলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সহজ-সরল বর্ণনা। তাছাড়া এ গ্রন্থে নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় উল্লেখের পাশাপাশি জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের বাণীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। অনুবাদক অত্যন্ত চমৎকারভাবে সহজ-সরল বাংলা ভাষায় ফারসি উচ্চারণ সহ অনুবাদ করেছেন। বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি গ্রন্থটিকে উর্দুতেও অনুবাদ করা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদের কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

مرد جان باز	خدای کار ساز
মর্দে জাঁ বায বীরপুরুষ	খোদায়ে কারে ছায কাজ সম্পাদনকারী খোদা

پسر خوشخو	لطف عمیم	رسول کریم
পেছারে খোশ খো উত্তম চরিত্রবান ছেলে	লুতফে আমীম সাধারণ দয়া	রাসুলে করীম সম্মানিত রাসুল(স.)
دل شادمان	جان غمگین	کتاب خوشخط
দেলে শাদে মাঁ চিন্তিত মন	জানে গামগীন আনন্দিত প্রাণ	কিতাবে খোশ খত সুন্দর লেখা কিতাব[৪০]

توحید باری تعالی
আল্লাহতাআলার একত্ববাদ।

نام حق بر زبان همین رانیم که بجان و دولش همین خوانیم
মুখে আমরা আল্লাহর নাম জপি মনে প্রাণে তাকেই ডাকি।

هر چه هست از بلندی و پستی همه زو یافت صورت هست
আকাশে জমীনে যা কিছু আছে সকলেই তা হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

طاعت اوست فرض عین شده بر همه خلق همچون دین شده
তার বন্দেগী ফরজে আইন হয়ে আছে সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর ঋণ সমতুল্য।

داد مارا کتاب تا خوانیم کرد مارا خطاب تا دانیم
তিনি কিতাব দান করেছেন যেন আমরা পড়ি তিনি আমাদের সম্বোধন করেছেন যেন আমরা বুঝি।

هر چه او گفت آن کنیم همه طاعت او بجان کنیم همه
যা বলেন তিনি আমরা যেন তাই করি মনে প্রাণে যেন আমরা তার পূর্ণ আনুগত্য করি।

آن چه او گفت غیر آن کردن نیست سودی بجز زیان کردن
তিনি যা বলেছেন, অন্য কিছু করা ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই।

روز و شب طاعت قبول و یئیم پیر وا مت رسول و یئیم
দিবানিশি আমরা যেন তারই আনুগত্য স্বীকার করি আমরা তার রাসূলের অনুসরণ কারী উম্মত।[৪১]

[৪০] মাওলানা আবদুস সাত্তার (অনু.), *ফারসী কী পহেলী কিতাব* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সী গজল সংকলন

ছৈয়দ আহমদুল হক কর্তৃক ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত আল্লামা রুমী সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মৌলানা রুমীর *দিওয়ানে শামস্ তাবরেজী* , *দিওয়ানে হাফেজ*, *শেখ সাদী*, মোল্লা জামী ও আমীর খসরুর (মূল ফার্সী, বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও কবিদের জীবন কথা সম্বলিত) শিরোনামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[৪২] উল্লেখ্য যে এছাড়াও তার রচিত মসনবী *শরীফের পয়গাম ও তফসির বানী ও ভাষ্য*, *মসনবী শরীফের কাহিনী ও মর্মবাণী*, *মুরালীর বিলাপ*, *প্রবন্ধ বিচিত্রা* ইত্যাদি শিরোনামে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে *মসনবী*য়ে রুমীর অনেক গুলো কবিতার অনুবাদ উপস্থাপিত হয়।

দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) রচিত *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন* নামক কাব্যসমগ্রটি জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। মমতাজ বেগম কর্তৃক ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এগ্রন্থে ১১৮টি গযল, ২টি ক্বাসীদা ও ৪টি রুবাঈ সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রথম অধ্যায়ে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর গযল, ক্বাসীদা ও রুবাঈর অনুবাদ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর আসরারে হাকিকী নামক একটি প্রবন্ধ ও তাঁর খলীফা খাজা বখতিয়ার কাকী এর উদ্দেশ্যে লেখা ৭টি পত্রের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআন হাদীস ভিত্তিক ধারাবাহিকভাবে সূফী দর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর জীবন ও কর্ম এবং চিশতিয়া তরীকার বিধি-বিধান সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য অনূদিত গ্রন্থের অনুবাদে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় ফারসি গজলের মূল ভাবধারা চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অনুবাদকদ্বয় প্রথমে ফারসি গযল উপস্থাপন করেন, তারপর গজলের আধুনিক ফারসি উচ্চারণ তোলে ধরে অতঃপর অনুবাদ করেন।

---

[৪১] মাওলানা আবদুস সাত্তার (অনু.), *ফারসী কী পহেলী কিতাব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

[৪২] ছৈয়দ আহমদুল হক, *ফার্সী গজল সংকলন* (চট্টগ্রামঃ আল্লামা রুমী সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. সূচীপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে অনুবাদ ও অনূদিত কবিতার মূল তথা ফারসির ভাবধারা অনুধাবন করা পাঠকদের জন্য সহজতর হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে অনুবাদের পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ে তথ্যবহুল, তাত্ত্বিক ও গুরুত্বপূর্ণ টীকা উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে এ গ্রন্থের অনুবাদের মান বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে। নিম্নে অনুবাদের কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হল:

غزل

ربود جان و دلم را جمال نام خدا   نواخت تشنه لبان را زلال نام خدا
وصال حق طلبی هم نشین نامش باش   ببین وصال خدا در وصال نام خدا
میان اسم و مسمّی چو فرق نیست ببین   تو در تجلّی اسما کمال نام خدا
یقین بدان که تو با حق نشسته ای شب و روز   چو هم نشین تو باشد خیال نام خدا
ترا سزد طیران در فضای عالم قدس   به شرط آنکه به پری به بال نام خدا
چو نام او شنوم گر بود مرا صد جان   فدای اوست به عزّ و جلال نام خدا
معین ز گفتن نامش ملول کی گردد   که از خداست ملالت ملال نام خدا[43]

১. রোবূদ্ জ'ন ও দেলাম্ র' জাম'লে ন'মে খোদ'
নাভ'খত্ তেশ্নে লাব'ন র'যোল'লে ন'মে খোদ'
২. ভেস'লে হাক্ব তালাবী হাম্নেশীনে ন'মাশ্ ব'শ
বেবীন্ ভেস'লে খোদ দার্ ভেস'লে ন'মে খোদ'
৩. মিঅ'নে এস্ম্ ও মোসাম্ম' চো ফর্ক্ব নীস্ত বেবীন
তো দার্ তাজাল্লিয়ে আস্ম' কাম'লে ন'মে খোদ'
৪. ইয়াক্বীন বেদ'ন কে তো ব' হাক্ব নেশাস্তেয়ী শাব্ ও রূয্
চো হামনেশীনে তো ব'শাদ্ খেইঅ'লে ন'মে খোদ'
৫. তোর' সাযাদ্ তাইয়ার'ন দার্ ফা'যয়ে অলামে ক্বোদ্স
বে শার্ত্ অ'ন্কে বেপার্রী বে ব'লে ন'মে খোদ'
৬. চো ন'মে ঊ শেনাভাম্ গার্ বুভাদ মার' সাদ্ জ'ন্
ফেদ'য়ে ঊসত বে এয্য ও জাল'লে ন'মে খোদ'
৭. মুঈন যে গোফ্তানে নমা'শ্ মালূল কেই গারদাদ্
কে আয্ খোদ'স্ত মাল'লাত্ মাললে ন'মে খোদ'

অনুবাদ

১. খোদার নামের সৌন্দর্য আমার প্রাণ ও হৃদয় ছিনিয়ে নিয়েছে
খোদার নামের নির্মলতা তৃষ্ণার্ত ঠোঁট সিক্ত করেছে।
২. যদি হকতায়ালার মিলন চাও তবে তার নামের আসরে বিভোর উপবেশনকারী হও
খোদার নামের মিলনেই তার মিলন লক্ষ্য কর।
৩. তার জাত ও নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

[৪৩] জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান (অনু.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন* (ঢাকা: খাজা মঞ্জিল, ২০০৩), পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

দেখো, খোদার নামের তজল্লিতেই তার নামের পূর্ণতা।
৪. নিশ্চিত জেনো, তুমি যখন হকতায়ালার সাথে দিবানিশি বসো
খোদার নামের খেয়াল তোমার সাথে বিভোরে আসীন।
৫. তোমাকে পবিত্র জগতের পরিবেশে উজার উপযুক্ত করেছে
কেবল খোদার নামের ডানার ওপর ভর করে।
৬. যখন আমি তার নাম শুনি তখন শত প্রাণের অধিকারী হই
আমি খোদার নামের মহিমা ও ইজ্জতের জন্য উৎসর্গীকৃত হই।
৭. মঈন তার নামের বিরামহীন জেকেরে কখন হবে অবসাদগ্রস্ত
খোদার নামের অবসাদগ্রস্ততা তার পক্ষ থেকেই।[৪৪]

قصیده

حمدی که بر صحایف اطباق نه فلک   توقیع بر کشیده که الکبریا ملک
حمدی که خود رقم زده بر صفحهٔ قدم   کان را به هیچ حادثه ممکن نه گشته فک
حمدی که در تصدی او فاز من هدی   حمدی که در تخلّف او خاب من هلک
حمدی که جوهریش زند سکّه قبول   روزی کز امتحانش دهد جلوه بر محک
ذات خدای هر دو جهان را سزد که هست   بر طبق مدّعاش مسجّل هزار صک
ذرّات کاینات زبان بر گشاده اند   اندر ادای نکتهٔ توحید یک به یک
بر ذات پر کمال تو دارد دلالتی   ایات کن فکان ز سماگیر تا سمک[45]

১. হাম্‌দী বার্ সাহ'য়েফে আত্‌ব'ক্কে নোহ্ ফালাক্
তৌক্বী-বার্ কেশীদে কে আল্‌কেব্‌রিঅ' মালাক্
২. হাম্‌দী কে খোদ্ রাক্বাম্ যাদে বার্ সাফ্‌হেয়ে ক্বেদাম্
ক'ন্ র' বে হীচ্ হ'দেছে মোম্‌কেন না গাশ্‌তে ফাক্
৩. হাম্‌দী কে দার্ তাসাদ্‌দিয়ে উ ফ'য' মান্ হাদ'
হাম্‌দী কে দার্ তাখাল্‌লোফে উ খ'ব' মান্ হালাক্
৪. হাম্‌দী কে জৌহারিয়াশ্ যানাদ্ সেক্‌কেয়ে ক্বাবূল্
রূযী কায্ এম্‌তেহ'নাশ্ দাহাদ্ জেল্‌ভে বার্ মেহাক্
৫. য'তে খোদ' ই হার্ দো জাহ'ন্ র' ছাযাদ্ কে হাস্‌ত
বার্ তেব্‌কে মোদ্দাঅ'শ্ মোসাজ্‌জাল্ হেয'র্ সাক্
৬. যার্ র'তে কয়েন'ত্ যাব'ন্ বার্ গোশ'দে আন্‌দ
আন্‌দার্ আদ'য়ে নোক্‌তেয়ে তৌহীদ ইয়েক বে ইয়েক্
৭. বার্ য'তে পোর্ কাম'লে তো দ'রাদ্ দাল'লাতী
অ'ইঅ'তে কোন্ ফাক'না যে সাম' গীর্ ত' সামাক্

অনুবাদ

১. নয় আকাশের গালিচার ওপরে যে প্রশংসা অনবরত
ফেরেশতাকুলের সামনে ইল্লাল্লার নকশার ফরমান রাখা হয়েছে।

---

[৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।
[৪৫] জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান (অনু.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. এমন প্রশংসা যা লেখা হয়েছে আদি পৃষ্ঠাতে
যা মুছে ফেলা কোন ঘটনার পক্ষেই সম্ভব হয় নি।
৩. যে সোজা পথে চলে তাকে এ প্রশংসা দেখানো হয়
এ প্রশংসার বিপরীতে (যে চলে) সে বিচ্যুত ও ধ্বংস প্রাপ্ত।
৪. এমন প্রশংসা যার ঔজ্জ্বল্য এনে দেয় কবুলের মুদ্রা
কেয়ামত দিবসে যখন তুমি হবে তার হৃদয়ের জলোয়া।
৫. খোদার জাত দোজাহানের জন্যই প্রযোজ্য
তার দাবি অনুযায়ী হাজার সত্যায়ন প্রতিষ্ঠিত।
৬. জগত-সমুহের অণু-পরমাণু মুখ খুলেছে
এক এক করে তওহিদের বিষয় বর্ণনা করার জন্য।
৭. তোমার পরিপূর্ণতার সত্তার ওপর রয়েছে দিক-নির্দেশনা
আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত 'কুন ফাইয়াকুনের' আয়াত।[৪৬]

رباعی

شاه است حسین پادشاه است حسین   دین است حسین و دین پناه است حسین
سر داد نه داد دست در دست یزید   حقا که بنای لااله است حسین[৪৭]

শ'হ আস্‌ত্‌ হোসেইন প'দশ'হ্‌ আস্‌ত্‌ হোসেইন
দীন আস্‌ত্‌ হোসেইন ও দীনে পান'হ্‌ আস্‌ত্‌ হোসেইন
সার দ'দ্‌ না দ'দ দাস্‌ত্‌ দার্‌ দাস্‌তে ইয়াজিদ্‌
হক্বক্ব' কে বানয়ে লাএলাহ্‌ আস্‌ত হোসেইন

অনুবাদ

হোসাইন রাজা হোসাইন বাদশাহ
হোসাইন দ্বিন হোসাইন আশ্রয়
মাথা দিয়েছে দেয়নি তো হাত ইয়াজিদের হাতে
প্রকৃতপক্ষেই হোসাইন লা-ইলাহার বুনিয়াদ।[৪৮]

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত অনুবাদ ছাড়াও হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) রচিত *দীওয়ানটি দিওয়ানে গওছিয়া* নামে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি মাহমুদ হোসেন কর্তৃক ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে অনূদিত হয়। তিনি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। আলোচ্য অনুবাদগুলোর মান বিচার-বিশ্লেষণ করলে ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ও জেহাদুল ইসলাম কর্তৃক অনূদিত অনুবাদ গ্রন্থটি মূলানুগ ও বেশি মানসম্পন্ন বলে মনে হয়।

---

[৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১১।
[৪৭] জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান (অনু.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৩।
[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

দিওয়ানে ওয়াইসী

সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (১৮২৫-১৮৮৬ খ্রি.) বাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষাভাষীদের ন্যায় আধিপত্য অর্জন করেন। ওয়াইসী ২০৮ পৃষ্ঠার একটি ফারসি দীওয়ান রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ১২বছর পর তাঁর দৌহিত্র মৌলবী মীর হাসানের উদ্যোগে প্রথম বার ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার গাউসিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কাইউম মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ১৭৫টি গযল ২৩টি কাসিদা ও ৬টি বিবিধ কবিতা রয়েছে।[৪৯]

সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী রচিত *দিওয়ানে ওয়াইসী* গ্রন্থটি আলহাজ্জ শাহ সূফী সৈয়্যেদ জানে আলম কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রন্থটি খানকায়ে সুরেশ্বরী কর্তৃক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থে ১৯৪টি গযলের অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া এ গ্রন্থে বিভিন্ন সূফী তরীকার শাজারা বা নসবনামার বর্ণনা রয়েছে। সূফী সৈয়্যেদ জানে আলমকৃত অনুবাদের নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

জীন, মানুষ, হুর, পরী, তারকা ও ফেরেস্তার মধ্যে
আমার মনে প্রাণে ও আমার বক্ষে তোমার চিন্তা ছাড়া আর কিছু নাই।
তোমার স্তুতিগান তোমার দয়া তোমার শুকুর ও তোমার অনুকম্পা ভিন্ন
সমস্ত দেশের রাজা ও সকল রাজ্যেও বাদশাহ।
তোমার দরগাহের দরজায় পথ প্রদর্শকসম।
সকল দেশের খাকান বাদশাহ আর সকল দেশের রাজাধিরাজ।[৫০]

পান্দ নামা

ফরীদ উদ্দীন আত্তার কর্তৃক রচিত হয় *পান্দ নামা* গ্রন্থটি। সালজুকী শাসনামলে (১০৩৯-১১৫৭) ইরানের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, এ যুগের খ্যাতিমান সূফী ও দার্শনিক কবি শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার। আত্তারের প্রকৃত নাম 'মোহাম্মদ'।[৫১] তাঁর পুরোনাম ফরিদ উদ্দীন হামিদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইব্রাহীম বিন ইসহাক আত্তার কাদকানী নিশাপুরী।[৫২] তবে তিনি আত্তার নামেই সমধিক পরিচিত।

---

[৪৯] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ২৮৫।

[৫০] আলহাজ্জ শাহ সূফী সৈয়্যেদ জানে আলম, *দিওয়ানে ওয়াইসী* (ঢাকা: খানকায়ে সুরেশ্বরী, ২০০১), পৃ. ১৬৮।

[৫১] শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার নিশাবুরী, *মুসীবত নামা*, ড. নূরানী বেসাল (সম্পা.) (তেহরান: কিতাবফোরূশীয়ে যাওয়্যার, ১৩৬৪ ইরানী সাল), পৃ. ৩৬৭; বদীউয্যামান ফোরূযানফার, *শারহে আহওয়াল ওয়া নাখদ ওয়া তাহলীলে আসারে শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার নিশাবুরী* (তেহরান: এন্তেশারাতে আন্‌জুমানে আসার ওয়া মাফাখেরে ফারহাঙ্গী, ১৩৭৪ ইরানী সাল), পৃ. ১।

[৫২] ড. যবীহ উল্লাহ সাফা, *গানজ ওয়া গানজিনে* (তেহরান: মোআসসেসেয়ে এন্তেশারাতে আমির কাবির, ১৩৬৩ ইরানী সাল), পৃ. ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আত্তারের কাব্যে দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইসলামী ঐতিহ্য এবং কাব্যশিল্পের বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।[৫৩] তাঁর পিতা তৎকালীন সময়ের একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, ঔষধ বিক্রেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কর্মজীবনে আত্তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পিতার পেশা গ্রহণ করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ পেশায় অবস্থান করেই তিনি আধ্যাত্মিক রহস্য সম্বলিত গ্রন্থসমুহ রচনা করেন।[৫৪]

ফরীদ উদ্দীন আত্তারের রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য হলো *দিওয়ানে আত্তার*, *মানতেকুত্তায়ের*, *ইলাহীনামা*, *আসরারনামা*, *মূসীবতনামা*, *মুখতারনামা*, *পান্দেনামা* ও *তাযকিরাতুল আউলিয়া*। তাঁর কবিতার সাবলীলতা এমনভাবে উপস্থাপিত যে, কোন সাধারন ব্যক্তি তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। তার সমগ্র রচনা হয়ে আছে আধ্যাত্মিকতা, সূফীদর্শন ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পাথেয়।

ফরীদ উদ্দীন আত্তার রচিত মাসনবী কাব্যগ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ। *পান্দ নামা* গ্রন্থটি হিন্দী, তুর্কী, আরবী ও বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থের ভাষা সহজ, সাবলীল ও প্রাণবন্ত হিসাবে সমাদৃত। *পান্দ নামা* গ্রন্থটি নীতি-নৈতিকতা ও শিষ্টাচার বিষয় সংক্রান্ত আলোচনার সমাহার। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে-

মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা, সায়্যিদুল মুরসালীন (স.) এর প্রশংসা, মুজতাহিদ ইমামগণের বর্ণনা, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দরবারে মুনাজাত, চুপ থাকার উপকারিতা, সৎস্বভাবের বর্ণনা, ধ্বংসাত্মক বিষয়ের বর্ণনা, ভাগ্যবানদের বর্ণনা, নিরাপত্তার কারণসমুহ, বিনয় ও দরবেশগণের সাহচর্য, দুর্ভাগ্যের কারণসমুহ, সাধনার বর্ণনা, দারিদ্রতার বর্ণনা, বোকার পরিচয়, বিপদমুক্তির বর্ণনা, জিকিরের ফজিলত, কুস্বভাবের বর্ণনা, উপদেশ ও সৌভাগ্যের বর্ণনা, ক্রোধের নিন্দা, আয়ু অমূল্য সম্পদ, দানশীলতা ও নিশ্চুপ থাকার বর্ণনা, নারী ও শিশুদের বর্ণনা, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনাসমুহের বর্ণনা, রাজ্যপতনের কারণ, সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ, যেসব কাজের উপর ভরসা করা যায় না তার বর্ণনা, উপদেশ ও শুভ কামনা সংক্রান্ত আলোচনা, আল্লাহর পরিচয়, সেবার উপকারিতা, দান-সদকার বর্ণনা, মেহমানের আপ্যায়ন, অল্পে তুষ্টি, মুত্তাকীর পরিচয়, সহনশীলতা, মানবতা, আত্মীয়তার বন্ধন ও অলসতা বর্জন ইত্যাদি।[৫৫]

---

[৫৩] নে'মাতুল্লাহ কাজী শাকিব, *বেসূয়ে সীমোরগ* (তেহরানঃ মোআসসেসেয়ে এন্তেশারাতে সিক্কে, ১৩৮০-১৩৮১ ইরানী সাল), পৃ. ১৩২।

[৫৪] ড. যাহরা খানলারী কেয়া, *রাহনুমায়ে আদাবিয়াতে ফারসি* (তেহরানঃ কিতাব খানেয়ে ইবনে সিনা, ১৩৪০ ইরানী সাল), পৃ. ২৬৭; হাসান আনুশেহ, *দানেশনামায়ে আদবে ফারসি* (তেহরানঃ ওয়াযারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাদে ইসলামী, ১৩৭৫ ইরানী সাল), পৃ. ১৭৮০।

[৫৫] *পান্দ নামা* কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতার শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

পান্দ নামা গ্রন্থটির তিনটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান কর্তৃক বাংলা ছন্দে অনূদিত ও ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম *ছন্দে বাংলা পান্দেনামা*। মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ কর্তৃক অনূদিত *সহজ পান্দ নামা* শিরোনামে আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী কর্তৃক অনূদিত হয়ে *পান্দনামা* নামে আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা থেকে অপর অনুবাদটি ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অনুবাদের দুটি নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান কর্তৃক অনূদিত নমুনা:

যেসব কাজের উপর ভরসা করা যায় না

کس نیابد پنج چیز از پنج کس   یاد گیر از ناصح ای صاحبنفس
পাঁচ জনের কাছে পাঁচ পাবে না কখন সুধীজনের উপদেশ রাখিও স্বরণ।
কেউ পাঁচ ব্যক্তির নিকট পাঁচটি জিনিস আশা করতে পারে না হে সুবোধ (সজীব) তুমি উপদেষ্টা হতে এ উপদেশবাণীগুলো স্বরণ রাখ।

نیست اول دوستی اندر ملوک   این سخن باور کند اهل سلوک
রাজার কাছে বন্ধুত্ব না পাবে কখন একথা বিশ্বাস করে সকল সুধীজন।
প্রথমত কেউ রাজার সাথে বন্ধুত্বের আশা করতে পারেনা আর একথা সকল জ্ঞানী-গুনী সাধকগণ বিশ্বাস করেন।

سفلۀ رابامروت ننگری   هیچ بد خوئی نیابد مهتری
ইতর হতে মানবতা না দেখে যখন চরিত্রহীন নেতৃত্ব পাবে না কখন।
কোন ইতর ব্যক্তির নিকট মানবতার আশা করা যায় না আর চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনও নেতৃত্বের আসন পায় না।

هر که بر مال کسان دارد حسد   بوئی رحمت بردماغش کی رسد
অপরের ধনের প্রতি হিংসা আছে যার রহমতের সুবাতাস মাথায় ঢুকিবে না তার।
যে অপরের ধন-সম্পদ দেখে হিংসায় জ্বলে তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না।

آنکه کذاب ست میگوید دروغ   نیست او را در وفاداری فروغ
যে জন মিথ্যা কথা বলে সর্বক্ষণ তার দ্বারা জনহিত হবে না কখন।
যে মিথ্যাবাদী সর্বদা মিথ্যা কথা বলে, তার দ্বারা কোন মানুষ উপকৃত হয় না।[৫৬]

---

[৫৬] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ছন্দে বাংলা পান্দেনামা* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রোধের নিন্দা

ای پسر هر کس که دارد چار چیز   چار دیگر هم شود موجود نیز

শোন বৎস চার বস্তু কাছে আছে যার তার সাথে যোগ হবে অন্য আরো চার।

হে বৎস! জেনে রাখ যার মধ্যে চারটি কু-অভ্যাস আছে তার মধ্যে অন্য চারটি স্বাভাবিক ভাবে জড়ো হয়।

عاقبت رسوائی آید از لجاج   خشم را نکند پشیمانی علاج

কলহ বঞ্চনা আনে জানিবে নিশ্চয় ক্রোধের চিকিৎসা কভু অনুতাপে নয়।

ঝগড়া-কলহ দ্বারা মানুষ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হয় ক্রোধের পর কোন কাজ করে পরে অনুতপ্ত হলে কোন ফল হয় না।

بیگمان از کبر خیزد دشمنی   حاصل آید خواری از کاهل تنی

অহঙ্কার শত্রুতা আনিবে নিশ্চয় অলসতা অপদস্থ করিবে তোমায়।

অহঙ্কার দ্বারা পরস্পর শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই হয়না, আর অলসতা মানুষকে অভাবের দিকে টেনে নিয়ে অপদস্থ করে।

چون لجوجی درمیان پیدا شود   بنده از شومی او رسوا شود

পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হইবে যখন তার কারণে বান্দাগণ হইবে পতন।

যখন পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হয় তার কুফলে সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

خشم خود را چونکه راند جاهلی   جز پشیمانیش نبود حاصلی

ক্রোধ যদি চালায় কোন অবোধ জাহিল অনুতাপ ছাড়া কিছু না হবে হাসিল।

যদি কোন মূর্খ ক্রোধের তাড়নায় কোন দুর্ঘটনা ঘটায়, তখন অনুতাপ ছাড়া তার কিছুই করার থাকেনা।

هر که گشت از کبر بالا گردنش   دوستان گردند آخر دشمنش

অহঙ্কারে গর্দান যার হবে উর্দ্ধগামী আপনজন শত্রু হবে জেনে রাখ তুমি।

যে অহঙ্কার দ্বারা মাথা তোলা দেয়, একদিন তার বন্ধু-বান্ধব তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুতে পরিনত হয়।

کاهلی را هر که سازد پیشهٔ   آید از خواری بپایش تیشهٔ

অলসতার কুঅভ্যাস হইবে যাহার বঞ্চনার কুঠার পায় পড়িবে তাহার।

যার মধ্যে অলসতার কুঅভ্যাস গড়ে উঠবে, সে অভাবের কসাঘাতে অপদস্থ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

خشم خود را گرفرو نخورد کسی   عاقبت بیند پشیمانی بسی

ক্রোধ হতে সংযত না হবে যে জন অনুতপ্ত হয়ে পরে করিবে রোদন।

যে ক্রোধ ত্যাগ করে সংযমী হবে না, শেষ পর্যন্ত সে অনেক অনুতপ্ত হবে তখন কিছুই করার থাকবে না।

هر که اوفتاده وتن پرورست   نیست آدم کمتر از گاؤ و خرست

অলসতার দেহ যার লুটাইয়া দেয় গরু গাধা হতে নীচু মানুষ কভু নয়।

অলসতার মধ্য দিয়ে যার দেহ লালিত-পালিত হয় সে গরু গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। তার মানুষ বলে পরিচয় দেওয়ার অধিকার নাই।[৫৭]

মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ কর্তৃক অনূদিত অনুবাদের নমুনা:

যে জিনিস ভরসার উপযুক্ত নয় তার বর্ণনা

পাঁচ (প্রকারের) জিনিষ পাঁচ প্রকারের মানুষ থেকে পায় না। প্রাণচঞ্চল! উপদেশদানকারী থেকে মুখস্ত করে নাও। প্রথমতঃ বাদশাহের মধ্যে (খাঁটি) বন্ধুত্ব নেই। আল্লাহর পথে চলমান ব্যক্তিরা একথা বিশ্বাস করেন।

কোন নীচকে তুমি মানবতা বিশিষ্ট দেখবে না। কোন অসচ্ছরিত্র মানুষ নেতৃত্ব পাবে না। যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদকে হিংসা করে। রহমতের ঘ্রাণ তার মস্তিষ্কে কিভাবে পৌছবে? যে ব্যক্তি মিথ্যুক এবং মিথ্যা কথা বলে, তার বিশ্বস্ততায় কোন উন্নতি (আস্থা) নেই।[৫৮]

ক্রোধ ও গোস্বার অপকারিতার বর্ণনা

হে বৎস! যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি জিনিস (দোষ) বিদ্যমান থাকবে, অন্য চারটি জিনিসও তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে।

ঝগড়ার ফলে অবশেষে লাঞ্ছিত হতে হয় লজ্জিত হওয়া ক্রোধের চিকিৎসা করে না। অর্থাৎ রাগ পড়ে যাওয়ার পর অনুতপ্ত হলেও ক্রোধের ক্ষতিপূরণ হয় না।

নিঃসন্দেহে অহংকার দ্বারা শত্রুতার উৎপত্তি হয়, অলসতার ফলে অপমান সইতে হয়।

যখন পরস্পর ঝগড়া সৃষ্টি হয়। বান্দা তার অমঙ্গলে লাঞ্ছিত হয়।

যখন কোন মূর্খ স্বীয় ক্রোধকে পরিচালিত করে। লজ্জিত হওয়া ব্যতীত তার কিছুই লাভ হয় না। অর্থাৎ মূর্খতা বশতু ক্রোধ লজ্জার কারণ হয়ে দাড়ায়।

অহংকার হেতু যার ঘাড় উঁচু হয়। অবশেষে তার বন্ধুও দুশমনে পরিণত হয়।

যে ব্যক্তি অলসতাকে পেশা বানায়। তার পায়ে লাঞ্ছনার কুড়াল পতিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্রোধকে হজম (দমন) না করে। অবশেষে সে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেখতে পাবে (সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।)

যে ব্যক্তি অলস ও শরীর প্রতিপালক (বিলাস প্রিয়) সে মানুষ নয়; বরং গরু গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।[৫৯]

---

[৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০।

[৫৮] মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *সহজ পান্দ নামা* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১০০।

[৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা হাফিজুর রহমার যশোরী কর্তৃক অনূদিত অনুবাদের নমুনাঃ

> কেহ পাঁচ ব্যক্তি হইতে পাঁচটি জিনিস পায়না, হে জীবন্ত ব্যক্তি! তুমি অত্র উপদেশ দাতা হইতে উহা স্বরণ রাখ।
>
> প্রথমতঃ এই যে, রাজা-বাদশাহগণের মধ্যে বন্ধুত্ব নাই। এ কথাটি আল্লাহর পথের পথিকগণ বিশ্বাস করেন।
>
> কোন ইতর ব্যক্তি কে মানবতা সম্পন্ন দেখিবে না। দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি নেতৃত্ব পায় না।
>
> যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদের প্রতি হিংসা করে– রহমতের ঘ্রাণ তাহার মস্তিষ্কে কবে পৌছিবে?
>
> যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয় এবং মিথ্যা কথা বলে-বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে তাহার কোন উজ্জল্য নাই। (অর্থাৎ মানুষে তাহাকে বিশ্বাস করে না।)[৬০]

ক্রোধ ও গোস্বার অপকারিতার বর্ণনা

> হে বৎস! যে ব্যক্তির মধ্যে (নিম্নের) চারটি দোষ থাকে, আরো চারটি জিনিষ তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।
>
> ঝগড়ার কারণে পরিণামে লজ্জিত হইতে হয়। অনুতাপ রাগের চিকিৎসা করেনা।
>
> নিঃসন্দেহে অহংকার দ্বারা শত্রুতার সৃষ্টি হয়। আর অলসতার দ্বারা লাঞ্ছনা লাভ হয়।
>
> পরস্পরে যখন শত্রুতা সৃষ্টি হয় (উভয়) ব্যক্তি তখন উহার অশুভতায় (অনিষ্টের দরুন) অপদস্থ হয়।
>
> কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যখন নিজ রাগ চালনা করে-তাহার লজ্জিত হওয়া ছাড়া কোন কিছু মিলে না। (অর্থাৎ পরে অনুতপ্ত হইতে হওয়াই সায় হয়।)।
>
> অহংকারে যার মাথা উঁচু হয়, শেষে তাহার বন্ধুগণও শত্রু হইয়া যায়।
>
> অলসতাকে যে পেশা বানায় তাহার পায়ে অপদস্থতার কুড়াল লাগিবে।
>
> নিজ রাগকে যদি কেহ হজম (দমন) না করে পরিণামে সে বহু লজ্জা অনুতাপ দেখিবে, (পরিণামে তাহাকে অতি অনুতপ্ত হইতে হইবে।)
>
> যে অলস ও বিলাস প্রিয় হয়, সে মানুষ নয়, বরং গরু গাধা হইতেও নিকৃষ্ট।[৬১]

আব্দুল মান্নান অনুবাদ করার সময় ছন্দে অনুবাদের পাশাপাশি গদ্যেও অনুবাদ করেছেন। ছন্দ ও পাশাপাশি গদ্য অনুবাদ হওয়ার ফলে তা একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদে পরিণত হয়েছে। আর মামুনুর রশীদ বঙ্গানুবাদের সাথে সাথে উর্দু অনুবাদও তোলে ধরেছেন। তাছাড়া তিনি ফারসি জটিল শব্দগুলো উল্লেখ করে এর অর্থও উপস্থাপন করেছেন। এতে করে পাঠকের জন্য অনুবাদ অনুধাবন সহজতর হয়েছে।

মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ কর্তৃক অনুবাদ ও মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান কর্তৃক অনুবাদের পর্যালোচনায় বলা যায় যে উভয় অনুবাদই মূলানুগ হয়েছে।

---

[৬০] মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী (অনু.), *সহজ পান্দ নামা* (ঢাকাঃ আল-আকসা প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ১১৯-১২০।
[৬১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ ধর্মীয় গ্রন্থাবলী

একুশ শতকে ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে নিম্নে বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নবুওতের ধারা

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নবুওতের ধারা নামক এ গ্রন্থটির মূল রচয়িতা আল্লামা সাইয়েদ মুজতাবা মুসাভী লারী। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মুন্সী মোহাম্মদ রফিকুল হাসান। গ্রন্থটির প্রকাশক আবুল হোসেন, ডন পাবলিশার্স, শাহবাগ, ঢাকা। এটি ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

দ্বীনের মৌলিক ভিত্তিসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার এ গ্রন্থটির মূল রচয়িতা শহীদ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (র.)। আর গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ করেছেন মো. মাঈনুদ্দিন তালুকদার। ফারসি ভাষার মূল গ্রন্থটির প্রকাশক শহীদ আল্লামা বাকের সাদর (রহ.) বিশ্ব সম্মেলন কমিটি, কোম, ইরান। গ্রন্থটি ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।

একুশটি পৃথক অধ্যায়ে গ্রন্থটির আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অধ্যায়গুলো হল, আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধিত্বের সাথে পরিচয়, আইন প্রণয়নের অধিকার কার? প্রত্যাদেশ বা ওহী কি? কুরআনের ওহীসমূহ, আল্লাহর বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের দৃঢ়তা, ইসলাম বিরোধীদের একটি সমালোচনার জবাব, আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক ইত্যাদি।[৬২]

আল্লাহ, রাসুল ও রিসালাত

দ্বীনের মৌলিক ভিত্তিসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার এ গ্রন্থটির মূল রচয়িতা শহীদ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহ.)। আর গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ করেছেন মো. মাঈনুদ্দিন তালুকদার। ফারসি ভাষার মূল বইটির প্রকাশক শহীদ আল্লামা বাকের সাদর (রহ.) বিশ্ব সম্মেলন কমিটি, কোম, ইরান। গ্রন্থটি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর শিরোনাম নিম্নরূপ:

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে স্রষ্টার প্রমাণ, মহান আল্লাহর গুণসমূহ, বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াতের প্রমাণ ও ইসলামী রিসালাতের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।[৬৩]

---

[৬২] মুন্সী মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নবুওতের ধারা* (ঢাকা: ডন পাবলিকেশান্স, ২০০২), পৃ. সূচীপত্র।

[৬৩] মো. মাঈনুদ্দিন তালুকদার, *আল্লাহ, রাসুল ও রিসালাত* (কোম: বিশ্ব সম্মেলন কমিটি, ২০০৪), পৃ. সূচীপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

মহাকালের ত্রাণকর্তা

ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ হচ্ছে *মহাকালের ত্রাণকর্তা*। মূল রচয়িতা আয়াতুল্লাহ শহীদ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর। আর অনুবাদক মো. আলী মোর্তাজা ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। গ্রন্থটি সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। *মহাকালের ত্রাণকর্তা* শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে গবেষণাধর্মী বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচিত বিষয়বস্তুর কয়েকটি শিরোনাম নিম্নরূপ: মুজিযা ও দীর্ঘ জীবন, কিভাবে মেনে নিব যে ইমাম মাহদী বাহ্যিক অস্তিত্বমান?, ইমাম-এ-জামানা এখনো পর্যন্ত কেন আবির্ভূত হন নি ইত্যাদি।[৬৪]

আহকামে মুমিনাত

মুসলিম নারীদের বিশেষ ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্বলিত গ্রন্থ *আহকামে মুমিনাত*-এ আলোচিত বিষয়গুলো হযরত ইমাম খোমেনী (র.) এর ফতোয়া ও হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী ইস্তিফতা থেকে সংগ্রহ করেছেন উস্তাদ মুহাম্মদ ওয়াহেদী। আর বাংলায় অনুবাদ করেন মো. আব্দুল কুদ্দুস বাদশা ও মো. মাঈনুদ্দীন তালুকদার। গ্রন্থটি আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতানী, খুলনা থেকে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে একজন নারীর প্রাত্যহিক জীবনে অবশ্য পালনীয় শরীয়তের বিধি-বিধান এর বর্ণনা বিধৃত হয়েছে।[৬৫]

মালা বুদ্দা মিনহু

কাযী মুহাম্মদ ছানা উল্লাহ পানিপতী ছিলেন একাধারে ক্বারী, হাফিয, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতী, বিচারক ও সফল সাধক। তিনি ১৭৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অর্ন্তগত পানিপত এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ এলাকায় সমাপ্ত করেন এবং সাত বছর বয়সে কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী গমন করে কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর সমকালীন সময়ে ইবাদত-বন্দেগীতে তিনি ছিলেন অনন্য। প্রতিদিন তিনি কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা এর পাশাপাশি গভীর অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন।[৬৬]

কাযী মুহাম্মদ ছানা উল্লাহ পানিপতী ত্রিশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, *মালা বুদ্দা মিনহু, আত তাফসীর আল মাযহারী, ইরশাদুত তালিবীন, ওয়াসিয়ত নামা, জাওয়াহিরুল*

---

[৬৪] মো. আলী মোর্তাজা ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, *মহাকালের ত্রাণকর্তা* (খুলনা: আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতনী, ২০০৫), পৃ. সূচীপত্র।

[৬৫] মো. আব্দুল কুদ্দুস বাদশা ও মো. মাঈনুদ্দীন তালুকদার, *আহকামে মুমিনাত* (খুলনা: আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতনী, ২০০৪), পৃ. সূচীপত্র।

[৬৬] ড. মুহাম্মদ সালেম কাগওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাসসিরীন আওর উনকি আরবী তাফসীরে* (নয়া দিল্লী: মাকতাবা জামিয়া লিমিটেড, তা.বি.), পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন, তাযকিরাতুল মাআদ, তাযকিরাতুল মাওতা ওয়াল কুবুর, হাকীকাতুল ইসলাম, রাদ্দে মাযহাবে শীয়া ইত্যাদি।[৬৭]

ফারসি ভাষায় রচিত *মালা বুদ্দা মিনহু* গ্রন্থটি মূলত হানাফী মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্র বিষয়ের আলোচনা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি সুদীর্ঘকাল যাবত ভারতীয় উপমহাদেশের অগনিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাদৃত হয়ে আছে। ফারসি ভাষায় রচিত *মা-লা বুদ্দা মিনহুতে* দশটি অধ্যায় রয়েছে; অধ্যায়গুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে: ঈমান, পবিত্রতা, নামায, জানাযা, যাকাত, রোযা, হজ্ব, তাকওয়া, ইহসান ও কুফরী কালামের বর্ণনা। ফারসি ভাষায় রচিত হানাফী মাযহাবের এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির তিনটি অনুবাদ বেরিয়েছে।

হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি *মালাবুদ্দা মিনহু* শিরোনামে আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অপর অনুবাদটি মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী কর্তৃক *মালাবুদ্দা মিনহু* বা *যা না হলে নয়* শিরোনামে আল-আকসা লাইব্রেরী থেকে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন *মা–লা–বুদ্দা মিনহু* শিরোনামে অনুবাদ করেন যা আশরাফিয়া বুক হাউস, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

কাযী মুহাম্মদ ছানা উল্লাহ পানিপতী রচিত মূল ফারসি সহ উক্ত অনুবাদগুলোর নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হল:

> بدان اسعدک الله تعالی این همه که گفته شد صورت ایمان و اسلام و شریعت است و مغز و حقیقت او در خدمت درویشان باید جست وخیال نباید کرد که حقیقت خلاف شریعت است که این سخن جهل و کفر است بلکه همین شریعت که در خدمت درویشان چون قلب از تعلق جسمی وجی که بماسوی الله داشت پاک شود و رذائل نفس برطرف گشته نفس مطمئنه شود و اخلاص بهم رساند شریعت در حق او با مغز شود نماز او عند الله تعلق دیگر بهم رساند دو رکعت او بهتر از لک رکعت دیگران باشد و بهمچنینصوم او وصدقئه او رسول فرمود صلی الله علیه و سلم اگر شما مثل احد زر در راه خدا خرچ کنید برابر یک سیریا نیم سیر جو نباشد که صحابه در راه خدا داده اند این از جهت قوت ایمان و اخلاص شان است[৬৮]

[৬৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১১ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৫৮-৫৯।
[৬৮] হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান (অনু.), *মালাবুদ্দা মিনহু* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান কৃত অনুবাদের নমুনা:

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সৌভাগ্যবান করুন। ইতিপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে তা ছিল ঈমান ইসলাম ও শরিয়তের বাহ্যিক আকৃতি। শরীয়তের হাকীকত ও সারনির্যাস আল্লাহর অলী-বুযুর্গদের কাছে তালাশ করা উচিত। এ রূপ ধারনা করা ঠিক নয় যে, তরিকত শরিয়ত থেকে ভিন্ন। এ রূপ মনে করা মূর্খতা ও কুফুরী। এই শরিয়ত অনুসারীগণই যখন বুযুর্গদের খেদমতে গিয়ে অন্তর-দৈহিক সম্পর্ক এবং গাইরুল্লাহর মহব্বত ছিন্ন করে পবিত্রতা অর্জন করে এবং নফস তার সকল খারাবী দূর করত: মুতমায়ীন্নার পর্যায়ে উপনীত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে এখলাস সৃষ্টি হয়, তখন শরিয়ত তার কাছে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন মনে হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে। তখন তার নামায আল্লাহর দরবারে অন্যরূপ সম্পর্ক অর্থাৎ (এহসানের) উঁচু মাকাম সৃষ্টি করে দেয়। তার দু'রাকআত নামায অন্যের লাখো রাকায়াত নামায হতে উত্তম হয়ে যায়। এমনিভাবে তার রোযা, ছদকা (অন্যান্য ইবাদত)ও এ রূপ মর্যাদা লাভ করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন:

যদি তোমরা উহুদ পাহাড় সমান সোনা বা রূপা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর তবুও তা এক সের বা আধাসের যবের সমান হবে না যা ছাহাবাগণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন। তাদের এ রূপ মর্যাদা ঈমানী শক্তি ও এখলাসের বদৌলতেই হয়েছে।[৬৯]

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী কর্তৃক অনূদিত নমুনা:

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে সৌভাগ্যশালী করুন! ইতিপূর্বে সে সব বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে তা ছিল ঈমান, ইসলাম ও শরীয়ত সর্ম্পকীয়। এসবের হাকীকত ও নিগুঢ়তত্ত্ব আল্লাহর অলীগণের খেদমতে তালাশ করা বাঞ্চনীয়। মারেফাত ও হাকীকত শরীআতের খেলাপ এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। বরং এটা মূর্খতা ও কুফুরী। বস্তুতঃ এটা জাহেল ও কাফেরের উক্তি। মূলত এটা-ই আসল শরীআত। কেননা আল্লাহর অলীদের খেদমতের দ্বারা (রূহ) অন্তরাত্মা দৈহিক সম্বন্ধ ও গায়রুল্লাহর প্রেম ও মহব্বত হতে পুতঃপবিত্র হয়ে যায়। (প্রকৃত প্রেমাষ্পদ আল্লাহর সাথে নিগুঢ় প্রেম সৃষ্টি হয়।) এবং আত্মার সমুহ কলুষ বিদূরিত হয়ে তা মুৎমায়িন্নার স্তরে পৌঁছে যায়। আর তখনই (আমলের মধ্যে) ইখলাস ও ঐকান্তিকতা পয়দা হয়। শরীআত তার জন্য হাকীকতে (সার সম্পন্ন) পরিণত হয়। তাঁর নামায মাওলার দরবারে ভিন্ন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তার দু'রাকাত নামায উত্তম হয় অন্যান্যদের লক্ষ রাকাত নামায হতে। এ রূপে তাঁর রোযা, সদকা প্রভৃতি।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন– "তোমরা উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান করো তা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর একসের বা অর্ধসের যবের সমতুল্যও হবেনা। বস্তুতঃ এ ছিল তাঁদের ঈমানী শক্তি ও ইখলাসের কারণে।[৭০]

হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন কৃত অনুবাদের নমুনা:

প্রিয় ছাত্র/ছাত্রীরা! জেনে! রেখে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সৌভাগ্যশালী করুন। ইতিপূর্বে যে সব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সে গুলো ছিল ঈমান, ইসলাম ও শরীয়ত সংক্রান্ত। এসবের হাকীকত ও নিগুঢ় তত্ত্ব আল্লাহর অলীগণের নিকট তালাশ করা বাঞ্চনীয়। মারেফাত ও হাকীকত শরীঅতের খেলাফ– এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়, মূর্খতা ও কুফুরী। বস্তুতঃ এটা

---

[৬৯] *প্রাগুক্ত।*

[৭০] মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী (অনু.), *মালাবুদ্দা মিনহু* (ঢাকা: আল-আকসা লাইব্রেরী, ২০০৪), পৃ. ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

জাহেল ও কাফেরের উক্তি; বরং এটা-ই আসল শরীঅত। কারণ আল্লাহর ওলীদের খেদমত দ্বারা অন্তর দৈহিক সম্পর্ক এবং গায়রুল্লাহর প্রেম মহব্বত থেকে পূত-পবিত্র হয়ে যায়। প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহর সাথে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং আত্মার সমুহ কলুষ বিদূরিত হয়ে তা মুতমায়েন্নার স্তরে উপনীত হয়। আর তখনই আমলের মাধ্যমে ইখলাস আন্তরিকতা পয়দা হয়, শরীআত তার জন্য হাকীকতে পরিণত হয়। তাঁর নামায মাওলার দরবারে ভিন্ন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তার দুরাকাত নামায অন্যদের লক্ষ রাকাত নামায অপেক্ষা উত্তম। এরূপে তাঁর রোযা, সদকা প্রভৃতি অন্যদের রোযা এবং সদকা থেকে উত্তম।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন– "তোমরা যদি উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান কর তা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর একসের বা অর্ধসের যবের সমতুল্যও নয়। বস্তুতঃ এ ছিল তাঁদের ঈমানী শক্তি ও ইখলাসের কারণে।[৭১]

হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান তাঁর অনুবাদে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন। অপর দিকে মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থে ফারসি শব্দের উল্লেখসহ শব্দার্থ উপস্থাপিত হয়েছে। তেমনিভাবে হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থেও ফারসি শব্দের উল্লেখসহ শব্দার্থ রয়েছে। তবে এ গ্রন্থে টীকা শিরোনামে জটিল কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত অনুবাদগুলোর মূল্যায়নে বলা যায় যে তিনটি অনুবাদই প্রায় একই রকম। অনুবাদগুলো নিঃসন্দেহে মূলানুগ ও ব্যাখ্যামূলক।

চিরভাস্বর মহানবী (স.)

আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত *ফুরূগে আবাদিয়্যাত* নামক গ্রন্থটি মোহাম্মদ মুনির খান অনুবাদ করেন। অধ্যাপক সিরাজুল হকের সম্পাদনায় *চিরভাস্বর মহানবী (স.)* শিরোনামে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে এপ্রিল ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটিকে একত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে এর বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর উল্লেখযোগ্য শিরোনাম নিম্নরূপ:

আরব উপদ্বীপ: ইসলামী সভ্যতার সূতিকাগার, প্রাক ইসলামী যুগের আরব জাতি, দুই পরাশক্তি ইরান ও রুমের অবস্থা, মহানবী (স.) এর পূর্বপুরুষগণ, বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর শুভ জন্ম, মহানবী (সা.) এর শৈশবকাল, যৌবনকাল, কোরআন সম্পর্কে কুরাইশদের অভিমত, কোরআন, হাদীস ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে মেরাজ, আকাবার চুক্তি ইত্যাদি।[৭২]

---

[৭১] হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন (অনু.), *মা–লা–বুদ্দা মিনহু* (ঢাকা: আশরাফিয়া বুক হাউস, ২০০৫), পৃ. ২১২।

[৭২] মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান (অনু.), *চির ভাস্বর মহানবী (সা.)* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০০৪), পৃ. অধ্যায় শিরোনাম।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদের ফলে বাংলা ভাষী পাঠক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানা সহজতর হয়েছে।

সিররে হক্ক জামে নূর

সিররে হক্ক জামে নূর গ্রন্থটি শামসুল ওলামা আল্লামা হযরত শাহ সুফী সৈয়্যেদ আহ্মদ আলী ওরফে হযরত জানশরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী (র.) রচিত। মাওলানা এ. কে. এম মাহবুবুর রহমান কর্তৃক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। আলহাজ্জ্ব সৈয়্যেদ শাহ নূরে মোর্শেদ ও তার ভাইদের উদ্যোগে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

মৌলিক গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত হলেও আরবী ফারসির আবহ রয়েছে সর্বত্র। *সিররে হক্ক জামে নূর* তথা 'আল্লাহর রহস্য নূরের পেয়ালা' গ্রন্থে সূফীবাদ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষের দিকে টীকা শিরোমে কতগুলো মৌলিক বিষয়ের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত এ. কে. এম. মাহববুর রহমান অনূদিত একটি ফারসি গযল নিম্নরূপ:

در افشاندم بر فتح یاد گاری من
چون از خار گل شده بدلداری من

উচ্চারণ: দার আফশান্দাম বর ফাত্হে ইয়াদগারীয়ে মান্
চুঁন্ অয খার্ গোল শোদাহ বেদিলদারীয়ে মান্

অনুবাদ: হৃদয় দিয়ে করেছি যবে কাঁটাকে ফুল বাগান
বিজয়ের স্মৃতি উঠেছে ভেসে অবিরাম অম্লান

سیاهی در گلاس کرده شیشۂ آتشی دارد
ز یک شعله دو عالم شد اشکباری من

উচ্চারণ: সিয়াহি দার্ গেলাস কারদাহ্ শিশায়ে আতাশি দারাদ্ যে
ইয়েক শো'লাহ দো অলাম শোদ আশক্‌বারীয়ে মান

অনুবাদ: দৃষ্টিতে মোর নেমেছে ছায়া আয়নাতে মোর লেলিহান,
এক ঝলকে দু'জাহান মোর হয়েছে অশ্রু বহমান

از صراط مستقیم چون برون آمد پدرم
اتحادیگانه گردر هجوی تسخیر من

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ: অয্ সিরাতে মুস্তাকিম চুঁন বরূন অমাদ পেদারাম
ইত্তেহাদে ইগানে গার দার হাজবীয়ে তাসখীরে মান্

অনুবাদ: সিরাতুল মুস্তাকিম হতে যেই বের হয়ে যাই,
একই সূত্রে ক্ষমতা মোর গ্রথিত দেখতে পাই।

مباش ایمن از فصحات درياری
بنگر بهر سویکه ملکش به ابداری من

উচ্চারণ: মাবাশ্ আয়মান অয ফোসহাত দার ইয়ারী
বেন্গার বেহার সূয়ি কে মুলকাশ্ বে আবদারিয়ে মান্

অনুবাদ: বন্ধুত্বের মাঝেও বাক-চাতুর্য থেকে ভেবোনা নিরাপদ,
যে দিকে তাকাও দেখবে তাঁর রাজত্ব হয়েছে আমারই সম্পদ।

جامهٔ پاره کرده چون دیدم روی او
بهر مسکن پدید آمد که صور در تن من

উচ্চারণ: জামায়ে পারে কারদে চুঁন দিদাম রোয়ে উ
বেহার মাসকান পাদীদ অমাদ কে সূবার দার তানে মান।

অনুবাদ: ছিঁড়েছি জামা দেখেছি যখন চেহারা তাঁর,
যেখানেই সে উদিত হয়েছে ধারণ করেছে চেহারা আমার।

کی سکینه از حب الوطن متبصر شمیدرا
نه در کونین دمی شاد آن ولی سارا ابجان من

উচ্চারণ: কেই সাকিনা অয হুব্বুল ওয়াতান মুতাবাস্সার শামীদরা
নাদার কাউনাইন দামী শাদ আন অলি সারা বেজানেমান

অনুবাদ: স্বদেশ প্রেমে পেরেশান মন পেয়েছে সান্ত্বনা,
দুই জগতে নেই যে সুখ শুধুই বিরহের যন্ত্রনা।

خار شدی یا گل شدی هر چه دو عالم شدی
من بودم و تو بودی که در ای منصوری من

উচ্চারণ: খার শুদি ওয়া গোল শুদি হার চে অলাম শুদি
মান বুদাম ওয়া তু বুদি কে রেদায়ে মানসুরিয়ে মান

অনুবাদ: দুই জগতে তুমি কাঁটা হও আর ফুল হও,
আমার ভুবনে তুমি সদা বিজয়ের নিশান হয়ে রও।

Dhaka University Institutional Repository

شریفی در زندگانی سلید یک دم
که جلوهٔ همنشین کرد و عنن زنجیر من

উচ্চারণ: শরিফী দার জিন্দেগানী নয়া সাইয়াদ একদম
কে জালওয়ায়ে হাম নাশীন কার্‌দ এনানে জানজীরে মান

অনুবাদ: শরিফী তো জীবন ভর পায়নি আরাম মুহূর্তও
তোমার পরশের তাজাল্লী বেঁধেছে সব অস্তিত্বও।[৭৩]

অনুবাদক অত্যন্ত সার্থক অনুবাদ করেছেন এবং উপস্থাপিত অনুবাদটি মূলানুগ হিসাবে বিবেচিত। এ গ্রন্থে অনুবাদের সাথে সাথে ফারসি উচ্চারণ উপস্থাপনের কারণে পাঠকের জন্য কাব্যের গভীরে প্রবেশ করে মর্মার্থ অনুধাবন সহজতর হয়েছে।

ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান

শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহ্‌হারী রচিত (خدمت متقابل اسلام و ایران) *খিদমাতে মুতাকাবেলে ইসলাম ওয়া ইরান* গ্রন্থটি এ. কে. এম আনোয়ারুল কবীর কর্তৃক *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান* শিরোনামে অনূদিত হয়। অধ্যাপক সিরাজুল হকের সম্পাদনায় কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা থেকে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থের অনুবাদের বিষয়ে গ্রন্থের প্রকাশক কালচারাল কাউন্সেলর শাহাবুদ্দীন দারায়ী বলেন:

> ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইরান ও ইসলামের অভিন্ন সূত্র সম্পর্কে ইতিহাসের পাতা থেকে সত্য উদঘাটন, প্রজ্ঞা ও ইনসাফের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জবাব দানের লক্ষ্যে বর্তমান গ্রন্থটি অনুবাদের পদক্ষেপ নিয়েছে। উল্লিখিত প্রশ্নসমূহ এবং অনুল্লিখিত আরো অনেক প্রশ্নের জবাব রয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বিজ্ঞ, সত্যানুসন্ধানী ও সংস্কৃতিসেবী লোকদের হাতে অর্পণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।[৭৪]

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু তিনটি ভাগে বিভক্ত। ইসলাম ও জাতীয়তার প্রসঙ্গ, ইরানের প্রতি ইসলামের অবদান ও ইসলামের প্রতি ইরানের অবদান। গ্রন্থের আলোচনা নিম্নোক্ত শিরোনামের আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে:

ইরানী জাতির দৃষ্টিতে ইসলাম, ইরানে ইসলামের অবদান, ইসলামের প্রতি ইরানের অবদান, দর্শন ও প্রজ্ঞা, এরফান ও তাসাউফ এবং শিল্প ও সাহিত্য ইত্যাদি। *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান* গ্রন্থে ধর্মীয় বিষয়ের তথ্যবহুল ও তাত্ত্বিক বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

---

[৭৩] এ. কে. এম. মাহববুর রহমান (অনু.), *সিররে হক্ক জামে নূর* (ঢাকা: খানকায়ে সুরেশ্বরী, ২০০৪), পৃ. ১১০০-১০৩।

[৭৪] এ. কে. এম আনোয়ারুল কবীর (অনু.), *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান* (ঢাকা: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০০৪), পৃ. প্রকাশকের কথা।

Dhaka University Institutional Repository

আজবেবাতুল ইস্তিফতাআত

হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী কর্তৃক রচিত ফতোয়া সংকলনটি দারুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে অনূদিত হয়ে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অধ্যায় ভিত্তিক আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে শরয়ী মাসআলাসমূহ ও শরীয়ত সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সন্নিবেশিত হয়েছে। *আজবেবাতুল ইস্তিফতাআত* গ্রন্থে কিতাবুত তাকলীদ, কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত, কিতাবুস সওম, কিতাবুল খুমস, কিতাবুল জিহাদ ইত্যাদি শিরোনামে শরীয়তের গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।[৭৫] উল্লেখ্য যে এ গ্রন্থের অপর একটি খণ্ড ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে দারুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন থেকেই প্রকাশিত হয়। এ অধ্যায়েও শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের পরও ফারসি হতে বাংলায় অনুবাদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের পর হতে যে গ্রন্থগুলো বাংলায় অনূদিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

আল্লামা মাজলিসী (রহ.) রচিত *বিহারুল আনোয়ার কাহিনী সম্ভার*, মোহাম্মদ আলী মোর্তাজা কর্তৃক অনূদিত; ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মাহদী জা'ফরী রচিত *নাহজুল বালাগাহ্ পরিচিতি*, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কর্তৃক অনূদিত; ফারসি ছোট গল্পকার জালালে আলে আহমদের গল্পসংকলন گزیدهی داستان های کوتاه جلال آل احمد তথা *জালালে আলে আহমাদের নির্বাচিত ছোটগল্প* শিরোনামে আবদুস সবুর খান কর্তৃক অনূদিত; আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল মুজাফফর রচিত *আকাঈদ আল ঈমামীয়াহ* গ্রন্থটি *শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস* শিরোনামে মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন তালুকদার কর্তৃক অনূদিত; সাইয়্যেদ মাহ্দী শোজায়ী রচিত گزیده ادبیات معاصر (مجموعه داستان) *সমকালীন ফারসি সাহিত্য* (নির্বাচিত ছোট গল্প) শিরোনামে নূর হোসেন মজিদী কর্তৃক অনূদিত; *হযরত আলী (আ.)-এর দৃষ্টিতে মহানবী (স.)* (নাহজুল বালাগাহ থেকে সংকলিত), মো. মুনির হোসেন খান কর্তৃক অনূদিত; ইমাম গায্যালী (র.) রচিত *আইয়ুহাল ওয়ালাদ! হে বৎস* শিরোনামে মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কর্তৃক অনূদিত; আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী রচিত فروغ ابدیت *চির ভাস্বর মহানবী (স.)* শিরোনামে মো. মুনির হোসেন খান কর্তৃক অনূদিত; মওলানা জালাল উদ্দীন মুহম্মদ রূমীর প্রণীত *মসনবী*র বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মূলক গ্রন্থ *মওলানা রূমী (রঃ) মসনবী শরীফ* প্রথম খণ্ডের প্রথমার্ধ মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কর্তৃক অনূদিত; হুজ্জাতুল ইসলাম মোহসেন কারাআতী রচিত پرسشهای مهم ، پاسخهای کوتاه *গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এর সংক্ষিপ্ত* উত্তর শিরোনামে মুহাম্মদ মাইন উদ্দিন কর্তৃক অনূদিত; আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী রচিত منشور عقائد امام *ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ* শিরোনামে মুহাম্মদ মাইন উদ্দিন কর্তৃক অনূদিত; ইমাম সাইয়্যেদ রুহুল্লাহ

[৭৫] আয়াতুল্লাহ আল-উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী, *আজবেবাতুল ইস্তিফতাআত* (ঢাকা: দারুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ. সূচীপত্রের শিরোনাম।

Dhaka University Institutional Repository

মুসাভী খোমেইনী রচিত عبد صالح *একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের কথা* শিরোনামে মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কর্তৃক অনূদিত; শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারী রচিত نظام حقوق زن در اسلام *ইসলামে নারীর অধিকার* শিরোনামে নূর হোসেন মজিদী ও আব্দুল কুদ্দুস বাদশা কর্তৃক অনূদিত; শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারী রচিত داستان راستان *সত্যবাদীদের কাহিনী সম্ভার* শিরোনামে মাওলানা আলী আব্বাস ও আব্দুল কুদ্দুস বাদশা কর্তৃক অনূদিত; ফিলিস্তিনের ইসলামী জিহাদ আন্দোলন - তেহরান অফিস কর্তৃক সংকলিত فلسطين،سرزمين تاريخ و مقاومت *ফিলিস্তিন ইতিহাস ও প্রতিরোধের ভূমি* শিরোনামে মুহাম্মদ মাইন উদ্দিন কর্তৃক অনূদিত; মোহাম্মদ আলী জামালযাদে রচিত يكى بود يكى نبود *একদা এক সময়* শিরোনামে আব্দুস সবুর খান কর্তৃক অনূদিত; আল্লামা আলী আল কুরানী রচিত *ইমাম মাহদী (আ.) এর আত্মপ্রকাশ* (আসরে যুহুর), মোহাম্মদ মুনির হোসেন খান কর্তৃক অনূদিত; শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারী রচিত (ع) جاذبه و دافعه على.) *হযরত আলী (রা.)এর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ* শিরোনামে মুহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ কর্তৃক অনূদিত; হযরত আল্লামা হাদী মারেফাত রচিত معصونيت قرآن از تحريف *কোরআন অবিকৃত থাকার রহস্য* শিরোনামে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান কর্তৃক অনূদিত; আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী রচিত طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن *কুরআনে ইসলামী চিন্তাধারার সামগ্রিক পরিকল্পনা* শিরোনামে মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কর্তৃক অনূদিত; ড. এম আর হাশেমীর ভূমিকা সম্বলিত (خطبۂ غديريه پيامبر اكرم (ص *গাদীরে খুম-এ রাসুলুল্লাহ (স.) এর ভাষণ* শিরোনামে মাওলানা আলী আব্বাস ও আব্দুল কুদ্দুস বাদশা কর্তৃক অনূদিত; আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী রচিত از ژرفهاى نماز *নামাযের অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য* শিরোনামে মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কর্তৃক অনূদিত; মুহাম্মদ রেইশাহরি *রচিত আধ্যাত্মিক বিস্ময়ঃ শেইখ রজব আলী খাইয়্যাত* মুহাম্মদ ইরফানুল হক কর্তৃক অনূদিত; দার রাহে হক প্রকাশনীর লেখক কর্তৃক রচিত হযরত মা ফাতিমা (আ.) শিরোনামে মোহাম্মদ নূরে আলম কর্তৃক অনূদিত; সাইয়্যেদ সদরুদ্দিন আল সদর রচিত *কে ইমাম মাহদী (আ.)?* শিরোনামে মুহাম্মদ ইরফানুল হক কর্তৃক অনূদিত; আল্লামা আব্বাস বিন মুহাম্মদ রেযা আল কুম্মি রচিত المهموم نفس *শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস* শিরোনামে মুহাম্মদ ইরফানুল হক কর্তৃক অনূদিত; শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারী রচিত گزيده حماسه حسينى *ইমাম হোসাইনের কাল বিজয়ী বিপ্লব* শিরোনামে মো. আব্দুল কুদ্দুস বাদশা কর্তৃক অনূদিত; মুহাম্মাদ রেজা মুশফেকীপুর রচিত احكام آموزشى *আহকাম শিক্ষা* শিরোনামে মো. আব্দুল কুদ্দুস বাদশা কর্তৃক অনূদিত; আল্লামা আব্বাস বিন মুহাম্মদ রেযা আল কুম্মি রচিত المهموم نفس *শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস* (দ্বিতীয় খণ্ড) শিরোনামে মুহাম্মদ ইরফানুল হক কর্তৃক অনূদিত; ড. আহমদ তামিমদারী রচিত تاريخ ادب پارسى (مكتب ها، دورها، سبكها، و انواع ادبى) *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস* (মতবাদ, যুগ, সাহিত্যশৈলী ও প্রকরণসমূহ) শিরোনামে তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কর্তৃক অনূদিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে মঈজুদ্দিন মুহাম্মদ সাম (শিহাবুদ্দীন ঘুরী)-এর সিপাহসালার ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকেই এ দেশে ফারসি চর্চা ইতিহাসে স্বীকৃত স্থান লাভ করে। তারপর হতে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন থেকে এ দেশে ফারসি সরকারের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে এবং প্রায় ছয়শত বছর ধরে তা রাজ ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ দেশে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইংরেজ শাসক লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত ফারসি ভাষা এ দেশের রাজ ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সুদীর্ঘকালের মধ্যে ফারসি ভাষার মাধ্যমে পাক-ভারত উপমহাদেশে বিরাট ইতিহাস সাধনার ধারা গড়ে উঠে। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য জগতেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসির প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আরবী-ফারসির প্রভাবান্বিত হয়ে দৌলত উজীর বাহরাম খা, আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, সৈয়দ হামযা, সাবিরিদ খান, দোনা গাজী চৌধুরী, ইয্যতুল্লাহ, পোরাওল, মুহাম্মদ নকী, হাজী আলী, কাজী শেখ মনসুর, মুহাম্মদ আলী, আলী রজা, ফরহাতুল্লাহ ফরহাত, নওয়াজিস খান, সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবর, সৈয়দ সেরবাজ চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রমুখ কবিগণ ফারসি কাব্যাবলম্বনে সরাসরি অথবা ঐ কাব্য-কাহিনীর ভাবাবলম্বনে কাব্য রচনা করেন।

আর তখনই রচিত হয় *ইউসুফ-জোলেখা, আমীর হামজা, লাইলী-মজনু, মধুমালতী, হানিফা ও কয়রা পরী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, লালমতি ও সয়ফুলমুলুক, গুলে বকাওলী, জেবলমুলুক শামারোখ, জঙ্গনামা, রসুল বিজয়, সিকান্দার নামা, হাফতে পেইকার, নূরনামা, নসিয়তনামা, চারিমোকাম ভেদ, দুররে মজলিস, সুরতনামা, নূরনামা, তালেবনামা, চারি মোকাম ভেদ, শিহাবুদ্দীন পীরনামা, ধ্যানমালা, সিরাজ কুলুব, আগাম জ্ঞান সাগর, জ্ঞান চৌতিশা, যোগ কলন্দর, সিরনামা, তন-তেলাওত, যুগীকাচ, মুসার হাজার সওয়াল, ফক্কর নামা, নবীবংশ, শব-ই-মিরাজ, রসুল বিজয়, ওফাৎ-ই-রাসুল, জয়নাবের চৌতিশা, মক্তুল হোসেন, জঙ্গনামা, ফাতেমার হাজার সওয়াল, কাশিমের লড়াই, শহীদ-ই-কারবালা, সখিনার বিলাপ, সংগ্রাম হুসন, আমীর নামা, আমীর হামযা, সোনাভান* ইত্যাদি গ্রন্থ।

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজী ভারতবর্ষের রাজভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়। তখন থেকে বাংলায় ফারসি ভাষার প্রচলন এবং চর্চা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও

Dhaka University Institutional Repository

একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। এরই প্রভাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতক থেকে ফারসি সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ পরিলক্ষিত হলেও বিশ শতকের গোড়ার দিকে এর প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়। এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এ অনুবাদ আরো ব্যাপকতা লাভ করে। বিশেষ করে ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকর্ম *শাহনামা* স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদরূপে প্রকাশিত হয়। অপরদিকে ভারতবর্ষে রচিত উল্লেখযোগ্য ফারসি গ্রন্থ *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, *সিয়ার-উল- মুতায়াখখিরীন*, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, *হুমায়ুননামা*, *তবকাতে আকবরী*, *তারীখে ফিরিশ্‌তা*, *বিলায়েত নামা*, *তারীখে ফিরোজশাহী*, *তবকাত-ই-নাসিরী*ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গানূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উপস্থাপিত **বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫** অভিসন্দর্ভে উপর্যুক্ত বিষয়ে বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

তা ছাড়া ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়্যামের *রুবাঈয়াত*, শেখ সা'দীর সাহিত্যকর্ম, মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর *মাসনবী*, মহাকবি হাফিজের কাব্য, আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের সাহিত্যকর্ম-এর অনুবাদ ও অন্যান্য লেখকের অনূদিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে অনুবাদকগণ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল রচনার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্য রেখেছেন, অনুবাদকর্মটি কি মূলানুগ না ভাবানুবাদ এ বিষয়ে স্থানভেদে অনুবাদকর্মের মূল ফারসিসহ অনুবাদের নমুনা ইত্যকার বিষয়াদি **বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্য চর্চা ১৯৭১-২০০৫** শীর্ষক অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচনায় অনূদিত গ্রন্থের মূল ফারসি গ্রন্থ ও এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে কখনো সংক্ষেপে কখনো বিশদ বিবরণ প্রদানের পাশাপাশি মূল ফারসি ইবারত উপস্থাপন করে অনূদিত গ্রন্থের অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখানো হয়েছে।

বাংলা–ইরান সম্পর্ক, বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্রমবিকাশ ও বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্য-অনুবাদের ক্রমবিকাশ, একুশ শতকে ফারসি সাহিত্য-বঙ্গানুবাদের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব চিহ্নিত করা হয়েছে। তা ছাড়া উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভে বাংলা-ফারসি অনুবাদের মূল্যায়নে তথ্যনির্ভর আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ কালের বিভিন্ন অনুবাদ-প্রয়াসের মধ্যে আমাদের জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রয়েছে। আমরা অনুভব করি যে, আমাদের জাতি জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অবশ্যই আরও উচ্চতর উন্নতির পরিচয় দেবে এবং অনুবাদ তাতে গুরুতর ঋদ্ধি যোগাবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ফারসি গ্রন্থাবলী

আগাহী, উস্তাদ মুতাহ্হারী শাহীদ — *ইমাম খোমেনী (রহ.) চেরাগে হেদায়াত,* তেহরানঃ ইত্তেহাদীয়ে আন্‌জুমানহায়ে ফারহাঙ্গীয়ে তালাব, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৮১ ইরানী সাল।

আযীয, আবদুল (সম্পা.) — *মীযানুস সরফ,* ঢাকাঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।

আতাবুকী, পারভেয — *বারগুযিদে ওয়া শারহে আসারে সা'দী,* তেহরানঃ নাশরে পাযুহেশে ফারজান, চাপে নুশতার, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৪ ইরানী সাল।

———————— — *শাহনামেয়ে ফেরদৌসী,* তেহরানঃ শেরকাতে এন্তেশারাতে এলমী ওয়া ফারহাঙ্গী, ১৩৭৫ ইরানী সাল।

আনসারী, হামীদ — *হাদীসে বিদারী,* নেগাহী বে যেন্দেগী নামেয়ে অরমানী, এলমী ওয়া সিয়াসীয়ে ইমাম খোমেনী, তেহরানঃ মোআসসেসেয়ে তানযীম ওয়া আসাওে ইমাম খোমেনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৪ ইরানী সাল।

আনুশেহ, হাসান — *দানেশনামায়ে আদবে ফারসি,* তেহরানঃ ওয়াযারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাদে ইসলামী, ১৩৭৫ ইরানী সাল।

আফশানী, মুহাম্মদ মেহদী বাবাপুর গুল — *তাহলীলীয়ে বার এনকেলাবে ইসলামীয়ে ইরান রীশেহা ওয়া পীয়ামদহা,* কুমঃ এন্তেশারাতে মারকাযে জাহানীয়ে উলূমে ইসলামী, ২০০৩।

আবদী, প্রফেসর সাইয়্যেদ আমীর হাসান — *'শাহনামে ওয়া হিন্দ', কানদে গোযিদেয়ে মাকালাতে ফারসি,* তেহরানঃ এন্তেশারাতে দাবিরখানেয়ে শুরায়ে গুস্তারেশে যাবান ওয়া আদাবিয়্যাতে ফারসি, ১৩৮২ ইরানী সাল।

আহমদ, খাজা নিযামুদ্দীন — *তবকাত-ই-আকবরী,* কলকাতাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙ্গাল, ১৯২৭।

ইকবাল, ড. মুহাম্মদ — *কুল্লিয়াতে ইকবাল ফারসি,* লাহোরঃ গোলাম আলী পাবলিশার্স, ১৯৭৫।

———————— — *কুল্লিয়াতে আশআরে ফারসিয়ে ইকবাল,* তেহরানঃ কিতাব খানেয়ে সানায়ী, ১৯৬৪।

ইয়াগানী — *হাকিম ওমর খৈয়াম ওয়া রোবাইয়াতে উ,* তেহরানঃ এন্তেশারাতে আনজুমান আসারে মিল্লী, ১৩৪২ ইরানী সাল।

ইয়াহাকী, ড. মোহাম্মদ জা'ফর — *ফারহাঙ্গে আসাতীর ওয়া ইশারাতে দাস্তানী দার আদাবিয়াতে ফারসি,* তেহরানঃ এন্তেশারাতে সোরূশ, ১৩৭৫ ইরানী সাল।

Dhaka University Institutional Repository

——————— *চূন সাবুয়ে তেশনে,* তারীখে আদাবীয়াতে মুয়াসেরে ফারসি, তেহরান: জামী প্রেস, ১৯৯৫।

করীব, মাহদী *বাযখানিয়ে শাহনামে,* তুসঃ এন্তেশারাতে তুস, খেয়াবানে ইনকিলাব, ১৩৬৯ ইরানী সাল।

কেয়া, ড.যাহরা খানলারী *রাহনুমায়ে আদাবিয়্যাতে ফারসি,* তেহরানঃ কিতাব খানেয়ে ইবনে সিনা, ১৩৪১ ইরানী সাল।

খাঁন, মৌলভী সাইয়্যেদ আহমদ (সম্পা.) *তারীখে ফিরোজশাহী,* কলকাতাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙ্গালা, ১৮৭২।

খোমেনী (র.), ইমাম *কালেমাতে কাসার পান্দহা ওয়া হেকমাতহা,* তেহরানঃ মুআসসাসেয়ে তানযীম ওয়া নাসরে আসারে ইমাম খোমেনী (র.), ১৯৯৩, প্রথম প্রকাশ।

——————— *দীওয়ানে ইমাম,* তেহরানঃ মোআসসাসেয়ে তানযীম ওয়া নাসরে অসাওে ইমাম খোমেনী, ১৩৭৩ ইরানী সাল।

খানলারী, পারভেজ নাতেল ও সাফা, যাবিহুল্লাহ *শাহকারহায়ে আদাবিয়্যাতে ফারসি,* তেহরানঃ মোআসসেসেয়ে চাপ ওয়া এন্তেশারাতে আমীর কবীর, ১৩৪৩ ইরানী সাল।

চাগতাই, ড. আবদুল্লাহ (সম্পা.) *তবকাত-ই-নাসিরী,* লাহোরঃ কিতাব খানেয়ে নুরেস, ১৯৫২।

তাবাতাবায়ী, সাইয়্যেদ গোলাম হুসাইন *সিয়ার-উল-মুতায়াখখিরিন,* কলকাতাঃ বেদারুল উমারা, তা.বি.।

দাহশিরী, সাইয়্যেদ যিয়া উদ্দীন *না'তে হযরত রাসূলে আকরাম দর শে'রে ফারসি,* তেহরানঃ ১৩৪৮ ইরানী সাল।

দেহকান, আলী রেজা *চেহেল নুকতে আয সীরে আমালীয়ে ইমাম খোমেনী (র.),* তেহরানঃ নাশরে রূহ, ১৩৮১ ইরানী সাল।

দেহখোদা, আল্লামা আলী আকবর *লোগাত নামেয়ে দেহখোদা,* ৮ম খণ্ড, তেহরানঃ দানেশগাহে তেহরান, ১৩৪২ ইরানী সাল।

——————— *লোগাত নামেয়ে দেহখোদা,* ৩৭ তম খণ্ড, তেহরানঃ দানেশগাহে তেহরান, ১৩৪১ ইরানী সাল।

নদভী, সাইয়্যেদ নাজীব আশরাফ (সম্পা.) *রুকআতে আলমগীরী,* কলকাতাঃ আজম ঘাট, ১৯২৯।

নাফিসী, সাঈদ *জুসতজু দার আহওয়াল ওয়া আসারে ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরী,* তেহরানঃ কিতাব ফুরূশী ওয়া চাপ খানেয়ে ইকবাল, ১৩২০ ইরানী সাল।

Dhaka University Institutional Repository

——————— *তারিখে নায্‌ম ওয়া নাসর দার ইরান ওয়া দার যাবানে ফারসি*, তেহরান: এন্তেশারাতে ফুরুগী, ১৩৬৩ ইরানী সাল।

নায়িনী, ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রেযা জালালী — *দীওয়ানে হাফিজ শিরাজী*, তেহরান: আন্‌জুমানে খোশ নাভেস্তানে ইরান, ১৩৭৫ ইরানী সাল।

নিশাবুরী, শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার ও বেসাল, ড. নূরানী (সম্পা.) — *মুসীবত নামা*, তেহরান: কিতাবফোরূশীয়ে যাওয়্যার, ১৩৬৪ ইরানী সাল।

নোমানী, আল্লামা শিবলী — সাইয়েদ মোহাম্মদ তাকী খরদায়ী গিলানী (অনূদিত)*শে'রুল আজম*, তেহরান: দুনিয়ায়ে কিতাব, ১৩৬৩ ইরানী সাল, ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড।

নায়িনী, ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রেযা জালালী (সম্পা.) — *দীওয়ানে হাফিজ শিরাজী*, তেহরান: আন্‌জুমানে খোশ নাভেস্তানে ইরান, ১৩৭৫ ইরানী সাল।

নিছারী, সালিম — *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, তেহরান: ১৩২৮ ইরানী সাল।

পেজু, মনুচেহের দানেশ — *গোযিদেহায়ে নায্‌ম ওয়া নাস্‌রে ফারসি*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে আল্লামে তাবাতাবাঈ, ১৯৯৫ খ্রি.।

ফজল, আবুল — *আইন-ই-আকবরী*, কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, তা.বি.।

ফিরিশ্‌তা, মুহাম্মদ কাসিম — *তারীখে ফিরিশ্‌তা*, কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙ্গাল, তা.বি.।

ফোরূগী, মোহাম্মাদ আলী — *কুল্লিয়াতে সা'দী*, তেহরান: এন্তেশারাতে পেইমান, ১৩৪২ ইরানী সাল।

——————— *শাহনামেয়ে ফেরদৌসী*, তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৩৭২ ইরানী সাল।

ফোরূযানফার, বদীউজ্জামান — *তারীখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, তেহরান: ওয়াযারাতে আমুযাশে ইরান কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৮৩ ইরানী সাল।

——————— *শারহে আহওয়াল ওয়া নাগ্বদ ওয়া তাহলীলে আসারে শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার নিশাবুরী*, তেহরান: এন্তেশারাতে আন্‌জুমানে আসার ওয়া মাফাখেরে ফারহাঙ্গী, ১৩৭৪ ইরানী সাল।

বায়নী, ড. মাহদী — *কারনামায়ে বুযুর্গানে ইরান*, তেহরান: এদারায়ে কুল্লি এন্তেশারাত ওয়া রাদিও, ১৩৪০ ইরানী সাল।

ভিজদানী, মোস্তফা — *সারগুজাশত্‌হায়ে ভীযে আয যেন্দেগীয়ে হযরত ইমাম খোমেনী*, তেহরান: এন্তেশারাতে পায়ামে আযাদী, ১৩৬৪ ইরানী সাল, পঞ্চম প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

মাশকূর, ড. মুহাম্মদ জাওয়াদ — *তারীখে ইরান জামীন*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে এশরাকী, ১৯৯৩, চতুর্থ প্রকাশ।

মাশীরী, ড. মাহশীদ — *নাখুস্তীন ফারহাঙ্গে যাবানে ফারসি*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে সোরূশ, ১৩৭৪ ইরানী সাল।

মারতাযাভী, মনুচেহের — *ফেরদৌসী ওয়া শাহনামে*, তেহরানঃ মোআসসেসেয়ে মোতালাআত ওয়া তাহকীকাতে ফারহাঙ্গী, ১৯৯৩ খ্রি.।

মুঈন, ড. মুহাম্মদ — *ফারহাঙ্গে ফারসি*, তেহরানঃ মুআসসেসেয়ে এন্তেশারাতে আমীর কাবীর, ১৩৭৫ ইরানী সাল, ১ম খণ্ড।

———————— — *ফারহাঙ্গে ফারসি*, তেহরানঃ মুয়াসসেসায়ে এন্তেশারাতে আমীরে কাবীর, ১৯৮৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

মুহিব্বী, মাহমুদ — *দাস্তানে বাস্তান*, মাশহাদঃ এন্তেশারাতে ইয়াস, খেয়াবানে সাদী, ১৩৭২ ইরানী সাল।

যানযানি, ড. বারায়াৎ — *আহওয়াল ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, তেহরানঃ মুয়াসসাসেয়ে এন্তেশারাত ওয়া চাপে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৭২ ইরানী সাল।

রমযানী, মুহসিন (সম্পা.) — *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম দর ছেহ যাবান*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে পাদীদে হুনারী, ১৩২২ ইরানী সাল।

রশীদ, শায়খ আবদুর — *ফুতূহাত-ই ফীরূজ শাহী*, আলীগড়ঃ মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ইতিহাস বিভাগ, ১৯৫৪।

রাদফার, আবুল কাসেম — *তারজুমেহায়ে শাহনামে*, তেহরানঃ শেরকাতে এন্তেশারাতে এলমী ওয়া ফারহাঙ্গী, ১৩৬৯ ইরানী সাল।

রিয়াহী, মোহাম্মাদ আমীন — *সারে চেশমেহায়ে ফেরদৌসী শেনাসী*, তেহরানঃ মোআসসেসেয়ে মোতালাআত ওয়া তাহকীকাতে ফারহাঙ্গী, ১৯৯৩ খ্রি.।

রেজবী, মুহাম্মদ হাসান — *যেন্দেগী নামেয়ে সিয়াসীয়ে ইমাম খোমেনী*, তেহরানঃ মারকাযে ফারহাঙ্গীয়ে কেবলে, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৩ ইরানী সাল।

শরীফ, মীর সায়্যিদ — *নাহবেমীর*, ঢাকাঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।

শাকিব, নে'মাতুল্লাহ কাজী — *বেসূয়ে সীমোরগ*, তেহরানঃ মোআসসেসেয়ে এন্তেশারাতে সিক্কে, ১৩৮০-১৩৮১ ইরানী সাল।

শাকিবা, পারভীন — *শে'রে ফারসি আয অগায তা এমরোয*, তেহরানঃ এন্তেশারাতে হিরমান্দ, ১৯৯৪, ২য় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

শাফাক, রেজাযাদেহ — *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, তেহরান: চাপ খানেয়ে আরমান, ১৩৬৯ ইরানী সাল।

শিআ'র, ড. জা'ফর — *বারগুযিদেয়ে সিয়াসত নামা*, তেহরান: চাপখানেয়ে সেপেহের, ১৩৭২ ইরানী সাল।

শিরাজী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ — *দীওয়ানে গজালিয়্যাতে হাফিজ শিরাজী*, তেহরান: এন্তেশারাতে সফী আলী শাহ, ১৩৭৯ ইরানী সাল।

শো'বানী, রেযা — *কেতাবে ইরান* (গুযীদেয়ে তারীখে ইরান), তেহরান: মারকাযে মোতালায়াতে ফারহাঙ্গীয়ে বায়নাল মেলালী, ২০০২।

সলীম, গোলাম হোসাইন — *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, বাঙ্গাল, তা.বি.।

সাফা, ড. যবীহ উল্লাহ — *তারীখে আদাবিয়্যাত দার ইরান*, তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৩৭১ ইরানী সাল, ১ম খণ্ড, ১২তম সংস্করণ।

——— *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, তেহরান: রামীন প্রকাশনী, ১৯৯৫, ২য় খণ্ড, দশম মুদ্রণ।

——— *গানজ ওয়া গানজিনে*, তেহরান: মোআসসেসেয়ে এন্তেশারাতে আমির কাবির, ১৩৬৩ ইরানী সাল।

সাতুদে, আমির রেযা — *পা বে পায়ে আফতাব*, গুফতেহা ওয়া নাগুফতেহা আয যেন্দেগীয়ে ইমাম খোমেনী, তেহরান: নাশরে পানজেরে, ১৩৭৩ ইরানী সাল।

সাবা, আব্দুর রহীম — *তারীখে কাশ্মীরিয়ানে ঢাকা*, (অপ্রকাশিত)।

সামারকান্দী, নিযামী আরুযী — *চাহার মাকালে*, তেহরান: এন্তেশারাতে আমীর কবীর, ১৩৬৬ ইরানী সাল।

সাহসারামি, ড. কলিম — *খেদমাত গুযারানে ফারসি দার বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৯ খ্রি.।

সিয়াকী, ড. সাইয়্যেদ মোহাম্মদ দাবীর — *যেন্দেগী নামেয়ে ফেরদৌসী ওয়া সারগুযাশতে শাহনামা*, তেহরান: শেরকাতে চাপ ওয়া এন্তেশারাতে এলমী, ১৩৭০ ইরানী সাল।

——— *বারগারদানে রাওয়ায়েতে গোনেয়ে শাহনামেয়ে ফেরদৌসী বে নাসর*, তেহরান: নাশরে কাতরে, ১৩৪১ ইরানী সাল।

সুবহানী, ড. তাওফিক হা. — *তারীখে আদাবিয়্যাত*, তেহরান: পায়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ১৯৯০।

সোবহান, আবদুস (সম্পা.) — *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী*, কলকাতা: আনজুমানে এশিয়ায়ী, ১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিমী, ড. ইসমাঈল — *আদাবীয়াতে মুয়াসেরে ইরান*, তেহরান: আসাতীর, ময়দানে ফেরদৌসী, আওয়াল ইরান শাহরে সাখতেমান, ১৯৯৫।

হাফিজ, আবেদা — *তারীখে শাহ শুজাঈ*, পিএইচ. ডি. থিসিস (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮।

উর্দু গ্রন্থাবলী

আযীম, সৈয়দ ইকবাল — *মাশরেকী বাঙ্গাল মে উর্দূ*, ঢাকা: মাশরিক কো-অপারেটিভ পাবলিশার্স, ১৯৫৪।

উল্লাহ, আহসান — *তাওয়ারীখ-এ-খান্দান-এ-কাশ্মীরিয়া*, (অপ্রকাশিত, উর্দু গ্রন্থ)।

কাগওয়ায়ী, ড. মুহাম্মদ সালেম — *হিন্দুস্তানী মুফাসসিরীন আওর উনকি আরবী তাফসীরে*, নয়া দিল্লী: মাকতাবা জামিয়া লিমিটেড, তা.বি.।

গাঙ্গুহী, মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ — *যফরুল মুহাস্সিলীন*, করাচী, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা।

জোনাইদী, আজিমুল হক ও ফারুকী, মোহাম্মাদ তাহের — *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, পেশাওয়ার: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সী, ১৯৬০ খ্রি.।

নদভী, মাওলানা আবদুস সালাম — *ইকবালে কামেল*, লাহোর: আযমগড় প্রেস, ১৯৯১।

নাফিসী, সাঈদ — *জুসতজু দার আহওয়াল ওয়া আসারে ফরীদ উদ্দীন আত্তার নিশাপুরী*, তেহরান: কিতাব ফুরূশী ওয়া চাপ খানেয়ে ইকবাল, ১৩২০ ইরানী সাল।

নোমানী, শিবলী — *শে'রুল আজম*, লাহোর : আল ফয়সাল, ১৩২৫ হিজরী।

বাকী, এমাদুদ্দীন — *বাররাসেয়ে ইনকেলাবে ইরান*, তেহরান: নাশরে তাফাক্কুর, ১৯৯১।

বাদাখশানী, মির্যা মকবুল বেগ — *তারীখে ইরান*, লাহোর:মজলিসে তারাক্কীয়ে আদব, ১৯৬৭, ১ম খণ্ড।

——————— — *আদব নামেয়ে ইরান*, লাহোর: এস ডি প্রিন্টার্স তা.বি.।

ময়েজ উদ্দীন, অধ্যাপক মোহাম্মদ — *রাহনুমায়ে সুখান*, ঢাকা: কোরআন মঞ্জিল, তা.বি.।

রফীক, রফীক আহমদ — *এরশাদুত্তালেবীন ফী আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, করাচী: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি.।

রাশেদী, ওফা — *বাঙ্গাল মে উর্দু*, হায়দারাবাদ: ইশাআতে উর্দু প্রেস, ১৯৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

লতিফী, আশরাফ ও বোখারী, সাইয়্যেদ খোরশীদ হোসাইনি — *মোতালায়ে আদাবিয়্যাতে ইরান*, লাহোরঃ তাজ বুক ডিপো, ১৯৬৬।

লীভী, রীভীন — *ফারসি আদাব কী মোখতাসার তারিখ*, ড. হাফিজ উদ্দীন আহমদ কেরমানী (অনু.), লক্ষ্ণৌঃ নিযামী প্রেস, ১৯৮৫।

হাই, ড. আবদুল; আহসান, প্রফেসর আলী ও শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ — *বাংলা আদবকী তারীখ*, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

হোসাইন, কাজী সাজ্জাদ — *মাসনবীয়ে মওলভীয়ে মা'নাবী*, লাহোরঃ ইসলামী কুতুব খানা, তা.বি.।

সাহসারামী, প্রফেসর কলিম — *রেওয়াত ও দেরায়েত*, পাটনাঃ নুক্কাদ পাবলিশার, ১৯৯১ ।

আরবী গ্রন্থাবলী

খুরশীদ, ইব্রাহীম যাকী — *আত তারজামাহ ওয়া মাশকিলাতুহা*, আল হাইয়া আল মিসরিয়াহ আল আম্মা লিল কুত্তাব, ১৯৯৫ খ্রি.।

জাওহারী, ইসমাইল বিন হাম্মাদ আল — *তাজ আল লুগাহ ওয়াছিহা আল আরাবিয়া*।

জামিলী, ড. রশীদ — *হারাকাত আত তারজমাহ ওয়া আন নাক্বল ফিল মাশরিক আল ইসলামী ফিল ক্বারনাইন আল আউয়াল ওয়া আস সানী লিল হিজরাহ*, মানশুরাত জামিয়া কার ইউনুস।

নাদীম, ইবন — *আল ফিহরিস্ত*, মিশরঃ আল মাকতাবা আল তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, ১৩৮৪ হি.।

মানজুর, ইবন — *লিসান আল আরব*, ইবন মানজুর, *লিসান আল আরব* (বৈইরুতঃ দারে সাদের, তা.বি.।

মুহাম্মদ, ড. ফওজী আতিয়্যাহ — *ইলম আত তারজামাহ মাদখালুন লুগাবিয়্যান*, কায়রোঃ দার আস সাফা আল জাদীদাহ, তা.বি.।

মোবারকপুরী, আল্লামা শফিউর রহমান — *আর রাহীকুল মাখতুম*, খাদিজা আখতার রেজায়ী (অনূদিত), ঢাকাঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ১১তম সংস্করণ, ২০০৪।

যারকানী, মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আল — *মানাহিল আল ইরফান ফী উলুম আল কুরআন*, বৈরূতঃ দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গ্রন্থাবলী

আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ — *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

———— *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪।

———— *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪।

আউয়াল, আবুহেনা আবদুল — *নজরুলের সাহিত্যচিন্তা ও তাঁর সাহিত্য*, ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০১০।

আনিসুজ্জামান (সম্পা.) — *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

আবদুল হক, আবুল ফারাহ মুহাম্মদ (অনু.) — *রুমূয-ই-বেখুদী*, ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্‌, ১৯৫৫।

আবদুল কাদির, মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ — *অশ্রু সরোবর-* দীওয়ানু ইবনিল ফারীদ-এর কাব্যানুবাদ, বরিশাল: শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬।

আমীন, মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল — *ইলমুস সীগাহ*, ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.।

আলী, অধ্যাপক শাহেদ — *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান*, চট্টগ্রাম: জিলা কাউন্সিল বই ঘর, ১৯৬৫।

আলী, এম আকবর — *বিজ্ঞানী কবি ওমর খৈয়াম*, ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ১৯৯০।

আলী, মোহাম্মদ মোবারক — *শায়খ সাদী (র.)-এর গুলিস্তাঁ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

আলীম, এ. কে. এম আবদুল — *ভারতে মুসলিম ব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

———— *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

আলম, মাহবুবুল — *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬।

আলম, আলহাজ্জ শাহ সূফী সৈয়্যেদ জানে — *দিওয়ানে ওয়াইসী*, ঢাকা: খানকায়ে সুরেশ্বরী, ২০০১।

আলমুতি, আবদুল্লাহ — *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৬।

আসাদ, আমিন আল — *ফকীর গরীবুল্লাহ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৬৮ বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

————————	*মুহম্মদ বরকতুল্লাহ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।
————————	*ইমাম খোমেনী (র.) ও ইসলামী বিপ্লব,* ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৭।
আহমদ, আলী	*চোর ও সারমেয় সমাচার,* ঢাকা: বুক ক্লাব, ১৯৯১।
আহমদ, ওয়াকিল	*বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত,* ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬।
————————	*বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান,* ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৯।
————————	*মহাকবি আলাওল জীবন ও কাব্য,* ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১০।
আহমদ, মাওলানা নূরুদ্দীন	*অস-সবউল মু'আল্লাকাত,* ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২।
আহমদ, শাহাবুদ্দিন (সম্পা.)	*ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।
আহসান, সৈয়দ আলী	*কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা,* চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৩৭৫।
আহসান, সৈয়দ আলী ও হাই, মুহম্মদ আবদুল	*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪।
ইউসুফ, ফজলুল হাসান	*বাংলাদেশর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।
ইউসুফ, মনিরউদ্দীন	*আমার জীবন আমার অভিজ্ঞতা,* ঢাকা: কালান্তর প্রকাশনী, ১৯৯২।
ইসলাম, আজহার	*মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।
ইসলাম, জেহাদুল ও খান, ড. সাইফুল ইসলাম (অনূদিত)	*দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন,* ঢাকা: খাজা মঞ্জিল, ২০০৩।
ইসলাম, অধ্যাপক কাজী মো. শহীদুল ও ভুঁইয়া, অধ্যাপক মো. আবুল কাসেম (অনু.)	*গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।
ইসলাম, ড. মযহারুল	*কবি হেয়াত মামুদ,* রাজশাহী: বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, সিরাজুল (প্রধান সম্পাদক) — *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

———————— *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৩, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

———————— *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৪ ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

———————— *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৬ ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ ।

———————— *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৭, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

———————— *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৮ ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ ।

———————— *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৯, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

———————— *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ১০, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

———————— *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০।

উদ-দীন, আকবর — *বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

উদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর — *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা: হাসি প্রকাশনালয়, ২০০২।

উল্লাহ, এ, এন, সালামত — *হাজার বছরের বিস্ময়*, ঢাকা: তাযকীয়া প্রকাশনী, ১৪১০ হি.।

উল্লাহ্, মোহম্মদ মাহফুজ — *আবুল কালামশামসদ্দীন রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, ১ম খণ্ড।

ওয়াহিদ, আবদুল (সম্পা.) — *ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬।

কাইউম, মুহম্মাদ আব্দুল — *বরকতুলাহ রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

———————— *সাময়িক পত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।

———————— *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল ও সুলতানা, রাজিয়া (সংকলন ও সম্পাদনা) — *আলাওল রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

———— *রক্ত রঞ্জিত পথ*, ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১।

কবীর, এ. কে. এম আনোয়ারুল (অনু.) — *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, ঢাকা: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০০৪।

করিম, ড. আব্দুল — *ফুতূহাত-ই ফীরূজ শাহী*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

———— *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৭, ২য় প্রকাশ।

———— *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।

———— *বাংলার ইতিহাস: মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত*, ১২০০-১৮৫৭, ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯।

———— *পাক-ভারতে মুসলিম শাসন*, ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৯।

———— *আবদুল হক চৌধুরী ও তাঁর গবেষণাকর্ম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

———— *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

———— *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবন ও কর্ম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

———— *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

কাসেমী, মুফতী অলিউল্লাহ (অনু.) — *দরসে মীযান*, ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০৪।

কাদির, আবদুল — *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ*, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৯।

কাদের, ড. এম আবদুল (অনু.) — *সিয়ারে মুতাখ্খিরীন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

কাদির, আব্দুল (সম্পা.) — নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনঃমুদ্রণ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

কুণ্ড, ড. অশোক (সম্পা.) — *শাহ গরীবুল্লাহ বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা,* কলকাতাঃ বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থা, ১৯৮৯।

কোরায়শী, গোলাম সামদানী (অনু.) — *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

খাতুন, সনজিদা — *কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,* কলকাতাঃ নিতাই চন্দ্র দাস, ১৯৫৮।

খান, ফরহাদ ও রহমান, মো. সৈয়দুর — *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারকে নিবেদিত প্রবন্ধ সংকলন,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

খান, মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন — *ইমাম খোমেনীর কবিতা,* ঢাকাঃ সহিফা প্রকাশনী, ১৯৯১।

খান, রুহুল আমীন — *কাসীদা সওগাত,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

খান, মোহাম্মদ মুনীর হোসেন (অনু.) — *চির ভাস্বর মহানবী (সা.),* ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০০৪।

খানম, মাহমুদা — মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

খালেক, মুহম্মদ আবদুল — *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

খোমেনী, ইমাম — *অমিয় বাণী (উপদেশ ও দিকনির্দেশনা),* ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৬, দ্বিতীয় প্রকাশ।

গরীবুল্লাহ — গরীবুল্লাহ বিরচিত *জঙ্গনামা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় কতৃক সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ৬৫৩।

__________ — *অসীয়তনামে ইলাহীয়ে সীয়াসী,* তেহরানঃ মারকাযে চাপ ওয়া নাশেরে সাযমানে তাবলীগাতে ইসলামী, ১৩৭১ ইরানী সাল, ৬ষ্ঠ প্রকাশ।

গুপ্ত, শ্রীরামপ্রাণ (সম্পা.) — *রিয়াজ-উস-সালাতিন,* ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ, ২০০৫।

ঘোষ, কান্তি চন্দ্র — *রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

চক্রবর্ত্তী, রতনলাল — *আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

চট্টোপাধ্যায়, ড. সুধাকর — *অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ,* কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৮ বাংলা।

চৌধুরী, আ, ন, ম, রুহুল আমিন — *ইরান বিপ্লবের চেতনা,* ঢাকাঃ আল– আমিন পাবলিকেশন্স নর্থব্রুক হল রোড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, আবদুল মুকীত	*নজরুল ইসলাম:ইসলামী কবিতা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।
চৌধুরী, আবদুল মুকীত ও রহমতী, মুহাম্মদ হাসান	*ইমাম খোমেনী (রহ.)ও ইসলামী বিপ্লব,* ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৭।
———————	*দীওয়ান-ই-আলী* (রা.)-কাব্যানুবাদ, ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২।
চৌধুরী, আবদুল মমিন	*প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* ঢাকা: বর্ণায়ন, ২০০২।
চৌধুরী, আবদুল হক	*প্রবন্ধ বিচিত্রা ইতিহাস ও সাহিত্য,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।
চৌধুরী, খালেকদাদ (অনু.)	*বাহারিস্তান-ই-গায়বী,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।
চৌধুরী, বেলাল	*মনিরউদ্দীন ইউসুফ সংকলন,* ঢাকা: মনিরউদ্দীন ইউসুফ সংকলণ কমিটি, ১৯৮৯।
চৌধুরী, মোমেন (সম্পা.)	*মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪, ১ম খণ্ড।
———————	*জীবনী গ্রন্থমালা* ১৬, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।
জলিল, মুহম্মদ আবদুল	*শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।
জামান, ডক্টর হাসান	*সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭।
জাহাঙ্গীর, ড. আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ	*ড. গোলাম মাকসুদ হিলালী র্কমজীবন ও চিন্তাধারা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১।
ঢাকুবী, মাওলানা আবদুল মজিদ	*মসনবীয়ে রুমী,* ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৪।
তালুকদার, মো. মাঈনুদ্দিন	*আল্লাহ, রাসুল ও রিসালাত,* কোম: বিশ্ব সম্মেলন কমিটি, ২০০৪।
দাস, নিতাই	*পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
দেব, নরেন্দ্র	*রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।
দেহকান, আলী রেজা	*চেহেল নুকতে আয সীরে আমালীয়ে ইমাম খোমেনী (রঃ),* তেহরান: নাশরে রূহ/ কুম, খীয়াবানে আরাম, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮১ ইরানী সাল।
দোনাগাজী	*সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র — *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতাঃ শ্রী জগদীশ প্রেস, ১৩১৬ বাংলা।

ফরিদী, আবদুল হক — *মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশে*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬।

ফতেহপুরী, মুহাম্মদ নূরুদ্দীন — *বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সহ কারীমা*, ঢাকাঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ২০০০।

বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত — *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, কলিকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০৪ বাংলা।

বরকতুল্লাহ, মোহম্মদ — *জীবন স্মৃতি* (অপ্রকাশিত)।

বাকী, ড. মুহাম্মদ আবদুল — *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।

বাদশা, মো. আব্দুল কুদ্দুস ও তালুকদার, মো. মাঈনুদ্দীন — *আহকামে মুমিনাত*, খুলনাঃ আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতনী, ২০০৪।

বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস — *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজীবকান্ত দাস (সম্পা.) — *অন্নদা মঙ্গল*, কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১২৫০ বাংলা।

বেগম, নূরুন নাহার — *রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

বিশ্বাস, সুকুমার *বাংলা* — *একাডেমী পুঁথি পরিচয়-১*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

ভূঁইয়া, সুলতান আহমদ — *কবি শাহ মোহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল*, ঢাকাঃ মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৬৪ বাংলা।

মঈন, আইয়ুব বিন — *সহজ বোসতাঁ*, ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০০।

মঞ্জুর, নূরুল ইসলাম — *বাঙালীর ইতিহাস চর্চার ধারা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

মান্নান, মাওলানা আবদুল — *ছন্দে বাংলা কারীমা*, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.।

———————— — *ছন্দে বাংলা পান্দেনামা*, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.।

মান্নান, এ বি এম আব্দুল — *বোস্তাঁর বঙ্গানুবাদ*, বরিশালঃ কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, ১৯৯০।

মান্নান, সৈয়দ আবদুল (অনুঃ) — *আস্‌রারে খুদী*, ঢাকাঃ তমদ্দুন পাবলিকেশন্স, ১৯৫০।

মা'বুদ, মুহাম্মদ আবদুল — *আল্লাহর পথের সৈনিক*, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ — *হাফিজের কবিতা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩।

মুজাম্মিল, খন্দকার — *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

———— *সৈয়দ নুরুদ্দীন জীবন ও গ্রন্থাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

মুসা, মাওলানা আবু — *গুলিস্তাঁ*, ঢাকা: ইছামতি অফসেট প্রেস, ১৯৯৮।

মজিদী, নূর হোসেন — *ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৭।

———— *ইরানের সমকালীন ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৬।

মোবারকপুরী, আল্লামা শফিউর রহমান — *আর রাহীকুল মাখতুম*, অনুবাদক - খাদিজা আখতার রেজায়ী, ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ১১তম সংস্করণ, ২০০৪।

মোর্তাজা, মো. আলী ও রহমান, মোহাম্মদ মিজানুর — *মহাকালের ত্রাণকর্তা*, খুলনা: আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতনী, ২০০৫।

মল্লিক, নূর মোহাম্মদ — *ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে*, ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ২০০০।

মিয়া, ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান (সম্পা.) — *মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত সংগ্রাম হুসন*, ঢাকা: জ্যোতি প্রকাশন, ২০০২।

———— "কবি নজরুলের সাহিত্যকর্ম: ইরানী সাহিত্যের প্রভাব" *প্রবন্ধ সমুচ্চয়*, ঢাকা: জ্যোতি প্রকাশন, ২০০৮।

মুসা, মনসুর — *প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা*, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী, ২০০০।

মোল্লা, অধ্যাপক আবদুস সালাম (অনুবাদক) — *দি প্রফেট*, ঢাকা: গ্রাজুয়েট প্রডাক্ট বিডি লি., ২০০৬।

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ — *তবকাত-ই-নাসিরী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

———— *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন*, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৫।

———— *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

———— *মোজাফফরনামা ও নওবাহরি-ই-মুর্শিদকুলীখানি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

রশীদ, আ. ন. ম. বজলুর — *আমাদের সূফী সাধক,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭।

রসুল, মোহাম্মদ গোলাম — *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস,* ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৭৩।

রহমান, আহমদ ফজলুর (অনু.) — *তবকাত-ই-আকবরী,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

——————— *আইন–ই–আকবরী,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

রহমান, এ. কে. এম. মাহবুবুর — *ঈদে মিলাদুন্নবী উৎযাপন কি ও কেন,* আল-ফাতিহা গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৫।

রহমান এ. কে. এম মাহবুবুর ও শাহজালাল মুহাম্মদ (অনু.) — *কেবরিতে আহ্‌মার* (ঢাকা: ফাহমী প্রকাশনী, ২০০০।

——————— *সিররে হক্ক জামে নূর,* ঢাকা: খানকায়ে সুরেশ্বরী, ২০০৪।

রহমান, খন্দকার আব্দুর — জীবনী গ্রন্থমালা, (আমীর খসরু), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

রহমান, ড. মাহবুবুর — *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ১৯৪৭-৭১, ঢাকা: সময় প্রকাশ, ১৯৯৯।

রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর — *কাসীদাতুল বুরদাহ,* ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০১।

রহমান, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর — *সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪।

রহমান, চৌধুরী শামসুর — *সম্রাট হুমায়ূনের কাহিনী,* ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০২।

রহমান, সাঈদ-উর — *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা,* ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।

রহমান, হাফেজ মাওলানা হাবীবুর (অনু.) — *মালাবুদ্দা মিনহু,* ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.) — *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র,* ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

রহীম, ডক্টর এম.এ. আবদুর — *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত) ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

রহমান, হাকীম হাবিবুর — *আসুদেগানে ঢাকা,* ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৪৬।

রহমান, হাফেজ মাওলানা হাবীবুর (অনু.) — *সহজ পাঞ্জগঞ্জ ও যুবদাহ,* ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫।

——————— *সহজ ই'লমুছ ছীগাহ বাংলা,* ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

———————	*প্রশ্নোত্তরে সহজ নাহ্বেমীর*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫।
———————	*মালাবুদ্দা মিনহু*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৫।
রশীদ, মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর	*সহজ গুলিস্তা*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৯।
রশীদ, মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর	*সহজ পান্দ নামা*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৪।
রসূল, অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম	*ইকবাল প্রতিভা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।
রহমান যশোরী, মাওলানা হাফিজুর (অনু.)	*পাঞ্জগাঞ্জ*, ঢাকা: আল-আকসা লাইব্রেরী, ২০০৪।
———————	*সহজ পান্দ নামা*, ঢাকা: আল-আকসা প্রকাশনী, ২০০১।
———————	*সহজ ফার্সী-বালা নাহবেমীর*, ঢাকা: আল-আকসা লাইব্রেরী, তা.বি.।
———————	*সহজ বাংলা ই'লমুছ ছীগা*, ঢাকা: আল-আকসা লাইব্রেরী, ২০০১।
———————	*মালাবুদ্দা মিনহু*, ঢাকা: আল-আকসা লাইব্রেরী, ২০০৪।
রাজ্জাক, মুহাম্মদ আবদুর (অনু.)	*আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।
রায়, ডক্টর মোহিতকুমার	*ভাষাবিজ্ঞানের গোড়ার কথা*, কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮।
রায়হান, সৈয়দ আবু	*ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত*, টাঙ্গাইল: রীনা খান, ১৯৯৫।
শরীফ, আহমদ	*বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮, ১ম ও ২য় খণ্ড।
———————	*বাঙলার সূফী সাধক*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।
———————	*সওয়াল সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।
———————	মুহম্মদ কবীর বিরচিত *মধুমালতী*, ঢাকা: বাঙলা একাডেমী ১২৬৬ বাংলা।
———————	*পুথি পরিচিতি*, ঢাকা: বাঙলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।
———————	*লায়লী-মজনু*, বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৬।
———————	*শা'বারিদ গ্রন্থাবলী*, ঢাকা: বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ১৯৬৬।
———————	*আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

———————— *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

শরীফ, মীর সায়্যিদ — *নাহবেমীর*, ঢাকা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।

শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ — *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ — *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: রেনেসাস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭।

———————— *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড, ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭।

———————— *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০।

———————— *দীওআন-ই হাফিয*, ঢাকা: রেনেসাস প্রিন্টার্স, ১৯৫৯।

———————— *ইকবাল*, ঢাকা: রেনেসাস প্রিন্টার্স, ১৯৫৮।

শাকেরউল্লাহ, মোহাম্মদ — *জীবনী গ্রন্থমালা আবদুস সাত্তার*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১।

শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা — *ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী*, ঢাকা: ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী, ১৯৯০।

শিকদার, আবদুল হাই — *মনিরউদ্দীন ইউসুফ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

সম্পাদনা পরিষদ — *ইসলামী বিশ্বকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

———————— *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

———————— *আলোর স্মারক*, ইতিহাসের চির ভাস্বর অবয়ব খোমেনী, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১৯৯০।

———————— *আলোর পথে*, ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অসিয়তনামা, একটি অনুবাদ গোষ্ঠী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পা., ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮৯।

———————— *জামারানের পীর* (ইমাম খোমেনী (র.) স্মরণে নিবেদিত সংকলন), ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪।

———————— *বাংলাদেশী পত্রপত্রিকার দৃষ্টিতে ইমাম খোমেনী*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ১৯৯০।

সফিয়ুল্লাহ, মুহম্মদ (সম্পা.) — *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ* (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স,১৯৬৭), পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার, মো. জিয়াউদ্দিন — *বাংলাদেশে আরবী সাহিত্য চর্চা : সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব*, (অপ্রকাশিত-এম.ফিল থিসিস)।

সাইয়েদ, আহসান — *তাওফীক আল-হাকীমের নাটক*, ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০২।

সাকলায়েন, ড. গোলাম — *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য*, ঢাকা: পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯, ২য় সংস্করণ।

———— *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

———— *কবি মোজাম্মেল হক ও ফেরদৌসী-চরিত*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮।

সামাদ, এবনে গোলাম — *ইসলামী শিল্পকলা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

সাহাবুদ্দিন, মুহাম্মদ — *ইমাম খোমেনী*, মুর্শিদাবাদ: জীবাক প্রকাশনী, ১৯৯৮।

সাত্তার, মাওলানা আবদুস (অনু.) — *ফারসী কী পহেলী কিতাব*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৪।

সাত্তার, মৌলভী আবদুস — তারীখে মাদ্রাসায়ে আলীয়া, ঢাকা: মাদ্রাসা-এ-আলিয়া, ১৯৫৯।

সাত্তার, আব্দুস — *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯।

———— *বালি ও ফেনা*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৩।

———— *আধুনিক আরবী গল্প*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৫।

———— *মসনবীর গল্প*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০।

———— *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ*, ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২।

———— *আধুনিক আরবী ফার্সী তুর্কী কবিতা*, ঢাকা: নয়া দুনিয়া পাবলিকেশান্স, ১৯৮৭।

সুলতানা, রাজিয়া — *সাহিত্য বীক্ষণ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

সেন, সুকুমার — *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০০।

সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান — *অনুবাদ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

সুলতানা, রাজিয়া — *আবদুল হাকিমঃ কবি ও কাব্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

সৈয়দ, আব্দুল মান্নান (সম্পা.) — *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

———————	ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
স্বপন, আনিসুর রহমান	*তাহেরেহ্ সফরজাদেহ: স্বনির্বাচিত কবিতা,* ঢাকা: বুকভিউ, নিউমার্কেট, ১৯৯১।
———————	*বাংলাদেশে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য,* ঢাকা: বুক ভিউ, ১৪০২ বাংলা সাল।
হক, অধ্যাপক সিরাজুল	*আল্লামা ইকবালের জীবন ও কর্ম,* ঢাকা: মাসিক নিউজ লেটার, ১৯৯৭।
হক, আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল (অনু.)	*রুমূয-ই-বেখুদী,* ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স্, ১৯৫৫।
হক, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল	*মুসলিম বাংলা-সাহিত্য,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।
হক, নজরুল	*মসনবীর কাহিনী,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০।
হক, শাইখুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল	*মাওলানা রুমীর মাছনবী শরীফ,* ঢাকা: রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৩।
হবিবুল্লাহ, আবু মহামেদ	*বিলায়েতনামা,* ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮১।
হাওলাদার, ড. মোহাম্মদ ছবিরুল ইসলাম	*ফররুখ আহমদের কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ ও ইসলামী উপাদান: একটি মূল্যায়ন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭।
হাফিজ, আবদুল	*হাফিজের গজলগুচ্ছ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।
হায়দার, ইউসুফ	*ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ,* ঢাকা: ঢাকা প্রকাশন, ১৯৮৫।
হারুন, শরীফ (সম্পা.)	বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।
হাসান, মুন্সী মোহাম্মদ রফিকুল	*ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নবুওতের ধারা,* ঢাকা: ডন পাবলিকেশান্স, ২০০২।
হারুন, মোস্তফা (অনূ.)	*হুমায়ুন নামা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।
হোসেন, কাজী আকরম	*দীওয়ান ই হাফিজ,* ঢাকা: আযাদ প্রকাশনী, ১৯৬১।
হোসেন, সেলিনা ও ইসলাম, নূরুল (সম্পা.)	*বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।
হোসেন, যাহিদ (অনু.)	*সিয়াসত নামা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
হোসাইন, হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ সাখাওয়াত (অনু.)	*মা–লা–বুদ্দা মিনহু,* ঢাকা: আশরাফিয়া বুক হাউস, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী গ্রন্থসমূহ

Arberry, A. J. — *Classical Persian Literature,* London: Geprge Allen and Unwin ltd. 1958.

Armajani, Yahya — *Middle East Past and Present,* New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood cliffs, 1970.

Aarabi, Gholam Hossein — *Six Theories About The Islamic Revolution`s Victory,* Tehran: Al Hodh Publishers, 2000.

Ahmad, Tanwir — *A Short History of Persian Literature,* Calcutta: Naaz Publishing Centre, 1991.

Aryanpur, Abbas — *THA NEW UNABRIDGED ENGLISH – PERSIAN DICTIONARY,* Tehran: Amir-kabir Publishing & Printing Institution, 1996.

Asher, R E (ed.) — *The Encyclopedia of Language and Linguistics,* Oxford: Pergamam Press, 1994.

Avery, Peter — *Modern Iran,* London: Ernest Benn Limited, 1967.

Aziz Hatami, Donald N. Wilber — *Iran,* Tehran: Ettela'at Press, 1963.

———— — *Iran Past and Present*, New Jersey : Princeton University Press, 1958.

Browne, Edward G. — *A Literary History of Persia*, London: Cambridge University Press, 1928, Vol. 2.

Crystal, David — *The Cambridge Encyclopedia of Language*, second edition, Cambridge university press.

Chatterji, Nikshoy C. — *A History of Modern Middle East*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1987.

Hastings, James — *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 3, New York : Charles Scribner's Sons, 1959.

Hoque, Enamul — *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents. Dhaka: 1968, p. 196.*

Ikram, S.M. & Spear (ed.) — *Cultural Heritage of Pakistan, London*: Oxford University Press, 1955.

Jaffar, S. M. — *The Mughal Empire,* Delhi: 1974

Kashani, Abbas Aryanpur — *Persian English Dictionary*, Tehran: Amir Kabir Publication, 2004.

———— — *THA NEW UNABRIDGED ENGLISH – PERSIAN DICTIONARY,* Tehran: Amir-kabir Publishing & Printing Institution, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

Krishraswamy, S.K.Verma.n — *Modern linguistics: An Introduction*, Oxford University Press, 1989.

Panahi, Dr. Mohammad Hossein — *An Introduction to The Islamic Revolution of Iran and Its Slogans*, London: Al-Hoda, 2001, p.11.

Prasad, Ishwari — *A Short history of Muslim Rule in India*, Allahabad: The Indian Press (Publications) Private Ltd., 1994.

Qaderi, Dr. Sayyid Ali,Translated and Edited: M.J.Khalili and Dr.Salar Manafi Anari — *The Life of Imam Khomeini,* Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, First Edition, 2001.

Rajput, A.B. — *Iran, To-Day,* Lahore : Lion Press, 1953.

Sarker, J.N — *History of Bengal*, Vol.-2, Dacca University, 1948.

Savory, Roger — *Iran Under the Safavid*, New York : Cambridge University Press, 1980.

Shojakhani, M. & Rikhtehgaran — M.R, *Indo-Iranian Thought: A World Heritage*, Delhi: 1995.

Smith, Vincent A C.I.E — *The Oxford History of India,* Oxford: At the Clarendon Press, 1958.

Subhan, Abdus — *Ta'rikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi*, Calcutta: The Asiatic Society, 1969.

Srivastava, Ashirbad Lal — *The Mughal Empire* (1526-1803 A.D.), Agra: Shiva Lal Agarwala & Co., (Private) Ltd., 1957.

Waiz Lal, Joel — *An Introductory History of Persian Literature*, Delhi: Adma Ram & Sons.

The Encyclopedia Americana, Vol. 15. Grlier Incoporated, 1984.

New Standard Encyclopedia, Vol. 9, Chicago: Ferguson Publishing Company, 2001, Vol. 9.

The New Encyclopeadia Britannica, Vol. 6, London: Encyclopeadia Britannica Inc., 2002.

Britannica Ready Reference Encyclopeadia, New Delhi: Encyclopeadia Britannica (India) pvt. ltd. and Impulse Merketing , Vo. 5, 2005 A .D.

The World Book Encyclopedia, Vol. 10.

The Macmillan Family Encyclopedia,Vol. 11.

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি প্রবন্ধ

মজুমদার, ড. কুলসুম আবুল বাশার	*পেইভান্দহায়ে মাওজুদ দরমিয়ানে দু' যাবান ফারসি ওয়া বাঙালী,* ইসলামাবাদঃ ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩ খ্রি.।
বিল্লাহ, আবু মূসা মোঃ আরিফ	*ফারসি দর বাংলাদেশ,* রাহ আভারদ, তেহরানঃ গুজারিশে নাখুস্তিনে মাজমায়ে বাইনাল মিলালী উস্তাদানে যাবানে ফারসি ইরান, ১৩৭৬ ইরানী সাল।
বানু, শামীম	*তারীখচেহ অ'মুযেশে যাবানে ফারসি দর বাংলাদেশ ভা মুশকিলাতে কানুনীয়ে অ'ন,* রাহ আভারদ, তেহরানঃ গুজারেশে নাখুস্তিনে মাজমায়ে বাইনাল মিলালী উস্তাদানে যাবানে ফারসি, ১৩৭৬ ইরানী সাল।
বিল্লাহ, আবু মূসা মোঃ আরিফ	*খিদমাতে দা'নেশমান্দানে শিবহে ক্বারেহ বেযাবানে আদাবিয়তে ফারসি,* ইসলামাবাদঃ ইরান-পাকিস্তান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩ খ্রি.।
ফারসি, ফারহাঙ্গেস্তানে যাবান ওয়া আদবে	*দা'নেশনামায়ে যাবান ওয়া আদবে ফারসি দার শিবহে ক্বারেহ,* তেহরানঃ ফারহাঙ্গেস্তানে যাবান ওয়া আদবে ফারসি, ১৩৮৪ ইরানী সাল।
সরকার, মো. আবুল কালাম	'তরজমায়ে মুতূনে ফারসি বেযবানে বাংলা বা'দায পেইরোযীয়ে ইনকেলাবে ইসলামী দর ইরান', *মাজাল্লায়ে ফারসি ও উর্দু,* দানেশগাহে দাকা, ঢাকাঃ বাখশে ফারসি ও উর্দু, ২০০৫।

বাংলা প্রবন্ধ

মজুমদার, কুলসুম আবুল বাশার ও খান, মুহাম্মদ আব্দুস সবুর	*ফারসি সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।
আহমদ, ওয়াকিল	"সুফী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯।
ভূঁইয়া, সুলতান আহমদ	*কবি শাহ মোহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল,* ঢাকাঃ মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৬৪ বাংলা।
শরীফ, ড. আহমদ	*তোহ্‌ফা* ঢাকাঃ সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৪।
করিম, আবদুল	*গৌড়-পাণ্ডুয়ার ইতিহাস,* ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা ১৯৮৯, খণ্ড ৭।
বিল্লাহ, আবু মূসা মো. আরিফ	'বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ও অভিধান' *সাহিত্য পত্রিক,* ঢাকাঃ সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আষাঢ় ১৪০২, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ২।

Dhaka University Institutional Repository

খাঁন, কে এম সাইফুল ইসলাম ও সিরাজী, তারিক জিয়াউর রহমান — *আব্দুল করিম খাকি : জীবন ও সাহিত্য-প্রতিভা*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩, একবিংশ খণ্ড।

পাল, শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র — *বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ সংকলন*, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৬৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শরীফ, ড. আহমদ — *তোহ্ফা*, ঢাকা: সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৪।

হক, অধ্যাপক সিরাজুল (সম্পা.) — *নিউজ লেটার*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, নভেম্বর -ডিসেম্বর- ২০০২, ২৪তম বর্ষ ১১-১২ সংখ্যা।

——————— — *নিউজ লেটার*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৫) ১৭তম বর্ষ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ইংরেজী প্রবন্ধ

An Introduction to The Islamic Revolution of Iran and Its Slogans.

Imam Khomeini (a.s) A Portrait, Tehran : Headquarters for the 100th Birth Anniversary of Imam Khomeini (a.s), 2000.

Imam Khomeini (a.s) A Portrait, Tehran: Headquarters for the 100th Birth Anniversary of Imam Khomeini (a.s), 2000.

Islamic Revolution of Iran, Tehran: Islamic Propagation Organization, 1991.

Journal of the Asiatic Society of Pakistan Dacca. vol. X111, no.1 April 1968, p. 122.

The International WEBSTER New Encyclopedic Dictionary of the English Language & LIBRARY OF USEFUL KNOWLEDGE, TABOR HOUSE, NEWYORK,P.1047.

Translation/History/culture, ed.Andre Lefevere, Routeledge, London, 1992, p. 1.

Web Address

Central Intellegence Agency (CIA), *The World Sect Book Bangladesh 2011*, Available at: www.cia.gov/library/publications on 28.07.2011.

University Grants Commission of Bangladesh (UGC), 2011, *List of the University in Bangladesh*, Available at: www.ugc.gov.bd/university on 28.07.2011.

Available at: www.iranembassy.org.za/e/trade/iran%20statistics.htm on 29.07.2011.